মপাসাঁ রচনাসমগ্র

প্রথম খণ্ড

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

দেবাশীষ দে

বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড

৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূতা দেবীপ্রতিমা স্বরূপা অগ্রজা রত্না দত্তকে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাসহ এবং আমার একান্ত প্রেমময়ী সহধর্মিণী ইতি দেকে ঐকান্তিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ এই গ্রন্থ. উৎসর্গ করলাম—

দেবাশীষ দে

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দিতে গী দ্য মঁপাসা বিশাল ও বিস্তীর্ণ ফরাসি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন তা এক কথায় অসাধারণ। তাঁর রচনার মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের অসংখ্য ত্রুটি ও দুর্বলতাকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন এবং তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রুপে বিব্ধ করেছেন।

হেনরি রেনে অ্যালবার্ট গী দ্য মঁপাসা ফরাসি সাহিত্যে ছোটোগল্প লেখক হিসাবে লাভ করেছেন সমস্ত বিশ্বের স্বীকৃতি, ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তা। তিনি যে সমস্ত ছোটোগল্প রচনা করেছেন, কোনো-না-কোনোভাবে সেই সমস্ত গল্পের চরিত্রদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর রচনা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে ফলে তিনি ছোটোগল্পকার হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগ থেকে তাঁর সমগ্র রচনা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে বাঙালি পাঠকসমাজের কাছে মনোগ্রাহী রচনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর রচনা ও ছোটোগল্পে স্থান পেয়েছে, নরম্যানডির কৃষক সম্প্রদায়, সরকারি অফিসের কর্মী এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী মানুষের চরিত্র ও জীবনকাহিনি। সে সমস্ত রচনা তাদের চরিত্র ও জীবনকাহিনি আবিষ্কারভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভুত না হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও সম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে। এই মাধ্যমের উৎকর্ষতা গুণগত বৈশিষ্ট্যে এক অসাধারণ ও অনবদ্য স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছিল। তাঁর সমস্ত রচনা, সহজ স্বাভাবিক ও সুন্দর রসের স্পর্শে সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তিনি তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মেলামেশা করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন—তাই তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিপূর্বে কোনো সাহিত্যিক ভালো বা মন্দের পক্ষপাতিত্বকে অস্বীকার করে তাঁদের রচনাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেননি। তাঁর রচনার মধ্যে তত বেশি দার্শনিক, নৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব স্থান লাভ করেনি—তা হয়ে উঠেছিল নিজস্ব গুণে স্বাভাবিক, সহজ ও স্বচ্ছন্দ। তাঁর শৈল্পিক সৃষ্টির উপাদান হিসাবে তিনি তাদের জীবন ও চরিত্র থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন সাহিত্যোপযোগী রসদ ও উপকরণ। সঠিক শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাগুরু ফ্লবার্টের কাছে একান্ত আন্তরিকতা, আগ্রহ ও একাগ্রতার সঙ্গে শিক্ষালাভ করেছিলেন। গল্পের চরিত্র ও প্রেক্ষাপট থেকে সারাংশ আহরণ করে কীভাবে তা গল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে হবে—সে বিষয়ে তাঁর শিক্ষাগুরু তাঁকে শিক্ষা দিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা কার্পণ্য করেননি। এ সমস্ত সত্ত্বেও তাঁর গল্প বা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গিয়েছে। সাহিত্যোপযোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক এবং উপযুক্ত উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া যে কতটা অসম্ভব তা তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিকাঠামো থেকে কিছুটা অন্তত উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। অবশ্যই সেই অসম্ভবকে একমাত্র মঁপাসাই সম্ভব করে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর এই অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন সুদীর্ঘ দশটি বছর। এই মূল্যবান সময়ের মধ্যে তিনি রচনা করেছিলেন অসংখ্য ছোটোগল্প। তাদের মধ্যে যেগুলো শ্রেষ্ঠ

হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে, সেগুলো সঠিক ও উপযুক্ত বর্ণনার গুণে অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্প ও রচনার মধ্যে যে চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা নৈরাশ্য, নিরানন্দ ও বিষাদে আচ্ছন্ন। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে চরিত্রের কুৎসিত এমনকি সময় সময় হীন, নৃশংস ও নিষ্ঠুর রূপ। সে সমস্ত সত্ত্বেও তাঁর রচনার রূপরেখা সূক্ষ্ম কারুকার্যের নৈপুণ্যগুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি বছর, মঁপাসাকে মানসিক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে তাঁকে উন্মাদাশ্রমে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে তাঁকে বেশ কয়েক বছর বাস করতে হয়েছিল চিকিৎসকদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে। একজন নারীবিদ্বেষী হিসাবে সর্বত্র তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল—কিন্তু যেভাবে তিনি দেহোপজীবীণীদের চরিত্র চিত্রায়ণ করেছেন—তা থেকে উপলব্ধি করা যায়—তাদের সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

খুবসম্ভব মঁপাসা ফরাসি দেশের Chateau de Miromesniel, Dieppe-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক পূর্বপুরুষরা ছিলেন Custav Flaubert'এর ধর্মপিতা। তাঁর বয়স যখন মাত্র এগারো বছর, তখন তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। মঁপাসা নরম্যানডির গ্রাম্য পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠেন। তাঁর অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রভাবে তিনি নিজের মনের মণিকোঠায় অসংখ্য তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করে রাখতে পারতেন। সেগুলো কখনও বিস্মৃতির অন্তরালে লুপ্ত হয়ে যেত না। এই সমস্ত তথ্য বা সংবাদ পরবর্তীকালে নরম্যান জাতির মানুষকে নিয়ে গল্প লেখার সময়ে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

মঁপাসার কিশোর বয়সে, কবি Algernon Swinburne (1837-1909) তাঁকে একটা মমিতে পরিণত হতে দেখিয়েছিলেন। মঁপাসা তাঁর রচিত প্রথম দিকের ছোটোগল্প, La Main Ecorchee তে ভৌতিক বিষয়ের উপস্থাপনা করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে মঁপাসা প্যারিসে এসে আইন পড়তে শুরু করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে, ফরাসি ও প্রাশীয়দের মধ্যে যে যুদ্ধের সূচনা হয়, তাতে তিনি ফরাসি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধশেষে তিনি যখন আবার প্যারিসে ফিরে আসেন, তখন তিনি Custav Flaubert-এর সাহিত্যচক্রে যোগদান করেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন মঁপাসার মায়ের বন্ধুর বন্ধুস্থানীয় এবং সেই সম্পর্কের সূত্রে মঁপাসার প্রতি ভদ্রলোকের স্নেহ ভালোবাসার কোনো অভাব দেখা যায়নি। তিনি মঁপাসাকে খ্যাতিমান সাহিত্যিক Emile Zola, Ivan Turgenev ও Henry James-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। Flavbert-এর সুনিপুণ লেখনশৈলী থেকে ছোটোগল্পকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণের যথার্থতা ও নৈপুণ্য এবং স্টাইল-এর সূক্ষ্মতা এবং সমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

১৮৭২ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত অসামরিক সরকারি বিভাগে চাকরি করেন। প্রথমে তিনি জাহাজ চালনা সম্পর্কিত কাজে যোগ দেন এবং পরে শিক্ষা-মন্ত্রীর দপ্তরে নিযুক্ত হন। তাঁর মধ্যে কাব্যপ্রতিভারও স্ফুরণ ঘটেছিল এবং একজন কৃতি কবি হিসাবে DESVERS (1880) নামক কবিতায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ওই বছরেই তাঁর রচনার সংকলন গ্রন্থ Soirées de Medan (1880) এ

Emil Zola, তাঁর রচিত অনবদ্য গল্প, Boule De Suif (1880)-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন এবং অসাধারণ দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। ফরাসি-প্রাশীয় যুদ্ধের সময় এই গল্পের পরিকল্পনা করেন। মঁপাসা রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন এবং দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ তাঁর খ্যাতি মধ্যগগনের সূর্যের মতো ভাস্বর হয়ে ছিল। তিনি প্রায় তিনশো গল্প রচনা করেছিলেন, সংবাদপত্রে article. লিখেছিলেন দুশো, রচনা করেছিলেন ছ'খানি মনোগ্রাহী উপন্যাস ও তিনখানি ভ্রমণসংক্রান্ত গ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর রচনার তালিকাভুক্ত হয়েছিল একগুচ্ছ কবিতা এবং সেগুলো একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

মঁপাসার রচিত সমস্ত গল্প উদ্দেশ্য, সুনিয়ন্ত্রিত স্টাইল এবং সময় সময় মারাত্মক হাস্যরসের বৈশিষ্ট্যে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। সাধারণত গল্পগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার টুকরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং ব্যক্ত হয়েছে মানুষের জীবনের গোপন দিক।

মঁপাসার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম গ্রন্থখানি হল UNEVIE (একটি নারীর জীবনী, 1883)। এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে নরম্যান জাতির একজন বধূর নৈরাশ্য ও হতাশাপূর্ণ জীবনযাপন। BEL-AMI (1885) নামক উপন্যাসে, নীতিজ্ঞানহীন, অবিবেকি একজন সাংবাদিকের চরিত্র চিত্রন করেছেন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। PIERRE ET JEAN (1888) উপন্যাসে দুই ভাইয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে একজন যোগ্য মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে অনৈতিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে কারণ এই উপন্যাসের নায়ক অনৈতিক কাজের মাধ্যমে জীবনে সাফল্যের সিঁড়িগুলো একটি একটি করে অতিক্রম করে গেছে। মঁপাসার সব থেকে রোমহর্ষক 'হরর' গল্প LE HORLA লেখা হয়েছে পরপর অনেকগুলো আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই গল্পের নামবিহীন প্রধান চরিত্র একজন সিফিলিসের রোগী। গল্পের শুবুতে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন নরম্যান ভদ্রলোক, যিনি এই গল্পের বর্ণনা দিচ্ছেন, দেখতে পেলেন তিন-দাঁড়ের ব্রাজিলের একটা নৌকো তাঁর বাড়ির পাশের নদীটির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। তিনি নৌকোর ওপর হোরলাকে দেখে অভিবাদন জানালেন—যে হোরলা এক অদৃশ্য প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই হোরলারা রক্তশোষক পিশাচদের জ্ঞাতিভাই। তাদের আগমন বা আর্বিভাব থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট যে মানুষের আধিপত্য করার কাল শেষ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাহিনির বর্ণনাকারী তাঁর গৃহে বসবাসকারী হোরলাকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু এতে হোরলারা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে তাঁর চাকরবাকররা ওই আগুনে পুড়ে মারা গেল। তিনি অনুভব করলেন, হোরলারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, সুতরাং তিনি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মঁপাসা তাঁর কুড়ি বছর বয়সে সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন রোগভোগের পর তাঁর মাথার গোলমাল দেখা দিল। এর পর তাঁর দুঃস্বপ্নকেন্দ্রিক গল্পগুলোর মধ্যে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছিল। এই সমস্ত গল্পের সঙ্গে Edgar Allan Poe-এর অতিলৌকিক গল্পগুলোর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলোতে তাঁর অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় এবং তা থেকেই তাঁর গল্পের সমালোচকরা তাঁর মানসিক অসুস্থতার কথা

অনুধাবন করেন আর •এই মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারটা তাঁর গল্পগ্রন্থ LA MAISON TELLIER (1881)-এ প্রতিফলিত হয়। তাঁর রচিত সমস্ত গল্পগুলোর এক-দশমাংশ অর্থাৎ উনচল্লিশটি গল্প 'হরর' গল্পের পর্যায়ভুক্ত। এই গল্পগুলোর মধ্যেও তাঁর মানসিক অসুস্থতার প্রকাশ ঘটেছে। 'A Night in Paris' গল্পে লেখকের সন্দিগ্ধ মনের এবং অপরের প্রতি অবিশ্বাসের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়। এই গল্পের বর্ণনাকারীর সর্বদাই মনে হয়, তাকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেই হবে। ঘরের আসবাবপত্র দেখলে তাঁর মধ্যে এক ধরণের delusion গড়ে ওঠে। 'A Mad man' নামক গল্পটি একজন বিচারককে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা লাভের জন্য একজনকে হত্যা করেন এবং একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে সেই হত্যার অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মঁপাসা রচিত 'The Inn' নামক উপন্যাসের সঙ্গে Stephen King's বিখ্যাত উপন্যাস, 'The Shining' এর যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির মূল কাহিনি দুজন Care-taker কে কেন্দ্র করে। তারা আল্পস পর্বত থেকে বহুদূরের একটি সরাইখানায় বাস করত। দীর্ঘ ছ'মাস যাবৎ সরাইখানাটির চারিপাশে যে বরফের পাহাড় জমে যেত, তা অতিক্রম করে সেই সরাইখানায় পৌঁছোনো অসম্ভব ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ Care-takerটি হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল। সে বাইরে বেরিয়েছিল কয়েকটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য। কিন্তু সে আর ফিরে এল না। এর পরে বয়োঃকনিষ্ঠ Care-takerটির একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা ভয়ংকরভাবে দুঃসহ হয়ে উঠল এবং একদিন সে পাগল হয়ে গেল। 'হাত' নামক গল্পটি পড়ে বহু সাহিত্যিক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক অনুপ্রাণিত হন। এর পর Lizard's Tail নামক উপন্যাস অবলম্বনে 1946 সালে চিত্র পরিচালক Robert Florey, 1960 সালে Henry Cass এবং 1981 সালে Oliver Stone একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন।

1892 সালের 2n January মঁপাসা নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। এর পরে তাঁকে প্যারিসের প্যাসে অঞ্চলে Dr. Esprit Blanch-এর উন্মাদাশ্রমে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানেই তিনি পরের বছর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মঁপাসার অধিকাংশ ছোটোগল্পগুলোর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ জীবনকাহিনি। তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম, ঘাতপ্রতিঘাতের বাস্তব কাহিনিগুলো হয়ে উঠেছে যেমন সংবেদনশীল, তেমনি হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক ও মর্মস্পর্শী। এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে তাদের জীবনের অনেক গোপনীয় ঘটনা। একথা সত্য বলে দাবি করা হয় যে মঁপাসা রচিত সমস্ত গল্প তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। যদিও মনে করা হয় লোকের মুখে যে সমস্ত ঘটনার কথা শুনতেন, সেগুলোকে গল্পের রূপ দিয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক ও মনোগ্রাহী করে তুলতেন। মঁপাসার লেখনশৈলী বা রচনাশৈলীকে অনুকরণ করেছেন অগণিত সাহিত্যিক এমনকি Somerset Maughm ও O Henry-এর মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তাঁর রচনাশৈলীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

মঁপাসার উপরে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে, সেগুলি হল, Edward D Sullivan-

এর Maupassant The Novelist (1954), John L. Ducan-এর Illusion and reality (1973), Lev Tolstoy-এর Guy de Maupassant (1974), Mary Donaldson–Evans-এর Woman's Revenge: The Chronology of Dispossession in Maupassant's Fiction (1986), Paul Perron-এর Maupassant: The Semiotics of Text (1988), Bertrand Logan Ball ও Helan Roulston-এর Love and Nature ও Unity and Doubting in the Novels of Maupassant (1989), Rachel M. Hartig-এর Struggling under the Destructive Clance : Androgyny in the Novels of Guy de Maupassant (1991), Richard Fusco-র Maupassant and the American Short Story (1994); Charles J. Stivale-এর The Art of Rupture (1994), David Pringle-এর St. James Guide to Horror, Ghost and Gothic writers (1998), Michael Betten Court-এর Guy de Maupassant (1999)।

যাঁর অকৃপণ সহযোগিতা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, তিনি হলেন বসাক বুক স্টোর-এর কর্ণধার শ্রী স্বপন বসাক। তাঁর ঐকান্তিক আন্তিরকতা ও অকৃত্রিম আগ্রহকে পাথেয় করে আমি নির্দিষ্ট লক্ষ পূরণে ব্রতী হয়েছি মাত্র।

আমার অনূদিত গ্রন্থের সমালোচনার জন্য পাঠকবর্গের কাছে রইল আমার সাগ্রহ ও সাদর আমন্ত্রণ।

ধন্যবাদান্তে
দেবাশীষ দে

সূচিপত্র

সুখ	...	১
ডট অ্যান্ড ক্যারি	...	৭
বিধবা	...	১২
শয়তান	...	১৭
স্নায়ুর বিকার	...	২৪
খোঁড়া	...	২৭
প্রতিশোধ	...	৩২
দ্বন্দ্বযুদ্ধ	...	৩৭
নেকড়ে	...	৪২
মরা হাত	...	৪৮
সাধু অ্যান্টনি	...	৫৩
কবর	...	৬৩
কোকো	...	৬৮
ম্যাদময়জেল	...	৭৩
গহ্বর	...	৭৭
একটি কৃষক বালিকার কাহিনি	...	৮৬
বেড নং ২৯	...	৯৩
একটি বড়োদিনের কাহিনি	...	৯৯
দৈত্যদের মাতা	...	১০৫
আর্দালি	...	১১১
কালা ও বোবা	...	১১৪
কাপুরুষ	...	১১৮
ব্রানিজার ভেনাস	...	১২৫
একটি বিদঘুটে ভোজপর্ব	...	১২৮
শিল্পী	...	১৩৩

নদীর বুকে	···	১৩৮
কুৎসিত	···	১৪২
ম্যাডাম ব্যাপটিস্ট	···	১৪৬
ভয়ংকর	···	১৫২
ভাঁড়	···	১৫৫
ব্যাবেতি	···	১৬০
ওয়েটার, এক বোতল বীয়ার দাও	···	১৬৬
এক দরিদ্র বালিকা	···	১৭০
রোজ	···	১৭৩
খরগোশ	···	১৮০
জলাতঙ্ক	···	১৮৬
হিপ্পোলিটের দাবি	···	১৯২
মা স্যাভেজ	···	১৯৪
সম্মানচিহ্ন	···	১৯৮
মাদার সুপিরিয়রের পঁচিশটি ফ্রাঁ	···	২০২
গিলেমত পাহাড়	···	২০৭
হটট ও তার পুত্র	···	২১১
ঘণ্টা	···	২১৭
সারমেয় সঙ্গী	···	২২০
প্রস্বর	···	২২৪
উন্মাদিনী নারী	···	২২৭
প্রেত	···	২৩১
ভয়	···	২৩৪
একটা সত্যি গল্প	···	২৪০
এগারো নম্বর ঘর	···	২৪৬
পাগল?	···	২৫০
নারীর ফাঁদ	···	২৫৫
পরিবর্ত	···	২৫৮

মাতাল	...	২৬০
লা মরিলনি	...	২৬৫
অরণ্যের অভ্যন্তরে	...	২৬৮
একটি বিবাহবিচ্ছেদের পরিণাম	...	২৭৪
ঋণ	...	২৭৮
প্রবঞ্চনা	...	২৮৩
ঘাতক	...	২৮৮
প্রেম	...	২৯৩
একটি নরম্যানডি পরিহাস	...	২৯৮
অশরীরী	...	৩০৩
মোহমুক্তি	...	৩১০
বৃদ্ধ জুডাস	...	৩১৩
দার্শনিক	...	৩১৭
খ্রিস্টানদের উৎসব	...	৩২০
স্ত্রীর স্বীকারোক্তি	...	৩২৪
প্রকৃত পরিহাস	...	৩২৭
নামকরণ	...	৩৩০
চৌম্বকশক্তি	...	৩৩৫
দুই তরুণ সৈনিক	...	৩৩৯
সংশয়াত্মক সুখ	...	৩৪২
আদালত কক্ষ	...	৩৪৬
পরিত্রাণ	...	৩৫০
অভিশপ্ত রুটি	...	৩৫৪
সিঁধেল চোর	...	৩৫৭
কাঠের জুতো	...	৩৬২
লিলি লালা	...	৩৬৬
মার্টিনের মেয়ে	...	৩৭১
বহু ভূমিকায়	...	৩৭৭

তামাকের দোকান	...	৩৮০
এক দিনের গ্রাম পর্যটন	...	৩৮৩
দরকারি বাড়ি	...	৩৮৮
রজারের পদ্ধতি	...	৩৯০
উইল	...	৩৯৪
চোর	...	৩৯৯
রোজালি প্রুডেন্ট	...	৪০১
নর্তকীর প্রণয়	...	৪০৪
আমার বাড়িওয়ালি	...	৪০৬
এক রাজার ছেলে	...	৪০৯
কাদাখোঁচা পাখি	...	৪১৩
বৃদ্ধ বোনিফেস-এর অপরাধ	...	৪১৬
ম্যাদময়জেল কোকোতি	...	৪২১
পিতা	...	৪২৬
আদর্শ	...	৪৩০
মঁসিয়ে জোকাস্তে	...	৪৩৬
সন্তান	...	৪৪০
একটি অতি সাধারণ নাটক	...	৪৪৬
মৎস্য শিকারের কাহিনি	...	৪৫১

সুখ
Happiness

উপযুক্ত একটা পরিবেশের মধ্যে আড্ডাটা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন ভৃত্য এসে টেবিলে চা পরিবেশন করে গেল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। সৃষ্টির সেই শুরু থেকেই একই বিষয় সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা বলা হয়েছে, বহু কাহিনি প্রচারিত হয়েছে, রচনা করা হয়েছে কত কাব্য কত সাহিত্য। কত শিল্পী ক্যানভাসের ওপর ফুটিয়ে তুলেছে কত প্রেমের অপূর্ব সমস্ত ছবি, সৃষ্টি করেছে তাদের নূতন ভাবে নূতন ছন্দে নূতন ব্যঞ্জনায়।

এইভাবে যখন প্রেম নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন তাদের মধ্যে কয়েকজনের মন হারিয়ে গিয়েছিল বহুদূরে সমুদ্রপারের ধূসর পাহাড়শ্রেণির দিকে। হঠাৎ একটি জিনিসের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সে বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠল, দেখুন দেখুন, বহুদূরে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে—ওটা কী?

পাহাড়ের শেষ সীমানায় হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে ধূসর রং-এর বিশাল একটি পিণ্ড।

সকলে সেটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। এমন একটি জিনিস দেখার অভিজ্ঞতা তাদের আগে আর কখনও হয়নি।

তাদের মধ্যে একজন বলল, ওটার নাম কর্সিকা। বছরে দু-তিনবার দিগন্তরেখায় ওই ধরনের একটি জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে এটা ঘটে থাকে।

শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে প্রবীণ একজন ভদ্রলোক এতক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপ করে বসেছিলেন। তিনি এবার কথা বললেন। বললেন, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে—আমরা যখন সত্যিকারের প্রেমের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম—ঠিক তখনই 'কর্সিকা' নামের অদ্ভুত ওই জিনিসটা আমাদের নজরে পড়ল, আর তখনই আমার মনে পড়ে গেল ভয়ংকর দ্বীপ কর্সিকার একটি কাহিনি। ওই দ্বীপেই প্রকৃত প্রেম নামক বস্তুটির আমি সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি সেই কাহিনিটাই এখন আপনাদের বলব।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমি ওই দ্বীপে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় ওই শ্বাপ-সংকুল অরণ্য পরিবেষ্টিত দ্বীপের দূরত্ব আমেরিকার থেকে অনেকটাই বেশি এবং সেটা আরও বেশি রহস্যময়। মাঝে মাঝে ফরাসি দেশের উপকূলভাগ থেকে ওই দ্বীপটিকে দেখা যায়।

ওই দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করলে বিশৃঙ্খল এক আদিম দুনিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। ইতস্তত এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু কতকগুলো রুক্ষ পাহাড়। তারই মাঝখানে সংকীর্ণ কতকগুলো উপত্যকা। সেখানে সমতলভূমি প্রায় নেই বললেই চলে। যেদিকে তাকানো যায় দেখা যায় চারিদিকে ছড়িয়ে আছে গ্রানাইট

পাথর আর সুগভীর বিরাটাকারের অসংখ্য খাদ। ঘন ঝোপজঙ্গল আর বড়ো বড়ো পাইন আর কাজুবাদামের গাছ সমস্ত জায়গাটাকে ঢেকে রেখেছে। সেখানে কখনও চাষাআবাদ হয়নি। ভূমি কর্ষণের কোনো চিহ্ন কখনও দেখা যায় না। বহু দূরে দূরে দুই-একটা গ্রাম ছাড়া আর জনমানবের চিহ্ন কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। এখানে গড়ে ওঠেনি শিক্ষা বা শিল্প সংস্কৃতির পরিবেশ। গড়ে ওঠেনি কোনো কলকারখানা বা সভ্যসমাজের উপযুক্ত কোনো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। কারুশিল্প বা ভাস্কর্যের কোনো নিদর্শন এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহৎ বা সুন্দর জিনিসের প্রতি এখানকার মানুষের নেই কোনো স্পৃহা ও আকর্ষণ। এই ঊষর রুক্ষ দ্বীপের এটাই বিশেষত্ব। শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ এখানে সম্পূর্ণ পঙ্গু।

অথচ এই দ্বীপের বিপরীতে ইতালি নামের যে দেশটি দাঁড়িয়ে আছে—তার কথা একবার ভেবে দেখুন। সেখানকার প্রতিটি প্রাসাদ কী এক অসাধারণ শৈল্পিক সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কাঠ, পাথর, মার্বেল ও বিভিন্নরকম ধাতু ব্যবহার করে কী অপূর্ব সমৃদ্ধি দান করেছে এই শহরটিকে। শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রেখেছে এক গৌরবময় অবদান।

কিন্তু কর্সিকা দ্বীপের অবস্থার কথা একবার তলিয়ে ভাবুন। আদিম যুগে এই দ্বীপটি যে অবস্থাতে ছিল আজও সেখানে তিলমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। মানুষ সেখানে আদিম যুগের বাতাবরণে বাস করে। আদিম যুগের রীতিনীতি ও চিন্তাধারা নিয়ে তারা কোনোরকমে টিঁকে আছে সেখানে। সভ্যতা সেখানে প্রবেশ করেনি। জীবনযাত্রার মান ও পদ্ধতি পশুসুলভ। ঘৃণা, হিংস্রতা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা ও রক্তের নেশায় তারা উন্মত্ত। এরাই আবার বিপবীত গুণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এরা আবার উদারতা, অতিথিপরায়ণতা, সরলতা ও সহানুভূতির মানসিকতায় মহান।

প্রায় এক মাস বা তার কিছু বেশি সময় ধরে আমি সেই দ্বীপে ঘুরে বেড়ালাম। মনে হল আদিম যুগের কোনো একটি অরণ্যে এসে আমি উপস্থিত হয়েছি। এখানে না আছে বিশ্রামের জন্য কোনো আশ্রয় বা কোনো পান্থশালা, না আছে সভ্য সমাজের মানুষের জন্য তৈরি কোনো প্রশস্ত রাজপথ। দুপাশে ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম ও জঙ্গলে ছাওয়া কোনো খাড়ি-পথ গ্রামের মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেছে। আবার কখনও পাহাড়ের সীমানায় অথবা উপসাগরীয় তীরে এসে শেষ হয়েছে। এই উপসাগরের তরঙ্গসংঘাত ও তার গর্জন ভেঙে দেয় ওই অঞ্চলের শান্ত নীরবতা। 'পর্যটকের দল গ্রামবাসীদের ঘরের দরজায় আঘাত করে রাতের মতো খাদ্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। প্রায় খুলে আসা পায়াযুক্ত টেবিলে বসে তাকে খাদ্য খেতে হয়। মাথাঠেকা ছাদের নীচে শুয়ে তাকে ঘুমোতে হয়। পর দিন সকাল হতেই বাড়ির কর্তা তাকে গ্রামের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে আসে। প্রথা অনুযায়ী অতিথির বিদায়ক্ষণে তারা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করে।

এক দিন প্রায় দশ ঘণ্টা হেঁটে বহু জায়গা ঘুরে সন্ধ্যার সময় ওই গ্রামের একটি জীর্ণ বাড়ির দরজায় এসে ধাক্কা দিলাম। ভাঙা বাড়িটার চারিদিক ঘিরে ছড়িয়ে আছে

আঙুর লতা। ভগ্নপ্রাপ্ত বাড়িটার সৌন্দর্যের একমাত্র আশ্রয় তার চারিপাশ ঘিরে সবুজের সমারোহ নিয়ে বেঁচে থাকা ছোট্ট সুন্দর একটা বাগান। এই বাড়িটা থেকে বেশ কিছুটা দূরে—এই হতদরিদ্র পরিবেশের মধ্যে রাজকীয় মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকা অতি মূল্যবান কয়েকটা বাদাম গাছ।

দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনে এক বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। তাঁর ভদ্রোচিত চেহারা এবং আচার-আচরণ, তাঁর সুপরিশীলিত ব্যক্তিত্ব, এই দ্বীপ, এই পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত বেমানান বা বিসদৃশ মনে হল। অদূরে একটি বেতের মোড়ার ওপর গৃহস্বামী বসেছিলেন। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন আর তারপর দ্বিতীয় আর একটা কথা না বলে তিনি আবার তাঁর আসনে গিয়ে বসে পড়লেন।

ভদ্রমহিলা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, ''ওঁর বয়স এখন বিরাশি বছর। কানে কিছুই শুনতে পান না।''—কথাগুলো বললেন শুদ্ধ ফরাসি ভাষায়। এই পরিবেশে তাঁর বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষা শুনে আমি যারপরনাই অবাক হয়ে গেলাম।

'আপনারা তাহলে কি কর্সিকান নন?'—আমি জানতে চাই।

'না'—তিনি জবাব দিলেন, 'ফরাসি দেশেই আমাদের জন্ম। শিক্ষাদীক্ষা সব সেখানেই। আমরা পঞ্চাশ বছর আগে এখানে এসেছি আর সেই সময় থেকেই আমরা এখানে বসবাস করছি।'

আমি ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ি। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এঁরা অরণ্য অধ্যুষিত, শিক্ষা সংস্কৃতিহীন পরিবেশে কীভাবে বসবাস করছেন শহরের পরিমণ্ডল ও জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, জনবহুল পরিবেশ থেকে এই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে কেন এই স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন—তা ভাবতে গিয়ে আমার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম হল। একজন প্রবীণবয়সি মেষপালক খাবার নিয়ে এলে আমরা খেতে শুরু করলাম। খাবারের আয়োজনও অতি সাধারণ। আলু, শুয়োরের মাংস ও বাঁধাকপি একসঙ্গে সিদ্ধ করে এক ধরনের স্যুপ তৈরি করা হয়েছে। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। সুতরাং আমার ভাগেরটুকু গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম। ডিনার সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি দরজার সামনে এসে বসলাম। আমার সামনে ঘন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন রাত্রির প্রকৃতি। নিঝুম চরাচরে শুধু শুনতে পাওয়া যায় কোনো নাম-না-জানা পাখির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর সমুদ্রের অবিরাম গর্জন।

বৃদ্ধা আমার কাছে এসে বসলেন। প্রবাসে দীর্ঘজীবন কাটাবার পর দেশের মানুষের সান্নিধ্য তাঁকে প্রগাঢ় আনন্দে অভিভূত করেছে। তাই উচ্ছসিত কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ফরাসি দেশ থেকেই আসছেন তো?

''হ্যাঁ, ভ্রমণপিয়াসি মন আমার ঘুরে বেড়ায় সর্বস্থানে।''

''নিশ্চয়ই, আপনার বসবাস প্যারিসেই আর সেখানেই আপনার বাড়ি।''

''না—আমি বাস করি নানসিতে, আর সেখানেই আমার বাড়ি।''

আমার উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ভীষণভাবে চমকে উঠলেন।

"তাহলে নানসিতেই আপনার বাড়ি। আর সেখান থেকেই আপনি আসছেন।" এই কথাটা তিনি অস্ফুট স্বরে ধীরে ধীরে বার কয়েক উচ্চারণ করলেন।

ঠিক তখনই গৃহস্বামী বৃদ্ধ ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে অন্যান্য কালা মানুষের মতো কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"ওঁকে নিয়ে আপনার উদ্‌বেগের কোনো কারণ নেই। কারণ উনি একদমই শুনতে পান না।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কী যেন ভাবলেন। তারপরে বললেন, "ওখানকার প্রায় সকলেই আমার চেনা।"

আমি বললাম, "নানসির লোকদের কথা বলছেন তো।"

"হ্যাঁ, প্রায় সকলকে। সেন্ট অ্যালিজ পরিবারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, খুব ভালো করেই চিনি ওঁদের। আমার বাবার সঙ্গে ওই পরিবারের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।"

"আপনার নামটা জানতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।" আমি তাঁকে আমার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন কেমন চমকে উঠলেন।

অন্যমনস্কভাবে কী যেন চিন্তা করতে করতে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ স্মৃতির পাতা উলটিয়ে কিছু মনে করার চেষ্টা করছিলেন।

"হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আচ্ছা ব্রিসেনভরা কেমন আছে?"

"তাঁদের পরিবারের কেউ আর বেঁচে নেই।"

কথাটা শুনে তাঁর চোখে মুখে দুঃখের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, "সারমন্ত পরিবারকে চেনেন? ওরা সব কেমন আছে?"

"হ্যাঁ, ওই পরিবারের ছোটো ছেলেটি এখন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার। সে একজন জেনারেল।

আবেগ রোধ করতে গিয়ে তিনি কেঁপে উঠলেন। যে গোপন রহস্য এতক্ষণ তাঁর অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা প্রকাশ করে ফেললেন, "হ্যাঁ, হেনরি দ্য সারমন্ত। সে আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই।"

এবার তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সমস্ত কথা আমার মনে পড়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে। সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই নিন্দনীয় কেচ্ছা কেলেঙ্কারির কাহিনি। লোরেন অঞ্চলের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষরা ওই ঘটনা নিয়ে নিন্দা সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। হুসার রেজিমেন্টের যিনি প্রতাপশালী কমান্ডার, তাঁর সুন্দরী তরুণী কন্যারত্নটি একজন সাধারণ পরিবারের ননকমিশনড অফিসারকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

বলিষ্ঠ চেহারার যুবকটির চাষি পরিবারে জন্ম হলেও অত্যন্ত সুদর্শন। সামরিক পোশাকে নিশ্চয়ই তার বীরধর্ম প্রকট হয়ে পড়েছিল। তাই সে তার ঊর্ধ্বতন

অফিসারের সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়ল। তাদের মধ্যে কখন কীভাবে যে প্রেম জমে উঠেছিল, সে-কথা কেউ বলতে পারে না।

তার কাজের মেয়াদ যেদিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন সন্ধেবেলা তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের মেয়েকে নিয়ে পালাল। অনেক খোঁজখবর করা হল কিন্তু কোথাও তাদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। অনুমান করা হল, মেয়েটি মারা গেছে।

এতদিন পরে এই কাহিনির নায়িকাকে আবিষ্কার করলাম এই জনহীন অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে।

স্পষ্টভাবে সব কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, "আপনিই সেই মেসিলি সুজান!"

তিনি সে কথা স্বীকার করে নিয়ে মাথাটা সামান্য নাড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি সেই মেসিলি সুজান।" কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল।

তারপর বৃদ্ধের দিকে ফিরে আমাকে বললেন, ওই সেই লোক। বৃদ্ধ আমাদের কথা কিছুই শুনতে পেলেন না—শুধু ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর প্রতি বৃদ্ধা সুজানের প্রেম বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

আমি জানতে চাইলাম, তিনি প্রকৃত সুখী হয়েছেন কি না।

তিনি উত্তর দিলেন, সত্যিই আমি সুখী হয়েছি। তাঁর ভালোবাসার স্পর্শে আমার জীবনের সমস্ত অন্ধ গ্লানি মুছে গেছে। নূতন আলোকের উজ্জ্বলতায় আমার হৃদয়ের উত্তরণ ঘটেছে। কারও বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

তাঁর কথা শুনে আমি পরম বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। তাঁর মুখখানি প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিত্ত সম্পদ ঐশ্বর্যের মধ্যে আজন্ম লালিত ওই সুন্দরী তরুণীটি চাষি পরিবারের এক যুবকের হাত ধরে, সবকিছুর মোহ আর আকর্ষণ ত্যাগ করে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পা বাড়িয়েছিলেন। অতি সাধারণ এক জীবনযাত্রার বলয়ের মধ্যে উন্মাদিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। যেখানে নেই কোনো আকর্ষণ, নেই কোনো উৎসব, নেই কোনো মাদকতা বা বৈচিত্র্য। গতানুগতিক এক পারিবারিক জীবনপ্রবাহে তিনি হারিয়ে গেলেন। তবুও তাঁর ভালোবাসার আবেগ এখনও অটুট, এখনও স্বচ্ছন্দ। এখনও তিনি মাথায় মেয়েদের ক্যাপ পরে, সাধারণ ক্যাম্বিসের স্কার্ট ব্যবহার করে অতি সাধারণ এক গ্রাম্য চাষির স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। সাধারণ একটা বেতের মোড়ায় বসে থাকতে বা নড়বড়ে টেবিলের সামনে বসে শুয়োরের মাংস, আলু আর বাঁধাকপির থকথকে স্যাপ খেতে বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করেন না। তিনি খড় বিছানো শয্যায় তাঁর স্বামীর পাশে শুয়ে থেকে আজও আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন।

তাঁর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উদ্বেগ, সমস্ত ভালোবাসা তাঁর স্বামীকে ঘিরেই বেঁচে আছে। তিনি কখনও দামি গয়না, দামি আসবাব বা সাজানো-গোছানো সুগন্ধি কোনো ঘর বা বিলাসসামগ্রীর জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেননি। ওই মানুষটিকে ঘিরেই তাঁর

সমস্ত কামনা বাসনা কেন্দ্রিভূত হয়েছিল। একমাত্র তাঁকেই তিনি চেয়েছিলেন আর তাঁকেই তিনি পেয়েছেন। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত, সুখী।

সমস্ত রাত জেগে আমি বৃদ্ধের নাসিকাগর্জন শুনতে থাকি। পরম সুখে বৃদ্ধা তাঁর পাশে শুয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। প্রেমের মর্যাদা দেওয়ার জন্য কী অপরিসীম তাঁর আত্মত্যাগ। তবুও তিনি সুখী এবং সেই সুখ অতি তুচ্ছ হলেও তাঁর কাছে তা সম্পূর্ণ।

পর দিন সকাল হতেই আমি সেবাপরায়ণ দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিদায়ক্ষণে বৃদ্ধা তাঁর মুখখানিকে উজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়ে তুলে আমার করমর্দন করলেন। পরমুহূর্তে নিজের দেশের মানুষকে দেখে গভীর আবেগে কেঁদে ফেললেন। আমার চোখ দুটোও সেই মুহূর্তে জলে ভরে উঠেছিল। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু কবলাম। ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমার কাহিনি এখানেই শেষ।

এক মহিলা মন্তব্য করলেন, "ওই স্ত্রীলোকটির প্রেমেব আদর্শে কোনো বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্য নেই। অত্যন্ত সাধারণ ও সাদামাঠা। তাঁর প্রয়োজনেব দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রাচীন ও আদিম। তাঁর মনে সত্যিকাবের চাহিদা নামক বস্তুটির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। স্ত্রীলোকটিকে আব যাই হোক বুদ্ধিমতী বলা যায় না।"

অন্য আব একজন মহিলা মৃদুস্বরে বলল, "ও সমস্ত কথা অর্থহীন। উনি তো জীবনে সুখী হয়েছেন, তাই যথেষ্ট।"

প্রকৃতির বুকে রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় অরণ্য পরিবেষ্টিত কর্সিকা দ্বীপটি তার রিক্ত, হতাশ আর বিষণ্ণ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি নিয়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগল ঘনান্ধকার সমুদ্রের গভীরে। আব তখনই আমাদের মনে পড়ে গেল তারই রুক্ষ পরিবেশের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে বহু বছর ধরে বেঁচে আছে এক প্রেমিক দম্পতি। কল্পনার দৃষ্টিতে দেখলাম তাদের প্রেমের আলোকে আলোকিত হয়ে আছে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বীপটি।

ডট অ্যান্ড ক্যারি
Dot And Carry

অতীতের স্মৃতিগুলো আমাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে—যার কথা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। আমি যে কাহিনিটি আপনাদের কাছে বলব, সেটা অনেক কাল আগে ঘটেছিল। সেই ঘটনার প্রতিচ্ছবিটি কেন আমার স্মৃতিতে এত স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে—তার কারণ আমি খুঁজে পাই না। তারপর আমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঘটনাপ্রবাহ বয়ে গেছে, কত কিছু ঘটতে দেখেছি, সেগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও ডট এন্ড ক্যারি নামের বৃদ্ধা মহিলাটির কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। আমার দশ বারো বছর বয়সে যখন তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম, আজ এত বছর পরেও তাকে যেন আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই রূপ, সেই মুখের আকৃতি, সেই চেহারা একইরকমভাবে আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

বৃদ্ধা মহিলাটি ছিল পেশায় দর্জি। সে আমাদের বাড়িতে আসত জামাকাপড় সেলাই করতে। মঙ্গলবার দিনই সে আসত। কাছাকাছি কতকগুলো আধা শহর আর গ্রামের মধ্যে একটাই গির্জা ছিল। অতীতের বহু স্মৃতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওই গির্জাটি, প্রাচীনত্বের নজির হিসাবে লাল রংএর ইঁটগুলোর রং কালো হয়ে গেছে।

প্রতি মঙ্গলবার সকালে ডট অ্যান্ড ক্যারি আমাদের বাড়িতে এসে প্রথমেই সেলাই-এর ঘরে গিয়ে ঢুকত এবং সেখানে তার নিজের আসনে বসে সেলাই-এর কাজ শুরু করত।

সে ছিল অনেকটা লম্বা আর রোগা। তার চেহারার মধ্যে সব থেকে বেশি যেটা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তা হল তার মাথার চুল। গোছা গোছা চুলে তার কপাল, নাক, মুখ সব ঢাকা পড়ে যেত। ঝোপের মতো চুল দেখে তাকে কোনো পাগলি বলেই মনে হত। তার ধূসর রং-এর মোটা মোটা ভুরু দুটো দেখলে মনে হত—যেন সেখানে দুটো ইঁদুর বসে বসে তার চোখ দুটোকে পাহারা দিচ্ছে।

হাঁটার সময় সে খোঁড়াত, তার খোঁড়ানোটা ছিল ভারী অদ্ভুত ধরনের, দেখলে একটা জাহাজ নোঙর করার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠত।

বৃদ্ধাটির প্রতি আমি যেন কেমন আকর্ষণ বোধ করতাম। ঘুম ভাঙতেই আমি তার ঘরে গিয়ে ঢুকতাম। দেখতাম, বৃদ্ধা মাথা নীচু করে একমনে তার কাজ করে চলেছে। তার পায়ের কাছে একটা পাত্রে রাখা থাকত গরম জল। সেভাবেই সে তার শরীরটাকে গরম রাখার চেষ্টা করত। আমি তার ঘরে গেলে, সে ওই গরম জলের পাত্রটার কাছে একটা টুল পেতে আমাকে বসতে বলত—যাতে ঠান্ডায় আমার অসুখ বিসুখ না করে।

তার শীর্ণ আঙুলগুলো দিয়ে সেলাই করতে করতে আমাকে অনেক গল্প বলত, রূপকথার গল্প, দত্যিদানোর গল্প, নানারকম হাসির গল্প, জীবজন্তু পশুপাখির মজার

গল্প। তার বেশি পাওয়ারের চশমা পরা ক্ষীণ দৃষ্টি, তার ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা, সেগুলো যেন আজও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। তার বলা গল্পগুলো আজও যেন শুনতে পাই। দেখতে পাই গল্প বলার সময় তার ঠোঁট নড়া, তার মুখের অভিব্যক্তি।

এইভাবে প্রতি মঙ্গলবার তার ঘরে গিয়ে আমি গল্প শুনতাম। গল্প শোনার নেশা যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল।

অন্যান্য মঙ্গলবারের মতো, সেদিনও আমি তার ঘরে যাওয়ার জন্য যে মুহূর্তে দরজাটা ঠেলে খুলে দিলাম, সেই মুহূর্তে শোচনীয় এবং বীভৎস দৃশ্য দেখে ভয়ে আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেখলাম, অসহায়া, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তখনও তার এক হাতে ধরা আছে ছুঁচ, ছুঁচের ছেঁদার মধ্য দিয়ে তখনও এক গাছি সুতো ঝুলছে, অন্য হাতে ধরা আছে আমার একটা শার্ট। তার নীল মোজা পরা লম্বা শীর্ণ পা-খানা চেয়ারের নীচে ঢুকে গেছে। চশমাটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে দেয়ালের কোণে, সেটা সেখানে ডাঁটিভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে।

ওই দৃশ্য দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাপারটা সকলকে বলতেই তারাও দিশাহারা হয়ে ছুটে এল। জানতে পারলাম, আমার প্রিয় বৃদ্ধাটি মারা গেছে।

হঠাৎ তার মৃত্যুটা আমাকে এত বেশি শোকাহত, এত বেশি বিপর্যস্ত করে তুলেছিল—সেইমুহূর্তে তা প্রকাশ করার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কী নিদারুণ মর্ম-যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল সেদিন! এক সীমাহীন শূন্যতা আর মর্মান্তিক শোকের আঘাতে আমার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল। আমি একটিও কথা না বলে—ধীরে ধীরে নির্জন একটা অন্ধকার ঘরের এক কোণে বসে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম, চোখের জলের ভেসে যেতে লাগল আমার বুক।

হঠাৎ মনে হল ঘরের দরজাটা খুলে গেল। জলে ভে   চোখ দুটো তুলে ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখলাম, বাতি হাতে কারা যেন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। অস্পষ্ট মোমের আলোতে কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। দেখলাম বাবা-মা আর একজন ডাক্তারকে, তাঁরা ডট অ্যান্ড কারির মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আমি তাঁদের কথাগুলো নিশ্বাস বন্ধ করে শুনে যেতে লাগলাম। কথাগুলো আমার মনের মধ্যে এত স্পষ্টভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে—সেগুলোর প্রতিটি শব্দ একটার পর একটা আজও বলে যেতে পারি।

ডাক্তার বললেন, আমি যেদিন প্রথম এই শহরে এলাম, সেদিনই একটা দুর্ঘটনায় তার একটা পা ভেঙে যায়, ঘটনাটা সত্যিই দুঃখজনক। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম, দেখলাম অবস্থা মারাত্মক।

এই ঘটনার কথা আজও পর্যন্ত কারও কাছে প্রকাশ করিনি। তা ছাড়া এই ঘটনার কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সে এখন মৃত। সুতরাং ব্যাপারটা চেপে রাখার কোনো যুক্তি নেই। যখনকার কথা বলছি তখন তার বয়স মাত্র সতেরো। যৌবনপুষ্ট

শরীরে অসাধারণ লাবণ্য। সত্যিকারের সুন্দরী বলতে যা বোঝায় সেইরকমই সুন্দরী ছিল সে।

সে সময় এক তরুণ এই শহরের একটি স্কুলে সহকারী শিক্ষকের চাকরি নিয়ে এসেছিল। তাকে দেখতেও যথেষ্ট সুন্দর। শরীরের গঠন বলিষ্ঠ। রাস্তা দিয়ে সে যখন দৃপ্তভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে হেঁটে যেত—তখন তাকে একজন সামরিক অফিসার বলে মনে হত। কয়েক দিনের মধ্যে শহরের সমস্ত তরুণী মেয়েরা তাকে নানা অছিলায় প্রেম নিবেদন করতে শুরু করল। কিন্তু তাদের আমন্ত্রণে সে সাড়া দিতে সাহস পেল না কারণ ওই স্কুলের হেডমাস্টার গ্রেবু ছিলেন বেশ কড়া ধাতের মানুষ। অনৈতিক কোনো ব্যাপারকে তিনি মোটেই প্রশ্রয় দিতে না বা সহ্য করতেন না সেসব। সুতরাং চাকরি হারাবার ভয়ে সে বাধ্য হয়ে তাদের এড়িয়ে চলতে লাগল।

গ্রেবু তাঁর স্কুলে সেলাই শেখাবার জন্য এই ডট অ্যান্ড ক্যারিকে বহাল করেছিলেন। মেয়েটির আসল নাম ছিল মিস হরটেনস্। আদর করে সকলে ডাকত ডট অ্যান্ড ক্যারি বলে —যে কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে।

তরুণ সহকারী স্কুলশিক্ষকটি হরটেনসের রূপে মুগ্ধ হল। মেয়েটিও তার আকর্ষণ এড়াতে পারল না। তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেল। অন্ধকার হলে ছাদের চিলেকোঠায় তারা এক দিন দেখা করবে বলে ঠিক করল।

সেদিন সে বাড়ি না গিয়ে, গোপনে আগে থেকে স্কুলের মধ্যে লুকিয়ে রইল। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে উপস্থিত হল তার প্রেমিক সেই স্কুলশিক্ষকের সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং তার আসার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করতে লাগল অধীর হয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে সেখানে এসে হাজির হল এবং সে যে তাকে কী অসম্ভব ভালোবাসে সেটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল গদগদ স্বরে। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন যমদূতের মতো হেডমাস্টার গ্রেবু। এসেই তিনি তাঁর সহকারী শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, "এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী করছ সিগিসবার্ট?"

সহকারী শিক্ষকটির তখন ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সে ভাবল, তার আর বাঁচার কোনো পথ নেই। গ্রেবু নিশ্চয়ই সবকিছু জেনে ফেলেছেন। তখন সে বোকার মতো বলে বসল, "ছাদের খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব ভাবছিলাম, মঁসিয়ে গ্রেবু।"

সিগিসবার্ট মেয়েটাকে ঘরের একটা কোণে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ফিশফিশ করে বলল, "এখানে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে লুকোও, শিগগির যাও।"

ওই গভীর নির্জনতার মধ্যে, তার ফিশফিশ স্বরে কথা বলার শব্দ শুনতে পেয়ে গ্রেবু বললেন, "তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ, সিগিসবার্ট? মনে হচ্ছে, এখানে আর একজন কেউ আছে?"

"না, স্যার, আমি এখানে একাই।"

"না, তুমি একা নও। আমি স্পষ্ট শুনেছি তুমি কারও সঙ্গে কথা বলছিলে।"

"আমি শপথ করে বলছি, মঁসিয়ে গ্রেবু, এখানে অন্য কেউ নেই।"

"ঠিক আছে, কেউ আছে কি না সেটা আমি এখনই দেখতে পাব।" এই বলে তিনি

ছাদের দরজার তালা বন্ধ করে নীচে নেমে গেলেন সম্ভবত আলো আনার জন্য।

ছেলেটি তখন আতঙ্কে দিশাহারা। মেয়েটিকে কাঁপা গলায় বলল, "এমন কোনো জায়গায় লুকিয়ে পড়ো, যাতে তোমাকে কেউ দেখতে না পায়। যদি গ্রেবু আমার সঙ্গে তোমাকে একবার দেখে ফেলেন, তাহলে আমার চাকরিটা চলে যাবে আর আমাকে উপোস করে দিন কাটাতে হবে। তোমার জন্য বোধহয় আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। উঃ কী কুক্ষণে যে প্রেম করতে গিয়েছিলাম।"

একটু পরেই দরজার তালা খোলার শব্দ হল। হরটেনস এক মুহূর্ত দেরি না করে ছাদের কার্নিশ-এর দিকে ছুটে যায়, বলে, "আমি নীচে লাফ দিচ্ছি। তুমি পরে গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে আসবে।"

কথাগুলো বলেই, হরটেনস অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। হেডমাস্টার গ্রেবু আলো নিয়ে সমস্ত জায়গাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না।

এই ঘটনার মিনিট পনেরো বাদে, সিগিসবার্ট আমার কাছে ছুটে এসে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলে।

গিয়ে দেখলাম, মেয়েটা দেয়ালের ধারে একটা জায়গায় পড়ে আছে। দোতলার উঁচু ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে তার পায়ের হাড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। পায়ের তিন জায়গার হাড় ভেঙে মাংস আর চামড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কাপড়ে ঢেকে সাবধানে তাকে তুলে আনা হল। ওই মারাত্মক যন্ত্রণার মধ্যে সে কিন্তু কাউকে দায়ী করল না। না গ্রেবুকে না তার প্রেমিককে। অদ্ভুত সহ্য ক্ষমতা মেয়েটার। শুধু আস্তে আস্তে বলল, আমার নিজের দোষেই আমি শাস্তি পেয়েছি।

"আমি তার বাবা-মাকে ঘটনাটা জানালাম। তাঁরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। আমি তাঁদের কাছে মিথ্যে কথা বললাম, স্কুলের সামনের রাস্তাটা পার হবার সময় একটা গাড়ি তাকে চাপা দিয়েছে। সকলে আমার কথা বিশ্বাস করল। পুলিশ কিছুদিন ধরে গাড়িটাকে বৃথাই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করল।"

আমার গল্প এখানেই শেষ। মনে হয় তার মধ্যে যে গুণ ছিল তাতে তার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করে নিতে পারত।

সমস্ত জীবনে সে একবারই মাত্র প্রেম করেছিল—আর এটাই তার সেই প্রেমের কাহিনি। একজন নারী হিসাবে তার মর্যাদা সত্যিই অপরিসীম। তার চরিত্রের মধ্যে যে মহত্ব, যে ভালোবাসা আমি লক্ষ করেছি—তার কোনো তুলনা আমি খুঁজে পাইনি। আমি তার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তা যদি না হতাম তাহলে অনেক সাধারণ ঘটনার মতো এই ঘটনাটা আমার স্মৃতি থেকে মুছে যেত। তার জীবিতাবস্থায় আমি যা এতদিন গোপন করে রেখেছিলাম, আজ তা প্রকাশ না করে পারলাম না। আর তার পিছনে আছে একটাই উদ্দেশ্য—তার মৃত্যুতে সকলের সামনে তার মহত্ত্বকে তুলে ধরা।

ডাক্তার এবার চুপ করলেন। শুনতে পেলাম, মা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর কান্না

জড়ানো গলায় বাবাকে যেন কী বলছেন। বাবা তার উত্তরে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি তখন মৃত মানুষের মতো বিছানায় পড়ে আছি, জলে ভেসে যাচ্ছে আমার দু'চোখ। কিছুক্ষণ পরে অনেকের পায়ের শব্দ এবং কাথাবার্তা শুনতে পেলাম। ওরা ডট অ্যান্ড ক্যারির প্রাণহীন দেহটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে।

বিধবা
The Widow

দ্য ব্যনভিলের গ্রামাঞ্চলের দিকে এখন পুরোপুরি শিকারের সীজন্ শুরু হয়ে গেছে। এবার দেখা যাচ্ছে, শরতকালেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। —ফলে সমস্ত পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে একটা ভিজে স্যাঁতসেতে ভাব। গাছ থেকে ঝরে যাওয়া পাতাগুলোর ওপর দিয়ে চলার সময় স্বাভাবিক অবস্থায় এই ঋতুতে যখন মর্মরধ্বনি শোনা যায়, তখন বৃষ্টির জলে সেই পাতাগুলোয় পচন ধরেছে। গাছপালায় ঘেরা জঙ্গালের মধ্য দিয়ে চলার সময় একটা ভিজে ভ্যাপসা গন্ধ অসহ্য মনে হবে আপনার কাছে। এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে যারা শিকার করতে বেরোয়, তাদের নাকালের একশেষ হতে হয়। শিকারি কুকুরগুলো এই ভিজে স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার মধ্যে বৃথাই শিকারের সন্ধান করে বেড়ায়। আর যে সমস্ত তরুণী মেয়েরা আঁটো পোশাক পরে শিকার করতে বেরোয় তারা ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে সন্ধ্যার সময় ফিরে আসে কোনো শিকার ছাড়াই।

ডিনারের পাট চুকে গেলে তারা সবাই মিলে লোটো খেলে কিন্তু তাদের খেলা মোটেই জমে ওঠে না। তাদের মধ্যে কয়েকজন গল্প বলার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা কেউ ভালো গল্প বলতে পারে না। কেউ কেউ আবার খরগোশ শিকারের রোমহর্ষক কাহিনি শোনায়। নূতন কোনো গল্প মনে করার বা বানাবার চেষ্টা করত মেয়েগুলো। কিন্তু শোনানোর মতো ভালো গল্প কারও মাথা থেকে বেরোত না।

গল্প বলার ব্যাপারে যখন কেউ বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে সেই চেষ্টা ছেড়ে দেবে বলে ঠিক করল—তখন একটি তরুণী তার অবিবাহিতা বৃদ্ধা মাসির হাতের আঙুলে একটা আংটি দেখতে পেল। আগেও সেটা তার নজরে পড়েছিল কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সে অত ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেনি। এখন সে তার মাসির আঙুলের আংটিটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "মাসি, তোমার আঙুলের এই আংটিটা একটা বাচ্চার চুল দিয়ে তৈরি হয়েছে মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কী আমাদের বলো।"

কথাটা শুনে তার মুখের চেহারা পালটে গেল, সমস্ত মুখ থেকে যেন রক্ত নেমে গেল। তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠল। তিনি প্রথমে কাহিনিটি বলতে রাজি হলেন না। কিন্তু সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি কাহিনিটি বলতে শুরু করলেন, "এটা এমন একটা করুণ কাহিনি, সর্বদা এটা আমি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি। ঘটনাটা মনে করলে ভয়ংকর এক বিষণ্ণতা আর দুঃখে আমি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি। চোখের জল ধরে রাখতে পারি না। তাই ঘটনাটার কথা আমি কিছুতেই মনে করতে চাই না, তবু তোমরা যখন এত করে বলছ...

"প্রায়ই আমি তোমাদের কাছে সাঁতেজ বংশের কথা বলি। বর্তমানে সেই বংশের

কেউ আজ আর বেঁচে নেই। এই বংশের যে শেষ তিনজন লোককে আমি চিনতাম তাঁরা পর পর মারা যান মাস তিনেকের মধ্যেই। মৃত্যুর কারণ ছিল একইরকমের। এই আংটিটা তৈরি হয়েছে এই বংশের কনিষ্ঠতম সন্তানের চুল দিয়ে। আমার জন্য সে আত্মহত্যা করেছিল। তখন সে মাত্র একজন তেরো বছরের কিশোর। ব্যাপারটা শুনে তোমরা খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ নিশ্চয়ই।

"এই সাঁতেজ বংশের মানুষগুলো ছিল অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ বা এমোশানাল আর এই এমোশান-এর বশবর্তী হয়ে তারা যেমন অনেক ভালো কাজের সাক্ষ্য রেখেছে তেমনি অনেক মন্দ কাজেরও জন্ম দিয়েছে। তাদের নিজের আত্মীয়পরিজনরা বলত—এই সাঁতেজের বংশধররা কাম রিপুর দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত।

"তাঁদের চেহারার মধ্যেই নাকি এই ব্যাপারটা ফুটে উঠত। তাঁদের কোঁকড়ানো চুলের গোছা নেমে আসত কপাল পর্যন্ত। বড়ো বড়ো চোখের দৃষ্টি ছিল এমন তীক্ষ্ণ আর অন্তর্ভেদী যে তাঁদের চোখে চোখ পড়লে লোকে একরকম অজানা আতঙ্কে যেন শিউরে উঠত। তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না—কেন তাদের মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি হয়।

"এই বংশের একজনের ঠাকুরদার মধ্যে অত্যধিক ভাবপ্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। নারীঘটিত ব্যাপারে অনেক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। দশ-বিশটা ডুয়েল লড়তেও তাঁর মধ্যে কখনও ইচ্ছা বা আগ্রহের অভাব দেখা যায়নি। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী এক নায়েবের মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলেন। গত বছর তাঁর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন উৎসব করে পালন করা হয়েছে। আমি তাঁদের দুজনকেই চিনতাম—আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও ছিল যথেষ্ট। নায়েবের মেয়ের চেহারা খারাপ ছিল না। আচার-আচরণ, হাবভাবে ফুটে উঠত আভিজাত্য, মিষ্টি হাসিতে সর্বদা মুখটা উজ্জ্বল হয়ে থাকত। সকলের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলত। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। তার প্রতি বৃদ্ধের ভালোবাসা ছিল এত গভীর, তিনি তাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না এক মুহূর্তের জন্যও। বৃদ্ধের পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূরাও তার সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করত। তারা ব্যাপারটাকে গভীর প্রেমের ঘটনা মনে করে ব্যাপারটাকে সহজ করে নিয়েছিল, মেনে নিয়েছিল সবকিছু হাসিমুখে।

"শরতের এক সকালে বৃদ্ধ এক যুবককে নিমন্ত্রণ করলেন শিকারের জন্য। নাম তার মঁসিয়ে দ্য গ্রাভেল। সে তাঁর তরুণী বধূকে নিয়ে পালিয়ে গেল। তিনি তার জন্য একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তাঁকে দেখে একবারও মনে হল না—তাতে তাঁর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এক দিন সকালে কুকুরের ঘর থেকে তাদের ছেড়ে দিতে গিয়ে চাকরটা দেখল, সিলিং থেকে গলায় দড়ি দিয়ে তিনি ঝুলছেন।

"কিছু দিনের মধ্যে তাঁর এক ছেলেকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় প্যারিসের এক হোটেলে আবিষ্কার করা হল। অপেরার এক গায়িকার তিনি প্রেমে পড়েন এবং যথারীতি সে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে।

"এঁর একটি ছেলে হয়েছিল। তার বাবার মৃত্যু হলে সে তার বিধবা মায়ের সঙ্গে বাস করত। ছেলেটির বয়স তখন বারো। ছেলেটির বিধবা মা হলেন আমার মাসি। আমার তখন বয়েস সতেরো। বার্তিলো এস্টেটে আমাদের বাড়ি। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর আমার মাসি ছেলেটিকে নিয়ে আমাদের বার্তিলো এস্টেটের বাড়িতে থাকতে আসেন।

"এই বারো বছরের ছেলেটি তার এত কম বয়সে এমন এঁচোড়ে পেকে গিয়েছিল—যা কল্পনাই করা যায় না। বংশের এই শেষ সন্তানটিকে দেখে মনে হত সাঁতেজ বংশের সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত ভাবপ্রবণতা, সমস্ত কামোত্তেজনা তার মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠেছে। সে যেন ওই বংশের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সব থেকে শ্রেষ্ঠ এক উদাহরণ, শ্রেষ্ঠ এক প্রতীক।

"আমাদের বাড়ির সামনে এলম গাছে ঘেরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে পায়ে চলা পথটা তৈরি হয়েছে সেই পথ দিয়ে সে হেঁটে বেড়াত। সেসময় তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠত স্বপ্নাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পেতাম, কী এক ভাবে তন্ময় হয়ে মাথা নীচু করে আপন মনে জঙ্গলের পথ ধরে হেঁটে চলেছে। মনে হত, চিন্তার এমন এক সূক্ষ্ম লক্ষে পৌঁছোতে চাইছে যা তার বয়সের কোনো ছেলের পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

"মাঝে মাঝে যখন জ্যোৎস্নার আলোয় প্লাবিত হয়ে যেত সমস্ত প্রকৃতি তখন তার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের পথ দিয়ে হেঁটে যেতাম। সে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত সেখানে, বলত, চলো দিদি—চাঁদের আলোয় আমরা বনের মধ্যে গিয়ে স্বপ্ন দেখি, চেষ্টা করি স্বপ্নের দেশে হারিয়ে যাওয়ার। শুভ্র চাঁদের আলো জঙ্গলের পাতার ওপর যে সূক্ষ্ম একটা আবরণ তৈরি করত সেই দিকে সে তাকিয়ে থাকত অপলকে। আমার হাতটা ধরে বলত, দেখো, দেখো, কী অপূর্ব! না, মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, আমাকে বুঝতে পারলে তুমি তোমার মধ্যে আনন্দের সন্ধান পাবে। তাই কাউকে ভালো করে বুঝতে গেলে তাকে ভালোবাসতে শিখতে হবে।

"তার ওই বয়সে ওইসব তাত্ত্বিক কথা শুনে আমি হাসতে হাসতে তাকে জড়িয়ে ধরতাম। ওই বয়সের ওই ছেলে আমাকে এত ভালোবেসে ফেলেছিল যে আমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য জীবন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

"অনেক সময় দেখতাম, আমার কোলে বসে মাকে বলছে, মাসি, একটা প্রেমের ঘটনা বল। মা তখন হাসতে হাসতে আমাদের বংশের উদ্দাম ভালোবাসার অনেক কাহিনি তাকে শোনাতেন। পূর্বপুরুষরা যে সমস্ত কুকীর্তি করে গেছে তাই শুনে উত্তর পুরুষরা উত্তেজিত হয়ে উঠত। তারা পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করে বংশের ঐতিহ্য বা রীতিনীতিগুলোকে বজায় রাখার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠত।

"এই সব ঘটনার কথা শুনে ওই বয়সের একটা বাচ্চা ছেলে হাততালি দিয়ে বলত, কীভাবে ভালোবাসতে হয় তাঁদের চেয়ে সেটা আমি অনেক ভালো করেই জানি।

"এর পরে সে আমার প্রতি এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার কাণ্ড

দেখে আমরা হাসতাম। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে ফুলের বাগানে গিয়ে আমার জন্য ফুল তুলে আনত। আমার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় ফুলগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমার ঘুম ভাঙতেই প্রথমেই তাকে আমি দেখতে পেতাম। সে আমার হাতে ফুলগুলো দিয়ে বলত, আমি তোমার জন্য ফুল তুলে এনেছি। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে সে আমার হাতে চুমু দিয়ে বলত, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

"আমার এখন মনে হয় আমার অপরাধের অন্ত নেই, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চিরকুমারী থেকে অথবা তার বাগ্‌দত্তা বিধবার বেশে আমৃত্যু আমার অন্যায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে যাব।

যা হোক ছেলেমানুষের এই ছেলেমানুষিতে খুব মজা পেতাম। অনেক সময় তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতাম আর সেটাকে সত্যি ভেবে নিয়ে আমার সঙ্গে সত্যিকারের একজন প্রেমিকের মতো ব্যবহার করত। পরিণত বয়সের প্রেমিকের সঙ্গে তার প্রেমিকা যেমন ব্যবহার করে, আমি তার সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করতে শুরু করলাম। আমি তাকে চুমু খেতাম, আদর করতাম, তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতাম। তাকে প্রেমপত্র লিখতাম। সেও আমার চিঠির উত্তর দিত। সে চিঠির ভাষা ছিল আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরা। আমার মা মাসি সেগুলো পড়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতেন। তার প্রেমপত্রগুলো এখনও আমার কাছে রেখে দিয়েছি তার স্মৃতি হিসাবে। সে নিজেকে পূর্ণবয়স্ক একজন যুবক হিসাবে মনে করত। সে জানত, আমাদের ভালোবাসার কথা সকলের কাছে গোপন আছে।

"এইভাবে একটা বছর কেটে গেল। এক দিন রাত্রে যখন আমি তার সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সে নতজানু হয়ে আমার পায়ের কাছে বসে আমার স্কার্টে চুমু খেয়ে বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সত্যিই আন্তরিকভাবে ভালোবাসি। তুমি যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাস—তাহলে বাবার পথই আমি অবলম্বন করব। বাবা কী করেছিলেন, সে কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি।

"তার কথা শুনে ভয়ে আমি বিবর্ণ হয়ে যেতাম, সমস্ত হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকত।

"এর পর সে আমার কানের কাছে মুখটাকে নিয়ে গিয়ে খুব মিষ্টি স্বরে আমার নাম ধরে ডাকত। তার ডাক শুনে আমার শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ জাগত, কেমন আবেশে পুলকে বিহ্বল হয়ে পড়তাম। এর পর বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তাকে অনুরোধ করতাম।

"আমি নিজেই যে এই পথে অনেকটা এগিয়ে গেছি তা প্রথমে বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে সে-কথা বুঝতে পেরে নিজেকে গুটিয়ে ফেললাম। আমি তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। তাই দেখে এক দিন আমাকে কঠিন স্বরে প্রতারক, ঠগ, বিশ্বাস-ঘাতক—ইত্যাদি বলে গালাগাল দিল। তখন আমি বলেছিলাম, দেখ, রসিকতা বা ঠাট্টাতামাশা করার বয়স তুমি পেরিয়ে এসেছ আর প্রেম করার মতো পরিণত বয়সে

তুমি এখনও এসে পৌঁছোওনি। তোমার উপযুক্ত বয়স হবার জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকব।

"ভাবলাম এইভাবে ধীরে ধীরে সে আমার কথা ভুলে যাবে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম আমার ধারণা কতটা অমূলক।

"স্কুল সেসান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দূর শহরের একটা স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে যখন আমাদের বাড়িতে এল—তখন আমার বিয়ের সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। খুব সহজেই সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। এর পর সে এমন গম্ভীর হয়ে গেল—আমি তাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম।

"তিন-চারদিন পরে লক্ষ করলাম আমার বন্ধ দরজার ঠিক কাছেই একখানা চিঠি পড়ে আছে। কেউ নিশ্চয়ই দরজার তলা দিয়েই চিঠিখানা ঢুকিয়ে দিয়েছে। চিঠিখানা সেখান থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। তাতে লেখা ছিল—তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ, তবে তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। তোমার জন্যই এই বয়সেই আমাকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে যেতে হচ্ছে। গত বছর পার্কের যে জায়গাটায় আমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলাম, সেখানে গেলেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। পোশাকটা কোনোরকমে পরে পাগলের মতো ছুটে গেলাম সেই বিশেষ জায়গাটায়। দেখলাম তার স্কুল ইউনিফর্মের মাথায় পরার টুপিটা ঘাসের ওপর পড়ে আছে। এর পর আর একটু এগিয়ে গিয়ে সামনের গাছটার দিকে তাকালাম, দেখলাম ঘন পাতার মধ্য থেকে কার একটা শরীর যেন ঝুলছে বাতাসের ধাক্কা খেয়ে।

"সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড আঘাতে মনে হল আমার সমস্ত স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম আমি বাড়িতে, বিছানায় শুয়ে আছি আর মা বসে আছেন আমার কাছে। আমি ভেবেছিলাম কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে আমি জেগে উঠেছি। মাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই পার্কের গাছে যার দেহটা ঝুলছিল, সে কি গোনট্রা?

"কেউ কোনো কথার উত্তর দিল না।

"আমার ধারণা মিথ্যে নয়, ও-ই গোনট্রা।

"তাকে আর একবার দেখার সমস্ত সাহস আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তার জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। আমি শুধু তার একগাছি চুল চেয়ে নিয়েছিলাম।"

এই কথাগুলো বলেই তিনি তাঁর হাতের রুমাল দিয়ে কয়েকবার চোখের জল মুছে নিয়ে বললেন, "যেখানে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাদের জানিয়ে দিলাম এ বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিন থেকে আমি নিজেকে সেই তেরো বছরের কিশোরের বিধবা স্ত্রী মনে করি।" এর পর তিনি আকুল হয়ে অঝোরে কেঁদে চললেন।

সবাই যখন সেখান থেকে চলে গেল তখন মোটা চেহারার একজন শিকারি তার সঙ্গীর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিশফিশ করে বলল, "অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা মানুষের এই ধরনের বিপদই ডেকে আনে।"

শয়তান
The Devil

মুমূর্ষু বৃদ্ধা মহিলাটির শয্যার পাশে ডাক্তারের মুখোমুখি চাষিটি দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধার মুখভাব ছিল প্রশান্ত। সবকিছু তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলেন। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের কথা শুনছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে জেনেও তার জন্য তাঁর কোনো ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। তাঁর জীবনদীপ নিভে যাওয়ার সময় হয়েই গিয়েছিল কারণ তাঁর বয়স হয়েছিল বিরানব্বই।

কুলাই-এর প্রখর সূর্যরশ্মি খোলা জানালা ও দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে চাব পুরুষ ধরে ব্যবহৃত বাদামি মাটির অসমতল মেঝেটাকে আলোকিত করেছে। দুপুরের তপ্ত বাতাস বয়ে নিয়ে আসে মাঠের গন্ধ, ফসলের ঘ্রাণ, রোদে পোড়া পাতার উদাস করা সুগন্ধ, হাওয়ায় ভেসে আসে ফড়িংএর ঝিমঝিম সুরের গান।

ডাক্তার চড়া গলায় বললেন, ‘‘হোনোর, তোমার মাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যেয়ো না। যে কোনো সময়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।’’

দুঃখী চাষিটি বলল, ‘‘অনেকক্ষণ ধরে মাঠে গমের আঁটিগুলো পড়ে আছে, এখনই না আনতে পারলে ফসলগুলো নষ্ট হবে। এ ব্যাপারে তুমি কী বলো মা?’’

মুমূর্ষু মহিলাটি তখনও নর্মানসুলভ ধনলিপ্সায় প্রভাবিত হয়ে চোখ ও মুখের ভাবে সম্মতি জানিয়ে একথা বলতে চাইলেন যে তাঁকে একাকী মৃত্যু শিয়রে ফেলে রেখে সে যেন গমের আঁটিগুলো ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু ডাক্তার তাতে ভীষণ রেগে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকে বললেন, ‘‘তোমাকে নিষ্ঠুর ছাড়া অন্য কিছু বলা উচিত নয়, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি তোমাকে এখন মাঠে যেতে দেব না, বুঝতে পেরেছ? আর নেহাতই যদি গমের আঁটিগুলো আনতে তোমাকে আজ মাঠে যেতেই হয় তাহলে র‍্যাপেটের স্ত্রীকে এনে তার ওপর তোমার মায়ের দেখাশোনার ভার দিয়ে মাঠে যাও। আর তুমি যদি আমার কথা না শোন, তাহলে যেদিন তোমার অবস্থা তোমার মায়ের মতো হবে, সেদিন তোমাকে কুকুরের মতো মরতে হবে, এই তোমাকে বলে দিলাম, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?’’

লম্বা, রোগা চেহারার চাষিটা, নড়তেচড়তে যার বেলা যায়, একদিকে ডাক্তারের ভয়ে অন্য দিকে সঞ্চয়ের তীব্র ইচ্ছায় এক নিদারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তোতলাতে তোতলাতে বলল, ‘‘অসুস্থ রোগীদের দেখাশোনার জন্য সে কত পারিশ্রমিক নেয়?’’

ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন, ‘‘আমি কী করে জানব? সেটা নির্ভর করবে কতক্ষণ তাকে থাকতে হবে তার ওপর। সেটা তুমি তার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নাও।’’

সুতরাং লোকটি মনস্থির করে ফেলল, বলল, ‘‘আমি তার কাছেই যাচ্ছি, ডাক্তারবাবু

দয়া করে রাগ করবেন না।''

ডাক্তার চলে গেলেন, যাওয়ার সময় বললেন ''ঠিক আছে, তোমার মায়ের দিকে লক্ষ রেখো।''

এর পর হোনোর তার মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, ''মা, তোমার দেখাশোনার জন্য আমি লা র‍্যাপেটকে আনতে যাচ্ছি, তুমি একটু একা থাকো।''

এই বলে সে বেরিয়ে গেল। লা র‍্যাপেট একজন বয়স্কা ধোপানি। কাপড় কাচার কাজ ছাড়া পাড়াপড়শির কারও বাড়িতে কেউ মারা গেলে বা মরণাপন্ন হলে সে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বদলে তার সেবা পরিচর্যা করত। তার মনটা ছিল লোভ লালসায় পরিপূর্ণ। শুধুমাত্র মৃত্যু সম্বন্ধে কথা বলতে সে ভালোবাসত। জন্ম থেকে সে যে কতরকমের মৃত্যু দেখেছে সে সমস্ত সে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ব্যাখ্যা করত।

হোনোর তার বাড়ি গিয়ে দেখল, মেয়েদের কাপড়চোপড় কাচার জন্য সে একটা পাত্রে নীল গুলছে।

হোনোর জিজ্ঞেস করল, ''কেমন আছ র‍্যাপেট বুড়ি?''

সে ফিরে তাকাল। ''ওই একইরকম, তোমার খবর কী?''

''আমি ভালোই আছি। তবে মার অবস্থা বিশেষ ভালো ঠেকছে না।''

''তোমার মা?''

''হ্যাঁ, আমার মায়ের কথাই বলছি।''

''কী হয়েছে।''

''মায়ের এখনতখন অবস্থা।''

সে কথা শুনেই র‍্যাপেট নীল গোলা ফেলে রেখে সহানুভূতির ছল করে বলল, ''সত্যি তার এমন অবস্থা?''

''ডাক্তার বলেছেন, বিকেলটা কাটবে কি না সন্দেহ।''

''তাহলে তো খুবই খারাপ অবস্থা।''

হোনোর এবার আসল কথাটা বলতে গিয়ে বেশ দ্বিধা বোধ করে। কীভাবে যে সেই প্রসঙ্গে সে কথা বলবে সে নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করতে থাকে। শেষপর্যন্ত কোনো কিছু স্থির করতে না পেরে সে হঠাৎই বলে ফেলল, ''মা মারা না যাওয়া পর্যন্ত তার দেখাশোনা করার জন্য তুমি কত চাও? তুমি তো জানোই, আমি বড়োলোক নই। একটা বাচ্চা বয়সের চাকরানি রাখাও আমার সামর্থ্যের বাইরে। আমার অর্থাভাবের জন্যই মায়ের আজ এই দুরবস্থা। অতিরিক্ত খাটুনির জন্য আজ মায়ের এই অবস্থা। এই বিরানব্বই বছর বয়সে দশজনের খাটুনি সে একাই খেটেছে। আজকের দিনে তুমি এধরনের মানুষ খুঁজেই পাবে না।''

লা র‍্যাপেট তার কথা শুনে বেশ গম্ভীরভাবেই উত্তর দিল, ''ধনী লোকদের কাছ থেকে আমি দিনপ্রতি চল্লিশ সাউস এবং রাত হিসাবে তিন ফ্রাঙ্ক নিয়ে থাকি। আর অন্যদের ক্ষেত্রে দিনপ্রতি কুড়ি সাউস এবং প্রতিরাতের জন্য চল্লিশ সাউস হিসাবে ধার্য করি। তোমাকে দ্বিতীয় রেটটাই দিতে হবে।''

কিন্তু এই হিসাবটা চাষির মনঃপূত হয় না। সে তার মাকে ভালোভাবেই জানত। জানত, তার মা কী শক্তধাতের মানুষ, তাঁর জীবনীশক্তি কী অপরিসীম। কোনো অসুখবিসুখে তার মাকে সে এতকাল কাবু হতে দেখেনি। খুব শিগগির যে তিনি মারা যাবেন এমন তার মনে হয় না ডাক্তার যাই বলুন না কেন, আরও এক সপ্তাহ তিনি টিকে যাবেন।

মনে মনে এমন ভরসা পেয়ে হোনোর দৃঢ়স্বরে বলল, "না, মায়ের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তুমি থোক কিছু টাকা হিসাব করে নাও। এক্ষেত্রে দুজনেরই ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছেন তিনি যখনতখন মারা যেতে পারেন। যদি তাই হয় তাহলে তোমার লাভ হবে সব থেকে বেশি আর সেই অনুপাতেই আমার ক্ষতি হবে। কিন্তু তিনি যদি আগামীকাল, পরশু বা আরও বেশ কয়েক দিন টিকে যান তাহলে তুমি হারবে আর আমি জিতব।"

বৃদ্ধ সেবিকা কিছুক্ষণ তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মৃত্যু নিয়ে তাকে যে এভাবে জুয়ো খেলতে হবে সে কখনও ভাবেনি। কিন্তু হঠাৎ কিছু লাভের আশায় সে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। আবার তখনই তার সন্দেহ হল লোকটা ঠকাবার মতলব করে তাকে নাচাচ্ছে না তো!

"তোমার মাকে না দেখা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারছি না।"

"বেশ, তাহলে আমার সঙ্গে এসো, তাঁকে দেখবে।"

ধোপানি তার হাত ধুয়ে তখনি তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যেতে যেতে কারও সঙ্গে কোনো কথা বলল না। ধোপানি হাঁটছিল অত্যন্ত দ্রুত। প্রচণ্ড উত্তাপে গোরুগুলো ভীষণ ক্লান্ত হয়ে মাঠের মধ্যে শুয়েছিল। পথচারী দুজনকে দেখে তারা মাথা উঁচু করে ক্ষীণ হাম্বা স্বরে ডেকে উঠে যেন কিছু সবুজ কচি ঘাসের জন্য তাদের কাছে আর্জি জানাল।

বাড়ির কাছে এসে হোনোর করুণ বিষণ্ণ স্বরে বলে উঠল, "মনে হয় সব শেষ হয়ে গেছে।" গলার স্বরে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার অবচেতন মনের ইচ্ছাটা।

কিন্তু তার মা তখনও দিব্যি বেঁচে আছেন। পিঠ ফিরিয়ে অন্য দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন, ভয়াবহ শীর্ণ হাত দুটো দেখে মনে হয় অদ্ভুত কোনো জন্তু বা কাঁকড়ার থাবা।

লা র‍্যাপেট ধীরে ধীরে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়, মুমূর্ষু বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে তাঁর অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করে, কব্জি ধরে নাড়ির গতি অনুভব করে, তাঁর বুকে কান রেখে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনে এবং তাঁর কাছ থেকে উত্তর পাবার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, হোনোর এল তার পিছন পিছন।

হোনোর এর মনে হল তার মা বোধহয় আজকের রাতটাও টিকে থাকবেন না। এমন সন্দেহে জিজ্ঞেস করল, "কেমন দেখলে, ভালো?"

নার্স উত্তর দিল, "এখনও দুদিন ওঁর আয়ু আছে, সেটা তিন দিনও হতে পারে। তা হোক, তোমাকে সর্বসাকুল্যে ছয় ফ্রাঙ্ক দিতে হবে।"

ছয় ফ্রাঙ্কের কথা শুনে সে আকাশ থেকে পড়ল, চিৎকার করে বলল, ‘‘বল কী, ছয় ফ্রাঙ্ক! এতটাকা একসঙ্গে আমার বাবাও চোখে দেখেনি। ছয় ফ্রাঙ্ক, তুমি কী পাগল হয়ে গেছ? আমি বলছি, আমার মা বড়োজোর আর পাঁচ থেকে ছ’ঘণ্টা টিকে থাকবেন।’’ এর পর দুজনেই রেগে গেল এবং দরকষাকষি করল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর বুড়ি র‍্যাপেট যখন বলল, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে আর হোনোর যখন বুঝতে পারল গমের আঁটিগুলো নিজেরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি আসবে না তখন সে ধোপানির শর্তে রাজি হল।

‘‘ঠিক আছে, ছয় ফ্রাঙ্ক, আমি তাতেই রাজি। কিন্তু মনে রেখো, শবদেহ কবর দেবার আগে পর্যন্ত সমস্ত কাজই তোমাকে করতে হবে।’’

‘‘তাহলে, ওই কথাই রইল, ছয় ফ্রাঙ্ক’’।

হোনোর কাজের কথা শেষ করে মাঠে চলে গেল। সেখানে প্রচণ্ড রোদের তাপে তার গমের আঁটিগুলো পুড়ে কাঠ হচ্ছে। ওদিকে বুড়ি র‍্যাপেট গিয়ে ঢুকল হোনোরের মরণাপন্ন মায়ের ঘরে। সে বাড়ি থেকে আসার সময় কিছু কাজ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তাকে যখন মৃত বা মৃতপ্রায় মানুষের পাশে বসে তার সেবা যত্ন করতে হয়, তখন সে অবসর বুঝে নিজের জন্য বা নিয়োগকারীর পরিবারের জন্য কিছু কাজ করে দেয়। অবশ্যই উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে।

হঠাৎ সে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘মাদার বনতেম্পস, ধর্মীয় অনুষ্ঠান কি পালন করা হয়েছে?’’

বৃদ্ধা মহিলা মাথা নেড়ে জানালেন যে তা করা হয়নি।

ভক্তিমতী লা র‍্যাপেট সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, ‘‘হায় ভগবান, এও সম্ভব? আমিই তবে পাদরি মশাইকে ডেকে আনি।’’

একথা বলেই সে বাজারের মধ্য দিয়ে ছুটতে শুরু করে। তাকে এভাবে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটতে দেখে রাস্তার লোকেরা মনে করল কোথাও নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পুরোহিত তাঁর যাজকের পোশাক পরে বেরিয়ে এলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলেন। তাঁর পিছনে পিছনে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলল একজন বালক-গায়ক, তার সেই ঘণ্টা বাজানোর শব্দে মনে হল—রোদে পোড়া শান্ত গ্রামের মানুষের কাছে মৃত্যুর আগমনবার্তা সে ঘোষণা করছে। খানিকটা দূরে যে কয়েকজন লোক কাজ করছিল তাদের মাথার বড়ো বড়ো টুপিগুলো তারা খুলে ফেলল এবং পুরোহিতের সাদা রঙএর পোশাক যতক্ষণ না একটা খামারবাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ততক্ষণ নির্বাক নিশ্চল হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল। যে সমস্ত স্ত্রীলোক ফসলের আঁটি বেঁধে সেগুলোকে সাজিয়ে রাখছিল তারা ক্রুশ আঁকার জন্য উঠে দাঁড়াল। কালো মুরগিগুলো ভয় পেয়ে খাল ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে তাদের অতি পরিচিত গর্তের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর তাদের আর দেখতে পাওয়া গেল না। মাঠের মধ্যে যে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সে যাজকের পোশাক দেখে ভয় পেয়ে প্রচণ্ড বেগে পা ছুঁড়ে চক্কর খেতে খেতে লাফাতে লাগল।
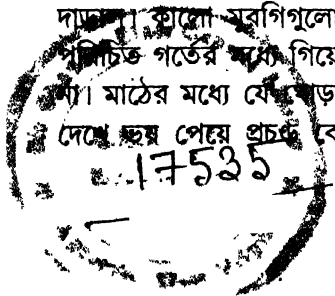
লাল পোশাক পরা বালক-গায়ক দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছিল, আর পাদরি মশাই মাথা নীচু করে বিড়বিড় করে প্রার্থনার মন্ত্র পড়তে পড়তে তার সঙ্গে সমতা বজায় রেখে হেঁটে চলেছিলেন। সবশেষে লা র‍্যাপেট তার মাথাটাকে দ্বিগুণ নীচু করে জোড় হাতে তাদের পিছন পিছন ছুটছিল।

হোনোর খানিকটা দূর থেকে তাঁদের লক্ষ করেছে। সে একজনকে জিজ্ঞেস করে, "আমাদের পুরোহিত কোথায় যাচ্ছেন?"

জবাব দিল সে, "তোমার মায়ের শেষ সময় উপস্থিত। সেইজন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হবে।" চাষিটি মোটেই অবাক না হয়ে বলল, 'সেটা খুবই সম্ভব।' এই বলে সে নিজের কাজে মন দেয়।

মাদার বনতেম্পসের স্বীকারোক্তি নিয়ে পাদরি তাঁর পাপ ক্ষমা করলেন। তারপর দুজন মহিলাকে দমবন্ধ করা অন্ধকার কুঁড়েঘরের মধ্যে একলা ফেলে রেখে তিনি লোকজন নিয়ে গির্জায় ফিরে গেলেন।

লা র‍্যাপেট মুমূর্ষু বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে—ও কি আরও অনেক সময় বেঁচে থাকবে?

দিনের আলো মুছে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গাছের পাতা ছড়িয়ে দিচ্ছে ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস। তিনি নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছেন। চোখ দুটো খোলা, নির্বিকার হয়ে প্রতীক্ষা করছেন মৃত্যুর শীতল কোলে আশ্রয় নেবার জন্য পরম নিশ্চিন্তে, পরম নির্ভরতায়। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি হয়ে ওঠে দ্রুততর। গলার ভিতর থেকে শিসের মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মনে হয় খুব শিগগিরই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে এমন একজন নারী যার জন্য দুঃখ করার কেউই থাকবে না।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই হোনোর ফিরে এল। বিছানার কাছে গিয়ে সে দেখল তার মা তখনও বেঁচে আছেন। তাঁর অসুস্থতার সময় সে যেমন জিজ্ঞেস করত তেমনভাবে জিজ্ঞেস করল, 'মা, কেমন আছ?' তারপর সে বুড়ি র‍্যাপেটকে বাড়ি পাঠাবার আগে তাকে বলল, 'কাল ঠিক সকাল পাঁচটায় চলে এসো।'

"হ্যাঁ, ঠিক সকাল পাঁচটায়।"

পর দিন যথা সময়ে র‍্যাপেট এসে উপস্থিত হল, দেখল হোনোর নিজের হাতের তৈরি স্যুপ মহা তৃপ্তি করে খাচ্ছে। কারণ তাকে এখনই মাঠে যেতে হবে।

সেবিকা জিজ্ঞেস করল, "ভালো কথা, তোমার মা কি মারা গেছেন?"

হোনোর চোখের কোণ দিয়ে একটু বাঁকা হেসে বলল, "একটু ভালোর দিকেই মনে হচ্ছে।" এই বলে সে চলে গেল।

লা র‍্যাপেট বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সে বিছানার কাছে ছুটে গিয়ে বুড়ির মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল। ঠিক তখনই বৃদ্ধা দু'চোখ খুলে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টায় অবশ দুই হাতে বিছানার চাদরটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন। সেবিকা বুঝল, এইভাবে দুদিন, চার দিন, আট দিন এমনকি.... তারও বেশি দিন এই বুড়ি টিঁকে যেতে পারে। তার

লোভী মন ভয়ে বিবশ হয়ে পড়ল। তার সঙ্গে এমন চালাকি করেছে ভেবে ধূর্ত লোকটার ওপর এবং এই যে বুড়িটা মরেও মরছে না তার ওপর চাপা রাগে ফুঁসতে লাগল।

তা সত্ত্বেও সে ছুঁচ সুতো নিয়ে সেলাই করতে বসল কিন্তু মাদার বনটেম্পসের অসংখ্য রেখাযুক্ত কোঁচকানো মুখের ওপর তার চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল।

সকালবেলা হোনোর এল প্রাতরাশ সারতে। তাকে দেখে বেশ খুশি মনে হল, এক কৌতুককর অনুভূতি তাকে যেন ঘিরে রেখেছে। সে গমের আঁটিগুলোকে অনায়াস স্বচ্ছন্দে বেশ ভালো অবস্থায় ঘরে তুলে এনেছে।

এদিকে বুড়ি র‍্যাপেট কিন্তু রাগে ফুঁসছিল। এক একটা মিনিট বয়ে যায় আর সে ভাবে তার টাকাপয়সা আর সময় সব নষ্ট হয়ে গেল। তার এখন ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছে ওই বুড়ো গাধাটার গলাটা টিপে ধরে এক্ষুণি শেষ করে দেয়। শক্তপ্রাণ বুড়িটার গলায় একটু চাপ দিলেই সব খেলা শেষ হয়ে যাবে। কারণ তার মনে হচ্ছে বুড়িটা যেন তার অর্থ আর সময় সব ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা করার যে বিপদ আছে র‍্যাপেট সেটা বুঝতে পারল। তার ফল কী হতে পারে সেসব চিন্তাও তার মাথায় জট পাকাতে থাকে। সুতরাং সে বিছানার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কখনও শয়তানকে দেখেছেন?"

মাদার বনটেম্পস অতি ক্ষীণ গলায় উত্তর দিলেন, "না।"

তখন বুড়ি র‍্যাপেট এমন এক সাংঘাতিক ভয়ের গল্প বলতে শুরু করল যা তাঁর দুর্বল এবং অর্ধচেতন মনের ওপর ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করে। সে বলতে আরম্ভ করে, মানুষের মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে সেই শয়তান এসে উপস্থিত হয়, তার এক হাতে থাকে ঝাঁটা, মাথায় থাকে একটা সসপ্যান, আর সে ভয়ংকর শব্দে চিৎকার করতে করতে তার প্রাণটা টেনে বের করে নেবার জন্য এগিয়ে আসে। কেউ যদি তাকে একবার দেখতে পায় তাহলে তার সব শেষ হয়ে যাবে—আর সেই লোকটা বেঁচে থাকার জন্য মাত্র কয়েকমুহূর্ত সময় পাবে। আর যারা যারা শয়তানের দেখা পেয়েছে তাদের কথাও বলতে ছাড়ল না। তারা হল, জোসেফাইন লইসেল, ইউল্যালি র‍্যাটিয়ার, সোফি প্যাডগনা আর সেরাপাইন গ্রসপিয়েড।

বুড়ি র‍্যাপেটের গল্প শুনে মাদার বনটেম্পসের মানসিক অস্থিরতা ভীষণভাবে বেড়ে গেল। সমস্ত শরীরে তখন তাঁর কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর হাত দুটোতে মোচড় দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করে দেখতে চাইলেন, ঘরের কোণে সেই শয়তান এসে উপস্থিত হয়েছে কি না।

সুযোগ বুঝে লা র‍্যাপেট চৌকির নীচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। আলমারি খুলে সে একটা চাদর বের করে নিজের সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলে। তারপর একটা লোহার পাত্র এনে সে নিজের মাথার উপর উলটো করে চাপিয়ে দেয় যাতে পাত্রটার বাঁকানো পা তিনটিকে তিনটি শিং বলে মনে হয়। এরপর ডান হাতে এক গাছা ঝাঁটা এবং বাঁ-হাতে টিনের একটা পাত্র নিয়ে সেই ঝাঁটাগাছা দিয়ে এমন সপাটে টিনের পাত্রটার

গায়ে ঝাপটা মারে এবং তাতে টিনের পাত্রটা বিকট শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায়।

সেটা মাটিতে এসে পড়তেই প্রচণ্ড শব্দে মেঝেটা যেন কেঁপে উঠল। আর সেই শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাপেট এক মুহূর্ত দেরি না করে মৃতপ্রায় বৃদ্ধার ঘরের ঝোলানো পর্দাটাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনে। তারপর তার মাথার ওপরের টিনের পাত্রটাতে উৎকট শব্দ তুলে ঝাঁটা হাতে নিয়ে বৃদ্ধার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে।

ভয়ংকর ভয়ে উন্মাদিনীর দৃষ্টিতে মরণাপন্ন বৃদ্ধা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। তারপর অমানুষিক চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করলেন। সেই অসম্ভব চেষ্টায় তাঁর কাঁধ ও বুকের অংশ বিছানার বাইরে এসে ঝুলে পড়ে। তারপর বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বিছানার ওপর পড়ে গেলেন। আর সেই নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এর পর ধীরেসুস্থে লা র‍্যাপেট যেখানকার জিনিস সেখানেই সাজিয়ে রাখে। ঝাঁটাগাছাটা রাখে দেয়ালআলমারির এক কোণে, চাদরটা রাখে আলমারির মধ্যে, রান্নার পাত্রটা রাখে মাটির উনুনের ওপর, টিনের পাত্রটা মাটির মেঝেতে আর চেয়ারটা রাখে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে। এর পর সে পেশাদারের দক্ষতায় মৃতার বিস্ফারিত চোখের পাতা বন্ধ করে দেয়, বিছানার ওপরে একটা পাত্র রেখে তাতে পবিত্র জল ঢেলে দেয় এবং তার মধ্যে ডুবিয়ে দেয় বক্সউড গাছের একটা নরম কচি ডাল। এর পর সে প্রথানুযায়ী মৃতার আত্মার সদ্গতির জন্য হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করতে শুরু করে।

রাত্রে হোনোর বাড়ি ফিরে এসে তাকে ওইভাবে প্রার্থনা করতে দেখল। সে সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করতে লাগল, হায় হায় বুড়ি র‍্যাপেট তার কুড়ি সাউস ঠকিয়ে নিয়েছে। ও এখানে সময় দিয়েছে তিন দিন ও এক রাত, তাতে তার মোট পাওনা হয় পাঁচ ফ্রাঙ্ক, কিছুতেই ছয় ফ্রাঙ্ক নয়।

স্নায়ুর বিকার
The Spasm

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বহু ভ্রমণকারী এখানে আসে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই এই হোটেলে এসে ওঠে। রোজ সন্ধেবেলা রাত্রির খাবার খাওয়ার জন্য যখন বোর্ডাররা এখানকার ডাইনিং হলটাতে এসে হাজির হয় তখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে যদি পরিচিত কাউকে দেখতে পায়।

এক দিন সন্ধ্যার পরে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য যখন ডাইনিং হলটাতে গিয়ে হাজির হলাম, দুজন নূতন বোর্ডারকে সেখানে ঢুকতে দেখলাম। তাদের একজন বাবা অন্যজন মেয়ে। সহজে নজরে পড়ার মতো চেহারা। মেয়েটির বাবার বয়স খুব বেশি না হলেও দেখলে বৃদ্ধ বলে মনে হয়। মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। চেহারাটা রোগা হওয়ার কারণে তাঁকে অনেকটাই লম্বা মনে হয়। ছোটোখাটো মেয়েটার চেহারাটা বেশ রোগা। তাকে দেখে এমন দুর্বল মনে হচ্ছিল যেন হাঁটাচলা করতে বা কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আর একটা ব্যাপার বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যখনই ভদ্রলোক খাবার সময় কোনো পাত্র ধরতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর হাতটা যেন কেমন বেঁকে গিয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

খাওয়াদাওয়া করে অন্যান্য দিনের মতো আমি সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। যে পথ ধরে আমি হাঁটছিলাম, সেটা পাহাড়ি একটা পথের সঙ্গে মিশে গিয়ে শেষ হয়েছে শিতেল গুয়েন-এ যেখানে প্রায়ই আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসে তপ্ত লাভার স্রোত।

ওই রাস্তাটা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখলাম ভদ্রলোকও তাঁর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দেখা হতেই তাঁর সঙ্গে আমি সম্ভাষণ বিনিময় করলাম। সেখানে কোনো বেড়ানোর জায়গা আছে কি না, সে-কথা তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন।

আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোতে লাগলাম। এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় লোকে আসে সাধারণত রোগ সারাবার জন্য। ফলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায় এবং সকলের প্রতি সকলের একটা সহানুভূতির মানসিকতা গড়ে ওঠে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নিজের রোগ সারাবার জন্য আমি এখানে আসিনি। মেয়েটাকে সুস্থ করে তোলার জন্য আমি এখানে এসেছি। অনেক চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছি, তার অনেকরকম চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু অসুখ সারেনি। তার অসুখটা যে কী, কোনো ডাক্তারই সেটা ধরতে পারেনি। কেউ বলে তার হার্টের অসুখ,

কেউ বলে লিভারের গোলমাল থেকে এই অসুখের সূত্রপাত আবার কেউ কেউ বলে তার মেরুদণ্ডের ত্রুটির জন্য সে এই রোগের শিকার হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনো কিছু ধরতে গেলে আপনার যে হাত কাঁপে, হাত বেঁকে যায়, এই ধরনের স্নায়ুঘটিত অসুবিধাগুলো কি আপনাদের বংশগত?

তিনি বললেন, একটা ঘটনার পর থেকে আমার এ ধরনের স্নায়ুর অসুখগুলো দেখা দিয়েছে। আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, আমার এই মেয়েটিকে জীবন্ত অবস্থায় একবার কবর দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর কথা শুনে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তিনি এর পর তাঁর কাহিনি বলতে শুরু করলেন।

আমার এই মেয়েটির নাম জুলিয়েট। ও অনেক দিন থেকে হার্টের রোগে ভুগছিল। সে এক দিন যখন বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিল তখন কোনো একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এবং জ্ঞান হারায়। ওই অবস্থায় যখন তাকে বাড়িতে আনা হল — তখন তার সমস্ত শরীর বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করলেন। জুলিয়েট ছিল আমার একমাত্র সন্তান। বহু বছর আগে সে তার মাকে হারিয়েছে। সুতরাং আমার সমস্ত স্নেহ, ভালোবাসা, মায়ামমতা দিয়ে তাকে বড়ো করে তুলেছিলাম। সে-ই ছিল আমার একমাত্র সম্বল আর তাকেই আশ্রয় করে আমি বেঁচেছিলাম। সুতরাং তাকে সমাধিস্থ করার আগে তার প্রিয় পোশাক আর অলংকারগুলো তার কফিনের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এর পর তাকে কবর দেওয়া হল আর একাজে আমাকে সাহায্য করল আমাদের পুরোনো চাকর প্রসপার।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোক দুঃখে একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। সমস্ত রাত্রি বিছানায় শুয়ে ছটফট করলাম, তার সমস্ত স্মৃতি মনে পড়ে যেতে দুচোখ দিয়ে অবিরাম ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল, চোখের জলে ভিজে উঠল আমার মাথার বালিশ।

হঠাৎ মাঝরাতে শুনতে পেলাম কে যেন দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। সেই শব্দে আমি চমকে উঠলাম. ভাবলাম এত রাতে কে এল। আমি একটা মোমবাতি ধরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। চাকরদের কারও ঘুম না ভাঙার জন্য তারা কেউ দরজা খুলতে আসেনি। আমি দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে? কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিল না আর অন্ধকারের মধ্যে কাউকে যখন দেখতে পেলাম না তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল যে দরজায় ধাক্কা দিয়েছে সে জুলিয়েটের প্রেতাত্মা ছাড়া আর কেউ নয়। মায়ার টানে সে আবার ফিরে এসেছে। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতেই দেখলাম সাদা কাপড় জড়িয়ে একটি নারীমূর্তি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে আপনি?" নিজের গলার স্বরটা যেন কেমন কাঁপা-কাঁপা মনে হল, চিনতেই পারছিলাম না নিজের গলার স্বর বলে।

যা হোক সে বলল, বাবা, আমি।

জুলিয়েটের গলা শুনে ভীষণ ভয় আর আতঙ্কে আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। সেই অবস্থায় হাত দিয়ে মূর্তিটাকে সরিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু অতৃপ্ত আত্মার বায়বীয় মূর্তিটাকে হাত দিয়ে আমার ছোঁয়ার ক্ষমতা হল না, বরং ভয় পেয়ে বেশ কয়েক হাত ঘরের মধ্যে পিছিয়ে এলাম। এদিকে দরজার পাল্লা দুটো হাট হয়ে খোলা রইল।

সেই মূর্তি তখন জুলিয়েটের স্বরে বলল, বাবা, আমি বেঁচে আছি। তোমরা আমাকে মৃত মনে করে কবর দিয়েছিলে কিন্তু আমি মরিনি। একটা চোর আমার কবর থেকে তোমার দেওয়া অলংকারগুলো চুরি করতে এসেছিল। তুমি যে আমার কফিনের মধ্যে সেগুলো দিয়ে দিয়েছ, সেটা খুবসম্ভব সে জানতে পেরেছিল। সে যখন আমার আঙুল থেকে হিরের আংটি নেওয়ার জন্য আমার আঙুলটা কাটতে শুরু করল তখন ভীষণ যন্ত্রণায় আমার চৈতন্য ফিরে এল। আমি তখন বীভৎস স্বরে চিৎকার করে কফিনের মধ্যে উঠে বসি আর চোরটা আমাকে প্রেত মনে করে পড়ি কি মরি করে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

আমি তখন তার সামনে মোমবাতিটা নিয়ে গিয়ে ভালো করে লক্ষ করতে লাগলাম। দেখলাম সত্যিই তার আঙুল থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। তখন আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। আমি মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে গভীর মমতায় পরম স্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সমস্ত রুদ্ধ আবেগ অশ্রু হয়ে আমার চোখ দুটো থেকে ঝরে পড়তে লাগল। আমি আনন্দে উত্তেজনায় একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মানুষের জীবনে এ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে, সেটা ভেবে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরম স্নেহ আদরের সন্তান এইভাবে যে মৃত্যুর পর আবার ফিরে আসতে পারে, সে-কথা আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এর পর আমি তাকে জড়িয়ে ধরে ওপরে নিয়ে গেলাম। ঘরটাকে গরম করার জন্য চাকরদের বললাম, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতে। তারা যখন ব্যাপারটা জানতে পারল তখন অবাক হয়ে জুলিয়েটকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল, ভাবতে লাগল এ কি সত্যিই জুলিয়েট না জুলিয়েটের প্রেত? জুলিয়েট যে এভাবে আবার বেঁচে ফিরে আসতে পারে—তা তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। আমি পরে বুঝেছিলাম, প্রসপারই গয়না চুরি করতে গিয়েছিল। কারণ সে-ই একমাত্র কফিনে গয়না দেওয়ার কথা জানত। কিন্তু যেহেতু সে পরোক্ষভাবে আমার মেয়ের প্রাণদান করেছে এবং আমার মৃত সন্তানকে ফিরে পেয়েছি সেজন্য তাকে কোনোরকম শাস্তি দেওয়ার কথা চিন্তা করিনি। সমস্ত কিছু আপনাকে খুলে বললাম। এই ঘটনার পর থেকে আমি এ ধরনের স্নায়ুর অসুখে কষ্ট পাচ্ছি।

তাঁর কাহিনি শেষ করে ভদ্রলোক চুপ করলেন। এদিকে রাত বেড়ে যেতে আমি হোটেলে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমি ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম, চলুন, এবার আমরা হোটেলে ফিরে যাই।

খোঁড়া
The Cripple

যে ঘটনাটা এখন বলব সেটা ঘটেছিল ১৮৮২ সালের গোড়ার দিকে। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, ট্রেনের একটা কামরা ফাঁকা। শান্তিতে কাটাব বলে সেই কামরাটায় উঠে পড়লাম। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জানালার ধারের একটা সিট-এ এসে বসলাম। হঠাৎ দেখলাম দরজাটা খুলে গেল, একজনকে বলতে শুনলাম, সাবধানে আসুন স্যার। আমরা কিন্তু এখন লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। পাদানিটা অনেকটা উঁচুতে, সাবধানে উঠবেন স্যার।

তার কথার উত্তরে আর একজনকে বলতে শোনা গেল, লঁরে! ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই—আমি শক্ত করেই রডটাকে ধরব। তারপরেই দেখলাম, একটা মাথা ভিতরে ঢুকে এল, মাথায় চাপানো ছিল একটা গোলাকার টুপি। কামরার দুদিকে যে চামড়ার দড়ি ঝুলছিল—সেটার একটা চেপে ধরলেন দুহাত দিয়ে। তাঁর পিছনে পিছনে এসে ঢুকলেন একজন মোটা চেহারার লোক। সেই লোকটি যে মুহূর্তে কামরার মেঝেতে পা দিলেন—খট খট করে একটা শব্দ হল। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, সেই মোটা লোকটার দুটো পা-ই কালো কাঠের। তাঁর পিছনে আর একটি লোক উঁকি দিয়ে লোকদুজনকে দেখে নিয়ে বলল, সব ঠিক আছে তো স্যার?

স্যার বলে যাঁকে ডাকা হচ্ছিল, তিনি বললেন, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

এই রইল আপনার জিনিসপত্র। ক্রাচ দুটো ভিতরে রেখে দিলাম। যে লোকটি কথা বলছিল, মনে হল সে আগে সেনাবাহিনীতে কাজ করত। লোকটার হাতে ছিল অনেকগুলো ছোটো বড়ো বান্ডিল। সে বান্ডিলগুলোকে তার কর্তার মাথার ওপরের বাংকারে ভালো করে গুছিয়ে রাখল। তারপরে বলল, সবগুলো ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখলাম, দরকারমতো নিয়ে নেবেন। আরও কয়েকটা সাধারণ কথা বলে চাকরটি বিদায় নিল। যাওয়ার সময় দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেল। এতক্ষণ পরে লোকটিকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলাম।

মাথার চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেলেও তাঁর বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ হতে পারে। তাঁর পোশাকের ওপর তাঁর বীরত্বের প্রতীক হিসাবে আটকে দেওয়া হয়েছে নানারকম স্মারক পদক। গোঁফজোড়াটা চমৎকার, শরীরের গঠন বেশ বলিষ্ঠ। কোনো কর্মী মানুষ যখন অসুস্থতাবশত মাঝে মাঝে কারণে অকারণে নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না, সহযাত্রীটি সেই প্রকৃতির একজন মানুষ বলেই মনে হল।

দেখলাম বেশ শব্দ করে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কপালের ঘাম মুছছেন। বুঝলাম অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এর পর কোনো ভণিতা না করে

আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ধূমপান করলে কি আপনার অসুবিধা হবে?

আমি খুব মার্জিতভাবে উত্তর দিলাম, না স্যার, আপনি স্বচ্ছন্দে ধূমপান করতে পারেন।

কিছুক্ষণ সহযাত্রীটির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ ভদ্রলোককে আমার খুব চেনা মনে হল। তাঁর চোখ, মুখ, তাঁর গলার স্বরের সঙ্গে আমি যে কোনো এক সময় বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম কিন্তু কোথায় যে কবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সে-কথা মনে করতে পারলাম না। নিশ্চয়ই সেটা ঘটেছিল অনেক বছর আগে। তারপরে দেখাসাক্ষাৎ বা যোগাযোগ না থাকার ফলে এই ভদ্রলোকের স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। সহযাত্রীটিরও অবস্থা হল আমার মতো। তিনি আমার মতো মনের মধ্যে খুঁজে চলেছিলেন স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া আমার অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। আমরা কেবল পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির যন্ত্রণা ভুগতে লাগলাম। বেশকিছুক্ষণ এ ধরনের একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে শেষে আমিই প্রথম কথা বললাম, আচ্ছা দীর্ঘসময় ধরে আমরা যে পরস্পরের মুখের দিকে এইভাবে তাকিয়ে আছি তাতে কিন্তু আমাদের সমস্যার সামাধান হবে না। বরং আমরা যদি আমাদের পরিচয়ের সূত্রটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করি আর তাতে সফল হই, তাহলে সেটা আমাদের উভয়ের কাছে আনন্দজনক হয়ে উঠবে এবং ট্রেনের কামরার পরিমণ্ডলকে করে তুলবে আকর্ষণীয়।

নিশ্চয়ই—আমার সঙ্গে একমত হলেন আমার সহযাত্রীটি।

আমার নাম জানার পর সহযাত্রীটি তাঁর নাম বললেন, হেনরি বুক্লেয়ার। তিনি এখন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কর্মরত।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন তারপর বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার ঠিক মনে পড়েছে, অনেক দিন হল, তা প্রায় বছর বারো হবে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পঁয়সেলে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

হ্যাঁ, তাই-ই হবে। আপনি লেফটেন্যান্ট রেভালিয়ের নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধের সময় গোলার আঘাতে আমার পা-দুটো খোয়া যায়। সেসময় আমি ছিলাম ক্যাপটেন।

এবার সবকিছু আমার স্পষ্টভাবে মনে পড়ে গেল। সেসময় রেভালিয়ার ছিলেন একজন সুদর্শন চেহারার তরুণ। তাঁর সৈন্যপরিচালনার পদ্ধতি দেখে আমি খুব অবাক হতাম। তিনি প্রচণ্ড ঝড়ের গতিতে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন বলে দুরন্ত ঝড় নামে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারেও তিনি যে একজন নিপুণ শিল্পী ছিলেন সেটা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। ভুলে যাওয়া স্মৃতির অন্ধকার পর্দা সরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে একজন যুবতীর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। একইসঙ্গে তার নামটাও চকিতে আমার মনে পড়ে গেল, মিলি দি ম্যানডেল। এবার সম্পূর্ণ ঘটনাটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অন্যান্য প্রেমের ঘটনার মতোই এটাও সেরকম একটা। রেভালিয়ারের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয় তখন ওরা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। জানতে পারলাম ওদের খুব শিগগিরই বিয়ে হবে। ওরা পরস্পরকে খুব ভালোবাসত।

যুবকটির মাথার ওপরে বাঙ্কারে যে সমস্ত জিনিস ছিল ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে হঠাৎ প্রেমসম্পর্কিত একটা ব্যাপার আমার মনে পড়ে গেল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেখানে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গভীর সেখানে কোনো দুর্ঘটনায় যদি একজন কারও অঙ্গহানি হয়, তাহলে তাদের ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন হয় না এবং প্রেমিক বা প্রেমিকা তাকে বিয়ে করে। সেরকম এই যুবকটি যুদ্ধে পা দুটো হারিয়ে তার প্রেমিকার কাছে ফিরে আসে এবং প্রেমিকা তাঁকে বিয়ে করে।

গল্প উপন্যাসে এ ধরনের আত্মত্যাগের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়, আমি ব্যাপারটাকে সেরকম সহজ ও সাধারণ একটা ঘটনা বলে মনে করেছিলাম। প্রেমের জন্য মহান আত্মত্যাগের এই সমস্ত কাহিনি যখন আমরা বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই বা শুনতে পাই তখন আমাদের মনের উদারতা প্রসারিত হয়, দৃষ্টিভঙ্গি হয় স্বচ্ছ—আমরা অপরের কল্যাণের জন্য তৎপর হয়ে উঠি, ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হই, কিন্তু পরের দিন যদি কোনো দুস্থ বন্ধু সামান্য অর্থ আমাদের কাছে ধার চাইতে আসে তখন মহাবিরক্তিতে আমাদের মুখের রেখাগুলো বিকৃত হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই হঠাৎ আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল। এমনও হওয়া বিচিত্র নয় যে যুদ্ধে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ফলে প্রেমিকা তাকে নিজের স্বামী বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় এবং স্বামীর সেবা যত্ন করে, তাকে ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাহচর্য দিয়ে স্ত্রীর কর্তব্য করেছে।

এই বিয়ে কি যুবকটিকে সুখী করতে পেরেছিল—না, দুঃখ যন্ত্রণায় তার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল? ঘটনাটা জানার জন্য প্রথম দিকে আমার ততটা কৌতূহল ছিল না কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোল, সেটা জানব বলে বিশেষভাবে উৎসুক হয়ে উঠলাম। প্রধান প্রধান কিছু অংশ জানতে পারলেও সেটাতে কল্পনার রং দিয়ে একটা কাহিনি খাড়া করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত না। বাঙ্কারে যে পাঁচটা প্যাকেট সাজানো ছিল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে অনুমান করে নিলাম—নিশ্চয়ই এই উপহারগুলো নিজের পরিবারের পাঁচজনের জন্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তিন ছেলেমেয়ে আর স্বামী স্ত্রী।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কটি ছেলেমেয়ে?

আমার কোনো সন্তান হয়নি।

হঠাৎ আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল। মনে হল আমি বোধহয় অতিরিক্ত অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি। তাই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম, আপনার

লোকটি যে সমস্ত খেলনার কথা শুনিয়ে গেল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই আমার এ ধরনের একটা ধারণা হয়েছিল।

একটু হেসে বললেন, না, আমাদের বিয়ে হয়নি, দুঃখের বিষয় আমাদের প্রেম কোনো পরিণতি লাভ করেনি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে বললাম, আপনার সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন মিলি দি ম্যানডেলের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল।

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আশ্চর্য! এতদিনের ঘটনা, আপনার তো বেশ মনে আছে। সত্যিই আপনার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে হয়।

উৎসাহিত হয়ে বললাম, যতদূর জানি মিলি যাকে বিয়ে করেছে, তার নাম মঁসিয়ে, মঁসিয়ে... কী যেন ভদ্রলোকের নামটা!

"মঁসিয়ে ফ্লুরেল।"

যুদ্ধের সময় যে আপনার পা-দুটো হারিয়েছিলেন, সে সংবাদ আমি পেয়েছিলাম।

সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়ে মানুষ যেমন জগতের লোকের কাছে অকৃতকার্যতার কারণ ব্যাখ্যা করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে, তেমনভাবে বললেন, ম্যাডাম দ্য ফ্লুরেল-এর সঙ্গে নাম জড়িয়ে লোকে নানা কথা বলে ভুল করে। পা-দুটো হারিয়ে যখন আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম—তখন সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি কখনই রাজি হতাম না। কারণ, সে আমাকে বিয়ে করে করুণা করুক—সেটা আমি কোনোভাবেই মন থেকে মেনে নিতে পারতাম না। স্বামীকে নিয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য মেয়েরা বিয়ে করে কিন্তু যাকে সে বিয়ে করছে—সে যদি শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে বয়ে বেড়াতে হবে দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণা আর গ্লানি। আমার মতে সমস্ত আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগ একটা সীমিত গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু নারী বা পুরুষ—যেই হোক না কেন, সে যদি শুধু নিজের সমস্ত কামনা বাসনা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তেমন একজন পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে সে অবশ্যই ভুল করবে এবং পরবর্তী জীবনে তাকে সহ্য করতে হবে অপরিসীম দুঃখ আর যন্ত্রণা। কাঠের তৈরি পা নিয়ে যখন আমি হেঁটে বেড়াই আর মেঝের উপর ক্রাচের নীচে লাগানো লোহার পাতের ধাতব শব্দ হয় তখন মাঝে মাঝে মনে হয় চাকরটাকে দু'হাত দিয়ে গলা টিপে শেষ করে ফেলি। এমন একটি কুৎসিত বিকৃত ব্যাপারের শিকার হয়ে যে পুরুষকে সেটা মেনে নিতে গিয়ে সর্বক্ষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়—তাকে বিয়ে করে সেই মেয়েটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কীভাবে সেই যন্ত্রণা সহ্য করবে? আপনার কি মনে হয় আমার কাঠের পা-দুটো দেখে মেয়েরা আমাকে প্রেম নিবেদন করার জন্য অস্থির হবে?

আর কথা না বলে তিনি চুপচাপ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। আমি তাঁকে কোনো কথাই বলতে পারলাম না। কারণ বলার মতো আমার কিছুই ছিল না। কীই বা তাঁকে বলতে পারতাম? মনে হল তিনি যা বলছেন সেটাই ঠিক। মেয়েটিকে যেমন

আমি দায়ী করতে পারি না, দায়ী করতে পারি না তাঁকেও। তাঁদের কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো আমার কিছুই নেই। তবুও কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, ম্যাডামের কি ছেলেমেয়ে হয়েছে?

হ্যাঁ, একটি মেয়ে দুটি ছেলে, এইসব খেলনা নিয়ে যাচ্ছি তাদের জন্য। বাচ্চাগুলোকে খুশি হতে দেখে, ওদের আনন্দ আর হাসিমুখ দেখে আমিও ওদের আনন্দের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। স্বামী স্ত্রী ওরা দুজনেই আমাকে খুব ভালোবাসে।

আমাদের ট্রেনটা তখন সেন্ট জাঁসেস পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করেছে। টানেলের মধ্য দিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পরের স্টেশনে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমার সহযাত্রীটি এই স্টেশনেই নেমে যাবেন। তিনি উঠে দাঁড়াতেই আমি তাঁকে নামতে সাহায্য করব বলে তাঁকে নিয়ে গেটের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। দেখলাম খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে এল দুটো হাত।

তোমার আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো, রিভেলিয়ার? স্মিত হেসে প্রশ্ন করলেন একজন ভদ্রলোক।

না, তোমরা সবাই ভালো আছ তো ফ্লুরেল?

ভদ্রলোকের পিছনে যে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তাঁর স্ত্রী। তিনি তাঁকে দেখে দস্তানায় ঢাকা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর পাশে একটা বাচ্চা মেয়ে তাঁকে দেখতে পেয়েই আনন্দে চিৎকার করে নাচত লাগল। ছেলে দুটো খেলনার প্যাকেটগুলোর দিকে তীব্র কৌতূহল ও প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ফ্লুরেল তখন ট্রেনের বাংকার থেকে প্যাকেটগুলো নামিয়ে আনছেন।

কাঠের পাওয়ালা মানুষটি প্ল্যাটফর্মে নেমে আসতেই বাচ্চারা হই হই করে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তারা সকলে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ছোট্ট মেয়েটা একান্ত ভালোবাসা, একান্ত নির্ভরতায় তার ছোট্ট-একটা হাত দিয়ে ক্রাচটা ধরে রেখেছে—যেন পরম প্রিয় এক বন্ধুর একখানি হাত।

প্রতিশোধ
Vendetta

প্যাওলে সাভেরিনির বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বলিফেসিওর গড় ঘিরে থাকা মাটির ঢিপির ওপর এক পর্ণকুটির তৈরি করে বাস করত। পাহাড়ের পাশের যে অংশটা ক্রমশ ছুঁচোলো হতে হতে ঢালু হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে সেই ঢালু অংশে শহরটি গড়ে উঠেছে। আর সেই ঢালু অংশটাকে সার্ডিনিয়ার নিম্নতম অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্য ভাগে এর নীচে এবং এটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল একটি পাহাড়ি ফাটল আর সেটাকে দেখলে বিশাল একটা বারান্দা বলে মনে হত এবং সেটা বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই খাড়ি বরাবর জায়গাগুলোতে মানুষ যেখানে বসবাস করতে শুরু করেছিল সেই জায়গাগুলো পর্যন্ত ইটালি আর সার্ডিনিয়ার ছোটো ছোটো জেলে ডিঙিগুলো যাতায়াত করত। আর পনেরো দিন পর পর একবার করে অ্যাজাকোয়া থেকে আসত ঝড়ে ক্ষতবিক্ষত পুরোনো একটা স্টিমার। ওই সমস্ত খাড়িগুলোর মধ্যে কোনো জাহাজ কখনও সাহস করে ঢুকতে পারত না। সেইসব খাড়ি বরাবর পাহাড়ের গা ঘেঁষে যে সমস্ত বাড়ি তৈরি হয়েছিল সেগুলোকে দেখলে শিকারি পাখি ছাড়া অন্য কিছু মনে হত না। সমুদ্রের উপকূলভাগ ছিল সম্পূর্ণ অনুর্বর। সেখানে কয়েকগাছা ঘাস ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না। ওই অঞ্চলে প্রায়ই ঝড়ঝঞ্ঝা লেগেই থাকত। আর যখন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হত তখন তা অগভীর ও সংকীর্ণ খাড়ির ওপর দিয়ে ভয়ংকর বেগে বয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ত উপকূলের ওপর আর সেই মারাত্মক আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যেত দুই উপকূলভাগের সমস্ত কিছু।

সাভেরিনির বিধবা ওই পাহাড়ের এক প্রান্তে কুটির বেঁধে বাস করত। ওই কুটিরের তিনটি জানালাই সমুদ্রের দিকে মুখ করে খোলা বাস করত। সেখানে সে তার একমাত্র সন্তান অ্যানাতোয়া আর তাদের কুকুর সেমিলাতিকে নিয়ে থাকত। বিশাল দেহের কুকুরটা ছিল ভয়ংকর। গায়ের চামড়া ছিল ভীষণ খসখসে। ছেলেটি যখন শিকার করতে বেরোত তখন সে একে সঙ্গে নিয়ে যেত।

এক দিন সন্ধেবেলা নিকোলো র‍্যাভালটির সঙ্গে তার ঝগড়া হলে সে অ্যানাতোয়াকে বুকে ছুরি মেরে রাতের অন্ধকারে সার্ডিনিয়াতে পালিয়ে আসে।

রাস্তার ওপর ছেলেটির মৃতদেহটাকে পড়ে থাকতে দেখে কয়েকজন পথচারী সেটা তাদের কুটিরে পৌঁছিয়ে দেয়। বৃদ্ধা এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে শুধু মৃতদেহটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর সে তার দুর্বল কাঁপা হাতে ছেলের মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ করল, সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবেই। বৃদ্ধা অন্য কাউকে নিজের কাছে থাকতে দিল না। ছেলের মৃতদেহটা নিয়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইল। তার সঙ্গে রইল শুধু কুকুর সেমিলাতি। তার মাস্টার এর বিছানার দিকে

তাকিয়ে দুই পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে করুণস্বরে চিৎকার করতে লাগল। কুকুরটা আর অ্যানাতোয়ার মা চুপ করে সেখানে বসে রইল। সে তার ছেলের মুখের কাছে ঝুঁকে অপলকে তাকিয়ে রইল আর চোখ দুটো বেয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। যুবকটি চিত হয়ে শুয়ে উপর দিকে মুখ করে পড়ে আছে। গায়ে তার ধূসর রংএর কোট, বুকের কাছটা ছেঁড়া আর রক্ত মাখা। হত্যাকারীরা যখন বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছিল তখন তার কোটের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গিয়েছিল। তার কোট, সার্ট, ট্রাউজার ইত্যাদি সমস্ত পোশাক রক্তে ভিজে গেছিল। রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল তার দাড়ি আর চুলের মধ্যে।

বৃদ্ধা মা তার মৃত সন্তানের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যুবকটির মায়ের গলার স্বর শুনতে পেয়ে কুকুরটা তার করুণ চিৎকার বন্ধ করল।

তার মা বলল, হে আমার প্রিয় পুত্র, এই হত্যার প্রতিশোধ আমি নেব। সুতরাং তুমি তার জন্য দুঃখ কোরো না। তোমার হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে আমি শান্ত হব না। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমার মা-ই এই শপথ করছে। তুমি কি জান না তোমার মা কখনই তার শপথ ভঙ্গ করেনি।

এরপর ধীরে ধীরে তার মাথাটা নীচু করে তার সন্তানের মৃতদেহের ঠোঁটের সঙ্গে তার নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরল।

সেমিলাতি আবার করুণস্বরে চিৎকার করতে লাগল। সেই চিৎকারে মিশে ছিল এক দিকে বুকভাঙা কান্না আর যন্ত্রণা আর অন্য দিকে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় তা হয়ে উঠেছিল ক্রুদ্ধ, ভয়ংকর।

একইভাবে শোকের যন্ত্রণা সহ্য করে তারা সকাল পর্যন্ত ওই ঘরে চুপ করে বসে রইল।

পরের দিন অ্যানাতোয়া সাভেরিনিকে সমাধিস্থ করা হল। এর পর বলিফেসিওর মানুষেরা চিরদিনের জন্য তার নাম উচ্চারণ করতে ভুলে গেল।

যুবকটির কোনো ভাই ছিল না। তার কোনো নিকটাত্মীয়ও ছিল না। এমন কেউ ছিল না যে তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। কীভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায়, হতভাগিনী বৃদ্ধা সে-কথা সর্বক্ষণ ভেবে চলল।

ওই পাহাড়ি খাঁড়িটার একপাশে তাকিয়ে সে সমুদ্রোপকূলের ওপর একটা সাদা রংএর চিহ্ন দেখতে পেত। এটা ছিল লঙগোসার্ডো নামের সার্ডিনিয়ার ছোটো একটা গ্রাম আর কর্সিকার ডাকাতরা খুব বেশি তাড়া খেলে ওইগ্রামে এসে লুকিয়ে থাকত। ওরাই ছিল ওই গ্রামের প্রধান অধিবাসী আর ওই গ্রামটিকে আত্মগোপনের স্থান হিসাবে বিবেচনা করে সর্বত্র তারা অপরাধমূলক কাজ করত এবং বিপদে পড়লেই ওই গ্রামে এসে আশ্রয় নিত। সে জানতে পেরেছিল র‍্যাভালটি ওই গ্রামেই পালিয়ে এসেছে।

সারাদিন জানালার ধারে বসে সন্তানহারা বৃদ্ধা—ওই ছোটো গ্রামটির দিকে তাকিয়ে থাকত আর ভাবত কীভাবে সে তার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবে। তার এমন

একজন কেউ নেই যে তাকে সাহায্য করতে পারে। সে দুর্বল, বৃদ্ধা তার মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছে। কেমন করে প্রতিশোধ নেবে, কিন্তু সে তার মৃত পুত্রের শিয়রে বসে তার হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। সে-কথা সে ভোলেনি। আর বেশি দেরি করার মতো সময়ও তার নেই।

এই মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। কী করবে সে ভেবে ঠিক করতে পারল না। সে রাত্রে ঘুমোতে পারে না। একটি মুহূর্ত সে বিশ্রাম নেয় না। তার স্বস্তি শান্তি সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। কীভাবে সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে সে কথা ভাবতে ভাবতে তার সমস্ত দিন কেটে যায়। কুকুরটা তার পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমোয় অথবা সেও হয়তো ঘুমোতে পারে না। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দূরের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে ওঠে। তার প্রভুকে সে যেদিন থেকে দেখতে পায় না সেদিন থেকে সে মাঝে মাঝে এমনভাবে চিৎকার করে ওঠে যেন সে তার প্রভুকে ডাকছে। তার পশুসত্ত্বাকেও যেন আর সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না। তার প্রভুর যে স্মৃতি তার হৃদয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে তা যেন কোনো কিছুতেই ম্লান হবে না।

একদিন রাত্রে অন্যদিনের মতো যেভাবে চিৎকার করছিল সেমিলাতি তাতে বৃদ্ধার মনে এক হিংস্র বন্য প্রতিহিংসার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল। সে সেটা নিয়ে সকাল পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করল। আর সকাল হতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গির্জায় গিয়ে উপস্থিত হল। সে ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করল তাকে এ কাজে শক্তি আর সাহস দেওয়ার জন্য, তারপর গির্জার মেঝেতে শুয়ে তার ভবিষ্যৎ কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল।

প্রার্থনা শেষ করে সে বাড়িতে ফিরে এল। তাদের উঠোনে মুখ ঢাকা একটা পিপে ছিল। তার মধ্যে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হত। পিপের ভেতর থেকে জল ফেলে দিয়ে সেটাকে সে উপুড় করে খালি করে ফেলল তারপর কাঠ বা পাথরের টুকরোর সাহায্যে—মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে দিল। তারপর কুকুরটাকে দরজার কাছে বেঁধে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

এরপর সার্ডিনিয়ার উপকূলের দিকে তাকিয়ে সে ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওই তো, ওখানেই আছে সেই হত্যাকারী।

সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধরে কুকুরটা চিৎকার করল। সকাল হতে তাকে শুধু সে খানিকটা জল খেতে দিল। রুটি বা স্যুপ কিছুই দিল না।

সেদিনটাও চলে গেল। সেমিলাতি খিদের জ্বালায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে তার মধ্যে হিংস্র প্রবৃত্তি জেগে উঠল, জ্বলজ্বল করতে লাগল তার চোখ দুটো, গায়ের রোমগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সে মরিয়া হয়ে গলার চেনটা ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল। তবুও বৃদ্ধা তাকে কিছু খেতে দিল না। খিদের জ্বালা সহ্য-করতে না পেরে সে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ভীষণ কর্কশ স্বরে চিৎকার করতে লাগল। সেদিন রাত্রিটা সেইভাবে কেটে গেল। সকাল হতেই মা সাভেরিনি একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে দুটো খড়ের আঁটি চেয়ে নিয়ে এল। তার স্বামীর ব্যবহার করা কিছু শুকনো

পোশাক আর জামা জোগাড় করে তার মধ্যে কিছু খড় ভরে সেটাকে একটা মানুষের আকৃতি দিল। পুরোনো কিছু ন্যাকড়া গোল করে পাকিয়ে মাথাটা তৈরি করল। সেমেলাতি যেখানে থাকে তার সামনে একটা লাঠি পুঁতে মানুষের প্রতিকৃতিটাকে সেটার সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখল।

কুকুরটা অবাকদৃষ্টিতে খড়ের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। খিদেতে মরার মতো অবস্থা হলেও সে আর একটাও শব্দ করল না।

এর পর বৃদ্ধা কসাইখানায় গিয়ে খানিকটা কালো মাংস কিনে আনল। তারপর বাড়ি ফিরে মাংসটা রান্না করল। কুকুরটা মাংসের গন্ধ পেয়ে বাঁধা অবস্থাতেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে লাফাতে শুরু করল।

এর পর স্ত্রীলোকটি ধোঁয়া ওঠা গরম শুয়োরের দীর্ঘ মাংসখণ্ডটা খড়ের প্রতিকৃতির গলায় গলবন্ধের মতো জড়িয়ে দিল, খড়ের প্রতিমূর্তির গলায় যাতে সেই মাংসখণ্ডটা অনেকটা ঢুকে যায় সেজন্য একটা লম্বা দড়ি দিয়ে সেটাকে গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে দিল। এর পর সে কুকুরের গলার চেনটা খুলে দিল।

খিদের জ্বালায় উন্মাদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিমূর্তির গলা লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটা এবং তার কাঁধের উপর দুই পা রেখে সেটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়তে লাগল। এর পর সে শিকারের শরীরের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে নীচে নেমে এল। আবার সে ভয়ংকর আক্রোশে গর্জন করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মূর্তিটার ওপর। জড়িয়ে থাকা দড়িগুলোর মধ্যে মুখটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকটা মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে আবার নীচে নেমে এল। এর পর এক মুহূর্ত সে চুপ করে দাঁড়াল তারপর ভয়ংকর এক হিংস্র ক্রোধে আবার মুর্তিটার গলা লক্ষ করে লাফ দিল এবং ঘাড় থেকে মুণ্ডুটাকে আলাদা করে এক বিচিত্র আক্রোশে গর্জন করতে করতে মুণ্ডুটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখল। প্রতিহিংসার আগুনে ধক ধক করে জ্বলতে লাগল তার চোখ দুটো। এর পর সে কুকুরটাকে চেন দিয়ে বেঁধে ফেলল। আবার তাকে পর পর দুদিন কিছু না খেতে দিয়ে এই অদ্ভুত পরীক্ষাটা চালাল। এর পরের তিনটি মাস সে এইভাবে আক্রমণ করতে এবং প্রতিমূর্তির গলায় বাঁধা মাংসখণ্ডটা ছিনিয়ে আনতে তাকে অভ্যস্ত করে তুলল। তারপর থেকে তাকে ছেড়ে রাখা হত। তার মালকিন ইঙ্গিত করলেই প্রতিমূর্তিটির গলা লক্ষ করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

প্রতিকৃতির গলায় মাংস জড়ানো না থাকলেও তখন সে তার মালকিন এর নির্দেশে একইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত আর তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীলোকটি তাকে রান্না করা মাংসের টুকরোটা খেতে দিত।

প্রতিকৃতিটাকে দেখতে পেয়েই সে ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করতে থাকত এবং তার মালকিনের নির্দেশের অপেক্ষায় তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকত। বৃদ্ধা চিৎকার করে তার আঙুল তুলে বলত, যা, গলার নলিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দে।

সে বুঝতে পারল এবার সময় হয়েছে। তখন সে এক দিন সকালে গির্জায় গিয়ে আগামী কাজের জন্য অপরাধ স্বীকার করে প্রভু যিশুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারপর একজন অশক্ত দুর্বল বৃদ্ধ পুরুষের ছদ্মবেশে সার্ডিনিয়ার এক জেলের সঙ্গে চুক্তি করলে সে তাকে এবং তার কুকুরটিকে সার্ডিনিয়ার উপকূলে পৌঁছিয়ে দিল।

একটা কাপড়ের থলের মধ্যে বড়ো এক টুকরো কালো মাংস ভরে নিল সে। সেমিলাতিকে পর পর দুদিন অভুক্ত রাখা হল এবং প্রতিটি মুহূর্ত তাকে সুস্বাদু মাংসের গন্ধ শুঁকিয়ে উত্তেজিত করে রাখা হল।

তারা এর পর লঙগোসার্ডো গ্রামে এসে পৌঁছোল। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি—সেখানকার এক রুটিওয়ালার কাছে জিজ্ঞেস করল নিকোলাস র‍্যাভোলটি কোথায় থাকে। তার কাছ থেকে সে জানতে পারল নিকোলাস তার পুরোনো ব্যবসায় ফিরে গিয়েছে। সে তখন তার দোকানের পিছনের একটা ঘরে কাজ করছে।

বৃদ্ধা সেই ঘরের দরজা ঠেলে ডাকল, নিকোলাস, নিকোলাস।

নিকোলাস তার ডাক শুনে ফিরে তাকাল। এবার ছদ্মবেশী বৃদ্ধা তার কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, যা, ওর গলার নলিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল। উত্তেজিত জন্তুটা নিকোলাসের গলা লক্ষ করে হিংস্র গতিতে ঝাঁপ দিল এবং টুঁটিটা তার তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে ধরল। লোকটি তার হাত দুটো দিয়ে কুকুরটাকে সজোরে চেপে ধরে মেঝের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে সে তার দুপায়ে মাটি দাপাতে দাপাতে নিজের শরীরটাকে মোচড় দিতে লাগল। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। এর পরে সব নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল। সেমিলাতি তখন তার টুঁটিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

নিজেদের ঘরের দরজার কাছে যে দুজন প্রতিবেশী বসেছিল তাদের যেন মনে হল তারা একজন বৃদ্ধকে একটা কালো কুকুর নিয়ে নিকোলাসের দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। কুকুরটাকে তার মালিক তামাটে রং এর কিছু যেন একটা খেতে দিয়েছিল আর সেটা খেতে খেতে সে তার মালিকের পিছন পিছন আসছিল।

সন্ধেবেলায় বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি তার বাড়িতে ফিরে এসে বহুদিন পরে সে রাত্রি সে পরম শান্তিতে ঘুমোল।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ
A Duel

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্মানরা ফরাসি দেশ দখল করে নিয়েছে। এক বিজিত মল্লযোদ্ধার মতো বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর হাঁটুর নীচে শুয়ে দেশটা হাঁপাচ্ছে।

দুর্ভিক্ষ এবং হতাশার দীর্ঘ যন্ত্রণা সহ্য করার পর প্যারিস থেকে প্রথম ট্রেন চলতে শুরু করল। গ্রামের মধ্য দিয়ে ট্রেনগুলো ধীর মন্থর গতিতে নূতন সীমান্তবর্তী ঘাঁটির দিকে এগোতে লাগল। যাত্রীরা জানালা দিয়ে বিধ্বস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রান্তর এবং আগুনে পুড়ে যাওয়া গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। প্রাশিয়ান সৈন্যরা, পিতলের পেরেক আঁটা কালো রংএর শিরস্ত্রাণ পরে কতকগুলো বাড়ির ধ্বংসাবশেষের সামনে তাদের ঘোড়ার পিঠে বা চেয়ারে বসে আরাম করে পাইপ টানছিল। অন্যরা নিজেদের পরিবারের লোকজনের মতো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল বা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় হয়তো আপনি সেখানকার ফাঁকা জায়গায় সৈন্যদলকে কুচকাওয়াজ করতে দেখবেন আর রেলের চাকার ঘড়ঘড় শব্দ ছাপিয়ে কর্নেলদের রুক্ষ বা কর্কশকণ্ঠের আদেশ শুনতে পাবেন।

সৈন্যরা যতদিন প্যারিসকে অবরোধ করে রেখেছিল মঁসিয়ে দুবে প্যারিসের জাতীয় রক্ষী হিসাবে নিজের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এখন তিনি সুইজারল্যান্ডে তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। কারণ জার্মান আক্রমণের আগে তিনি বুদ্ধি করেই তাদের সেখানে রেখে এসেছিলেন।

দুর্ভিক্ষের নিপীড়ন এবং দৈহিক ও মানসিক ভয়ংকর কষ্টযন্ত্রণা এই ধনী শান্তিপ্রিয় মানুষটির সুন্দর স্বাস্থ্যকে ভেঙে দিতে পারেনি। নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে এবং মানুষের নিষ্ঠুর বর্বরতার বিরুদ্ধে তিক্ত অভিযোগ করে তিনি অতীতের দিনগুলো ভয়ংকর দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। যদিও কনকনে ঠান্ডা শীতের রাত্রিতে গড়ের ওপরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থেকে তাঁর নিজের কর্তব্য পালনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তবুও যুদ্ধশেষে বর্তমানে তিনি যখন সীমান্তবর্তী দেশ সুইজারল্যান্ডের দিকে যাত্রা করছেন তখন এই প্রথম তিনি প্রাশিয়ান সৈন্যদের দেখতে পেলেন।

ভীতিমিশ্রিত ক্রোধের দৃষ্টিতে তিনি ওই সমস্ত সশস্ত্র দাড়িওয়ালা বিদেশি সৈন্যদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। ফরাসি দেশের সর্বত্র এদের প্রহরার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এরা বিদেশের মাটিতে এমন স্বতস্ফূর্ত স্বাধীনতা নিয়ে অবস্থান করছে যেন মনে হয় এটা তাদের নিজেদের দেশ। সেই মুহূর্তে তাঁর অন্তরে তিনি নিষ্ক্রিয় ব্যর্থ দেশাত্মবোধের এক তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন। কিন্তু তা তিনি বাইরে প্রকাশ না করে নিজের ভিতরে চেপে রাখলেন। নতুন পরিবেশে অপ্রতিরোধ্য সেই

আবেগকে সংযত করে নিজের ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। একই কম্পার্টমেন্টে দুজন বলিষ্ঠ চেহারার ইংরেজ পর্যটক উঠেছিল। তারা চারিপাশের সমস্ত কিছু গভীর উৎসাহ নিয়ে লক্ষ করছিল এবং নিজেদের ভাষায় খোশগল্পে সময় অতিবাহিত করছিল। মাঝে মাঝে তারা গাইড বইএর পাতা উল্টিয়ে দেখছিল আর নির্দিষ্ট স্থানের নামগুলো শব্দ করে পড়ে তথ্যগুলো মিলিয়ে নিচ্ছিল।

হঠাৎ ট্রেনটা মফস্‌সলএর একটা স্টেশনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন প্রাশিয়ান অফিসার তরোয়ালের ঝনঝন শব্দ করতে করতে লাফ দিয়ে ট্রেনের ডবল ফুটবোর্ডের ওপরে উঠে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ল। দীর্ঘকায় অফিসারের পরনে ছিল আঁটসাঁট মিলিটারি পোশাক। তার লোমশ মুখে ছিল নিষ্ঠুর কুটিলতা, মাথাটা ভরে ছিল আগুন রং-এর লাল চুলে। তার ফ্যাকাশে রং এর দীর্ঘ গোঁফ ও ঝাঁকড়া দাড়ি তার মুখের দুপাশ থেকে এমনভাবে গজিয়ে উঠেছে দেখলে মনে হয় তা মুখটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

ইংরেজ দু'জন তৎক্ষণাৎ হঠাৎ জেগে ওঠা কৌতূহলের হাসি হেসে তাকে ভালো করে লক্ষ করতে লাগল। মঁসিয়ে দুবে তখন মনোযোগ দিয়ে সংবাদপত্র পড়ার ভান করছিলেন। পুলিশের উপস্থিতিতে চোরের যেমন অবস্থা হয় তেমনভাবে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কামরার এককোণে চুপ করে বসে রইলেন।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। ইংরেজ দুজন যথারীতি খোশগল্পে মেতে রইল আর মাঝে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন যুদ্ধের প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছিল। যে মুহূর্তে দুজন ইংরেজের মধ্যে একজন দূরের একটি গ্রামকে নির্দেশ করতে তার একটা হাত বাড়িয়ে দিল, প্রাশিয়ান অফিসারটি পিছনে হেলান দিয়ে এবং তার দীর্ঘ পাদুটিকে সামনে প্রসারিত করে ফরাসি ভাষায় মন্তব্য করল, ওই গ্রামের বারোজন ফরাসিকে আমরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছি এবং বন্দি করে এনেছি একশোজনেরও বেশি। ইংরেজ দুজন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'ও, আচ্ছা, তা ওই গ্রামের নামটা কী?'

প্রাশিয়ান অফিসার উত্তরে বলল, 'ফার্সবর্গ। এই সমস্ত অসাধু, দুর্নীতিগ্রস্ত ফরাসিগুলোকে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছিলাম।' এই কথাগুলো বলে সে মঁসিয়ে দুবের দিকে তাকিয়ে তার মোটা গোঁফের ফাঁক দিয়ে বিদ্রুপের স্বরে হেসে উঠল। বিজয়ী সেনাবাহিনী অধিকৃত গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে ট্রেনটা গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলল। রাস্তার ওপরে, মাঠের ধারে, রেলস্টেশন ও কাফেগুলোর বাইরে অসংখ্য জার্মান সৈন্যকে ঘুরে ঘুরে খোশগল্প করতে দেখা গেল। আফ্রিকার পঙ্গপালের মতো ফরাসি দেশের সর্বত্র তারা যেন ছেয়ে ফেলেছে।

অফিসার তার একটা হাত দুলিয়ে বলল, আমাকে যদি যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হত, আমি প্যারিস নগরীটাকে প্রথমেই দখল করে নিতাম। সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতাম, নরনারী, শিশু বৃদ্ধ, সকলকে নৃশংসভাবে হত্যা করতাম, ফরাসি নামের কোনো দেশের অস্তিত্ব বা চিহ্নও থাকত না।

ইংরেজ দুজন ভদ্রতার সঙ্গে অফিসারের কথার প্রত্যুত্তরে সহজভাবে বলল, 'তা ঠিক, তা ঠিক।' অফিসার বলতে থাকল, বছরকুড়ির মধ্যে সমস্ত ইউরোপ ও তার সমস্ত কিছুই আমরা অধিকার করে নেব। কারণ প্রাশিয়া ইউরোপের সমস্ত দেশের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

অফিসারের এসমস্ত কথায় ইংরেজ দুজন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কিন্তু তারা কোনো মন্তব্য করল না। আবেগহীন, নিস্পৃহ হয়ে উঠল তাদের মুখের চেহারা, তাদের সরু গোঁফের পিছনে মুখগুলো মনে হল যেন মোমের তৈরি। এর পর সেই প্রাশিয়ান অফিসারটি ব্যঙ্গের স্বরে হাসতে শুরু করল। এবার সে পিছনে হেলান দিয়ে বসে নানারকমভাবে বিদ্রুপ করতে শুরু করল। বিকৃত মুখভঙ্গিতে সে পরাজিত ফরাসি দেশ সম্বন্ধে নানারকম কটূক্তি করল। সদ্য বিজিত অস্ট্রিয়া সম্বন্ধেও সে কুৎসিত উপহাস না করে ক্ষান্ত হল না। সামরিকবিভাগগুলোর ব্যর্থ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সে নাক সিটকোল। পরাজিত দেশের কামানগুলো অধিকার করে বিসমার্ক যে লৌহনগরী গড়তে চেয়েছিলেন সে কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারল না। মঁসিয়ে দুবে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎই সে তাঁর উরুতে তার বুট পরা পা দিয়ে সজোরে আঘাত করল। তীব্র অপমানের জ্বালায় মঁসিয়ে দুবের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। ইংরেজ দুজনকে দেখে মনে হল ব্যস্ত পৃথিবীর কোলাহল থেকে বহু দূরে কোনো এক নির্জন দ্বীপে তারা যেন বন্দি হয়ে আছে। তাদের খুব কাছেই যে ঘটনাটা ঘটল সেব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রইল।

অফিসারটি পাইপ বার করে ফরাসি ভদ্রলোকটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাছে কি খানিকটা তামাক পাওয়া যাবে?'

মঁসিয়ে দুবে উত্তর দিলেন, 'না, স্যার।'

জার্মান অফিসারটি বলল, 'পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে আমার জন্য তামাক কিনে এনে দিয়ো।' তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'তার জন্য তোমাকে অবশ্য একপাত্র মদের পয়সা বকশিশ দেব।'

ট্রেন হুইসেল দিয়ে গতি কমিয়ে দিল। এর পরে ট্রেনটি প্রাশিয়ানদের আগুনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রামের একটি স্টেশনে এসে থামল। সমস্ত গাড়ি এসে নিয়মিত এখানে থামে।

কামরার দরজা খুলে জার্মান অফিসারটি মঁসিয়ে দুবের বাহুদুটো চেপে ধরে বলল, 'যাও, আমি যা বলছি তাড়াতাড়ি কর, যাও, শিগগির যাও।'

একদল প্রাশিয়ান সৈন্য এই স্টেশনটি অধিকার করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন কাঠের গ্রিলের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ট্রেন ছাড়ার আগে ইঞ্জিনটা অনেকখানি ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল। এর পর মঁসিয়ে দুবে খুব দ্রুত লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন এবং স্টেশনমাস্টারের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি অন্য একটি কামরায় লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

সেই কামরায় দ্বিতীয় কোনো যাত্রী ছিল না। তাঁর হৃৎপিণ্ডটি এত দ্রুত লাফাতে শুরু

করল যে শ্বাস নিতে প্রচণ্ড অসুবিধা বোধ করছিলেন তিনি। সুতরাং তিনি ওয়েস্টকোটের বোতামগুলো খুলে দিতে বাধ্য হলেন, হাঁপাতে হাঁপাতে কপালের ঘাম মুছলেন।

ট্রেনটি অন্য একটি স্টেশনে এসে থামল। প্রাশিয়ান অফিসারটি কামরার দরজায় এসে আবির্ভূত হল এবং লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ইংরেজ পর্যটক দুজন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অফিসারের পিছনে পিছনে কামরায় এসে ঢুকল। জার্মান অফিসারটি ফরাসি ভদ্রলোকটির মুখোমুখি বসে শ্লেষের হাসি হেসে বলল, 'তোমাকে যা আমি করতে বললাম তা তুমি করলে না।'

মঁসিয়ে দুবে উত্তর দিলেন, 'না, আপনার অনুমান নির্ভুল।'

তারপরে ট্রেন ছেড়ে দিতেই অফিসার বলল, 'তাহলে তোমার গোঁফজোড়াটাকে কেটে নিয়ে পাইপটা ভরে ফেলি, কী বল?'—এই বলে সে মঁসিয়ে দুবের গোঁফ লক্ষ করে তার একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

ইংরেজ পর্যটক দুজন আবেগহীন নিস্পৃহতা নিয়ে পলকহীন চোখে ঘটনাটা লক্ষ করছিল। জার্মান অফিসারটি ইতিমধ্যে তাঁর গোঁফজোড়াটি ধরে টানতে শুরু করেছে। মঁসিয়ে দুবে তাঁর হাতের পিছন দিক দিয়ে অফিসারকে সজোরে আঘাত করে তার হাতটাকে ছিটকে সরিয়ে দিলেন এবং তার কলার ধরে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে তার সিটের ওপরে ফেলে দিলেন। ভয়ংকর ক্রোধের জ্বালায় তাঁর রগের শিরাদুটো ফুলে উঠল। চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে লাল হয়ে উঠল। এক হাতে অফিসারেব গলা টিপে ধরে তার মুখের ওপরে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি মারতে লাগলেন। প্রাশিয়ান অফিসারটি তাঁকে প্রত্যাঘাত করার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগল এবং চিত অবস্থায় খাপ থেকে তরোয়ালটা টেনে বের করে তাঁকে পর্যুদস্ত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মঁসিয়ে দুবে তাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি তাঁর ভারী শরীর নিয়ে তাঁর ঘাড়ের ওপরে বসে তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে প্রায় পিষে ফেললেন এবং নিশ্বাস বন্ধ করে উপর্যুপরি তাঁর মুখের ওপর এলোপাথাড়ি ঘুসি মেরে চললেন। জার্মান অফিসারটির মুখ দিয়ে স্রোতের মতো রক্ত গড়াতে লাগল। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার ফলে তার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোতে থাকল। সেই অবস্থায় ঘুসির আঘাতে ভেঙে যাওয়া দাঁতের টুকরোগুলো সে রক্ত মাখা থুতুর সঙ্গে বের করে দিতে লাগল, একই সঙ্গে তাঁকে তার ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল বারবার।

ইংরেজ দুজন ব্যাপারটা আরও পরিষ্কারভাবে দেখার জন্য অনেকটা কাছে এগিয়ে এল। ভয়ংকর কৌতূহল নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করতে লাগল ঘটনাটা। মনে হল, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর হারজিতের ব্যাপারে তারা বাজি ধরতে প্রস্তুত।

ভীষণ পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মঁসিয়ে দুবে তাঁর নিজের আসনে ফিরে গেলেন।

প্রাশিয়ান অফিসারটি মঁসিয়ে দুবেকে আক্রমণ করতে সাহস পেল না কারণ ভয়ংকর প্রহারে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। একটু সুস্থ বোধ করার পর সে বলল, আমি তোমাকে পিস্তল দিয়ে ডুয়েল লড়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আর তুমি যদি আমার চ্যালেঞ্জ স্বীকার না কর, আমি তোমাকে হত্যা করব।

মঁসিয়ে দুবে উত্তর দিলেন, তোমার যখন ইচ্ছে তুমি সেটা করতে পার, আমি সবরকমভাবে তৈরি।

জার্মান অফিসার বলল, আমরা এখন স্ট্রাসবার্গে অবস্থান করছি। আমার সহকারী হিসাবে দুজন অফিসারকে সংগ্রহ করে নেব আর ট্রেন ছাড়ার আগে আমরা যথেষ্ট সময়ও পাব।

মঁসিয়ে দুবে ইঞ্জিনের মতো ফুঁসছিলেন। তিনি ইংরেজ দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা কি আমার সহকারী হতে রাজি আছেন?

তারা একসঙ্গে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

এর পরেই ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

এক মিনিটের মধ্যে প্রাশিয়ান অফিসারটি দুজন অফিসারকে ডেকে নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে যে পিস্তল ছিল তারা তাকে পিস্তল দুটো দিয়ে মঞ্চের মতো উঁচু একটা জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। পাছে ট্রেন ধরতে তাদের দেরি হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় ইংরেজ দুজন ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখতে লাগল বারবার।

মঁসিয়ে দুবে জীবনে কখনও আগে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়েননি। তাঁর শত্রুর কাছ থেকে তাঁকে কুড়ি পায়ের মতো দূরত্বে দাঁড় করানো হল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল তিনি তৈরি কিনা?

তিনি 'হ্যাঁ' বলতেই লক্ষ করলেন, একজন ইংরেজ রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাতা খুলেছে।

হঠাৎ আদেশ শোনা গেল, 'ফায়ার।'

মঁসিয়ে দুবে কী করছেন সে সমস্ত না ভেবে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগলেন এবং অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, প্রাশিয়ান অফিসারটি টলতে টলতে হাত দুটো ওপরে তুলে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অফিসারটি তাঁর গুলিতে নিহত হয়েছে।

একজন ইংরেজ পর্যটক নিজেদের কৌতূহল চরিতার্থ হয়েছে দেখে অধীর আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'সাবাস।' অন্য ইংরেজটি তখনও তার ঘড়িটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে মঁসিয়ে দুবের হাত ধরে টানতে টানতে সময়ের দ্বিগুণ বেগে স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল আর তার স্বদেশের বন্ধুটি মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত শরীরের দুপাশে রেখে মার্চ করার ভঙ্গিতে এক দুই, এক দুই বলতে বলতে তাদের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল।

তারা যখন পাশপাশি মার্চ করতে করতে স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছিল তখন তাদের দেখে কমিক সংবাদপত্রে আঁকা হাস্যকব তিনটি মূর্তির মতো মনে হচ্ছিল। ট্রেনটি তখন সবেমাত্র ছাড়ার হুইসেল দিয়েছে, তারা তিনজন লাফ দিয়ে কামরায় উঠে পড়ল। তারপর ইংরেজ দুজন তাদের মাথা থেকে টুপিগুলো খুলে নিয়ে তাদের মাথার ওপরে তিনবার দুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'হিপ্ হিপ্ হুররে।'

তারপরে বেশ গম্ভীরভাবে এক একজন করে মঁসিয়ে দুবের দিকে তাদের ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করল এবং একটি কোণ বেছে নিয়ে সেখানকার আসনে গিয়ে বসে পড়ল।

নেকড়ে
The Wolf

সেইন্ট হিউবার্ডের সম্মানে ব্যারনস ডি র‍্যাভেলস এর গৃহে ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। তা শেষ হওয়ার পর বৃদ্ধ মার্কুইস ডি আরভিল আমাদের গল্পটা বলেছিলেন। অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন সেদিন একটা হরিণ শিকার করে এনেছিলেন। একমাত্র মার্কুসই শিকারে যেতে রাজি হননি। শুধু সেদিনই নয়, জীবনে তিনি কখনও কোনো শিকারে অংশগ্রহণ করেননি।

দীর্ঘসময়ের ভোজসভার অনুষ্ঠানে পশুহত্যা ছাড়া অতিথিরা অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেননি। এমনকি মহিলারাও সেই রক্তক্ষয়ী অসম্ভব সমস্ত শিকারের কাহিনিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বক্তারা মানুষ এবং পশুদের মধ্যে আক্রমণ ও যুদ্ধের সময়ের গতিবিধির অনুকরণ করছিলেন বজ্রগম্ভীরস্বরে কথা বলে এবং হাত পা নেড়ে।

মঁসিয়ে ডি আরভিল বক্তা হিসাবে বেশ ভালোই। তিনি কথা বলছিলেন বেশ কবিত্বের ভাব নিয়ে এবং বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে অনায়াস স্বচ্ছন্দে কাহিনিটি বলে গেলেন, তাতে মনে হল তিনি এই গল্পটা অনেককে বহুবার বলেছেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি নিজে কখনও শিকারে অংশ নিইনি, আমার পিতা পিতামহ বা প্রপিতামহও কখনও শিকার করতে যাননি। আমার প্রপিতামহের বাবা আপনাদের সকলের থেকে অনেক বেশি শিকার করেছিলেন। ১৭৬৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কীভাবে তিনি মারা গেলেন সেই কাহিনিটাই এখন বলব। তাঁর নাম ছিল জন এবং তিনি ছিলেন বিবাহিত। তাঁরই পুত্র ছিলেন আমার প্রপিতামহ। লোরেনের গভীর অরণ্যে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। সেখানে তিনি তাঁর ছোটোভাই, ফ্রান্সিস ডি আরভিলের সঙ্গে বসবাস করতেন।

"শিকারের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আসক্তি থাকার কারণে তিনি অবিবাহিত থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একভাবে শিকার করে যেতেন। ক্লান্তি বা অবসাদ নামের এই দুটি শব্দকে তাঁরা অভিধান থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা শিকার ছাড়া অন্য কিছু ভালোবাসতেন না, অন্য কিছু বুঝতেন না বা অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতেন না। একমাত্র শিকারের মধ্যেই বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেই কারণেই তাঁরা বেঁচেছিলেন।

"শিকারের ভয়ংকর আসক্তি তাঁদের সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শিকার ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু জানতেন না বা ভাবতেও পারতেন না। উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল, কোনো কারণেই যেন তাঁদের শিকার অভিযান ব্যাহত না হয়। আমার প্রপিতামহ যখন জন্মালেন অর্থাৎ তাঁর জন্মমুহূর্তে তাঁর বাবা একটি খেঁকশিয়াল

শিকার করার জন্য তার পিছনে তাড়া করে চলেছিলেন। ছেলের জন্মসংবাদ পেয়েও তিনি শিকার থেকে বিরত হননি। তিনি বলেছিলেন শেয়ালটা মারা যাওয়া পর্যন্ত ভিখিরির বাচ্চাটা অপেক্ষা করতে পারল না? তাঁর থেকে তাঁর ভাই ফ্রান্সিস এর মাথাটা আরও গরম ছিল। ঘুম থেকে উঠেই তিনি প্রথমে কুকুরগুলোকে দেখতে যেতেন, তারপরে ঘোড়াগুলোকে, তারপর তিনি আশপাশের কয়েকটা পাখি শিকার করতেন। তারপর বড় শিকারে বেরোবার জন্য তৈরি হতেন।

"তাঁদের বিশাল শরীরের আকৃতি দৈত্যদের মতো। মোটা মজবুত হাড়ের বলিষ্ঠ শরীরগুলো ছিল লোমে ভর্তি। তাঁরা ছিলেন যেমন শক্তিমান তেমন দুর্দান্ত প্রকৃতির। ছোটো-ভাইটি ছিলেন তাঁর দাদার থেকেও লম্বা। তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রবাদ চালু ছিল —তিনি যখন চিৎকার করতেন তখন গাছের সমস্ত পাতা ঝরে পড়ত। আর এই প্রবাদের জন্য তিনি যথেষ্ট গর্ব বোধ করতেন।

"শিকারের জন্য তৈরি হয়ে তাঁরা যখন ঘোড়ায় চেপে বেরোতেন সেই চমৎকার দৃশ্য বহু মানুষের দৃষ্টি আর্কষণ করত। তারা অবাক হয়ে দেখত—দুটি দৈত্য ঘোড়ায় চেপে পাশাপাশি চলেছে।

"১৭৬৪ সালের শীতের মাঝামাঝি প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল। নেকড়েগুলো হয়ে উঠেছিল ভয়ংকর হিংস্র।

"রাত্রির দিকে দেরি করে যে সমস্ত চাষি ঘরে ফিরত নেকড়েগুলো তাদের আক্রমণ করত। রাতের অন্ধকারে তারা গৃহস্থ বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বীভৎস স্বরে তারা চিৎকার করত। অশ্বশালাগুলো বিধ্বস্ত করে দিত। এক সময় গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে ধূসর-সাদায় মেশানো বিরাট আকারের একটা নেকড়ে দুটো বাচ্চাকে খেয়ে ফেলেছে। একজন স্ত্রীলোকের একটা হাত খেয়ে তার খিদে মিটিয়েছে আর গ্রামের সমস্ত প্রহরী কুকুরগুলোকে শ্বাসরোধ করে মেরেছে। এখন সে গৃহস্থ বাড়ির আনাচেকানাচে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর দরজার কাছে এসে গন্ধ শুঁকছে। অধিকাংশ বাসিন্দার কাছে শোনা গেল যে তার নিশ্বাসে নাকি বাতির আলো কেঁপে কেঁপে উঠেছে। এই সমস্ত গুজব থেকে অতি দ্রুত সব জায়গায় একটা ভয়ংকর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই কেউ বাইরে বেরোতে সাহস করত না। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা যেত না। সব একেবারে শুনশান। কোনো ছায়া দেখলেই মনে হত ওই বুঝি ভয়ংকর জন্তুটা তাদের মারার জন্য এগিয়ে আসছে।

"আরভিল ভাইয়েরা হিংস্র জন্তুটাকে খুঁজে বের করে তাকে মেরে ফেলবেন বলে স্থির করলেন। সুতরাং তাঁরা দুজনে মিলে গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোকের কাছে প্রস্তাব রাখলেন-একটা বিরাট শিকার অভিযানে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য।

"কিন্তু তাঁদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। জন্তুটাকে তাড়িয়ে বের করার জন্য সমস্ত জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন, সমস্ত ঝোপঝাড় চষে ফেললেন কিন্তু তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁরা অনেক নেকড়েকে হত্যা করলেন কিন্তু তাঁদের

লক্ষ্যবস্তুটি অদৃশ্যই রয়ে গেল। প্রতিরাত্রে তেমন অভিযানের পর সেই ভয়ংকর নেকড়েটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কোনো নিরীহ পথিককে আক্রমণ করেছে নতুবা এমন সমস্ত জায়গায় অনেক গোরু ছাগল মেরে খেয়েছে, তাকে যেখানে খোঁজা হচ্ছে সে সমস্ত জায়গা সেখান থেকে অনেক দূরে।

"শেষপর্যন্ত এক দিন রাত্রিতে তাঁদের বাড়ির শুয়োর রাখার ঘরে ঢুকে সব থেকে ভালো জাতের দুটো হৃষ্টপুষ্ট শুয়োর মেরে তাদের খেয়ে ফেলল।

"তাতে দুই ভাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। এই ধরনের আক্রমণকে তাঁরা নেকড়েটার চ্যালেঞ্জ হিসাবে মনে করলেন। অতএব তাঁরা সব থেকে সুশিক্ষিত অনেকগুলো শিকারি কুকুর নিয়ে ভয়ংকর ক্রোধ ও সাহসের সঙ্গে জন্তুটার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

"ভোর থেকে বাদাম গাছের আড়ালে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত সময়টা বিশাল জঙ্গলের ঝোপঝাড়গুলো তাঁরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল।

"শেষপর্যন্ত, ব্যর্থতার হতাশায় ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা নলখাগড়ার ঝোপের মাঝখান দিয়ে যে সমস্ত সংকীর্ণ রাস্তা তৈরি হয়েছে সেই পথে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। জন্তুটার বিভ্রান্তিকর শক্তির কথা ভেবে তাঁরা ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎই অজানা অদ্ভুত একটা ভয় তাঁদের আচ্ছন্ন করল।

"বড়ো ভাইটি বললেন, "এটা সাধারণ কোনো জন্তু নয়। আমার ধারণা সে মানুষের মতোই চিন্তা করতে পারে।"

"প্রত্যুত্তরে ছোটো-ভাই বললেন, "সম্ভবত আমার কাজিন বিশপকে দিয়ে তার জন্য একটা বুলেটকে শুদ্ধ করে নিতে হবে। অথবা কোনো পাদরিকে অনুরোধ করব তিনি যেন আমাদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন।"

"তারপর তাঁরা আর কোনো কথা বললেন না। জন আবার বললেন, "সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখ। কী অদ্ভুত লাল দেখেছ! আজ রাত্রিতে নেকড়েটা নিশ্চয়ই কাউকে মৃত্যুর অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবে।"

"তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ঘোড়াটা পিছন দিকে সরে এল। ফ্রান্সিস এর ঘোড়াটা একই সময়ে ছুটতে শুরু করল। শুকিয়ে যাওয়া পাতায় ঢাকা একটা বিরাট ঝোপ অনেকটা ফাঁক হয়ে গেল এবং ধূসর সাদা রংএর বিরাটাকারের একটা জন্তু সেই ঝোপের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে চোখের নিমেষে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"জন্তুটাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়ে ভাই দুটি আনন্দে উত্তেজনায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাঁদের বিরাট শরীর নিয়ে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলেন এবং প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাওয়ার জন্য তাদের বিভিন্ন উপায়ে উত্তেজিত করে তুললেন। ঘোড়াদুটিও বাতাসের মতো তীব্র গতি নিয়ে ছুটতে শুরু করল। সওয়ারি দুজনকে পিঠে নিয়ে তারা ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে, ছোটো ছোটো

গাছ ও ডালপালা ভেঙ্গে, খানা ডোবা পার হয়ে নক্ষত্রগতিতে ছুটে চলল।

"কিন্তু হঠাৎ, এই ঘাড়ভাঙ্গা উদ্দামগতির তালে তালে দৌড়োনোর ফলে আমার পূর্বপুরুষের মাথাটা বিরাট একটা ডালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তিনি মৃত মানুষের মতো ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন আর তাঁর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"তা দেখে স্তম্ভিত, বিভ্রান্ত ছোটো ভাইটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘোড়াটিকে থামিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন, দাদাকে তুলে নিলেন নিজের হাতের ওপর এবং বুঝতে পারলেন তাঁর দাদা জ্ঞান হারিয়েছেন।

"এর পর দাদার পাশে বসে তাঁর ফেটে যাওয়া রক্তমাখা বীভৎস মাথাটিকে নিজের কোলের ওপর তুলে নিলেন। তারপর ভয়বিহ্বল ব্যাকুলতা নিয়ে দাদার মৃত মুখটার দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে এক অজানা আতঙ্ক তাঁর মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই আতঙ্ক ছিল ছায়ার আতঙ্ক, নৈঃশব্দ্যের আতঙ্ক, জনহীন অরণ্যের আতঙ্ক আর সেই অদ্ভুত নেকড়েটার আতঙ্ক। যার কারণে তাঁর ভাইএর এমন নিষ্ঠুর মৃত্যু হয়েছে।

"ছায়াভরা অন্ধকার ধীরে ধীরে গভীর হল। গাছের শাখাগুলো কনকনে ঠান্ডায় যেন ককিয়ে উঠল। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন দেখে সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে সাহস পেলেন না। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। কোথাও কোনো শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, না কুকুরের ডাক, না শিকারিদের শিঙ্গার শব্দ। সেই অদৃশ্য দিগন্তের সবকিছু যেন নিস্তব্ধ, নির্বাক হয়ে গেছে।

"রাতের এই কনকনে ঠান্ডায় এই বিষণ্ণ প্রকৃতির গভীর নৈঃশব্দ্যকে রহস্যজনক কোনো ভীতি যেন প্রভাবিত করে রেখেছিল।

"ফ্রান্সিস তাঁর বলিষ্ঠ দুটো হাত দিয়ে দাদার মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠের উপর শুইয়ে দিলেন বাড়ি ফেরার জন্য। তারপর ঘোড়ায় চড়ে চারিপাশের গভীর ছায়াময় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলেন। অতিপ্রাকৃত ভয়ংকর কিছু তাঁর মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

"হঠাৎ এই অন্ধকার অরণ্যের মধ্য দিয়ে যেন কিছু একটা বেরিয়ে গেল। ওই সেই নেকড়েটি। একটা রোমহর্ষক আতঙ্কের অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল, তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা হিমস্রোত নেমে যেতে লাগল। শয়তানের তাড়া খেয়ে একজন সন্ন্যাসী যেমন বুকের ক্রুশচিহ্নের স্মরণাপন্ন হন তেমন তিনি গভীর এক আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে বুকের ক্রুশটিকে আঁকড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে ভাইয়ের মৃতদেহের ওপর চোখ পড়ল তাঁর সমস্ত ভয় ক্রোধে পরিণত হল আর তিনি দুর্দমনীয় ক্রোধে ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলেন।

"ঘোড়াটাকে খোঁচা দিয়ে তিরের গতিতে ভয়ংকর জন্তুটার পিছনে ধাওয়া করলেন।

"রাত্রের গভীর অন্ধকারে সেই অরণ্যের মধ্য দিয়ে, ঝোপ জঙ্গল, খানাখন্দ, গাছপালার মধ্য দিয়ে একটি সাদা বিন্দুকে লক্ষ করে বায়ুবেগে ছুটে চললেন। তাঁর

ঘোড়াটিও অজ্ঞাত কোনো কারণে প্রচণ্ড গতি পেয়ে দুরন্ত বেগে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে তারা দুজনে একটা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বনের সীমানার বাইরে বেরিয়ে এল। তখন ছোটো একটা পাহাড়ের চূড়ায় চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোয় দেখা গেল পাহাড়টা পাথরে ভর্তি হয়ে আছে আর বড়ো বড়ো পাথরের চাঙড় সেখান থেকে বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং নেকড়েটা পালাবার পথ খুঁজে না পেয়ে দুপাটি হিংস্র দাঁত বার করে ঘুরে দাঁড়াল।

"আনন্দের তীব্র উত্তেজনা এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনায় ফ্রান্সিস প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার কবে হুংকার দিয়ে উঠলেন। সেই হুংকার রাত্রির নৈঃশব্দ্যকে খানখান করে দিয়ে বজ্রের শব্দে প্রতিধ্বনিত হল। এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুরি হাতে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামলেন।

"পশুটা তার পিঠটাকে ফুলিয়ে লোম খাড়া করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার চোখ দুটো, দুটি তারকাবিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। কিন্তু শত্রুর স্পর্ধার মোকাবিলা করার আগে বলিষ্ঠ শিকারি তাঁর দাদার দেহটাকে নিয়ে একটা বড়ো পাথরের চাঁই এর ওপর বসিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর মাথাটাকে, যেটা এখন জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়, এমনভাবে কতকগুলো পাথরের টুকরো দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখলেন যাতে মৃতদেহটা মাটিতে গড়িয়ে না পড়ে যায়। এর পর মৃত ভাইএর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, "জন দেখ, একবার তাকিয়ে দেখ।"

"এই কথা বলেই তিনি সেই ভয়ংকর দৈত্যটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর নিজের মধ্যে এমন এক অমিত শক্তির স্ফুরণ অনুভব করলেন যেন তিনি একটা পর্বতকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবেন, পাথরের চাঁইগুলোকে হাত দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারবেন। সেই মুহূর্তে জন্তুটা তাঁকে হত্যা করার জন্য তার পেটের মধ্যে উদ্যত থাবা দুটোকে গুটিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস এর ওপরে লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হল। এবং চোখের নিমেষে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ফ্রান্সিস তাঁর বজ্রের মতো কঠিন হাত দুটো দিয়ে জন্তুটার টুঁটিটা সজোরে চেপে ধরলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হৃৎস্পন্দন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার টুঁটিতে তাঁর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিতে থাকলেন এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো চিৎকার করে বললেন, দেখ জন, ভালো করে তাকিয়ে দেখ।

"নেকড়েটার প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। এবার তার দেহটা ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল। জন্তুটা মরে গেল।

"ফ্রান্সিস তার দেহটা দুহাতে তুলে মৃতভাইয়ের পায়ের নীচে এনে ফেলে দিয়ে বললেন, প্রিয় ভাই আমার, এই দেখ, সেই নরকের শয়তানটাকে হত্যা করেছি।

"এরপর ঘোড়ার পিঠের ওপরে দুটি দেহকে একটার ওপরে অন্যটাকে রেখে ভালো করে বেঁধে নিলেন, তারপর ঘোড়াটিকে তাঁর বাড়ির দিকে ছুটিয়ে দিলেন।

"হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে ফ্রান্সিস ফিরে এলেন। পশুটাকে তিনি কীভাবে হত্যা করেছেন, সে-কথা তিনি জয়ের আবেগে আত্মহারা হয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে

সকলকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন আর সেইসঙ্গে মৃত ভাই এর নাম ধরে দাড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে কেঁদে কেঁদে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। পরে, প্রায়ই ওই দিনটির কথা মনে করে তিনি যখন চোখের জলে ভেসে গিয়ে ঘটনাটার কথা বলতেন, তখন তিনি শুধু একটাই কথা বলতেন, আমি কীভাবে জানোয়ারটার টুঁটি টিপে তাকে হত্যা করেছি, জন যদি সেটা একবার দেখতে পেত তাহলে আমি নিশ্চিত সে শান্তিতে মরতে পারত। আমার প্রপিতামহের বাবা তাঁর পুত্রের মধ্যে শিকারের এমন এক ভীতি উৎপাদন করেছিলেন যেটা পিতার থেকে তাঁর পুত্রের মধ্যে এবং পরম্পরা অনুযায়ী আমার রক্তে সঞ্চারিত হয়েছে।"

মার্কুইস তাঁর কাহিনি শেষ করলেন। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, "কাহিনিটা সত্যি না..."

মার্কুইস বললেন, "আমি শপথ করে বলছি, ঘটনাটা আগাগোড়াই সত্যি।"

এরপর একজন ভদ্রমহিলা মিষ্টি স্বরে বললেন," শিকারের প্রতি এ ধরনের আসক্তি থাকা সত্যিই প্রশংসনীয়।"

মরা হাত
Dead Hand

প্রায় আট মাস আগে আমার বন্ধু লুই এক সান্ধ্যআড্ডায় তার কয়েকজন কলেজের বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলাম, যথেচ্ছ ধূমপান করলাম, সাহিত্য আর কলা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় তুললাম এবং কোনো আড্ডায় বা মজলিসে যে ধরনের উদ্ভট গল্পগুজব হয়, সেই ধরনের গল্পে মেতে উঠলাম। সবে আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। আমার সবথেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোত্থেকে আসছি বলোতো?"

আমাদের মধ্যে একজন বলল, "অবশ্যই ম্যাবিল থেকে।"

আর একজন বলল, "কী ব্যাপার? দেখে মনে হচ্ছে, ফুর্তিতে যেন একেবারে ফেটে পড়ছ! নিশ্চয়ই তুমি কারও কাছে বেশ কিছু টাকা ধার করেছ অথবা কোনো মামা বা কাকাকে কবর দিয়ে এসেছ অথবা হাতঘড়িটা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা পেয়েছ।"

বন্ধুবর বলল, "তোমাদের কারও ধারণা ঠিক নয়। আমি সোজা আসছি নরম্যানডি থেকে। সেখানে আমি এক সপ্তাহমতো ছিলাম। আসার সময় অন্ধকার জগতের একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তোমাদের অনুমতি হলে তাকে তোমাদের সামনে হাজির করতে পারি।"

এই বলেই সে পকেটের ভিতর থেকে একটা মাংস মজ্জাহীন কঙ্কাল হাত বের করে আনল। উঃ কী ভয়ংকর! কী বীভৎস! সেই লম্বাটে—হাতের কঙ্কালটা শুকিয়ে চিমসে আর কালো হয়ে উঠেছে। বলিষ্ঠ মাংসপেশীর কিছুটা হাতের পিছন দিক আর মধ্যবর্তী অংশটাকে খানিকটা কালো কোঁকড়ানো চামড়ায় আটকিয়ে রেখেছে। সরু আঙুলগুলোর ডগায় নখগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেক দিনের জমে থাকা ময়লা। অনেক দুর থেকে দেখেও কোনো অপরাধীর হাত বলে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

আমার বন্ধুবর বলল, কয়েক দিন আগে এক বৃদ্ধ যাদুকরের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যে বিক্রি হয়ে গেছে—একথা নিশ্চয়ই শুনেছ। যাদুকরটি গ্রামের লোকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রতি শনিবার রাতে সে নাকি ঝাঁটায় চেপে স্যাবাথের পথে পাড়ি দিত। নানারকম যাদু দেখিয়ে সকলকে সে অবাক করে দিত। সে-ই বলেছিল হাতটি একজন কুখ্যাত অপরাধীর। ১৭৩৬ সালে সেই অপরাধী তার স্ত্রীর মুণ্ডু কেটে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এছাড়াও গির্জার যে পুরোহিত তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিল তাকে খুন করে গির্জার মাথার স্পাইক-এ গেঁথে রেখেছিল। এই ধরনের বীরের কাজ করে সে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোল। তার এই

স্বল্পপরিসর কর্মব্যস্ত জীবনে সে বারোজন ভ্রমণকারীর টাকাপয়সা সোনাদানা লুট করল, একটি মঠে তার অভিযান চালিয়ে কুড়িজন পাদরিকে হত্যা করে ওই মঠটিকে তার হারেম করে তুলল।

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, তা না হয় করল, কিন্তু ওই বীভৎস কুৎসিত জিনিসটা নিয়ে তুমি কী করবে?

বুঝতে পারলে না? স্রেফ পাওনাদারদের তাড়াবার জন্য ওটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ওটা আমি দরজার কলিংবেলের সঙ্গে বেঁধে রাখব।

আমাদের মধ্যে একজন ছিল ডাক্তার। সে কোনো রসিকতার ধার দিয়ে গেল না। বেশ গম্ভীরভাবেই সে বলল, এটা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। পেয়ারি, আমার পরামর্শ যদি শোন, তবে তোমাকে বলব, খ্রিস্টানদের রীতি মেনে এটার যথাযথ শেষকৃত্য সম্পন্ন করার চেষ্টা কর। নতুবা এক দিন হয়তো দেখবে এই হাতের অধিকারী তার হাতটি ফিরে পাবার জন্য তোমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই হাতটির মালিকের মৃত্যু হওয়ার পরেও তার কুঅভ্যাস সে ত্যাগ করতে পারেনি। সেই বিশেষ প্রবাদ বাক্যটির কথা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি, একবার কারও চুরির অভ্যাস হয়ে গেলে সে অভ্যাস সে ছাড়তে পারে না।

এর পরে সকলে আমরা মদ্যপান করতে শুরু করলাম। পেয়ারি এক পাত্র মদ উঁচুতে তুলে হাতটির উদ্দেশে অভিবাদন জানিয়ে বলল, তোমার প্রভুর ভাবী আগমন কামনা করে এই মদ পান করছি।

তারপর আড্ডা ভেঙ্গে গেলে সকলে যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

পর দিন প্রায় বেলা দুটো নাগাদ আমি পেয়ারির বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই। তার ঘরে ঢুকে দেখলাম সে ধূমপান করতে করতে এক মনে বই পড়ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ?

'ভালোই', তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

তোমার সেই হাতের খবর কী—

"আমার হাত? ও, বুঝেছি। সেটা তো কলিংবেলের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছি, লক্ষ করনি বোধ হয়। গতকাল রাত্রেই টাঙিয়েছি। গতকাল রাতে শুনলাম কে যেন বেল বাজাচ্ছে, নিশ্চয়ই আমাকে বিরক্ত করার জন্য। কে কে করে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।"

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখলাম বাড়িওয়ালা। সে এমন অসভ্য যে আমাদের অনুমতি না নিয়ে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কোনো সম্ভাষণ না করেই সে সরাসরি আমার বন্ধুকে বলল, ওই কুৎসিত হাতটাকে সরিয়ে নেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আর আপনি যদি আমার অনুরোধ না রাখেন তাহলে দয়া করে আমার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

পেয়ারি বলল, তার গলার স্বর গম্ভীর, স্যার, আপনি কিন্তু হাতটাকে অসম্মান করছেন। ওটি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। জেনে রাখুন, ওটা একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের হাত।

এর পর বাড়িওয়ালা আর একটিও কথা না বলে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পেয়ারি তার পিছনে পিছনে বাইরে গিয়ে হাতটা বাইরের কলিং বেল থেকে খুলে এনে তার ঘরের ভিতরের বেলের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

সেদিন রাত্রে আমি ভালো করে ঘুমোতে পারছিলাম না। কেমন এক ধরনের আতঙ্ক যেন আমায় চেপে ধরেছিল। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল কেউ একজন যেন আমার ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়োাচ্ছে। তারপর ভোরের দিকে সবে একটু তন্দ্রা এসেছে, শুনলাম দরজায় কে যেন ভীষণ জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। ঘুম চোখে দরজা খুলে দেখলাম, আমার সেই বন্ধুর পরিচারক প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, ভয় আর আতঙ্কে তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরোচ্ছে। সে কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট স্বরে যা বলল তার অর্থ হল, তার মালিককে কে বা কারা যেন খুন করে রেখে গেছে।

কথাটা শুনে কোনোরকমে পোশাক পরে পড়ি কি মরি করে পেয়ারির বাড়ির দিকে ছুটলাম।

দেখলাম বাড়ির চার পাশে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মন্তব্য আমার কানে আসছিল। ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। চারজন পুলিশ অফিসার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফিশফিশ করে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করছিলেন, আর একটা নোট বই খুলে কী যেন লিখছিলেন।

যে বিছানায় পেয়ারি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেটার কাছে দাঁড়িয়ে, দুজন ডাক্তার কথা বলছিলেন। না, পেয়ারির মৃত্যু হয়নি। তবে তার চেহারাটা হয়ে গিয়েছিল ভীষণ বীভৎস। তার ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল বিভীষিকা। ভয়ংকর আতঙ্কে চোখের মণি দুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তার গলায় দেখা গেল পাঁচ আঙুলের ছাপ। কে যেন তার গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মারতে চাইছিল। সে এত জোরে গলা চেপে ধরেছিল যে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। রক্তের রং এখন জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু কোথাও সেই হাতটিকে দেখতে পেলাম না, ভাবলাম, মানুষের মনে বিরূপ কোনো ধারণা তৈরি হতে পারে ভেবে ডাক্তার অথবা পুলিশের লোকেরা নিশ্চয়ই হাতটাকে কোথাও সরিয়ে ফেলেছেন। তাই ওটা নিয়ে কাউকে আর কোনো প্রশ্ন করিনি।

পর দিন, খবরের কাগজে পুলিশের তদন্তের যে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল তার মুখ্য অংশটা এখানে তুলে ধরছি, "গত রাত্রে মঁসিয়ে পেয়ারি নামের একজন তরুণকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। তিনি একজন আইনের ছাত্র এবং নরম্যানডির সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি রাত্রি দশটার সময় বাড়িতে ফিরে আসেন। অত্যন্ত

ক্লান্ত ছিলেন বলে ভৃত্য রবিনকে শুতে বলে তিনি নিজেও শুয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে বেল বাজতে থাকে আর সেই শব্দে পরিচারকটির ঘুম ভেঙে যায়। ভয় পেয়ে সে আলো জ্বালে এবং আবার সেই বেলের শব্দ শোনার জন্য সে কান খাড়া করে রাখে, এক মুহূর্ত পরেই আবার ভয়ংকর শব্দে বেলটা বাজতে থাকে। সে ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে দারোয়ানকে ডাকতে তার ঘরের দিকে ছুটে যায়। দারোয়ান পুলিশকে খবর দেয় এবং তার কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। তারা দেখে, ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র, আসবাবপত্র সব লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। মনে হল যে ব্যক্তি তাকে খুনের চেষ্টা করছিল তার সঙ্গে পেয়ারির মারাত্মক রকমের ধস্তাধস্তি হয়। পেয়ারি ওপর দিকে তাকিয়ে মুখটা হাঁ করে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। চোখ দুটি ভীষণ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল, গলায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল পাঁচ আঙুলের দাগ। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় চিকিৎসককে খবর দেওয়া হয়। তিনি আক্রান্তের শরীর পরীক্ষা করে বলেন আক্রমণকারী ভীষণ শক্তিশালী—তার আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতোই সরু এবং শক্ত কারণ সেগুলো গলার ওপর এমন গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে মনে হচ্ছে সেগুলো বুলেটের ক্ষত। এই রকম জঘন্য খুনের চেষ্টার কারণ বা আক্রমণকারীর পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত করছে।"

পর দিন একই কাগজে আরও একটি সংবাদ প্রকাশিত হল, "যে পেয়ারি বি-কে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল ডাক্তারদের দুঘণ্টার অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তাঁর বিপদ কেটে গিয়েছে। তবে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি কখনও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবেন কি না সে ব্যাপারে ডাক্তারদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অপরাধীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

সংবাদটি সত্যি। আমার বন্ধু প্রকৃতই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। সাত মাস ধরে প্রতিটি দিন আমি হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি। উন্নতির কোনো সম্ভবনা চোখে পড়েনি। দিবারাত্র প্রলাপ বকছে, কেউ যেন সর্বদা ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করছে এই ভয়ে সর্বদা সে তটস্থ হয়ে আছে। হঠাৎ এক দিন আমাকে হাসপাতাল থেকে ডেকে পাঠানো হল। শুনলাম তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম তার শেষ সময় উপস্থিত। সে বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে দূরের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, "ওই যে, ওই বীভৎস হাতদুটো আমার গলা টিপে ধরেছে, ও দুটোর আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাও। আমাকে সাহায্য কর, তোমরা কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও।" এই ধরনের কথা বলতে বলতে ভয়ে দিশাহারা হয়ে ঘরের মধ্যে বার দুই ছোটোছুটি করল। তারপর মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আমরা সকলে তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। দেখা গেল তার দেহে তখন প্রাণের চিহ্ন নেই।

আমরা তার মৃতদেহ নরম্যানডিতে নিয়ে গেলাম, স্থির হল তার বাবা মাকে যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল, তাঁদের পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হবে। এখান

থেকেই সে সেই হাতটা নিয়ে আমাদের সান্ধ্যআড্ডায় হাজির হয়েছিল। পাদরি শিক্ষকের সঙ্গে একই কফিনে তার দেহটিকে ভরে আমরা কবরখানায় এসে উপস্থিত হলাম। সেদিনের আবহাওয়া ছিল ভারী চমৎকার। সূর্যের আলোয় সমস্ত পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে আসছে পাখিদের মিষ্টি গান। ছেলের দল এখানে ব্ল্যাকবেরি খাওয়ার জন্য ভিড় করেছে। আমরাও ছেলেবেলায় ব্ল্যাকবেরি খেয়ে ঠোঁট কালো করতাম।

কবর খোঁড়ার শব্দে আমার চিন্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যারা কবর খুঁড়ছিল তারা আমাদের চিৎকার করে ডাকতে লাগল। পাদরি তাঁর প্রার্থনা বন্ধ করলেন। তাদের চিৎকার শুনে আমরা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলাম। তারা বলল, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তারা একটা কফিন পেয়েছে। আমাদের নির্দেশে শাবলের ঘা দিয়ে কফিনের ঢাকনাটাকে তারা খুলে ফেলল। দেখা গেল, তার মধ্যে অস্বাভাবিক দীর্ঘকায় একজন মানুষের কঙ্কাল মুখটা ওপরের দিকে করে চিত হয়ে পড়ে আছে। তার শূন্য চোখের কোটর দুটি যেন আমাদের দেখে বিদ্রূপ করছে।

একজন হঠাৎ বলে উঠল, দেখুন, দেখুন কঙ্কালটার একটা হাত কাটা। এই বলে কঙ্কালটার পাশে পড়ে থাকা একটা কাটা হাত তুলে নিয়ে সে সবাইকে দেখাল।

পাদরি বললেন, এ নিয়ে বেশি হইচই বা হাসাহাসি কোরো না। মৃত কঙ্কালটাকে শান্তিতে থাকতে দাও। কফিনটা বন্ধ করে মাটি চাপা দিয়ে সকলে চলে এসো। পেয়ারির জন্য অন্য কোনো জায়গা ঠিক করতে হবে।

পরের দিন পেয়ারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে বৃদ্ধ পাদরির হাতে পঞ্চাশটি ফ্রাঁ দিয়ে বলে এলাম, কবর খোঁড়ার সময় যে কঙ্কালটাকে আমরা উত্যক্ত করেছি তার আত্মার শান্তি কামনা করে সেই অর্থে যেন একটি প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হয়।

সাধু অ্যান্টনি
Saint Antony

লোকের কাছে সে সাধু আনতোয়েন বা অ্যান্টনি নামে পরিচিত। কারণটা আর কিছুই নয়, তার প্রকৃত নাম ছিল আনতোয়েন। সঙ্গী হিসাবে সে ছিল উপযুক্ত, সে ছিল ভীষণ আমুদে, ভালো খেতে পারত, মদও খেত প্রচুর। আড্ডা ইয়ারকি মেরে আসর জমাতে তার জুড়ি ছিল না আর মেয়েদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার দিকে তার ঝোঁক ছিল সব থেকে বেশি। এই সব অভ্যাস তাকে পেয়ে বসেছিল যখন তার বয়স ষাটের সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছে।

সে বাস করত ককস জেলায় আর চাষ আবাদ করে সে জীবিকা নির্বাহ করত। লম্বা ফর্সা চেহারার অ্যান্টনির বুকের ছাতি ছিল বেশ চওড়া আর পুরু, পেটের আকার ও আয়তনও ছিল সেই অনুপাতে। কিন্তু তার পা দুটো ছিল অত্যন্ত সরু আর সেই পায়ের ওপর তার বিরাট দেহটা অত্যন্ত বিসদৃশভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

সাধু অ্যান্টনির স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল অনেক আগেই। একজন পরিচারিকা আর দুজন কাজের লোক নিয়ে সে তার খামারবাড়িতে বাস করত। তার জমিজায়গা দেখাশোনার ব্যাপারে তার বুদ্ধির কোনো ঘাটতি বা অভাব দেখা যায়নি। নিজের লাভলোকসানের ব্যাপারে সে যথেষ্ট সচেতন ছিল। চাষবাস আর পশুপালনের ব্যাপারে তার ব্যবসাবুদ্ধি ছিল তারিফ করার মতো। তার ছিল দুই ছেলে আর তিন মেয়ে।

মেয়ে দুটিকে সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছিল আর ছেলে দুটিরও বিয়ে দিয়েছিল বর্ধিষ্ণু চাষি পরিবারের দুটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। তারা সকলে কাছাকাছি গ্রামগুলোতে বাস করত। তারা মাসে একবার করে ডিনার খেতে আসত তাদের বাপের ভিটেতে। বলবান একজন মানুষ হিসাবে সারা অঞ্চলে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে কথায় কথায় বলে বেড়াত, সাধু অ্যান্টনির মতো শক্তিশালী মানুষ এ তল্লাটে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রাশিয়ান আক্রমণের সময় অ্যান্টনি গ্রামের শুঁড়িখানায় বসে মদ খেতে খেতে বলত সে একটা গোটা সৈন্যবাহিনীকে গিলে খেতে পারে। অন্যান্য নরম্যানদের মতো সে ছিল যেমন দাম্ভিক তেমনি নিজের সম্বন্ধে সে সর্বদা বড়ো বড়ো কথা বলত। অন্যান্য সমস্ত দাম্ভিক লোকদের মতো তার মধ্যে কাপুরুষতারও কোনো অভাব ছিল না। সে নিজের কবিত্ব প্রকাশ করত টেবিলে দুমদাম ঘুসি মেরে। সে চোখ মুখ লাল করে প্রচণ্ড চিৎকার করে তার নকল বীরত্ব ফলানোর চেষ্টা করত আর বলত শয়তানগুলোকে আমি গিলে খাব, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি আমি ওদের খাবই খাব।

সে কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি হঠাৎ প্রাশিয়ান সৈন্যরা ট্যানেভিলের সীমান্ত পার হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়বে। সৈন্যরা তখন রউতোত পর্যন্ত চলে এসেছে, এ সংবাদ শোনার পর থেকে সে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। সে সর্বদা রান্নাঘরের জানালার কাছে একটা টুল পেতে বসে বড়ো রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকত। সবসময় তার ভয় হত এই বুঝি বেয়নেট কাঁধে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে।

এক দিন সকালে যখন সে বাড়ির কাজের লোকজন নিয়ে খাওয়াদাওয়া করবে বলে ঠিক করেছে ঠিক সেই সময়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন মেয়র মঁসিয়ে চিকট। সে মেয়রের পিছনে পিছনে একজন সৈনিককেও ঢুকতে দেখল। তার মাথায় চাপানো ছিল তামার পেরেক আঁটা কালো রং এর শিরস্ত্রাণ। তাদের দেখে সাধু অ্যান্টনি উঠে দাঁড়াল। কাজের লোকগুলো ভয় পেয়ে তাদের দিকে বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারা প্রতিমুহূর্তে আশা করছিল এই বুঝি তাদের মালিক সৈন্যটিকে মেরে মাটির নীচে পুঁতে দেবে। কিন্তু অ্যান্টনি সেসবের ধার দিয়েও গেল না। শুধু দেঁতো হাসি হেসে মেয়রের সঙ্গে করমর্দন করল। মেয়র অ্যান্টনিকে একটা ব্যাপার বোঝানোর চেষ্টা করে বললেন, সেন্ট অ্যান্টনি, তোমার এখানে একজনকে নিয়ে এলাম। এর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। এর সঙ্গে আচার ব্যবহারে খুব সাবধান থাকবে। সামান্য এদিক থেকে ওদিক হলেই আমাদের কিন্তু সমূহ বিপদ। ওরা আমাদের সবাইকে গুলি করে মারবে বলে শাসিয়েছে। গ্রাম কে গ্রাম পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে বলে ভয়ও দেখিয়েছে। এই ছেলেটি যথেষ্ট ভদ্র। ওর আচার ব্যবহারও বেশ মার্জিত। লক্ষ রেখো ওর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আমি এখন চললাম। অন্যান্য অনেকের ব্যবস্থা করতে হবে তা ছাড়া অনেক কাজও বাকি পড়ে আছে।

মেয়র বিদায় নিলেন। এবার সে সৈনিকটিকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেল। বলিষ্ঠ শরীরের যুবক, গায়ের রং সাদা, চামড়া মসৃণ চকচকে, চোখের তারা নীলাভ, সুন্দর চুল, চিবুক পর্যন্ত সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি, একটু লাজুক প্রকৃতির, দেখলে খুব চালাক চতুর বলে মনে হবে না।

এক মুহূর্ত তাকে দেখেই ধূর্ত নরম্যান যা বোঝার বুঝে নিয়ে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাকে ইঙ্গিতে বসতে বলল।

অ্যান্টনি জিজ্ঞেস করল, একটু স্যুপ খাবে?

প্রশিয়ান যুবক তার ভাষা বুঝতে পারল না। অ্যান্টনি আর কোনো কিছু ভাবনাচিন্তা না করে কানায় কানায় এক গামলা ভরতি স্যুপ তার মুখের সামনে এগিয়ে দিল।

ওরে মোটা শুয়োরের বাচ্চা, এটাকে গলা পর্যন্ত চালান করে দে, জিব দিয়ে চেটে চেটে আরাম করে খা। বাপের জন্মে এমন জিনিস খাসনি।

সৈনিকটি কিছুই বুঝতে না পেরে নির্বোধের মতো তার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর মহা লোভীর মতো খুব দ্রুত খেতে লাগল। তার যে যথেষ্ট সাহস আছে

আর নিজের দম্ভে তাকে পরোয়াই করছে না এমন একটা ভাব নিয়ে সে আড়চোখে তার চাকরদের একবার দেখে নিল। তারাও তাদের মালিকের কাণ্ডকারখানা দেখে মুখ টিপে হাসছিল যদিও তারা বেশ ভয়েভয়ে ছিল পাছে—প্রাশিয়ান সৈনিকটি রেগে গিয়ে কোনো অঘটন্ ঘটিয়ে বসে।

প্রাশিয়ানটিকে এক গামলা স্যুপ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে দেখে, আর এক গামলা স্যুপ তার সামনে ধরে দিল অ্যান্টনি। সেটাও সে লোভীর মতো খেয়ে শেষ করল। কিন্তু তৃতীয় গামলার স্যুপটা তাকে খেয়ে ফেলার জন্য বারবার বলা সত্ত্বেও সে আর খেতে রাজি হল না।

অ্যান্টনি তাকে খেতে বলে বলল, "খা খা যত পারিস খা, গলা পর্যন্ত গেল। ওরে মোটা শুয়োরের বাচ্চা, আমি তোকে এমন মোটা বানাব যাতে তুই নড়তেচড়তে না পারিস।"

অ্যান্টনি যে ভাষায় কথা বলল তার একবর্ণও সে বুঝতে পারল না। সে ভাবল অ্যান্টনি তাকে মোটা না করে ছাড়বে না। তাই সে একটু মিষ্টি হেসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে তার আর খাওয়ার মতো অবস্থা একেবারেই নেই, তার পেট ভীষণ ভরে উঠেছে।

অ্যান্টনি মন্তব্য করল, শুয়োরের বাচ্চাটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নেই, মাথাটা একেবারে নিরেট।

হঠাৎ অ্যান্টনি হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়ে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। চাকর চাকরানিরাও তার সঙ্গে সমানে হাসতে লাগল, হাসির দমকে তাদের দমবন্ধ হবার হবার জোগাড় হল।

অ্যান্টনি এর পর সবথেকে ভালো এক বোতল ব্র্যানডি খেল। সৈনিকটির দিকেও এক বোতল এগিয়ে দিল। সে মহানন্দে ব্র্যানডির বোতল শেষ করে ইঙ্গিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে প্রশংসা করল। সেন্ট অ্যান্টনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, খুব ভালো খেতে তাই না? ওরে হোঁতকা শুয়োর, তোদের দেশে এমন খাঁটি জিনিস কখনও তৈরি হয়েছে?

এর পর থেকে অ্যান্টনি প্রাশিয়ান সৈনিকটিকে নিয়ে রোজ বেরোতে শুরু করল। সে যেখানে যায় তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য সে একটা নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছে। এই ধরনের রসিকতার মধ্য দিয়ে সে তার মনের জ্বালা মিটিয়ে নিত। সেখানকার মানুষেরা সেনাবাহিনীর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকলেও মৃত্যুভয়ে সর্বদাই তাদের শঙ্কিত উদ্‌বিগ্ন হয়ে থাকতে হত। সৈন্যদের চোখের আড়ালে অ্যান্টনির রঙ্গরসিকতায় তারা হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেত। সে এমন সব নূতন নূতন রসিকতার পথ উদ্ভাবন করত অন্য কেউ তা চিন্তাও করতে পারত না। প্রতিদিন বিকেলের দিকে অ্যান্টনি এই প্রাশিয়ান সৈনিকটির হাত ধরে প্রতিবেশীদের বাড়ি যেত এবং নূতন ধরনের রসিকতার মধ্য দিয়ে সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিত।

তরুণ সৈনিকটিকে নিয়ে অ্যান্টনি সর্বদা ঠাট্টাতামাশা করত। এইভাবে সে ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল। লোকটার উরুতে চিমটি কেটে আর তার কাঁধে থাপ্পড় মারতে মারতে বলত সমস্ত শরীরটা যেন মোটা চর্বিতে ঠাসা। চর্বিগুলো যেন জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে উঠেছে।

অ্যান্টনি যখন তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে যেত তখন সে তাকে ভালো ভালো খাবার খাওয়াতে বলত নাহলে তাদের ভয় দেখাত। আর তার ভয়ে তারা সৈনিকটিকে ভালো ভালো খাবারের জোগান দিত। সারাদিন ধরে এই কাজ করে সে খুব মজা পেত।

অ্যান্টনি বলত, ওকে কী খেতে দেবে তা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। যে-কোনো খাবার ও গ্রোগ্রাসে গিলবে।

তারা মাখন রুটি, সেদ্ধ আলু, ঠান্ডা স্টু আর বড়ো একতাল শুয়োরের মাংস তার সামনে এগিয়ে দিত আর এই সমস্ত খাবার সে হাসিমুখেই খেয়ে নিত। অতিরিক্ত খেয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এই ভয়েও কারও দেওয়া খাবার খেতে অস্বীকার করত না। ক্রমশ সে মোটা হতে লাগল, তার গায়ের জামা, পরনের প্যান্টালুন ছিঁড়ে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। তাতে অ্যান্টনি বেশ আত্মতৃপ্তি অনুভব করল।

অ্যান্টনি ঠাট্টা করে বলত, শোনো হে শুয়োরের বাচ্চা, তুমি দিন দিন এমন ফুলে যাচ্ছ, দেখছি তোমার জন্য একটা নূতন খোঁয়াড় তৈরি করে দিতে হবে।

সত্যি বলতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব এমন জমে উঠেছিল, অ্যান্টনি নিজের ব্যবসার কাজে কোথাও গেলে প্রাশিয়ান সৈনিকটি তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য জোর করত।

সেদিন ছিল বিশ্রী আবহাওয়া। এমন কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছিল যেন সবকিছু জমে যাওয়ার অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। ১৮৭০ সালে ফ্রান্সে সেবার এত ঠান্ডা পড়েছিল যে মানুষকে সীমাহীন বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অ্যান্টনি যেমন ছিল বিচক্ষণ তেমন দূরদর্শী। কোনো সুযোগ সে সহজে হাতছাড়া করত না। সে বুঝতে পেরেছিল, শীতের শেষে বসন্তকালে জমি চাষ করার সময় তার নিজের যতটা গোবর আছে তাতে তার প্রয়োজন মিটবে না। তার এক প্রতিবেশীর বিরাট এক গোবরের গাদা ছিল আর সে লোকটারও কিছু টাকারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং অ্যান্টনি টাকা দিয়ে সেই গোবরের গাদাটা কিনে নিল। প্রতিদিন সন্ধেবেলা সে প্রতিবেশীর খামারে গিয়ে এক গাড়ি করে গোবর নিয়ে আসতে লাগল। প্রাশিয়ান সৈনিকটি যথারীতি তার সঙ্গে যেত। রবিবারের অনুষ্ঠাগুলোতে চারিপাশ থেকে সমস্ত গ্রামের লোক যেমন পঙ্গপালের মতো ছুটে আসত তেমনি সেনাপুঙ্গবটিকে আকণ্ঠ পান ভোজনে তৃপ্ত করে আনন্দ পাওয়ার জন্য চারপাশ থেকে পিলপিল করে লোকজন তাকে নিমন্ত্রণ করতে আসত।

কিন্তু সৈনিকটির মনে এর মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সময় সময় অ্যান্টনির অট্টহাসির মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যেত তখন সে তীক্ষ্ণ সন্দেহের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখত। তাকে নিয়ে অতিরিক্ত ঠাট্টাতামাশা সে যে পছন্দ করছে

না বা তাতে যে সে বেশ রেগে যাচ্ছে তাকে দেখলে সেটা বোঝা যেত। এক দিন তাকে খাবার দেওয়া হলে যতটা সম্ভব সে খেয়ে নিল। এর পর সে টেবিলে বাকি সব খাবার ফেলে রেখে চলে যাওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু অ্যান্টনি নাছোড়। সে তাকে এমন শক্ত হাতে তার কবজি ধরে এবং কাঁধে চাপ দিয়ে চেয়ারের উপর বসতে বাধ্য করল যে সেই ধাক্কায় চেয়ারটা ভেঙে গেল। উপস্থিত সকলে সেই কৌতুককর দৃশ্য দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

নিজের কৃতিত্বে খুশি হয়ে অ্যান্টনি তাকে হাত ধরে তুলল এবং তার ক্ষতগুলিকে পরীক্ষা করে সমবেদনা বা সহানুভূতি জানাবার ভান করল। তারপর তাকে যেন খুশি করতে চাইছে এমন একটা কৃত্রিম ভাব নিয়ে বলল, ভগবানের দিব্যি, খাবার যদি তুমি আর না খেতে চাও খেয়ো না কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে বসে মদ না খাও আমি খুব দুঃখ পাব।

কাছের সরাইখানা থেকে মদ আনার জন্য সে তার একজন চাকরকে পাঠাল। তাতে সৈনিকটি রেগে গিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করল কিন্তু যতটা মদ তাকে দেওয়া হয়েছিল তা সে নিঃশেষে পান করল। উপস্থিত সকলে দেখল অ্যান্টনিও সৈনিকটির সমান পরিমাণ মদ খেয়েছে। তা দেখে তারা অ্যান্টনিকে উৎসাহিত করল। মনে মনে তারা ভাবল হুঁ হুঁ বাবা! তাদের অ্যান্টনিকে হারানো এত সহজ নয়।

অ্যান্টনি চোখ দুটো টমেটোর মতো লাল করে গ্লাসের পর গ্লাসভরতি মদ সৈনিকটির দিকে এগিয়ে দিতে থাকল আর মদের ঝোঁকে চিৎকার করে অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে বলতে লাগল, খা খা যত পারিস খা. এ সুযোগ আর পাবি না।

বিনা বাক্যব্যয়ে সৈনিকটিও গ্লাস কে গ্লাস গলায় ঢালতে লাগল। মনে হল দুজনেই ভয়ংকর এক প্রাণঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছে। চলছে দুজনের মধ্যে এক অদৃশ্য যুদ্ধ। কেউ কারও থেকে কম যায় না। কেউ কারও থেকে পিছিয়ে নেই। ইতিমধ্যে দুজনেই এক লিটার করে ব্র্যানডি শেষ করেছে। কারও আর এক ফোঁটাও খাওয়ার ক্ষমতা রইল না। উভয়ের কারও হারজিতের সিদ্ধান্ত হল না। সেটা পরের দিনের জন্য স্থগিত রাখা হল।

মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে টলতে টলতে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। গাড়ি-ভরতি গোবর সার নিয়ে ঘোড়া দুটো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। ওরাও টলতে টলতে গাড়ির পিছনে পিছনে চলল।

হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করল। মেঘে ঢাকা পড়েছে আকাশের চাঁদ। চারিদিকে নিঃসীম অন্ধকার। কনকনে ঠান্ডা তাদের ভয়ংকরভাবে আচ্ছন্ন করল। আরও বেশি মাতাল হয়ে উঠল তারা। মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতায় জিততে না পেরে অ্যান্টনি প্রাশিয়ান সৈন্যটিকে এক ধাক্কায় গর্তের মধ্যে ফেলে নিজের আক্রোশকে শান্ত করতে চাইল, মেটাতে চাইল মনের জ্বালা। কিন্তু জার্মান সৈনিকটি সেই ধাক্কা এড়িয়ে গেল আর যতবার সে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলার চেষ্টা করল ততবারই সে ধাক্কা এড়িয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে বকতে লাগল,

সৈনিকটির ভাবভঙ্গি দেখে অ্যান্টনির হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল।

শেষ পর্যন্ত সৈনিকটি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করছিল সে। এক সময় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। অ্যান্টনি যখন তাকে আর একবার ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল তখন সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, এত প্রচণ্ড জোরে অ্যান্টনির মুখে একটা ঘুসি মারল যে বৃদ্ধ নরম্যানটি টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে অতি কষ্টে সে সেই পতনের গতি রোধ করল। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে বৃদ্ধ নরম্যানটি এমনিতেই বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল আর ঘুসি খাওয়ার পর সেই ক্ষিপ্ততা ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেল। এর পর সে একটা বাচ্চাকে দুহাত দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরার মতো করে সৈনিকটিকে উঁচু করে ধরে কয়েকবার জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে খানিকটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিজের বীরত্ব জাহির করতে পেরে সে এত খুশি হল যে সে হাত দুটোকে বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে একজন বীরের ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে সৈনিকটির মাথা থেকে শিরস্ত্রাণটি কোথায় যে ছিটকে গিয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে সেটির কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। তার বীরত্ব ওইরকম চূড়ান্তভাবে একজন গেঁয়ো মাতালের কাছে পর্যুদস্ত হওয়াতে সে ভয়ংকরভাবে অপমানিত বোধ করল। সে মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে উঠে খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে নিয়ে ছুটে এল অ্যান্টনির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতের বহুদিনের তেল খাওয়া একটা লাঠি নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে প্রাশিয়ান সৈন্যটি মাথা নীচু করে তরোয়ালটিকে সোজা করে ধরে ছুটে এল তরোয়ালের ডগাটা তার প্রতিপক্ষের পেটে আমূল বসিয়ে দেবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে। সে যখন অ্যান্টনির খুব কাছে চলে এসেছে তখন সে তার সাঁড়াশির মতো কঠিন হাত দিয়ে তরোয়ালের ডগাটা চেপে ধরল এবং এক মুহূর্ত তাকে নড়বার সুযোগ না দিয়ে তার হাতের লাঠিটা সজোরে বসিয়ে দিল তার মাথায়।

মুহূর্তের মধ্যে প্রাশিয়ান সৈনিকটি অ্যান্টনির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। তারপরে কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে একেবারে নিথর হয়ে গেল। ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি দিশাহারা অ্যান্টনি কিছুক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার নিষ্প্রাণ শরীরটার দিকে। সেটা তখন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। অ্যান্টনি একটু নীচু হয়ে মৃত শরীরটাকে উলটিয়ে সোজা করে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সৈনিকটির চোখ দুটি তখন বন্ধ হয়ে ছিল, তার মাথার ব্রহ্মতালু থেকে তখনও অল্প অল্প রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও বরফের ওপর লাল রক্তের দাগ দেখতে পেল অ্যান্টনি। হতবুদ্ধি মানুষের মতো সে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়াগুলো সারবোঝাই গাড়িটা টেনে নিয়ে এগিয়ে চলল। চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে কী করবে, মৃতদেহটিকে সে কোথায় সরাবে, কীভাবে চাপা দেবে এই খুনের ঘটনাটা,

কীভাবেই বা প্রাশিয়ানদের চোখে ধুলো দেবে। তারা যদি সত্যি ঘটনাটা জানতে পারে তাহলে তারা তার সমস্ত শরীর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে, তার বাড়িঘর খেতখামার ফসল পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে খাক করে দেবে।

সেখানকার সীমাহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে দূর থেকে অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনল অ্যান্টনি। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণটা খুঁজে নিয়ে মৃত সৈনিকটির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাকে প্রথমে কোমর ধরে বসাল, তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে লাগল সারবোঝাই গাড়িটার পিছনে। এর পর তাকে গোবরের গাদার ওপর শুইয়ে দিল। সে ভেবে ঠিক করল পৌঁছোনোর পর সে সিদ্ধান্ত নেবে সে মৃতদেহটিকে নিয়ে কী করবে। কী করবে আর কী করবে না এই সমস্ত সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারল না। সে বুঝতে পারছিল কী ভয়ংকর বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর সেই বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে না পেরে সে গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। যখন সে বাড়ির সামনে পৌঁছোল, চিলেকোঠায় আলো জ্বলতে দেখতে পেল। নিশ্চয়ই পরিচারিকাটি এখনও জেগে আছে। গাড়িটাকে সে এমনভাবে পিছন দিকে ঠেলে দিল যাতে সেটা সার তৈরির গর্তের মুখের কাছে এসে দাঁড়ায়। সে ভাবল মৃতদেহটা যে গোবরের গাদার ওপর সে রেখে দিয়েছিল সেটাকে গোবরের সঙ্গে গর্তের মধ্যে ফেলতে গেলে দরজাটাকে খুলে দিতে হবে এবং সে তার ভাবনাটাকে কাজে পরিণত করতে গাড়ির দরজাটা খুলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে গোবরের গাদার সঙ্গে সৈনিকটির মৃতদেহটা গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ল এবং সেটা গোবরের নীচে চাপা পড়ল।

খড়-বিচালি তোলার জন্য যে হাতলওয়ালা যন্ত্রটা সে ব্যবহার করত সেটা দিয়ে সারের গাদাটাকে পরিষ্কার করে দিয়ে সেটাকে গাদার পাশে মাটিতে পুঁতে রাখল। একটা চাকরকে ডেকে গাড়ি থেকে ঘোড়া দুটোকে খুলে নিয়ে সে দুটোকে আস্তাবলে রেখে দিতে বলল। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে ক্লান্ত শরীরটাকে ছড়িয়ে দিল। এর পর সে কী করবে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল সে কথা ভেবে চলেছিল। কিন্তু বাঁচার কোনো পথের সন্ধান পেল না। ভয়ে তার হাতপা কাঁপতে লাগল, কণ্ঠ-তালু শুকিয়ে এল। নিশ্চয়ই ওরা তাকে মেরে ফেলবে। কাঁপতে কাঁপতে রান্নাঘরে ঢুকে সে আলমারি থেকে দুবোতল ব্র্যান্ডি এনে মুখে ঢেলে দিয়ে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল। তাতে সে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ল ঠিকই কিন্তু মন থেকে ভয় বা ভয়ংকর উদ্বেগকে তাড়াতে পারল না। সমস্ত ঘরময় পায়চারি করতে করতে নিজেকে বাঁচাবার পথ খুঁজতে লাগল কিন্তু সামান্যতম আলোও তার চোখে পড়ল না।

তখন প্রায় মাঝরাত। তার নেকড়ের মতো হিংস্র কুকুরটা হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। বৃদ্ধ অ্যান্টনিও সে চিৎকারে নিজেও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। যতবার তার কুকুরের ভয়ার্ত চিৎকার কানে এল ততবারই সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল। সে অনুভব করল তার শরীরের উষ্ণ রক্ত ভয়ে হিম হয়ে যাচ্ছে।

পায়চারি করার শক্তি হারিয়ে সে চেয়ারের ওপর হাতপা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল। তার মনে হল সমস্ত শরীরের স্নায়ু অবশ হয়ে গেছে। সে আবার তার কুকুরের চিৎকার শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

নীচের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজার শব্দ শোনা গেল। কুকুরটা আবার বিশ্রী সুরে কেঁদে উঠল। কুকুরটার সেই কান্নার শব্দ শুনে সে একটা জড়বস্তুর মতো চেয়ারের ওপর পড়ে রইল। সে ভাবল কুকুরটাকে ছেড়ে দিলে সে হয়তো তার কান্না বন্ধ করবে আর তাই ভেবে চেয়ার থেকে নিজের শরীরটাকে কোনো প্রকারে টেনে নিয়ে নীচে নেমে এসে দরজাটা খুলল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পর কুকুরটা যেখানে বাঁধা ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। কুকুরটা তখন চেনটাকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য লাফালাফি-টানাটানি করছে। চেনটাকে খুলে দিতেই কুকুরটার শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল, সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠল—দাঁতগুলো বের করে গোঁগোঁ শব্দ করতে করতে সারের গাদা লক্ষ করে একটা লাফ দিল আর লাফ দিয়েই সে মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠল না। তখন তার দেহে প্রাণের চিহ্ন নেই।

মৃত পশুটিকে উদ্দেশ্য করে অ্যান্টনি বলল, তোর কী হল রে ডেভোঁরা? কথাগুলো বলার সময় তার সমস্ত শরীর থরথর কাঁপতে লাগল।

এবার সে গোবরের গর্তটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। আবছা অন্ধকারে কাছের কোনো জিনিসকে চিনতে অসুবিধা হয় না। সে ওই অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালাল, দেখল গোবরের স্তূপের ওপর একটা লোক বসে আছে। সে ভীষণ ভয় পেয়ে সেই হঠাৎ উদয় হওয়া মূর্তিটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। যে-কোনো একটা অবলম্বনের জন্য এদিক-ওদিক তাকাল, দেখল, খড়-বিচালি তোলার যে যন্ত্রটি সে মাটিতে গেঁথে রেখেছিল সেটা সেখানেই পড়ে আছে। কোনো কিছু চিন্তাভাবনা না করেই সে সেটাকে টেনে তুলে ব্যাপারটা কী দেখার বা বোঝার জন্য সে দিকে ছুটে গেল।

লোকটি আর কেউ নয়, সেই প্রাশিয়ান সৈনিকটি। সে এত সময় মৃতপ্রায় অবস্থায় গোবরের গাদার নীচে পড়েছিল। শরীরে তাপ সঞ্চার হতেই তার চেতনা ফিরে আসে এবং গোবরের স্তূপের মধ্য থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। সে যে কী করছিল তা বোঝার মতো শক্তি তার ছিল না, শুধুমাত্র একটা যন্ত্রের মতো সে এই সমস্ত করেছে। সমস্ত শরীর তার পচা গোবর আর রক্তে মাখামাখি। মদের নেশায় তখনও সে আচ্ছন্ন। আঘাতের যন্ত্রণায় সে ক্লান্ত। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে তার সমস্ত শরীর ঢেকে গিয়েছে। সে ইতিমধ্যে অ্যান্টনিকে দেখতে পেয়েছে, কী ঘটেছে আর কেনই বা সে এখানে এই অবস্থায় বসে আছে—সে-কথা সে মনে করতে পারল না। শুধু সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু যে মুহূর্তে বৃদ্ধ নরম্যানটি তার আগের প্রতিপক্ষকে চিনতে পারল, সেই মুহূর্তে সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পাগল কোনো জন্তুর মতো তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগল।

সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, শুয়োরের বাচ্চা তুই! তুই বেঁচে আছিস, তুই মরিসনি এখনও! তুই আমাকে ধরিয়ে দিবি আর তোর লোকেরা আমায় গুলি করে মারবে, না? দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে।

এইভাবে বিড়বিড় করতে করতে সে প্রাশিয়ানটির দিকে দৌড়ে গেল। হাতে তার খড়-বিচালি তোলার সেই যন্ত্র। সে সেটাকে বর্শার মতো করে বাগিয়ে ধরে যথাসম্ভব শক্তিতে যন্ত্রের তীক্ষ্ণ ফলাটাকে সৈনিকটির বুকের মাঝখানে বিঁধিয়ে দিল। সে একটা তীক্ষ্ণ ক্ষীণ আর্তনাদ করে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। মুখটা হাঁ করে সে নিষ্প্রাণ দেহে ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। ওই অবস্থাতেই সে বারবার ওই যন্ত্রের মুখটা দিয়ে সে তার বুকে পেটে গলায় এবং অন্যান্য জায়গায় তার ইচ্ছেমতো এলোপাথাড়ি খোঁচা দিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে খোঁচাতে খোঁচাতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটাকে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। স্রোতের মতো রক্ত বেরিয়ে মিশে যেতে লাগল গোবরের স্তূপে। শেষ পর্যন্ত অসম্ভব পরিশ্রম, উদ্বেগ, আর স্নায়ুর অবসাদে ক্লান্ত হয়ে সে নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হল। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে নিজের নিশ্বাসের গতিকে স্বাভাবিক করল।

এক সময় রাত্রি শেষ হওয়ার সংকেত দিয়ে মোরগ ডেকে উঠল। ভোর হয়ে আসছে দেখে সে আর দেরি করতে সাহস পেল না। সকলের চোখের আড়ালে মৃতদেহটাকে কবর দেবার জন্য সে তাড়াহুড়ো করতে লাগল। যে গর্তটা গোবরে ভরতি করা হয়েছিল সেখানে সে আবার নূতন করে একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়তে খুঁড়তে সে মাটি পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তবুও সে গর্ত খোঁড়া বন্ধ না করে গর্তটাকে আরও গভীর করে খুঁড়তে লাগল। গর্ত যখন অনেকটা গভীর হল তখন অ্যান্টনি বিচালি কাটার যন্ত্রটা দিয়ে মৃতদেহটাকে ধীরে ধীরে ঠেলে গর্তটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপরে মাটি দিয়ে গর্তটার মুখটাকে চাপা দিল আর তার ওপর চাপিয়ে দিল গোবরের স্তূপ। ক্রমাগত তুষারপাত হওয়ার কারণে তার কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে উঠল। যেখানে যেখানে লাল রক্তের দাগ ছিল, তা বরফের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিল। শেষে সেই কাঁটাওয়ালা বিচালি তোলার যন্ত্রটাকে গোবরের গাদার মধ্যে অনেকটা নীচে পুঁতে দিয়ে তার ঘরে চলে এল। রান্নাঘর থেকে আর একটা ব্র্যান্ডির বোতল এনে পুরোটাই গলায় ঢেলে দিয়ে বিছানার ওপর হাতপা ছেড়ে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

যখন তার ঘুম ভাঙল তখন বেলা প্রায় দুপুর। সে তখন স্থির শান্ত। তার মধ্যে আদৌ কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে তার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার সৈনিক-বন্ধুটিকে খোঁজার জন্য আশেপাশের সমস্ত জায়গায় খবর দিল। সে প্রাশিয়ান সেনা-অফিসারদের কাছে গিয়ে জানতে চাইল কেন তাঁরা তার প্রিয় বন্ধুটিকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। অফিসার দেখলেন, বন্ধু হারানোর ব্যথায় তার দুটো চোখ জলে ভরে উঠেছে। অভিনয়ে তার কোনো ঘাটতি

দেখা গেল না। সে অভিনয় যেন কুশলী অভিনেতাকেও হার মানায়। তাদের ঘনিষ্ঠতার কথা কারও অজানা ছিল না। সুতরাং তার ওপর অফিসারদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ পড়ল না। প্রাশিয়ান সেনা-অফিসাররা যখন তার খোঁজ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তখন সে নিজেই আগ্রহী হয়ে তাঁদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করতে লাগল। সে এমন কিছু সম্ভাব্য পথের সন্ধান দিল যে পথ দিয়ে এগোলে তার প্রাণের বন্ধুটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। সে তাঁদের বলল, সে রাত্রিবেলা মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক সময় নষ্ট করত।

পাশের গাঁয়ে একজন বৃদ্ধের একটি ছোটো সরাইখানা ছিল। তার ছিল একটি সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি বাবার সঙ্গে থেকে সরাইখানার কাজে সাহায্য করত। জার্মান অফিসাররা সরাইখানার মালিককে খুঁজে বের করল এবং তার মেয়েকে গ্রেপ্তার করে তাকে গুলি করে মেরে ফেলল।

কবর
The Tomb

দিনটা ছিল আঠারোশো তিরাশি সালের সতেরোই জুলাই। বেজিয়ারস কবরখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মীটির হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর কুকুরের চিৎকারে। কবরখানার শেষ প্রান্তে একটি ছোটো ঘরে তিনি বাস করতেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় তাঁর কুকুরটি বাঁধা থাকত।

কুকুরের চিৎকার শুনে তিনি নীচে নেমে এসে দেখলেন, কুকুরটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কীসের যেন ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করছে আর রাগে গরগর করছে। তার চিৎকার শুনে মনে হল কোনো ছিঁচকে চোর সম্ভবত ঘরের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভিনসেন্ট তাঁর বন্দুকটা হাতে নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

জেনারেল বোনেত এর নামে একটি রাস্তা তৈরি হয়েছিল। কুকুরটা সেই রাস্তার দিকে দ্রুত দৌড়োতে শুরু করল এবং মাদাম তোময়সুর কবরের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে এসে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাবধানে কিছুটা এগোবার পর ভিনসেন্টের নজরে পড়ল ম্যালেভারস অ্যাভেনিউ এর দিক থেকে সরু একটা আলোর রেখা এসে মাটির ওপর পড়েছে। নিজেকে আড়াল করে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ ভয়ংকর জঘন্য ও অপবিত্র একটি ঘটনা তাঁর চোখে পড়ল।

একটি যুবক কবর খুঁড়ে একটি যুবতীর উলঙ্গ মৃতদেহ বাইরে বের করে নিয়ে এসেছে। আগের দিনই যুবতীটিকে কবর দেওয়া হয়েছিল। মাটির ওপর রাখা ছিল একটা ছোটো লণ্ঠন। তার অস্পষ্ট আলোয় তিনি সেই বীভৎস দৃশ্যটি দেখতে পেলেন।

লোকটি জঘন্য কাজে লিপ্ত হবার আগেই, ভিনসেন্ট অপরাধীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে তাকে থানায় নিয়ে এলেন।

অপরাধীকে দেখে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার চমকে উঠলেন। সে আর কেউ নয়। পেশায় সে নামকরা একজন আইনজীবী, ধনী, সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের সন্তান। একজন সম্মানী ব্যক্তি হিসাবে সকলের কাছে সে বিশেষভাবে পরিচিত। নাম কোর্বাতেল।

যথাসময়ে তার বিচার হল। পাবলিক প্রসিকিউটর যখন তার অপরাধের কাহিনি রসিয়ে রসিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন তখন আদালতে উপস্থিত জনতা লজ্জায় ঘেন্নায় ছিছি করতে লাগল। এক সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এজলাসে এসে নিজের আসনে বসলেন। জনতা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "ওকে ফাঁসিতে চড়ান, ওকে ফাঁসিতে চড়ান। ফাঁসিই ওর একমাত্র উপযুক্ত সাজা।" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অতি কষ্টে জনতাকে শান্ত করলেন।

এর পর তিনি গম্ভীর স্বরে আসামিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তুমি কি কিছু বলবে?"

আসামি অন্য কোনো আইনজীবীকে নিযুক্ত করেনি। আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজের বক্তব্য রাখার জন্য সে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

দীর্ঘদেহী, আকর্ষণীয় চেহারা, বলিষ্ঠ গঠন, চোখের দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

জনতার ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সে শিকার হল তাদের বাঁকা হাসির শব্দ আর তিক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে।

তাতে সে মনের জোর হারাল না বা ভয়ও পেল না। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট স্বরে বলতে শুরু করল, প্রথম দিকে তার কণ্ঠস্বর ছিল কিছুটা মৃদু কিন্তু ক্রমে সেই স্বরে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে তা হয়ে উঠল স্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ।

সে বলতে শুরু করল, ধর্মাবতার ও সম্মানিত জুরির সদস্য মহোদয়গণ, একজন যুবতীকে কবর খুঁড়ে বের করে এনে যে নীতিগর্হিত কাজ আমি করেছি আমি জানি তা আইনের চোখে ক্ষমার অযোগ্য এক দণ্ডনীয় অপরাধ। মিঃ ভিনসেন্ট যে যুবতীটিকে কবর থেকে আমাকে টেনে বের করে আনতে দেখেছেন সে ছিল আমার প্রিয়তমা রক্ষিতা। তাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতাম। কিন্তু সে ভালোবাসা ছিল এক বিচিত্র ধরনের। সে ভালোবাসা যেমন দেহকেন্দ্রিক ছিল না তেমনি দেহ ছাড়াও ছিল না। আবার সে ভালোবাসা ছিল পূর্ণতায় পরিব্যপ্তি। আমি যে তাকে কেমনভাবে কতটা ভালোবাসতাম তা আমি ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না। আমি তাকে এক বিচিত্র উন্মাদনা নিয়ে ভালোবাসতাম।

আমার বক্তব্য যদি দয়া করে আপনারা শোনেন তাহলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আমি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করলাম। কিন্তু সেটাকে আমি ঠিক প্রেম আখ্যা দিতে পারব না। এক সুখাবেশে আমার সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত ইন্দ্রিয় ভরে গিয়েছিল। তার হাসি, তার গ্রীবার ভঙ্গি, তার চলার ছন্দ, তার সুললিত কণ্ঠস্বর আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। তার সম্বন্ধে সবকিছু জানার আর বোঝার জন্য আমি নিশিদিন অপেক্ষা করে থাকতাম। আর সেই প্রতীক্ষা নিয়ে আনন্দের এক স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করতাম। আমার মনে হল সে যেন আমার অনেক দিনের চেনা, আগেও যেন তার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হয়েছে। আমার আবেগের অংশ নিয়ে যেন তার আবেগ আর অনুভূতি তৈরি হয়েছে।

তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরেই তাকে আবার দেখার জন্য আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে থাকত। তার স্পর্শে আমার সমস্ত শরীর শিহরিত, কণ্টকিত হয়ে উঠত। মনে হত এত আনন্দ বোধ করি জীবনে আর কখনও পাইনি। তার ঠোঁটের কোণে যদি সামান্য হাসির ছোঁয়া দেখতে পেতাম তাহলে আমার চোখ দুটো গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মনে হত নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে, হাসতে হাসতে চারিদিকে ছুটে বেড়াই।

তারপর এক দিন তাকে আমার রক্ষিতা করে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। তাকে

কেন যে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারিনি সে-কথা আমি বলতে পারব না। তবে তাতে এমন কিছু বাধা ছিল যা দূর করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সুতরাং তাকে পাওয়ার জন্যই তাকে আমার রক্ষিতা করে নিলাম।

কিন্তু শুধুমাত্র সে আমার রক্ষিতা ছিল না, আমার জীবনের সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ হরণ করে নিয়ে সে আমার হয়ে আমার কাছে এসেছিল। সে ছিল আমার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন। তাকে ছাড়া এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ছিল আমার কাছে অতি তুচ্ছ।

আমরা প্রায়দিনই সন্ধেবেলা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতাম। পাখিদের গান শুনতাম, নদীর বুকে ঢেউ এর খেলা দেখতাম, সেগুলোকে নদীর ধারে বসে বসে গুণতাম। এমনিভাবে একদিন যখন আমরা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমরা লুকোচুরি খেললাম। কিন্তু সেই বৃষ্টি ভেজাই তার কাল হল। পর দিন তার ফুসফুস আক্রান্ত হল, সে দুটো মারাত্মকভাবে ফুলে গেল। তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারলাম না। আট দিন পরে তার মৃত্যু হল।

তার মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে আমি বিচ্ছেদ আর হতাশার তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমার সমস্ত রকম চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এই দুঃসহ আঘাত আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম।

তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য যে সমস্ত কঠোর নিয়মকানুন আমাকে পালন করতে হয়েছিল—তা আমার মনের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছিল। আমার মন, আমার সমস্ত সত্ত্বাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। কী করছি আর কী না করছি—সে সম্বন্ধে আমার কোনো চেতনাই ছিল না।

তার মৃত্যুর পর তাকে যখন সমাধিস্থ করা হল, তখন যেন অদ্ভুত এক মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম। যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল তাতে মনে হল সে আমাকে যতটা ভালোবেসেছিল, সেজন্য এমন ব্যাকুল যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠা নিয়মবিরুদ্ধ। মনে হল তার জন্য যেন আমি অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে ফেলেছি।

কোনো দিনই আমি আর তাকে দেখতে পাব না। সারাদিন ধরে তার কথাই আমি ভেবে চললাম।

যাকে আপনি আপনার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন তেমন কেউ একজন আপনার কাছে থেকে তার উষ্ম সান্নিধ্যে আপনাকে ভরিয়ে রেখেছিল। এই পৃথিবীতে আপনার চোখে তার তুল্য আর কেউ ছিল না। তার হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে সে আপনাকে সুখী করেছিল, সর্বদা আপনাকে উজ্জ্বল হাসি দিয়ে বরণ করে নিত। আপনার সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত অন্তর, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত হৃদয় আর ইন্দ্রিয় মিশিয়ে দিয়ে সে যে মিলনের আনন্দে আপনাকে পরিতৃপ্ত করেছিল তাইই আপনাদের দুজনের মধ্যে জন্ম দিয়েছিল এক অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সুগভীর প্রেমের। সে তার দুটি সুন্দর চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিত পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর,

যা কিছু মহৎ—সমস্ত কিছুতেই আর সেসব কিছু থেকে আনন্দ আহরণ করে আপনাকে উপহার দিত। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য থেকে তিল তিল করে নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার সৌন্দর্য। তা তার মুখের উজ্জ্বল মিষ্টি হাসি তার অনুপম সৌন্দর্যকে আরও সুন্দর আরও মহৎ করেছিল। সেই স্ত্রীরত্নটি আপনাকে ভালোবেসেছিল, তার ভালোবাসার গভীরতায় আপনাকে মুগ্ধ করেছিল, নিয়ে গিয়েছিল আনন্দঘন স্বর্গের পারিজাত বনে।

আর তারপর হঠাৎ এক দিন আপনার সবকিছু শূন্য করে দিয়ে সে হারিয়ে গেল, পাড়ি দিল কোনো এক অজ্ঞাত লোকে। একবার ভেবে দেখুন, সে যে শুধু আপনার সান্নিধ্য ছেড়ে চিরকালের জন্য বিদায় নিল তা নয়, সে সকলকে বিদায় জানিয়ে পাড়ি দিল কোন্ অনন্তের পথে। মৃত্যুদেবতা তাকে নিয়ে গেছে তার রহস্যময় জগতে। চিরদিনের মতো সে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে গেল। তাকে আর কখনও কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। তার কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাওয়া যাবে না—এই পৃথিবীর বুকে।

তারই মতো মুখমণ্ডল, তার মতো শরীর আর সৌন্দর্য নিয়ে দ্বিতীয় কেউ আর এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে না। সে আর সে হয়ে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। পাথরের মূর্তি বা অন্য কোনো বস্তুর প্রতিরূপ হয়তো সংরক্ষিত করা যায় কিন্তু মৃত মানুষের শরীর বা তার মুখমণ্ডল কখনই আর সেই একই রূপে দেখতে পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে, তারা তাদের নগর গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে বেড়াবে, স্নান করবে কোনো জলাশয়, পুষ্করিণী বা নদীতে, কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে বাস করে, সংসারধর্ম পালন করে আনন্দের রসদ সংগ্রহ করবে কিন্তু ঠিক তারই মতো একজন নারীকে আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। এর রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আপনি উন্মাদ হয়ে যাবেন।

বিধাতা তার আয়ুস্কাল নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন মাত্র কুড়ি বছর। সে তার মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাকে ভরিয়ে রাখত, তার দৃষ্টির স্বচ্ছতায় সে আমাকে মুগ্ধ করত, আমাকে আনন্দ দিত। কিন্তু এখন সবকিছু শূন্য। তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। একটি মক্ষিকার থেকেও আমাদের প্রাণের মূল্য এতটুকুও বেশি নয়। তাকে সমাধি দেবার পরে আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল কীভাবে তার মৃত্যুর পরেও তার সতেজ, উষ্ণ প্রাণবন্ত শরীর মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। কোথায় তার সেই মিষ্টি হাসি, তার চোখের দৃষ্টিতে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি, কোথায় তার সেই কোমল হৃদয়ের ব্যঞ্জনা, কোথায় তার সেই আত্মা, কোথায় তার ভালোবাসা।

তাকে আর তো কখনও দেখতে পাব না। এর পর সে পরিণত হবে একটি গলিত শবদেহে। এখনও হয়তো তাকে চিনে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে না।

তাই, ওই কবর থেকে তার শরীরটা বের করে আনার জন্য আমি একটা কোদাল, লণ্ঠন আর একটা হাতুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যেখানে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেই জায়গাটা আমি খুঁজে বের করলাম। প্রয়োজন মতো মাটি দিয়ে গর্তটা

ভরাট করা হয়নি। সুতরাং কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি তুলে ফেলতেই তার কফিনটা দেখতে পেলাম। এক মুহূর্ত দেরি না করে কফিনের ডালাটা খুলে ফেললাম। জঘন্য একটা পচা দুর্গন্ধ আমার নাকে এসে ঢুকল। তাতে আমি লাঞ্চে যেটুকু খাবার খেয়েছিলাম তা আমার বমির সঙ্গে উঠে এল।

সেই বিশ্রী গন্ধটা খানিকটা গাসওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি কফিনের ডালাটা খুলে লণ্ঠনটা তুলে ধরে তাকে ভালো করে দেখলাম। সমস্ত মুখটা বিবর্ণ রক্তশূন্য নীল। সমস্ত দেহটা ফুলে বিকৃত হয়ে গিয়েছে। কী বীভৎস, কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তার সেই গোলাপের মতো সুন্দর মুখখানি। মুখের ভিতর থেকে জমাট বাঁধা কালো রক্ত বেরিয়ে তার ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে।

তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই কি আমার সেই প্রেমিকা? প্রচণ্ড একটা ঘৃণা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করল, তবুও অজ্ঞাত এক গভীর আকর্ষণে দুহাতে তার চুলগুলো ধরে তার মুখটাকে আমার নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলাম... আর ঠিক সেই মুহূর্তে বেজিয়ারস কবরখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ভিনসেন্ট আমাকে থানায় ধরে নিয়ে এল।

পূর্ণ রতিক্রিয়ার পরে নরনারী যেমন গভীর সুখ আনন্দ আর তৃপ্তি নিয়ে মদির আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আমি তেমনি আমার প্রিয়ার গলিত শবদেহের গন্ধের স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে সেইভাবে ঘুমোলাম।

ধর্মাবতার, আপুনি আমার সমস্ত কথা শুনলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমার আর কিছুই বলার নেই। এখন আপনি আমার প্রাপ্য শাস্তি আমাকে দিন।

আদালতকক্ষে অদ্ভুত এক নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করতে লাগল। সেখানে একটি ছুঁচ পড়লেও সে শব্দ আলাদাভাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। জনতা বিচারকের শেষ সিদ্ধান্ত শোনার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল। জুরির সদস্যবৃন্দ এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আদালতকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আলোচনা শেষ করে তাঁরা যখন ফিরে এসে নিজের নিজের আসনে বসলেন তখন আসামির দৃষ্টিতে নির্বিকার উদাসীনতা। তার মধ্যে লেশমাত্র ভয় লক্ষ করা গেল না। চিন্তাশূন্য মুখে উদাস দু'চোখ মেলে সে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। চিরকালের প্রথা মেনে বিচারক তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন।

বিচারকের রায় শোনার পরেও সে একইরকমভাবে নির্বিকার উদাসীন হয়ে বসে রইল। কিন্তু জনতা তার গভীর ভালোবাসার মর্যাদা দিতে তাকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।

কোকো
Coco

এ অঞ্চলের মানুষ লুকাসের জোতের জমির একটি বিশেষ নাম দিয়েছে আর সেটা হল জেতারি। নামের রহস্যটা অবশ্য সকলের কাছে অজানা। তবুও স্থানীয় চাষিরা জেতারি নামের যে অর্থ করেছে তা হল লুকাসের খামারবাড়ির বিশাল বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি। সত্যি বলতে সমস্ত জেলার মধ্যে লুকাসের জোতের জমির মতো এত বড় জমি আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া দেখাশোনা ও পরিচালনার গুণেই এই জমির এমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

বিশাল খামারের চারিদিক ঘিরে সারি দিয়ে বেড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট গাছ। সেগুলোর বেষ্টনীর আশ্রয়ে পরম নির্ভরতায় লালিত হচ্ছে ছোটো ছোটো মনোলোভা আপেল গাছ। ঝড়ে সেগুলোর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ওই বিরাট বিরাট গাছগুলোই তাদের ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা করে। খামারের শেষ প্রান্ত থেকেও লাল টালির ছাদ দেওয়া একটা লম্বা ঘর দেখতে পাওয়া যায়। ওই ঘরটা পাকা ফসল আর খড়-বিচালি রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। গোয়ালঘরগুলোতে অলস অবসরে গোরুগুলো বসে বসে জাবর কাটে। আস্তাবলে ডাঁশ-মাছির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ঘোড়াগুলো পা ছোঁড়ে, লেজ নাচায়। গোয়ালঘর আর আস্তাবল পার হয়ে খামারের মধ্য দিয়ে যে পায়ে চলা সরু রাস্তাটা চলে গেছে তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে লাল ইঁটের তৈরি ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ি আর সেটাই আবাসিক খামারকর্মীদের বিশ্রামগৃহ। সমস্ত গোবর এক জায়গায় জমা করে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। শিকারি কুকুরগুলো শিকার ধরার জন্য খামারের চারিদিকে ইতস্তত ছুটে বেড়ায়। মোরগ মুরগিগুলো খামারের পাশের উঁচু ঘাসের জঙ্গলে কেঁচো, গুবরে পোকা খুঁটে খুঁটে খায়।

লাল ইঁটের বাড়ির রান্নাঘরের লম্বা টেবিলের সামনে বসে খাওয়াদাওয়া করে জন পনেরো মানুষ। খামারবাড়ির মালিক, তাঁর আত্মীয়পরিজন, কয়েকজন কর্মচারী আর পরিচারক পরিচারিকা।

খামারের ঘোড়া, গোরু, শূকর আর ভেড়াগুলো যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট নধর। সযত্ন তত্ত্বাবধানে তারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর আর সতেজ। দীর্ঘদেহী লুকাস তার বিরাট জালার মতো পেট নিয়ে খামারবাড়ির চার দিকটা দিনের মধ্যে তিনবার ঘুরে ঘুরে দেখে। সমস্ত কিছু তদারক করে আর সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আপদবিপদের খবরাখবর নেয়। তাদের জন্য যেন তার ভাবনাচিন্তার অন্ত নেই।

আস্তাবলের বাইরে যে ছোটো একফালি ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে প্রতিদিন একটি বুড়ো ঘোড়াকে বেঁধে রাখা হয়। লুকাসের বউএর বুড়ো ঘোড়াটার ওপর খুব

দয়া। তার কড়া হুকুম, যতদিন ও বেঁচে থাকবে ততদিন ওর যত্নআত্তির যেন কোনো ত্রুটি না হয়। এই খামারের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তার নিঃস্বার্থ শ্রম জড়িয়ে আছে। সে এখানকার অতীত দিনের অনেক স্মৃতির সাক্ষী।

ওই অকেজো বুড়ো ঘোড়াটার দেখাশোনা বা যত্নআত্তি করার জন্য বছর পনেরোর একটা ছেলেকে রাখা হয়েছে। নাম তার ইসিডোর দ্যুঁভাল—লোকে তার একটা সংক্ষিপ্ত নাম দিয়েছে, জিডোর। আর সেই নামেই সকলে তাকে ডাকতে অভ্যস্ত। শীতকালে বুড়ো ঘোড়াটার জই, খড়-বিচালি ইত্যাদি খাবার বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে আর সেগুলোই জিডোর তাকে খেতে দেয় আর গ্রীষ্মকালে দিনের মধ্যে চারবার চারটে আলাদা জায়গায় নিয়ে যায় কচি ঘাস খাওয়ানোর জন্য।

বয়সের ভারে বুড়ো ঘোড়াটা চলার ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। কোনোরকমে অতি কষ্টে পা টেনে টেনে চলে। লোমশ চোখের পাতায় যে তার দুটো চোখ ঢাকা পড়ে আছে—সে চোখের দৃষ্টি অতি করুণ, অতি বিষণ্ণ।

সারাশরীরে তার জড়িয়ে থাকে সীমাহীন ক্লান্তি, চলার গতি অত্যন্ত মন্থর। সে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে না, হাঁটতে গেলে তার খুব কষ্ট হয়। সেজন্য ঘাসের জমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় জিডোর ওর দড়ি ধরে সজোরে টানতে থাকে। তবুও চলতে গিয়ে তার সমস্ত শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙে আসে। তাই তাকে থেমে যেতে হয়। বৃদ্ধ ঘোড়াটার করুণ অবস্থা দেখে জিডোরের দয়া হওয়া তো দূরের কথা, ওর মাথায় যেন খুন চড়ে যায়—হরদম খোঁচাতে থাকে ঘোড়াটাকে তার লাঠিগাছাটা দিয়ে। ও যেন জিডোরের চিরকালের শত্রু।

খামারের অন্যান্য কর্মচারীরা ঘোড়াটার ওপর জিডোরের এমন অদ্ভুত রাগ আর তার আচার-আচরণ দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। সুযোগ পেলেই তারা জিডোরকে খেপিয়ে মজা দেখার জন্য ওর কানের কাছে গিয়ে বুড়ো ঘোড়াটার কথা বলে আর ঘোড়াটার কথা শুনে জিডোর খেপে লাল হয়ে যায়। জিডোরের বন্ধুরাও ওকে ছেড়ে কথা বলে না। ঠাট্টাতামাশা করে তারা ওকে খেপিয়ে তোলে। এই অঞ্চলে এখন সবাই তাকে কোকো-জিডোর বলে ডাকে।

জিডোরের ক্ষোভ দুঃখের সীমা নেই। তাতে তার মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়ে আছে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে মনের মধ্যে। তার চেহারাটা রোগা পাকানো, হাত পা লিকলিকে সরু, সমস্ত শরীরে কয়েক পলেস্তরা ময়লা, ধুলো মাটি আর ঘামে কালো হয়ে আছে সমস্ত শরীরটা। তার মাথার এলোমেলো চুলগুলো একটা লাল ফেট্টি দিয়ে বাঁধা। কথাবার্তায় বোকামি ধরা পড়ে আর তোতলায় হরদম কথা বলার সময়। অসম্ভব খাটুনির জন্য মাথার ঘিলুর পরিমাণ অনেকটাই কমে এসেছে। সর্বদাই খিচড়ে আছে তার মেজাজ।

বুড়ো ঘোড়া কোকোকে এখনও যে কেন আরাম বিরামে রাখা হয়েছে তা সে ভেবেই পায় না। কত খাবারই না নষ্ট হচ্ছে ওই বুড়ো ঘোড়াটার জন্য। ওর ধারণা, যেদিন থেকে ওর কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, সেদিন থেকে ও বেঁচে থাকার

অধিকার হারিয়েছে অথচ [illegible] ন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে বেশি দামের জই, খড়-বিচালি, ভুট্টা, ছোলা আর কচি কচি সবুজ নরম ঘাস।

জিডোর প্রতিহিংসার আগুনে এমনভাবে জ্বলেপুড়ে মরছে যে মালিকের হুকুম সে অমান্য করার সাহস পায়। অবলা জীবটাকে পেট ভরে খেতে দেয় না। যে খাবার তার জন্য বরাদ্দ করা আছে তার সামান্যই তাকে খেতে দেয়। অনেক সময় আবার না-খাইয়েও রাখে। বুড়ো ঘোড়াটার ওপর তার যেন বিজাতীয় ক্রোধ। দিনে দিনে সে যেন ভয়ংকর হিংস্র হয়ে উঠছে ওই মূক প্রাণীটার ওপরে।

শীত শেষ হয়ে আসে গ্রীষ্ম। এই গ্রীষ্মকালে এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে জিডোরকে দৌড়িয়ে বেড়াতে হয় কচি ঘাসের সন্ধানে বুড়ো ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে।

যেতে যেতে কোনো জঙ্গল থেকে একটা মোটাসোটা গাছের ডাল ভেঙে নেয় জিডোর। তারপর নূতন কোনো ঘাসের জমিতে কোকো যখন সবে দু-চার গাছা কচি ঘাস খেতে শুরু করেছে সেই সময় সে লাঠি হাতে তার দিকে ছুটে যায় আর পশুটাকে ওই মোটা লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে থাকে।

পশুটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে পালাবার কিন্তু সে দড়ি ছেঁড়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে শুধু দড়ি বাঁধা অবস্থায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। পৈশাচিক উল্লাসে জিডোর মত্ত হয়ে ওঠে। তার পিছনে পিছনে সেও ছুটতে থাকে চরকির মতো আর মোটা লাঠিটা দিয়ে ঘোড়াটার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে তোলে আর তার দ্বারা সে যেন তার উৎকট প্রতিহিংসার সামান্য জ্বালা জুড়োবার চেষ্টা করে।

লাঠিপেটা করতে করতে এক সময় জিডোর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাতের লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে সে জায়গা থেকে চলে যেতে থাকে জিডোর। তার অপস্রিয়মাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে বুড়ো ঘোড়াটা অপেক্ষা করতে থাকে। যতক্ষণ না সে তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় ততক্ষণ ঘাসে মুখ দিতে সাহস পায় না সে।

গ্রীষ্মকালের রাতগুলোতে বুড়ো ঘোড়াটাকে আস্তাবলের অন্যান্য ঘোড়াদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়। উপত্যকার শেষে যে জঙ্গল আছে সেখানে জিডোর তাকে নিয়ে যায়। সেখানেও জিডোর নিরীহ জীবটির প্রতি হিংস্র হয়ে ওঠে। ওকে লক্ষ করে বড় বড় পাথর ছোঁড়ে। কোকোর কিছুর করার থাকে না, সব অত্যাচার চুপ করে সহ্য করে। শত্রুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে আর ভগবানের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করে ওর চলে যাওয়ার জন্য। ভগবান তার প্রার্থনায় সাড়া দেন। জিডোর ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে যায় আর সে প্রাণভরে কচি ঘাস খায়। তার যে বড়ো খিদে আর খিদের যন্ত্রণা যে বড়ো যন্ত্রণা।

ছেলেটা শুধু নিজেকেই প্রশ্ন করে আর সেই প্রশ্ন সর্বদা তার মনে কাঁটার মতো বিঁধছে। এই অকর্মণ্য অকেজো ঘোড়াটাকে কেন দিনের পর দিন এইভাবে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে। সেই খাদ্য খেয়ে অন্য কেউ তো বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করতে পারত। অপাত্রে দান করে খাদ্যের এমন অপচয় করা কি উচিত? জিডোর

নিজেই তো উদয়াস্ত পরিশ্রম করে চলেছে তার খিদের অন্ন জোগাবার জন্য।

এই ধরনের চিন্তা থেকে তার মনে জন্ম নিল হিংস্র ক্রোধ। এর পর থেকে জিডোর কোকোকে নিয়ে নূতন নূতন ঘাসের জমিতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। যে সমস্ত জমির ঘাস শুকিয়ে মরে তামাটে হয়ে গেছে, বেছে বেছে সেই সমস্ত জমিতে নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। সেই সমস্ত শুকনো ঘাস কোকো খেতে পারে না খিদেয় মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হলেও।

এইভাবে না খেয়ে খেয়ে কোকোর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়তে থাকে। বুকের হাড়গুলো গোনা যায়, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে ওঠে। এক সময় সে মরিয়া হয়ে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করে কিন্তু শরীরের শক্তিতে কুলোয় না। মাত্র কয়েক হাত দূরে মখমলের মতো নরম সবুজ ঘাসের গালিচা। বাতাসের স্পর্শ পেয়ে সেগুলো মাঝে মাঝে নেচে ওঠে। সে ওই ঘাসগুলোকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে নানাভাবে। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। সে শেষ পর্যন্ত সীমাহীন ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ে তার সীমিত পরিধির মধ্যে। খিদের জ্বালায় আবার সে উঠে দাঁড়ায়—উন্মাদের মতো চেষ্টা করে দড়ি ছিঁড়ে এগিয়ে যাবার, একটু দূরেই নরম কচি ঘাসে সবুজের উৎসব। সেগুলো দেখে লোভে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে সেগুলোকে নিজের নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য। কিন্তু তার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য অপূর্ণই থেকে যায়।

সমস্ত দিন ধরে অসহায় পশুটা সংগ্রাম করে চলে তার খিদের জ্বালা মেটাবার জন্য। কয়েক হাত দূরে অঢেল খাদ্য তার জন্য জমা হয়ে আছে প্রকৃতির বুকে অথচ তার ধারেকাছে পৌঁছোনো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। খিদের জ্বালা তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করতে করতে তার জীবনীশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে।

সেদিন আর ছেলেটির দেখা পাওয়া গেল না। পাখির বাসা ভেঙে, এর ওর সঙ্গে গল্প করে গান গেয়ে সারাটা দিন সে কাটিয়ে দিল। তার পরের দিন সে এসে হাজির হল। কোকো তখন শুয়েছিল। তার প্রাণশক্তি তখন শেষ হয়ে আসছে। গভীর ক্লান্তি আর অবসাদে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। নিঃশ্বাস নেবার জন্য সে হাঁপিয়ে উঠছিল। জিডোরকে আসতে দেখে নূতন আশায় সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে সে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়ায়। তার একমাত্র আশা এবার বোধহয় জিডোর তাকে কচি ঘাসের কাছে নিয়ে যাবে।

কিন্তু পাষণ্ড জিডোর দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তার সাদা শরীরে ঢিল ছুঁড়ে মারতে লাগল। তারপর গান গাইতে গাইতে চলে যায়।

জিডোরের চলে যাওয়ার দিকে গভীর করুণ ও বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, বুঝতে পারে এ জীবনে কচিঘাস খাওয়ার সাধ তার আর মিটবে না। সে চরম অবসাদে আবার শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে।

পর দিন জিডোর একবারও এল না। তার পর দিন যখন এল, দেখল বুড়ো ঘোড়াটা মাটিতে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখল তার শরীরে প্রাণ নেই।

সে কিছুক্ষণ নিস্পন্দ শরীরটার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তার চোখে মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। কিছুটা অবাকও হয়—একটু তাড়াতাড়ি যেন বুড়োটা মারা গেল। সে এগিয়ে এসে নিজের পা দিয়ে ঘোড়াটার পা-টা একবার তুলে দেখল। কিছুক্ষণ চুপচাপ মৃত শরীরটার পাশে বসে রইল। অদূরে বাতাসের ছোঁয়ায় কচি নরম ঘাসগুলো কাঁপতে থাকে। সেদিকে সে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

খামারে ফিরে এসে সে সঙ্গে সঙ্গে কোকোর মৃত্যুসংবাদ জানাল না কাউকে। বাকি কাজগুলো সে বেশ মনোযোগ দিয়ে করে ফেলল। পর দিন সেখানে গিয়ে দেখল মৃত শরীরটা ঘিরে কাকেদের মহোৎসব শুরু হয়ে গেছে আর তার পচনশীল দেহের চারিপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মাছি।

এর পর জিডোর ফিরে এসে সকলের কাছে কোকোর মৃত্যুসংবাদ জানাল। ঘোড়াটা এত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল যে তার মৃত্যুতে কেউ শোকপ্রকাশ করল না, অবাকও হল না কেউ।

লুকাস তাঁর দুজন কর্মচারীকে ডেকে বললেন, শোনো, ঘোড়াটার যেখানে মৃত্যু হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটাতে ওকে কবর দেবে।

এর পর বুড়ো কোকো ঠিক যেখানে খিদের জ্বালা সহ্য করতে করতে মারা গেছে— সেখানেই তার জন্য কবর খোঁড়া হল। যথাসময়ে কোকোর শরীর থেকে ওই জমিতে যে চমৎকার সার তৈরি হল তাতে সেখানে গজিয়ে উঠতে লাগল পর্যাপ্ত পরিমাণে নরম সবুজ ঘাস।

ম্যাদময়জেল
Madmoiselle

তার প্রকৃত নাম ছিল জ্যাঁ মেরি ম্যথিউ ভ্যালট কিন্তু লোকে তাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকত। তার মা তার জন্য যে অর্থের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তাতে তার বেশ আরামেই দিন কাটত। অভিভাবকটি নিয়মিত সেই অর্থ তাকে দিতে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতেন না। সুতরাং তাকে লোকে করুণা করার পরিবর্তে রীতিমতো হিংসা করত। তার চেহারার মধ্যে ছিল নারীসুলভ কমনীয়তা। মেয়েদের মতো তার পাতলা ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে থাকত আর সেই ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত মিষ্টি হাসির ছোঁয়া। সে মেয়েদের পোশাক পরতে ভালোবাসত এবং সেজন্য তাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকলেও সে বিন্দুমাত্র আপত্তি করত না।

ছেলেবেলায় তার চেহারাটা রোগা, ফরসা আর নারীসুলভ ছিল বলেই তার মা তাকে আদর করে ম্যাদময়জেল বলে ডাকতেন। কিন্তু তার ঠাকুমা তাকে ঠাট্টা করেই ওই নামে ডাকতেন।

যখন তার মা আর ঠাকুমা মারা যান তখন তার বাবার ভাই অর্থাৎ কাকার কাছে বেশ সুখেই বাস করছিল সে। ভদ্রলোক বিয়ে করেননি বলে তাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন এবং তার প্রতি কর্তব্যপালনের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়নি। এই ভদ্রলোকও তাকে ম্যাদময়জেল নামে ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সমস্ত গ্রামের লোক তাকে ওই নামেই ডাকত। তাকে ইচ্ছে করে বিদ্রুপ বা আঘাত করার জন্য যে তারা তাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকত তা নয়, তবে তারা ভাবত ওই নামে ডাকলে সে অনেক বেশি খুশি হবে আর সত্যি বলতে সেজন্য সে কারও ওপর রাগ করত না।

সাধারণত ফ্রক ও টুপি পরত সে। পাড়ার ছেলেরা ভাবত তাকে ওই নামে ডাকলে সে মনে কিছু করবে না। সুতরাং তাকে ম্যাদময়জেল নামে ডাকা তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে যদি কখনও ছেলেদের পোশাক পরে বাইরে বেরোত তখন তারা তাকে ঠাট্টাবিদ্রুপে অস্থির করে তুলত।

ম্যাদময়জেল কিন্তু তার পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল। কারণ তার নামের মতো তার কাছে পোশাকও ছিল বিশেষ প্রিয়। সে মেয়েদের পোশাক পরে আনন্দ পেত এবং সে ব্যাপারে কে কী বলল তা নিয়ে তার মোটেই মাথাব্যথা ছিল না। আর কৌতুকের কারণ যেটা ছিল সেটা হল সে জানত যে সে মেয়ে নয় এবং সে মেয়েদের ছদ্মবেশেই বাস করছে।

তার ভাবভঙ্গি ও আচার-আচরণে নারীসুলভ ব্যাপারগুলো এত বেশিরকম প্রকাশ পেত যে সেটা অনেক সময় স্বাভাবিক মনে হত না। তার মাথার টুপিটা সুন্দর সুন্দর

রঙিন ফিতে দিয়ে সাজানো থাকত। সে যে ঘাগরা পরত তার নীচের দিকটা মোড়া থাকত সুন্দর কারুকাজ করা ঝালরে। সে তার ঘাগরার মধ্যে এমন একটি জিনিস ব্যবহার করত যাতে সেটা অনেকটাই ফুলে থাকত। সে যখন আস্তে আস্তে হেঁটে যেত তার নিতম্বদেশ তার হাঁটার ছন্দে নাচতে থাকত।

তাকে এই অবস্থায় দেখে কেউ যদি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয়ে উঠত তাহলে তাকে বলতে হত, ওহ্, ম্যাদময়জেল, মেয়েদের পোশাকে তোমাকে কী সুন্দর মানিয়েছে।

এক সময় সে খুব খুশি হয়ে বলত, তুমি ঠিকই বলেছ, তবে লোকে ভাবে আমি মজা করার জন্য এ সমস্ত করি। এসব সত্ত্বেও গাঁয়ের কোনো উৎসবে ছেলেমেয়ে যখন একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচত তখন তাদের অনেকেই তাকে ম্যাদময়জেলের ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে নাচার জন্য অনুরোধ করত। কিন্তু সে একাই নাচত আর কখনও তার সঙ্গে নাচার জন্য অন্য কোনো মেয়েকে অনুরোধ করত না।

এক দিন সন্ধ্যায়, কেউ একজন তার কাছে জানতে চেয়েছিল মেয়েদের সঙ্গে তার না নাচার কারণ কী?

"আমার গায়ে ছেলেদের পোশাক থাকে না বলে আমি মেয়েদের নাচতে বলি না। আপনি কিন্তু ভীষণ বোকা। দেখতে পাচ্ছেন না—আমি মেয়েদের পোশাক পরে আছি?" যিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ। সেইভাবেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "ম্যাদময়জেল, তাহলে তুমি ছেলেদের মতো পোশাক পরতে পার।

"কিন্তু আমি যদি ছেলেদের মতো পোশাক পরি তাহলে কেউ আমাকে মেয়ে মনে করবে না" তার চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততা। কথাগুলো বলেই সে তার কাঁধ দুটো ঝাঁকাল।

কিন্তু ভদ্রলোকের কথাগুলো তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। কয়েক দিন পরে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতেই সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমি যদি ছেলেদের মতো পোশাক পরি তবুও কি আপনি আমাকে ম্যাদময়জেল বলে ডাকবেন?"

"নিশ্চয়ই, তোমাকে সবসময়ই ওই নামেই ডাকব।" ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মনে হল ভদ্রলোকের উত্তরে সে বেশ খুশি হয়েছে। কারণ তিনি তার পোশাক সম্বন্ধে যত না উৎসাহী তার ওই নামের ব্যাপারে তার থেকে অনেক বেশি উৎসাহী।

পরের দিন সে পুরুষের পোশাক পরে গ্রামের রাস্তায় বেরোল। তার পরনে ট্রাউজার, কোট আর মাথায় টুপি। এগুলো সে তার অভিভাবকের পোশাকের আলমারি থেকে বার করে নিয়েছিল। তাকে পুরুষের পোশাকে বেরোতে দেখে প্রতিবেশীদের মধ্যে ব্যাপক হইচই শুরু হয়ে গেল। কারণ এতদিন সকলে যাকে মেয়েদের পোশাকে দেখে আসছে, তাকে হঠাৎ পুরুষের পোশাক পরতে দেখে ভিতরে ভিতরে ভীষণ অবাক হয়ে গেল এমনকি খানিকটা ভয়ও পেল কিন্তু তারা সেটা হাসিঠাট্টায় প্রকাশ করল এবং ব্যঙ্গবিদ্রুপে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। কিছু লোকের অনিচ্ছাকৃত বিরোধিতা, অন্যান্যদের যথেচ্ছ ব্যঙ্গবিদ্রুপ এবং সকলের চূড়ান্তভাবে

অবাক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তার কাছে এত বেশি স্পর্শকাতর হয়ে উঠল, সে ঠিক করল ওদের দিকে সে ফিরেও তাকাবে না বা ওদের কথায় রেগে যাবে না বা বিরক্ত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা সব থেকে খারাপ হয়ে দাঁড়াল যেদিন রাস্তার একটা চ্যাংড়া ছেলে তার চারপাশে নেচে নেচে বিদ্রুপ করে বলতে লাগল, ওহ্, ওহ্, ম্যাদময়জেল আজ ট্রাউজার পরেছে, পুরুষের পোশাকে সেজেছে, হা-হা-হা।

ব্যাপারটা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করল যেদিন একদল ভ্যাগাবন্ড প্যাঁচার মতো স্বরে কুৎসিতভাবে ব্যঙ্গ করতে করতে তার পিছু নিল। যেমন ভ্রাম্যমাণ মেলাগুলোতে মুখোশ পরা লোকদের দেখে ছোকরার দল তার পিছু নেয়।

তবে এ বিষয়ে আদৌ কোনো সন্দেহ ছিল না যে হতভাগ্য প্রাণীটিকে মেয়েদের ছদ্মবেশে আগের থেকে অনেক বেশি নারীসুলভ মনে হত। মেয়েদের মতো জীবনযাপন করতে এবং মেয়েদের আচারআচরণে সে এত বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে তাকে দেখলে আদৌ কোনো পুরুষ বলে মনে হত না।

সে যে পুরোনো ফ্যাশনের কোট পরে ছিল তাতে নিটোল সুপুষ্ট কাঁধ আর বুকের বিশেষ বিশেষ অংশ এবং ঢিলে ট্রাউজারে তার স্ফীত পশ্চাৎদেশ আরও স্ফীত হয়ে উঠছিল। তার এধরনের অনভ্যস্ত পুরুষের পোশাকে তাকে ভীষণভাবে বেমানান মনে হত। মেয়েদের মতো তার মাথা নাড়ানোর বা হাঁটার ভঙ্গি বা তার হাত দোলানোর ভঙ্গির সঙ্গে তার পুরুষের পোশাক অত্যন্ত বিসদৃশ হয়ে উঠেছিল।

শিশু থেকে বৃদ্ধ—সমস্ত মেয়েপুরুষ তাকে এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে বিদ্ধ করতে শুরু করল যে সে লজ্জা সংকোচ ভয়ে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোতে বাধ্য হল। ঘরে গিয়ে সে তার মাথাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল—সে বুঝতে পারল না কেন তারা তার ওপর তারা এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল না সে তাদের কী ক্ষতি করেছে এবং পুরুষের পোশাক পরে সে তাদের কীভাবেই বা আঘাত করেছে? সে সত্যিই তো একজন পুরুষ। জীবনে সে এই প্রথম তার এই ম্যাদময়জেল নামের জন্য ভয় পেল।

পর দিন সে মেয়েদের পোশাক পরে বাইরে বেরোল। সে এমনভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল যেন আগের দিন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু সেখানকার কিছু লোক বিশেষ করে রাস্তার ছেলেগুলো সে ঘটনার কথা ভোলেনি। তারা আড়চোখে তাকে দেখতে লাগল। তাদের মধ্যে সব থেকে ভালো ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল আর অশ্লীলভাষী কয়েকজন লোক তার পিছু নিয়ে বলল, ওহ্, ম্যাদময়জেল, গতকাল তো তোমার পরনে ট্রাউজার ছিল আজ সেটা কোথায় রেখে এলে?

সে এমন ভাব করতে লাগল যেন তাদের কথা তার কানেই যায়নি। সে মেয়েদের পোশাক পরে মেয়েদের মতো হাসতে হাসতে আর কোমর দোলাতে দোলাতে খুশি মনে হেঁটে চলল।

অনেক দিন এইভাবে কেটে গেল। সকলে তার পুরুষের পোশাক পরার কথা ভুলে গেল। কিন্তু তার মনটা ভয়ংকর ভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে স্থির করল সে যে

একজন পুরুষ একথাটা সকলের সামনে একদিন সে প্রমাণ করবে এবং তাতে সে সফল হবেই হবে। তার জন্য সে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায়ই তাদের গ্রামে নাচ গানের আসর বসলে তার সমবয়সি ছেলেদের গর্ব করে বলতে শুনত তারা কোন্ কোন্ সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে নেচেছে এবং কাকে কাকে তাদের শয্যাসঙ্গিনী করেছে আর যারা এই সমস্ত কাজে পটু, মেয়েরা তাদের প্রশংসা করে। প্রায়ই সে লক্ষ করত নাচের শেষে ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় দুহাতে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচের আসর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো তার চোখে পড়ত এবং তাদের অশ্লীল আলোচনাও তার কানে আসতে মোটেই দেরি হত না।

নাচের শেষে ছেলে মেয়ে জোড়ায় জোড়ায় বাইরে বেরিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে নিজেদের বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকারের মধ্যে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হত। এসমস্ত ঘটনাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

এক দিন রাত্রে নাচ শেষ হয়ে গেলে প্রেমিক প্রেমিকা যথারীতি পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে যখন নাচের আসর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন জঙ্গলের মধ্য থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদের শব্দ সকলের কানে এল। বলে রাখা দরকার ওই জঙ্গলের পথ দিয়ে অনেককে পাশের গ্রামে ফিরে যেতে হত। এই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছিল সুন্দরী জোসেফাইনের। তার আর্তনাদ কানে এসে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাকে রক্ষা করার জন্য তার কাছে ছুটে গেল। ম্যাদময়জেল তখন তার গলাটা টিপে ধরেছে।

নির্বোধ ছেলেটি আগেই জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। যখন সে জোসেফাইনকে আসতে দেখল তখন তার শরীরটাকে উপভোগ করার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেমন যুবকরা সুযোগ পেলেই যুবতীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু জোসেফাইন তাকে ভয়ংকরভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করলে সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরে আর তাতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে, তার মনে হয় এক্ষুণি বোধ হয় তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

জোসেফাইনকে তার কবল থেকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে তারা তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন তার ঠোঁটের দুপাশ ফেনিয়ে উঠেছে এবং মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ছে। সে চিৎকার করে বলল, আমি আর মেয়ে নই, আমি একজন পুরুষ। একথা আমি তোমাদের সব্বাইকে বলে দিচ্ছি।

গহ্বর
The Hole

আততায়ীর প্রচণ্ড ঘুসি আর আঘাত মৃত্যুর কারণ হিসাবে মনে করা হচ্ছে।

মাস্টার লিওপোল্ড রেনার্ড আদালতে আসবাবপত্রের জোগানদার। তারই বিরুদ্ধে এই খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

সমন পেয়ে রেনার্ড আদালতে এসে উপস্থিত হয়েছে। ঘটনার প্রধান সাক্ষী ছিল তিনজন। কাঠ-ব্যবসায়ী লুইস লেডুর, নিহতের বিধবা স্ত্রী লেডি ফ্রেমেস আর লোহার মিস্ত্রি জাঁডুরডেন্ট। তারাও যথাসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষের পাশে কালো পোশাক পরে বসে আছে তার স্ত্রী। চেহারাটা এত কুৎসিত তাকে দেখলে মেয়েমানুষের পোশাকে একটা বানরী বলে মনে হয়।

আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মূল অভিযুক্ত রেনার্ড ঘটনাটা আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করতে লাগল,

"মহামান্য আদালতের কাছে আমি স্বীকার করছি আমার হাতেই লোকটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয় এবং তার জন্য আমি দোষী সাব্যস্ত হলেও এতে আমার বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই।

"ধর্মাবতার, সম্পূর্ণ ঘটনাটা আপনার কাছে পেশ করছি। তা শুনে আপনি বিচার করুন আমি দোষী কি নির্দোষ। আমি মোটামুটিভাবে আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার সামনে তুলে ধরছি। আমি, আমি মানুষ হিসাবে অত্যন্ত সৎ ও পরিশ্রমী। দীর্ঘ ষোলো বছর যাবৎ আসবাবপত্রের ব্যবসার সঙ্গে আমি যুক্ত। আমি নিজে যেমন উলটোপালটা কাজ করা পছন্দ করি না, অন্যরাও সেসব করুক সেটাও আমি চাই না। আমার সুন্দর আচার-আচরণ এবং সৎ চরিত্রের জন্য সকলে আমাকে যেমন ভালোবাসে তেমনি শ্রদ্ধা সম্মানও করে। আমি মিতব্যয়ী এবং কোনোকিছুর অপচয় আমি পছন্দ করি না। নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতে ভালোবাসি আর সেটাই আমাকে এনে দেয় শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য। ধর্মাবতার, আপনি ভাবতে পারেন এইসব সুন্দর অভ্যাসগুলোই হল আমার কাল আর তাইই হল আমার সর্বনাশ আর দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। আমি জানি, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সুতরাং আমি নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাইনি। আমি নিজের কাছে আমার সম্মান ও মর্যাদাকে আমি বজায় রাখতে পেরেছি।

"আমি ও আমার স্ত্রী মিলি রবিবারের ছুটির দিনগুলো কাটাবার জন্যে পঁয়েজিতে চলে যাই। গত পাঁচ বছর যাবৎ এটা আমরা করে আসছি। সুতরাং এটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পঁয়েজির নৈসর্গিক পরিবেশ অসাধারণ সুন্দর। সর্বদা সেখানে বয়ে চলেছে সুশীতল স্নিগ্ধ বাতাস। ওখানে যে নদী আছে তাতে প্রচুর মাছ

আর নদীর তীরে বসে ছিপ দিয়ে আমরা মাছ ধরি। এই মাছ ধরার নেশা আমাদের পাগল করে দেয়। মিলিই এ ব্যাপারে আমাকে প্রথমে উৎসাহিত করে। অবশ্য সে আমার থেকে অনেক বেশি উৎসাহী ও তৎপর। মিলির জন্যই আজ আমাকে আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে আর একটা নির্বোধ জানোয়ারের মতো আমাকে ওর দাসত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরুন, আমি সমস্ত কিছু খুলে বলছি।

"আমি বলিষ্ঠ চেহারার একজন ভদ্রলোক। আমার রুচি মার্জিত। আমি দুষ্ট প্রকৃতির লোক নই। শয়তানি নামের কোনো শব্দ আমার অভিধানে লেখা নেই। কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার চেহারা বা চরিত্রের কোনো মিল নেই। তার নরম শীর্ণ চেহারার মধ্যে লুকিয়ে আছে খাটাশের মতো ভয়ংকর একটা জন্তু। অবশ্য, আমি যদি বলি ওর কোনো গুণ নেই তাহলে মিথ্যে কি বলা হবে। আর ওর সেই সমস্ত গুণ আমার ব্যাবসার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু সমস্ত সর্বনাশের মূলে আছে ওর রুক্ষ মেজাজ। বাদিপক্ষের লোকদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা আমার কি একবাক্যে সমর্থন করবে। আমার যে সমস্ত চারিত্রিক গুণের কথা আপনাকে আগেই জানিয়েছি—সে সমস্ত গুণ তার কাছে অসহ্য। আমার গুণাগুণ নিয়ে সে প্রায়ই অভিযোগ করে এবং রাগ ফলায়। সে বলে আমার এধরনের গুণ বা স্বভাব সে নাকি মোটেই সহ্য করতে পারে না।

"হুজুর, আমি যদি আমার স্ত্রীর বশংবদ হয়ে তার অন্যায় আদেশ পালন করতাম তাহলে প্রতিমাসে অন্তত তিনবার করে লোকের সঙ্গে মারপিট করে বেড়াতে হত।"

মিসেস রেনার্ড তার স্বামীর বক্তব্যে আপত্তি জানিয়ে বলল, তোমার যা খুশি বলে যাও। কিন্তু মনে রেখো একহাতে কখনও তালি বাজে না, তবে জেনো, যার শেষ ভালো তার সব ভালো।

রেনার্ড তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ক্রোধের স্বরে বলল, অবশ্যই। আমি তোমার ঘাড়ে দোষ পড়তে দিইনি বলে খোশমেজাজে বসে আছ। নাহলে আমার জায়গায় তোমাকে এই কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হত।

এর পর সে আবার বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, "আমার যা বলার আছে তা আমি বলবই, আমাকে বলতেই হবে। শনিবার রাত হলেই আমার মনটা পঁয়েজিতে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠত। সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে আমরা চলে যেতাম পঁয়েজিতে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—যাতে আমরা পরের দিন খুব সকাল সকাল মাছ ধরতে বসে যেতে পারি। অভ্যাসই মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব। আর এই প্রবাদবাক্যটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল।

"পঁয়েজিতে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াবার সময় মাছ ধরার জন্য উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজে বের করেছিলাম। সত্যি মাছ ধরার জন্য জায়গাটা একেবারে খাসা।

"হুজুর, যদি কখনও আপনার অতিরিক্ত কাজের চাপের মধ্যে একটু সময় করে নিতে পারেন, তাহলে ওই জায়গাটা একবার দেখে আসার জন্য আপনাকে অনুরোধ

করব। জায়গাটা সুন্দর ছায়ায় ঘেরা, সেখানে জলের গভীরতা কম করে আট ফুট, দশ ফুটও হতে পারে। নদীর ধার ঘেঁষে গভীর একটা গর্ত। সেখানেই অজস্র মাছ ঝাঁক বেঁধে এসে খেলা করে। ওই জায়গাটা মৎস্যশিকারিদের কাছে যেন স্বর্গ।

"হুজুর, ওই গর্তটা আবিষ্কার করে আমি নিজেকে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সঙ্গে তুলনা করি। এই অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ সে-কথা জানে এবং ওইখানে গিয়ে মাছ ধরার একমাত্র অধিকারী যে আমি সে-কথা সকলে স্বীকার করে নিয়েছে আর তারা সে ব্যাপারে যে কথা বলে তাতেই তাদের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তারা বলে, ওই জায়গাটা একমাত্র রেনার্ডের।

"আমার এই অধিকার নিয়ে কেউ কখনও প্রশ্ন তোলেনি। এমনকি অন্যের জমির প্রতি যার ভয়ংকর লোভ, সেই মঁ প্লুমিউও জায়গাটার ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

"আমি আমার অধিকার সম্বন্ধে এতটাই সচেতন ছিলাম যে—যখন আমি সেখানে মাছ ধরতে যেতাম তখন এই ভেবে গর্ব বোধ করতাম যে জায়গাটার অধিকার একমাত্র আমার, অন্য কারও নয়। এক শনিবার আমরা পঁয়েজিতে পৌঁছে ডেলিলায় চড়ে নদীর বুকে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। 'ডেলিলা' হল আমার নিজের নৌকো। বেশ মজবুত কিন্তু যথেষ্ট হালকা ও নিরাপদ। অনুকূল বাতাস পেয়ে নদীর জলের ওপর দিয়ে বয়ে যায় আমার ছোটো নৌকোখানা। আমার ওই ছোটো নৌকোর ওপর বসে বঁড়শিতে টোপ গাঁথতাম। একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে টোপ গাঁথার ব্যাপারে হুজুর, আমার মতো ওস্তাদ একজনকেও আপনি খুঁজে পাবেন না। এই টোপ গাঁথার সঙ্গে এই দুর্ঘটনাটা কোনোভাবে যুক্ত নয়, তবুও আমি কি দিয়ে বঁড়শিতে টোপ গাঁথি সে ব্যাপারে যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না বা আপনার কৌতূহল মেটাতে পারব না। কারণ ওই রহস্যটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব, একান্তভাবে ব্যক্তিগত। ওটা আমারই আবিষ্কার। আর ওই রহস্য প্রকাশ করে দেবার জন্য কত লোক কতভাবে যে অনুরোধ করেছে, সে-কথা আর আপনাকে কি বলব হুজুর। তারা আমাকে মদ-মাংস খাইয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। আমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে খোশগল্প করেছে।—এ সমস্ত করেছে তারা আমি কি দিয়ে টোপ গাঁথি সে-কথা জানার জন্য। কিন্তু এ বান্দা একেবারে নাছোড়। জান চলে গেলেও এ রহস্য সে কখনই ফাঁস করবে না। কিন্তু আমার স্ত্রী মিলির সে তথ্য অজানা নয়। তাকে মেরে ফেললেও এ রহস্য সে ফাঁস করবে না।"

এর পর সে তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, "কি মিলি, আমি ঠিক বলিনি?"

বিচারক বাধা দিলেন, "আজেবাজে কথা বাদ দিয়ে আসল ঘটনাটা বলুন।"

আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রেনার্ড আবার বলতে থাকে, "নিশ্চয়ই ধর্মাবতার, আমাকে তো সে কথা বলতেই হবে। শুনুন বলছি, জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে আমরা বিকেল পাঁচটা পঁচিশের ট্রেন ধরে পঁয়েজিতে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে পৌঁছেই একটু বিশ্রাম নিয়েই আমরা সেই বিশেষ জায়গায় চলে

গেলাম 'চার' তৈরি করার জন্য। বিভিন্ন মশলা মিশিয়ে ওই চার তৈরি করতে হয়। আর মাছ ধরার আগের দিন ওই 'চার' তৈরি করে রাখতে হয়। ওই চারের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছেরা ছুটে আসে ওই গর্তটার মধ্যে।

"আবহাওয়ার পূর্বাভাসে মনে হল, রবিবার আবহাওয়া ভালোই থাকবে।

"আমার স্ত্রীকে বললাম, আগামীকালের আবহাওয়াটা ভালোই থাকবে মনে হয়। তুমি কি বল?

"সেও আমার কথায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে মাথা নাড়ে। এছাড়া বিশেষ কিছু কথা হয়নি আমাদের দুজনের মধ্যে। এর পর আমরা ফিরে এসে ডিনার খেলাম। নিজেকে বেশ সতেজ আর প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল। হঠাৎ মদ খাওয়ার ইচ্ছা জাগল। কিন্তু হুজুর, জানেন তো এই ইচ্ছাটাই সমস্তরকম সর্বনাশের মূল।

"আমি এর পর মিলিকে আমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে বললাম, মিলি, খুব মদ খেতে ইচ্ছে করছে—যদি এসময় এক বোতল নাইট লাইট পেতাম তাহলে খুব ভালো হত।

"নাইট লাইট এক ধরনের হালকা মদ। পরিমাণমতো খেলে বেশ মেজাজ আসে, মনটা ফুরফুরে হয়ে যায়। কিন্তু পরিমাণ বেশি হলেই বিপদ—রাতের ঘুমের একেবারে বারোটা বাজিয়ে দেয়।

"মিলি বলল, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব ন'। কিন্তু কাল সকালে উঠতে পারবে তো?

"মিলির কথাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। পরে বুঝেছিলাম ওর কথা না শুনে ভুল করেছি। যা হোক লোভে পড়ে পুরো এক বোতল নাইট লাইট সাবাড় করলাম। অবশ্যম্ভাবী ফল ফলল। দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে ছটফট করলাম। চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। মাথার মধ্যে অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খেতে লাগল। শেষপর্যন্ত মাঝরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। সে যে কী ঘুম আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। একেবারে ঘুমের গভীরে ডুবে গেলাম। জানতে পারলাম না দেবদূত কখন এসে আমার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন।

"সকাল ছটায় মিলি আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিল। লাফিয়ে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লাম। আমার ছোটো নৌকো ডেলিলাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। ডেলিলা আমার নির্দিষ্ট জায়গার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল।

"সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম অপরিচিত একজন আমার জায়গায় বসে দিব্যি ছিপ পেতে রেখেছে।

"হুজুর, তিন বছরের মধ্যে এধরনের ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ল না। মনে হল আমার চোখের সামনেই নিজের পকেটমার হয়ে গেছে।

"মহা উদ্বেগের সঙ্গে মিলি বোকার মতো বারবার বলতে লাগল, কিভাবে এটা হল, কেমন করে এটা হল?

"আমার স্ত্রীর কথায় মনে হল ওর মাথায় আগুন ধরে গেছে। সে বলল, আরও

মদ খাও, আরও মদ খাও। এনে দেব আরও গোটা দুই বোতল। নাইট লাইট, নাইট লাইট করে একেবারে খেপে উঠেছিলে। এখন বোঝো, এভাবে মাতাল হয়ে নিজের কাজ ভন্ডুল করতে তোমার লজ্জা করে না! তুমি একটি নির্বোধ গর্দভ ছাড়া আর কিছু নও, বুঝলে। যাও, এবার নিজের জায়গায় গিয়ে মাছ ধরতে বোসো। লজ্জাও করে না।

"আমি চুপচাপ মিলির কথাগুলো হজম করে গেলাম। কারণ ওর কথার প্রতিবাদ করার মতো আমার কিছুই ছিল না।

"ঘটনা যাই হোক না কেন, আমি ওই গর্তটার কাছাকাছি বসে ছিপ ফেলব স্থির করলাম। যদি কপালগুণে দুই একটা মাছ ওদিক থেকে এদিকে চলে আসে তাহলে আমার টোপ গিলতে পারে। আর যে লোকটা আমার জায়গাটা দখল করে বসেছে তার ভাগ্য যদি খারাপ হয়, তাহলে তার ছিপে একটা মাছও না উঠতে পারে। তখন হয়তো লোকটা আমার জায়গা ছেড়ে উঠে যাবে।

"লোকটা তার মাথায় বিরাট একটা খড়ের টুপি পরে ফাতনার দিকে একভাবে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। অতি শীর্ণ হাড়জিরজিরে চেহারা। ওর স্ত্রীও ওর সঙ্গে এসেছে। স্ত্রীটির আকার আয়তন লোকটার ঠিক বিপরীত। সে তার চর্বিবহুল বিরাট শরীর নিয়ে স্বামীর পিছনে বসে সেলাই করছে।

"আমরা যে ওই গর্তের কাছাকাছি বসে ছিপ ফেলার আয়োজন করছি—সেটা বোধ হয় ওই মহিলা বুঝতে পারে। সে হঠাৎ বলে ওঠে, নদীতে কি মাছ ধরার অন্য কোনো জায়গা নেই? কণ্ঠস্বর অতি রুক্ষ ও তেতো।

"আমার স্ত্রীও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, সুবিধাবাদী লোকদের এই এক জঘন্য অভ্যাস। তারা অপরের সম্পত্তি ভোগও করবে আবার নিজের অধিকার ফলাবে আর মাতব্বরি করবে।

"হুজুর, আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আমি নির্বিরোধী মানুষ। ঝগড়াঝাঁটি আমার ভালো লাগে না। তাই মিলিকে বললাম, মিলি ঝগড়া কোরো না। ওরা বসুক ওখানে। মাছ পাওয়া অনেকটা ভাগ্যের হাতে, আমরা দেখি কী হয়।

"আমার ছোটো নৌকো ডেলিলাকে উইলো গাছের নীচে রেখে আমরা তীরে এসে উঠলাম। একটা মোটামুটি পছন্দের জায়গা ঠিক করে ছিপ হাতে বসে পড়লাম। ওদের থেকে খানিকটা দূরে তবে এক সরলরেখা বরাবর।

"হুজুর, ঘটনাটা এবার সবিস্তারে বলা দরকার, নাহলে কে দোষী আর কে নির্দোষ তা বুঝতে হয়তো আপনার অসুবিধা হবে। পাঁচ মিনিটও পার হয়নি, আমার নজরে পড়ল লোকটার ফাতনাটা দু'তিনবার নড়ে উঠল। এর পরই সে বিরাটাকারের একটা রুই মাছ গেঁথে তুলল তার ছিপে। মাছটি সের দশেক তো হবেই, তারও বেশি হতে পারে।

"আমার নিজের সুযোগ এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য মনের ভেতরটা এক ধরনের হতাশায় মুচড়ে উঠল। সারা শরীর ঘেমে উঠল।

"মিলি বিকৃত স্বরে আমার কিগুলো নকল করে বলে ওঠে, মিলি, খুব মদ খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে, যদি এসময় এক বোতল নাইট লাইট পেতাম তাহলে খুব ভালো হত। গেলো মদ গেলো, বোকা গর্দভ কোথাকার। চোখ দিয়ে ভালো করে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে দেখো।

"হঠাৎ পঁয়েজির মুদিখানার মালিক মঁসিয়ে ব্রুকে দেখতে পেলাম। তিনি নৌকো করে নদী পার হচ্ছিলেন। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "মঁসিয়ে রেনার্ড, আপনার এতদিনের জায়গাটা কি বেদখল হয়ে গেল?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, মঁসিয়ে ব্রু, পৃথিবীতে লোভী ইতর মানুষের তো আর অভাব নেই, তারা নিজের পরের জিনিস বিচার করে না, সুযোগ পেলেই আত্মসাৎ করে।"

কিগুলো ওদের শোনানোর জন্য বললাম, কিন্তু মনে হল না, সেগুলো ওদের কানে ঢুকেছে। মেদসর্বস্ব মহিলাটি নির্বিকার হয়ে কখনও স্বামীর ছিপ ফেলা দেখছে, কখনও আবার সেলাই করছে। লোকটারও ওই একই অবস্থা। সেও সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক, সে শুধু একভাবে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে।"

বিচারক আমাকে শিষ্টতা বজায় রেখে কি বলার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, "ভদ্রভাবে কথা বলার চেষ্টা করুন। যাঁর সম্বন্ধে আপনি এই সমস্ত কুৎসিত মন্তব্য করছেন তিনি এই আদালতেই উপস্থিত আছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে রেনার্ড তার অশিষ্ট মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল।

"প্রথম মাছটা বঁড়শিতে গেঁথে তোলার মিনিট পনেরোর মধ্যেই আবার একটা মাছ তুলে আনল। এটার আকার আগেরটার থেকে অনেক বড়ো। পনেরো সেরের মতো হবে। তার বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। এর পর যেন ম্যাজিক শুরু হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে প্রায় একই সাইজের আর একটা মাছ তুলে আনল, আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে আর একটা, তারপর আর একটা, এইভাবে পর পর সে বঁড়শিতে মাছ গেঁথে তুলতে লাগল। আমার চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম হল। রাগে পাগল হওয়ার মতো অবস্থা হল মিলির। উলটোপালটা গালাগালি দিতে লাগল আমাকে লক্ষ করে, হাঁদা গঙ্গা কোথাকার, দেখো, ওই সিটকে লোকটা তোমার জায়গায় বসে তোমার পাওনা সব মাছ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার গায়ে কি মানুষের চামড়া আছে? আজ তোমার কপালে ছাই পড়ে গেছে, একটা মরা ব্যাঙও জুটবে না। এই রাগ আর সহ্য করতে পারছি না, সমস্ত শরীর আমার জ্বলে যাচ্ছে।

"তার কি শুনে আমার নিজেরও বেশ রাগ হচ্ছিল, কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করলাম। তাকে বোঝালাম, ওরা যখন দুপুরের খাবার খেতে ওখান থেকে উঠে যাবে তখন আমরা আমাদের জায়গায় গিয়ে বসব। তখনকার মত মিলি শান্ত হল। হুজুর, আমরা যেখানে বসে মাছ ধরতাম সেখানে বসেই দুপুরের খাবার খেয়ে নিতাম। আমাদের খাবারদাবার সব নৌকোর খোলের মধ্যে রেখে দিতাম। অন্যান্য যারা মাছ মারতে আসে তাদের মধ্যে এধরনের কোনো

অভ্যাস লক্ষ করিনি। তাই ভেবেছিলাম লাঞ্চ করার সময় ওই জায়গা থেকে ওদের উঠতেই হবে।

"কিন্তু ব্যাপারস্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেলাম। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম, বেলা বারোটা। লোকটা আমার দেখাদেখি একটা বড়োসড়ো কাগজের প্যাকেট বের করল আর তা থেকে বের করে আনল বেশ বড়ো সাইজের রোস্ট করা একটা পাখি, খেতে খেতেই বেশ বড়ো মাপের একটা কাতলা গেঁথে তুলল।

"আমার স্ত্রী আর আমি সবেমাত্র খাওয়া শুরু করেছি, কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমাদের খাওয়ার ইচ্ছাটাই বরবাদ হয়ে গেল। তবুও খেতে হল। আর ওই খাবার যাতে ঠিকভাবে পরিপাক হয়, সেইজন্য আমি গিলব্লাস নামের পত্রিকাটা পড়তে শুরু করলাম। প্রতি রবিবার আমি লাঞ্চের অবসরে নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসে ওই পত্রিকা পড়ি। তার একমাত্র কারণ হল, একমাত্র রবিবারেই লেখিকা কলমবাইন ওই পত্রিকাতে লিখে থাকেন। লেখিকা কলমবাইনকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি আর তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এই কথাগুলো বললেই মিলি ভীষণ খেপে ওঠে আর তাকে খেপাবার জন্য আমি ওই কথাগুলো বলি। আসলে ব্যাপারটা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যি বলতে ওই লেখিকাকে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি—চেনা তো দূরের কথা। কিন্তু তাঁর লেখনশৈলী এত সুন্দর, সহজে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে মেয়েদের কথা তিনি বেশ গুছিয়ে লিখতে পারেন। ভদ্রমহিলার লেখা আমার এত ভালো লাগে যে মনটা তাতে ডুবে যায়।

"যা হোক, মিলিকে অনেক কষ্টে শান্ত করেছিলাম ঠিকই কিন্তু সে ভিতরে ভিতরে বেশ রেগেই ছিল। এবার যেন আগুনে ঘি পড়ল।

"ঠিক সেই সময়, মঁসিয়ে লুইস লেডুর আর মঁসিয়ে জাঁ ডুরডেন্টকে নদীর অপর পারে দেখা গেল। আমি জানি এই আদালতেই ওঁরা উপস্থিত আছেন। আর ওঁদের চিনে নিতে আমার মোটেই অসুবিধা হবে না।

"রোগা সিটকে লোকটা ছিপ ফেলে একভাবে ফাতনার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সে অনেকগুলো বড়ো বড়ো মাছ ধরে ফেলে। আর আমার ভিতরটা পুড়ে খাক হতে থাকে।

"মিলি এবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিশফিশ করে বলে, "প্রত্যেক রবিবার এসে ওই একই জায়গায় বসে মাছ ধরি—কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটতে দেখিনি কখনও। একি কি কোনো ভৌতিক ব্যাপার না যাদুর খেলা, আশ্চর্য।"

"তার কথায় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল আমার মধ্যে। মনে হল শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

"মিলি আবার আমার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, তুমি পুরুষ নও, তুমি পুরুষ নামের অযোগ্য। তুমি মেয়েদেরও অধম। একটা মোরগের যে সাহস আছে, সে সাহসও তোমার নেই।

"এর পর আমি বলে উঠি, চলো, আমাদের এখান থেকে উঠে যাওয়া বরং ভালো।

"আমার কথা শুনে মিলি তেড়ে ওঠে, পুরুষ বলে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা করে না? নিজের হকের জায়গা অন্যের ভোগে লাগিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে চাইছ? মিলি সমানে তার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

"আমি কিন্তু তার কথা তেমনভাবে গায়ে মাখছি না। তখনও চুপ করে আছি। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছি। মিলি যখন এইভাবে আমাকে বিঁধে চলেছে, তখন মর্কটটা আর একটা বিরাট সাইজের রুই মাছ গেঁথে তুলল। মাছটা পেকে লাল হয়ে গেছে। আহা, ও ধরনের মাছ জীবনে আগে কখনও দেখিনি। আমার চোখ দুটো লোভে চকচক করে উঠল।

"মিলিও মাছের ওই চেহারা দেখে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। বেশ চড়া গলায় মেজাজ নিয়ে বলতে থাকে, ওদের শোনাবার জন্যই বলে, চোর, একেবারে দাগি চোর, আমাদের হকের মাছ চুরি করছে। ওদের লজ্জা ঘেন্না বলতে কি কিছুই নেই? কত কষ্ট করে চার তৈরি করে আমরা চার ফেললাম আর ওরা ধরছে মাছ। চার তৈরি করতে যে মশলা লেগেছে, সেগুলোর দাম অন্তত ওদের দিয়ে দেওয়া উচিত।

"মিলির মন্তব্য ওদের নিশ্চয়ই কানে পৌঁছেছে। ওদের একি বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ওদের উদ্দেশ্যেই মিলি ওই কিথুলো বলেছে।

"এবার ওই বেঁটে রোগা লোকটার বিশালকায়া স্ত্রী আর চুপ করে থাকতে পারল না। সেও চড়া গলায় মিলিকে জিজ্ঞেস করে, ম্যাডাম কিআমাদের লক্ষ করে কথাগুলো বললেন?

"মিলি সমান মেজাজে জবাব দিল, আমি কাউকে বলছি না, আমি বলছি মাছ চোরদের। আমরা সারারাত জেগে চার তৈরি করে চার ফেললাম আর কোনো কষ্ট না করেই চোরগুলো আমাদের মাছগুলো চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে।

"আপনি চোর বলছেন কাদের? নিশ্চয় আমাদের।"

"এর পর তারা পরস্পরকে লক্ষ করে অবিশ্রান্ত গালাগাল দিয়ে চলল অশ্রাব্য ভাষায় তর্কাতর্কি করতে থাকল চোখ রাঙিয়ে মেজাজ সপ্তমে তুলে। ওদের এই তর্কাতর্কি আর গালাগালি শুনে বেশ মজা পাচ্ছিলেন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই দুজন লোক। তাঁরা বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলেছিলেন, আপনাদের চিৎকার শুনে মাছগুলো যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, কী করে মাছ ধরবেন। এবার দয়া করে আপনাদের চিৎকার থামান।

"আমরা অর্থাৎ আমি আর সেই বেঁটে লোকটা একভাবে তাকিয়ে বসে আছি। এমন নিস্পৃহ হয়ে বসে আছি যেন ওদের চিৎকার আমাদের কানেই পৌঁছোচ্ছে না।

"কিন্তু বিধাতা যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা ঘটবেই। ওরা সমানে চিৎকার করে পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগল।

"এ বলে মিথ্যেবাদী, তো ও বলে তুই নষ্টা মেয়েছেলে। আবার এ বলে তুই বেশ্যা তো ও বলে তুই নেড়ি কুত্তা। এইভাবে অশ্রাব্য ভাষায় তারা পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগল।

"এর পর হঠাৎ একটা ঝটাপটির শব্দে আমার চমক ভাঙল। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম দশাসই রমণীটি মিলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাতে ছিল তার ছাতা। সেই ছাতা দিয়ে মিলিকে সমানে আঘাত করে চলেছে। মিলিও বসে নেই। সেও তার দুটো হাত তার ওপর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে আর মুটকিটাকে প্রায় কাবু করে ফেলেছে। সে এক হাত দিয়ে ওর চুল ছিঁড়ছে আর অন্য হাতে থাপ্পড় মেরে চলেছে ওর গালে। গলাটা লাল হয়ে ফুলে উঠছে। আমার কিন্তু ওই মারপিটে অংশ নেবার বা মারপিট করার আদৌ কোনো ইচ্ছা ছিল না। মেয়েদের মারপিটে শামিল হওয়া পুরুষের কাজ নয় আর সেটা যে-কোনো পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে সে কাজ করতে বাধ্য করল।

"এবার বেঁটে লোকটা নিজের বুদ্ধি হারিয়ে মিলিকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এল। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। লোকটার সরু একটা হাত বাঁ হাত দিয়ে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে ওর মুখ লক্ষ করে ঘুসি চালালাম। প্রথম ঘুসিটা শূন্য দিয়ে বেরিয়ে গেল আর দ্বিতীয় ঘুসিটা লাগল ওর নাকে। সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত বেরোতে লাগল। ওর শরীরটা কয়েকবার ঝাঁকানি খেল তারপর সে টলে উঠে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল নদীর জলে—আর স্রোতের ধাক্কায় এসে পড়ল একেবারে সেই গর্তের মধ্যে।

"ধর্মাবতার, আপনি বিচার করুন, আমি কি ইচ্ছে করে ওকে জলে ফেলে দিয়েছিলাম? সর্বনাশের মূলে আছে—ওই দুই মহিলার ভয়ংকর ক্রোধ। আমি তখন দুজনকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছি। আমি ধারণাই করতে পারিনি লোকটা ওইভাবে জলের নীচে তলিয়ে যাবে।

"আর ওই ভয়ংকর মহিলা দুজনকে যে কীভাবে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম তা চিন্তা করলে আমার সমস্ত শরীর ঘেমে ওঠে।

"আমি আমার কাহিনির শেষ অংশে চলে এসেছি। মনে পড়ছে, মিনিট দশেক সময় লেগেছিল, ওই দুজনকে পরস্পরের থেকে পৃথক করতে।

"শেষে লোকটার কথা মনে পড়তেই জলের দিকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু দেখলাম, জল স্থির, শান্ত। এদিকে নদীর ওপার থেকে যারা ঘটনাটা লক্ষ করেছিল তারা বলতে লাগল, লোকটাকে জল থেকে ওঠাও ও যে ডুবে গেল।

"কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না। ওই আট ফিট গভীর গর্ত থেকে ওকে তুলে আনার মতো সাধ্য বা শক্তি কোনোটাই আমার ছিল না।

শেষ পর্যন্ত খবর পেয়ে 'লক-কিপার' এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে এলেন দুজন ভদ্রলোক। হাতে তাঁদের আঁকশি গোছের একটা কিছু। তাঁরা লোকটাকে তুলে আনলেন ওই গর্ত থেকে।

"ধর্মাবতার, সবকিছু আপনাকে খুলে বললাম, এতে আমার কি অপরাধ বলুন।"

সাক্ষীরা আসামির কথার সত্যতা স্বীকার করলে বিচারক রেনার্ডকে বেকসুর সাব্যস্ত করে তাকে মুক্তি দিলেন।

একটি কৃষক বালিকার কাহিনি
The Story of A Firm Girl

সেদিন আবহাওয়াটা ছিল মনোরম। সুতরাং খামারবাড়ির লোকেরা অন্যান্য দিনের তুলনায় দুপুরের খাওয়ার পাট অনেক আগেই চুকিয়ে নিয়ে মাঠে ফিরে গেল।

তখন খামারবাড়ির ঝি রোজ রান্নাঘরে একাই ছিল। উনুনের আগুন তখন প্রায় নিভে এসেছে। সেই নিভন্ত আগুনে একটা বিরাট পাত্রে জল গরম হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে সেখান থেকে অল্প অল্প জল নিয়ে এঁটো থালা বাসন পরিষ্কার করছিল। বাসন মাজা ও ধোয়া মোছার কাজ শেষ করে সেগুলোকে তাকের ওপর রেখে সে গভীর ক্লান্তিতে বড়ো করে একটা শ্বাস নিল। তারপর বাইরে এসে দরজাটার কাছে বসে পড়ল।

সে অন্যান্য দিনের মতো সেলাই করবে কি না ভাবছিল। কিন্তু ওই কাজের জন্য শরীরে যথেষ্ট জোর পেল না। সে সেখানে বসে খোলা বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে লাগল।

কতকগুলো মুরগি তখন ধোঁয়াওঠা গোবরের গাদার ওপর বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। কয়েকটা আবার একপায়ের নোখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পোকামাকড় খুঁজে চলেছিল আর মোরগগুলো তাদের মাঝখানে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝেই সেগুলোর মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে তার চারিদিকে ঘুরতে লাগল এবং তার সঙ্গে শারীরিক সংসর্গের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটা মোরগ তার ভাষায় তাকে ডাকতে লাগল।

মেয়েটি সেদিকে তাকিয়ে দেখল কিন্তু সে সমস্ত তার মনে কোনো রেখাপাত করল না। এর পর চোখ তুলে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। দেখল আপেল গাছগুলো সাদা সাদা কুঁড়িতে ভরে উঠেছে আর মনে হচ্ছে সমস্ত গাছে কে যেন পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক তখনই প্রাণচঞ্চল একটি অশ্বশাবক তার পাশ দিয়ে দুলকি চালে ছুটে বেরিয়ে গেল। দূরের মাঠ থেকে বয়ে আসা মুক্তবাতাস তার সমস্ত ক্লান্তি যেন মুছে দিল। রোজের হঠাৎ ইচ্ছা হল সেও চঞ্চল ওই অশ্বশাবকটার মতো, উদাসী হাওয়ার মতো সমস্ত মাঠে প্রান্তরে দিগন্তে ছুটে বেড়াবে।

রান্নাঘরের সামনে যে উঠোন আছে তার এক দিকটায় মুরগি রাখার ঘর, আর গোয়ালঘর আর অন্য দিকে আস্তাবল আর টমটমের গ্যারেজ। গ্যারেজ ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি জলাশয়। জলাশয়ের ধার ঘেঁসে ফুটে আছে নানা রকমের নানাবর্ণের ফুল। ওই জলাশয়ের ধারে দাঁড়ালে দেখা যায় দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেখানে চাষিরা কাজ করছিল। ওই জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোকে এত ছোটো দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল জীবন্ত কতকগুলো পুতুল যেন বিভিন্ন ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িয়ে চলেছে।

দরজার সামনে থেকে উঠে সে জলাশয়টার দিকে এগিয়ে গেল। জলাশয়ের ধারে একটা জায়গায় গোরুর খাবারের জন্য খড়-বিচালি জমা করে রাখা হয়। বর্ষার হাত থেকে সেগুলোকে বাঁচাবার জন্য ওপরে একটা চালা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই চালার নীচের খড়ের গাদার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল রোজ। অদ্ভুত এক ধরনের সুখানুভূতি তার ক্লান্ত অবসন্ন শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে তাকে তন্দ্রার আবেশে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

হঠাৎ তার বুকের ওপরে কারও হাতের স্পর্শ অনুভব করে তার সেই আবেশের অনুভূতি অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে এল। ফলে সে চমকে উঠে বসল। দেখল জ্যাক তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সে এখানে চুপ করে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে মোটেই বুঝতে পারেনি।

জ্যাক দীর্ঘাকৃতির এক তরুণ। সে পিকাডি থেকে এসেছে। এই জ্যাকের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের প্রেম। জ্যাকের কাজ এই খামারে ভেড়া চরানো। কাজের অবসরে দুজনের মধ্যে দেখা হলে, তারা পরস্পরের কাছে প্রেম নিবেদন করে। রঙ্গরসিকতা করতেও ছাড়ে না। এইভাবে তাদের দিন কাটে।

রোজ উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক তাকে চুম্বন করতে গেল। কিন্তু রোজ তার মুখটাকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিল। এর পর তারা পাশাপাশি বসে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখসুখের কথা বলল, খামার মালিকের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করল, আবহাওয়া সম্বন্ধেও কথা বলল। তাদের ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে কাটাল। হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। সে বলল, মার সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি। তাঁকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

জ্যাকের মাথায় তখন একটাই চিন্তা, রোজের শরীরকেন্দ্রিক চিন্তা। একভাবে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশকে নিরীক্ষণ করে চলেছিল। যৌন আবেদন জাগানো তার রক্তাভ ফোলা ফোলা গাল, ডালিমের দানার মতো রসালো ঠোঁট আর সুপুষ্ট বুক তাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলল। ওসবের আকর্ষণ সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ ভয়ংকর কামতাড়িত হয়ে সে রোজকে জোর করে দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। কিন্তু রোজের মধ্যে হঠাৎ কী হয়ে গেল কে জানে, সে জ্যাকের মুখে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুসি মারল। সঙ্গে সঙ্গে নাক ফেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। রোজ যে হঠাৎ তার প্রেমিককে এভাবে আঘাত করে বসবে সে-কথা সে ভাবতেই পারেনি। তাই সে ভীষণ লজ্জিত হয়ে জ্যাকের কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। রোজ এবার এক হাত দিয়ে জ্যাকের কোমরটা জড়িয়ে ধরে সামনের রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ এক সময় সে নিজে থেকে গভীর আবেগে জ্যাককে জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মতো চুম্বন করতে লাগল। অনেকক্ষণ তারা পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে একটি জায়গায় চুপ করে বসে রইল।

এর পর থেকে তাদের মেলামেশা চলতে লাগল অবাধে। কখনও রাতের অন্ধকারে

আবার কখনও নিভৃত কোনো স্থানে। কিন্তু রোজ এক দিন বুঝতে পারল, তার প্রতি জ্যাকের আর কোনো আকর্ষণ নেই। সে তার দেহসংসর্গের জন্য আর সেভাবে আকর্ষণ বোধ করে না। হঠাৎ যদি তার সঙ্গে কোনোভাবে একবার দেখা হয়ে যায়, তাহলে সাধারণভাবে দু-একটা কথা বলে। তার মধ্যে আবেগ বা উষ্ণতার কোনো স্পর্শ থাকে না। তার দৃষ্টির মধ্যে কামনার কোনো উচ্ছ্বাস থাকে না।

কিছু দিনের মধ্যে সে বুঝতে পারল, সে অন্তঃসত্ত্বা। জ্যাক তার কাছে শপথ করে বলেছিল, সে তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে তার শপথ ভঙ্গ করেছে। সর্বক্ষণ সে তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। অথচ একমাত্র সেই-ই তাকে এই কলঙ্ক আর অসম্মানের গ্লানি থেকে রক্ষা করতে পারে।

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে সে এক দিন রাত্রে জ্যাকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। জ্যাক তখন খড়ের গাদার ওপর শুয়ে ঘুমে অচৈতন। গাঁকগাঁক করে নাক ডেকে চলেছে। তাকে ঘুম থেকে তুলে তার গলাটা বেশ জোরেই চেপে ধরল। রাগে তার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। গলায় চাপ বোধ হতেই জ্যাকের ঘুম ভেঙে গেল। সে বুঝল রোজের গায়ের জোর তার থেকে অনেক বেশি। তাকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয় জেনে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলল, সে তাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। এর পর রোজ তার গলা থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে এল।

কিন্তু এসবেও বিশেষ কোনো সুবিধা হল না। কয়েক দিনের মধ্যে সে শুনতে পেল জ্যাক খামারের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কোথাও উধাও হয়ে গেছে, তার জায়গায় নূতন একজন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে। একবার তার মনে হল, সে গির্জার পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিজের অপরাধ বা কুকর্মের কথা অকপটে স্বীকার করবে। কিন্তু তার ভয় হল, পাছে তার সমস্ত দোষ ত্রুটি, ভুলভ্রান্তি বা দুর্বলতা তাঁর কাছে ধরা পড়ে যায়, কারণ আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাঁদের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। তাঁরা শুধু একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার জীবনের গতিবিধি নাড়িনক্ষত্র সবই জানতে পারেন।

এক দিন তার বাড়ি থেকে একখানা চিঠি এল। চিঠি থেকে সে জানতে পারল তার মায়ের খুব অসুখ। সে চিঠির কথা জানিয়ে খামারমালিকের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিল। মালিকের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশেক হবে। দুবার স্ত্রীবিয়োগের কারণে তিনি আর বিয়ে করেননি। চিঠির কথা জেনে কিছুক্ষণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রোজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাকে সান্ত্বনা সহানুভূতি জানিয়ে ছুটি মঞ্জুর করলেন।

এর পর রোজ বাড়ি ফিরে এল। এসেই তার মাকে মরণাপন্ন অবস্থায় দেখতে পেল। ইতিমধ্যে তার গর্ভের সন্তানের বয়স হয়েছিল সাত মাস। তার মায়ের মৃত্যুর পর সে সাত মাসের এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। অনেক কষ্টে ছেলেটিকে বাঁচানো গেল। এর এক মাস পরে কোনো এক সহৃদয় প্রতিবেশীর ওপর বাচ্চাটার লালনপালনের ভার দিয়ে সে ফিরে এল তার কর্মস্থলে।

সেখানে ফিরে এসে রোজ বলল তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার গ্রামেই তার শ্বশুরবাড়ি আর তার স্বামী সেখানেই আছে। খামারবাড়ির অন্যরা তার কথা শুনে নানারকম প্রশ্ন তুলে তাকে ঠাট্টাতামাশা করল।

এর পর থেকে রোজ বেশি পয়সা রোজগারের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করতে থাকে আর মালিকের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। তারপর সে মালিকের কাজের মেয়েটিকে ছাড়িয়ে দিয়ে তাঁর সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মালিক তার কাজের প্রশংসা করে বলেন, সত্যি রোজ তোমার তুলনা নেই। তুমি একাই একশো।

কিন্তু এত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও রোজের রোজগার বাড়ে না। মালিক তার মাইনে বাড়ালেন না। এক দিন সে মাইনে বাড়াবার আবেদন নিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু সে-কথা সে বলতে পারল না। সে শুধু বাড়ি যাবার জন্য এক সপ্তাহের ছুটি চাইল।

এর মধ্যে দীর্ঘ আট মাস পার হয়ে গেছে। বাচ্চাটাকে দেখতে না পেয়ে তার খুব খারাপ লাগে। তার ইচ্ছে হয় শিশুটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গভীর মমতায় তাকে চুম্বন করে। তার সমস্ত শরীর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার উষ্ণ নরম শরীরের স্পর্শ পাওয়ার জন্য। মালিক আনন্দে তার ছুটি মঞ্জুর করে তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, রোজ, তুমি বাড়ি থেকে ফিরে এলে তোমাকে একটা কথা বলব।

এর পর সে ছুটি নিয়ে যথাসময়ে বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। যে কদিন সে সেখানে থাকল সে তার শিশু সন্তানটিকে নিয়ে পড়ে থাকল। সর্বদা তাকে আদরে, সোহাগে ভরিয়ে রেখে তার উষ্ণ নরম শরীরের উত্তাপ গায়ে মেখে অপার তৃপ্তি লাভ করল। তারপর ছুটির দিনগুলো শেষ হয়ে যেতেই সে আবার ফিরে এল সেই খামারবাড়িতে।

এর মধ্যে একদিন খামারমালিক রোজকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন। রোজ ভয়ব্যাকুল মন নিয়ে তাঁর সামনে এসে হাজির হল।

মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা রোজ, তুমি এখনও পর্যন্ত বিয়ে করোনি কেন? যে তোমার মতো সৎ কর্মী মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করবে, তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। সুখসমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে তার জীবন, তার গৃহের পরিমণ্ডল।

তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতে রোজের দিক থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তাকে নীরব থাকতে দেখে বললেন, তোমার মতো যদি আমার একজন স্ত্রী থাকত তাহলে এই খামার পরিচালনার কাজগুলো খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করতে পারতাম। তুমি কি আমার স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আমার সঙ্গে বাস করতে রাজি আছ?

"স্যার, তা কীভাবে সম্ভব?" রোজের গলায় ক্ষীণ প্রতিবাদের সুর।

মালিক বললেন, "কেন রোজ, আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার কি কোনো বাধা আছে? শোন রোজ, আজই এই মুহূর্তে, তোমাকে কোনো মতামত জানাতে বলব না। আগামীকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে তুমি ভাববার সময় নাও। কালই তুমি তোমার উত্তরটা জানিয়ো।

সে রাত্রে রোজ সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারল না। বিছানায় শুয়ে শুধু ছটফট করল। সে কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না মালিককে সে কী উত্তর দেবে।

পর দিন সে খামারমালিককে জানিয়ে দিল—তাঁর প্রস্তাবে রাজি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মালিক তখন তাকে সমস্ত কিছু খুলে বলার জন্য অনেকভাবে অনুরোধ উপরোধ করতে লাগলেন। এর পরে তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন, সে কি অন্য কাউকে ভালোবাসে বা অন্য কোনো লোকের বাগ্‌দত্তা।

রোজ কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও গেল না। সে বারবার শুধু একটাই কথা বলতে লাগল, সে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না।

গ্রামের দিকে অনেক বয়সের ব্যবধানে ছেলে মেয়ের মধ্যে বিয়ে হতে দেখা যায়। আর এটা তাদের কাছে অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। তা ছাড়া খামারবাড়ির মালিক আর কাজের মেয়েদের মধ্যেও অনেক সময় বিয়ে হতে দেখা যায়। কিন্তু রোজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ পৃথক। জ্যাক যে তার চরম সর্বনাশ করে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে আর সেই সর্বনাশের ফলে বিরাট এক কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে সেসমস্ত কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করতে পারছিল না। তার মালিকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকেও সে সমস্ত কথা জানাতে পারছিল না সে।

মালিক তাকে আরও সময় দিলেন নিজের মনস্থির করার জন্য। সাময়িকভাবে সে ওই প্রশ্নের দ্বিধাযুক্ত উত্তর দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর সে বিছানায় সমস্ত শরীরটাকে ছড়িয়ে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেল।

হঠাৎ মধ্যরাত্রিতে তার ঘুম ভেঙে গেল কোনো একটা শব্দে। মনে হল কে যেন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। রোজ বিছানার উপর উঠে বসল, ঘুমের ঘোরে মানুষটাকে চিনতে প্রথমে তার অসুবিধা হচ্ছিল, তারপরে ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই সে মালিককে এমন সময়ে তার ঘরে দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মালিক বললেন, শোনো রোজ, আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। তোমাকে কিছু বলার জন্য আমি এখানে এসেছি। কিন্তু তিনি কোনো কথা না বলে রোজকে সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। রোজ বাধা দেবার চেষ্টা করল কিন্তু সেই বাধা ছিল দুর্বল, নিজের দুর্বলতাই সেই বাধাকে বলিষ্ঠ হতে প্রতিহত করল। তার মধ্যে যে প্রবৃত্তি ভয়ংকর সবল হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই একইরকমের প্রবৃত্তির আক্রমণকে সে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হল। সেই প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে বাধ্য হল। তার মালিকের দৃঢ় ও উষ্ম আলিঙ্গনের মধ্যে পরস্পরের দৈহিক সংস্পর্শের আবেশের মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

পর দিন থেকে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে গেল সামাজিক নিয়মে।

বছর চার-পাঁচ এইভাবে কেটে গেলেও রোজ তার অতীত জীবন বা তার সন্তানের

কথা তার স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে পারল না। রোজ বেশ কিছু দিন যাবৎ স্বামীর মধ্যে এক বিচিত্র ভাবান্তর লক্ষ করছিল। সে সব সময় কী যেন ভাবে, সেই ভাবনার বিষয় অপ্রকাশিত থাকে। তার ভিতরে সে ভাবনা গুমরে গুমরে মরে। সেই গোপন অস্থির চিন্তা যেন দিনে দিনে তাকে অকাল বার্ধক্যের সীমানায় টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তার প্রকাশ ঘটল তার আচরণের মধ্যে। মেজাজ হয়ে উঠল খিটখিটে। কথায় কথায় সে রোজের ওপর আজকাল রেগে ওঠে। এক দিন প্রতিবেশীদের একটা বাচ্চা ছেলেকে তার দুষ্টুমির জন্য রোজ যখন বকাবকি করল তখন তার স্বামী রেগে গিয়ে তাকে বলল, "বাচ্চাটার সামান্য দুষ্টুমির জন্য এমনভাবে বকাবকি করলে কিন্তু সে যদি তোমার নিজের ছেলে হত, তাকে তুমি এমনভাবে বকাবকি করতে পারতে?"

সেরাত্রে দুজনে খেতে বসে কেউ কোনো কথা বলল না। চুপচাপ যে যার মতো খেয়ে উঠে গেল। বিছানায় শুয়ে যে যার মতো পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

সকাল হতে না হতেই রোজ আর সহ্য করতে না পেরে স্বামীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি কী অন্যায় করেছি যার জন্য তুমি আমাকে এইভাবে শাস্তি দিচ্ছ।"

গম্ভীর মুখে অনেক অভিমান নিয়ে সে বলল, "আজ প্রায় পাঁচ-ছ বছর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা একটা সন্তানের মুখ দেখতে পারলাম না। এর থেকে দুঃখজনক আর কী হতে পারে বল। যে গাভী বাচ্চা প্রসব করে না, তার অস্তিত্ব যেমন অর্থহীন তেমনি যে নারীর সন্তান হয় না বা যে নারী বন্ধ্যা, তার অস্তিত্বও তেমনি মূল্যহীন।"

করুণস্বরে উত্তর দিল রোজ, তার জন্য কি আমি দায়ী?

তার স্বামী বললেন, "না, না, তার জন্য তোমাকে আমি দায়ী করছি না, কিন্তু একবার ভেবে দেখ, ব্যাপারটা সত্যিই কতটা দুঃখজনক।"

এর পর রোজের জীবনের একমাত্র সাধনা হল—একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করা এবং তাকে এই পৃথিবীর আলো দেখানো। সে অনেক চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হল, অনেক ওষুধপত্র খেল, গির্জার পুরোহিতদের আশীর্বাদ নিল। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না।

এক দিন রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে তার স্বামী এত বেশি রেগে গেলেন যে, তিনি সন্তানহীনতার জন্য রোজকেই দায়ী করে তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করলেন না। রোজও আর সহ্য করতে না পেরে তার স্বামীটিকে দেয়ালের সঙ্গে জোর করে চেপে ধরল। তারপর ভীষণ রেগে গিয়ে বলতে লাগল, সন্তান চাইছ, না? ছেলে তুমি পাবে। জ্যাকের ঔরসে সে আমারই গর্ভজাত সন্তান। জ্যাক আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল কিন্তু সেই ধূর্ত আমার সঙ্গে প্রতারণা করে পালিয়ে যায়। তার ঔরসে আমার যে সন্তান হয় সেই অবৈধ সন্তানকে গ্রামের বাড়িতে রেখে এসেছি। সে অপরের দয়ায় বেঁচে আছে। আর তারই কথা ভেবে তোমার প্রস্তাবে আমি মত দিতে পারিনি।

হঠাৎ রোজের স্বামী শান্ত হয়ে গিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলল, "তোমার যে

ছেলে আছে, এ কথাটা তো আগে বলতে হয়। এদিকে অন্যের ছেলেকে পোষ্য নিয়ে নিজের সন্তানের মতো তাকে লালনপালন করব বলে স্থির করেছি। আমার ভাবনার বিষয়টা আমাদের চার্চের ফাদারকেও জানিয়েছি। আচ্ছা তোমার ছেলের বয়স কত?"

স্বামীর কথা শুনে রোজ একেবারে আনন্দে ডগমগ। সে বলল, "ছয়।"

তার স্বামীও খুশি হয়ে বলল, "তাহলে তো কোনো সমস্যাই রইল না। এর পর থেকে রোজের স্বামীর কাছে তার গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল। স্বামী তাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। পর দিন রোজকে আদর করতে করতে তার স্বামী বলল, "চলো, তোমার সেই সন্তানকে আনার জন্য আমরা দুজনেই যাব তোমাদের সেই গ্রামের বাড়িতে। তোমার সন্তান কি আমার সন্তান নয়? সত্যি রোজ, আজ আমি এত সুখী, মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আমার মতো সুখী আর কেউ নেই।

বেড নং ২৯
Bed No. 29

ক্যাপ্টেন এপিভেঁত যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন তরুণীরা তাঁকে মুগ্ধ হয়ে দেখত। সামরিক অফিসারদের মধ্যে এমন বলিষ্ঠ, সুন্দর, সুদর্শন মানুষ সত্যিই দুর্লভ। তাঁর পেশীবহুল দীর্ঘাকৃতি আর সুন্দরভাবে ছাঁটা মোটা গোঁফ তাঁর অহংকারের কারণ হয়ে উঠেছিল। সামরিক পোশাকে তাঁকে দেব অ্যাপোলোর মতো মনে হত।

কিন্তু তাঁর চরিত্রে বিশেষ একটা দোষ ছিল। সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসাররা ছাড়া তাঁর কাছে আর কেউ মানুষ হিসাবে গণ্য হত না। আবার তাদের মধ্যে যারা ছিল মোটা আর বেঁটে—তাদের দেখে তিনি সীমাহীন ঘৃণা ও বিরক্তিতে মুখটাকে বিকৃত করে তুলতেন, বিদ্রুপ করতেন তাদের কুশ্রী চেহারাকে।

ক্যাপ্টেন এপিভেঁত মেয়েদের মন হরণ করে নিতেন মুহূর্তের মধ্যে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে তিনি চূড়ান্তভাবে সফল হতেন।

প্রায় প্রতিদিনই তিনি একজন সুন্দরী রমণীকে সঙ্গে নিয়ে ডিনার করতেন এবং তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে তার সঙ্গে একই শয্যায় তিনি রাত কাটাবেন। সেদিন কোনো কারণে যদি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হত, অবশ্যই পরের দিন তিনি সে কাজে সফল হতেন। শহরের মেয়েরা তাঁকে দেখে যতটা আকৃষ্ট হত, পুরুষরা ততটাই তাঁর দুর্নামে পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। ভদ্র অভিজাত বংশের অবিবাহিতা তরুণী ও গৃহবধূ থেকে শুরু করে বাজারের মেয়েরা পর্যন্ত তাঁর একটু সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। নিজেদের রিপুকে সংযত করতে না পেরে, লোকলজ্জা ভুলে তারা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকে দেখত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনী ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ স্তরের পুরুষরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে ঘৃণা করত এবং দুশ্চরিত্র লম্পট বলে গালাগাল দিত।

এপিভেঁতের মাথায় যে ছোট্ট একটা টাক ছিল, তাঁর সুন্দর করে ছাঁটা পুরুষ্টু গোঁফের জন্য সেটাকে বিসদৃশ বা বেমানান বলে মনে হত না। অন্তত এপিভেঁতের সেইরকমই ধারণা ছিল। তিনি চরিত্রের দিক থেকে যেমন ছিলেন লম্পট তেমনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল। সেটা তাঁর কাছে বিশেষ দোষাবহ বলে মনে হত না, বরং সেটাকে তিনি খুবই স্বাভাবিক বলে মনে করতেন।

সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন দুপাশের বাড়ির বারান্দায় এসে ভিড় করত ভদ্র পরিবারের বিবাহিত অবিবাহিত তরুণীরা। তাঁর সামান্য কৃপাদৃষ্টিতে তারা যেন ধন্য হয়ে যাবে এমনভাবে গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। এপিভেঁতের সুন্দর পুরুষালি বলিষ্ঠ চেহারা দেখে তারা কামপীড়িত হয়ে তাঁর শরীরের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল

হয়ে উঠত। এপিভেঁতের সামান্য ইঙ্গিতে তাদের আত্মীয়পরিজন, স্বামী সংসার এবং সামাজিক কলঙ্কের দায়কে অতি তুচ্ছ মনে করে রাত্রে বা দিনে বা যে-কোনো সময়ে তাদের শরীরকে ব্যবহার করতে দিতে পারলে নিজেদের ভাগ্যবতী মনে করত। মনের এই গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠত আর তাদের দিকে দৃক্‌পাত না করেও এপিভেঁত তাদের মনের কথা উপলব্ধি করতেন।

এই সমস্ত তরুণী বধূদের স্বামীরা তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করত যে তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ না করে ক্ষান্ত হত না।

এক দিন এপিভেঁত যখন একটি দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে দেখতে পেয়ে ওই দোকানের মালিক তাঁর দিকে কোপদৃষ্টি হেনে বলল, সামরিক অফিসার হওয়ার অহংকারে লোকটার যেন মাটিতে পা পড়ে না, বাবুগিরির ঠেলায় একেবারে অস্থির। এই সমস্ত অপদার্থদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারলে সব থেকে ভালো হয়। তখন বাবুগিরি বেরিয়ে যাবে। আমার নিজের কথা আমি বলছি, একজন সৈনিক হওয়ার থেকে একজন কসাই হওয়া অনেক ভালো। এই সমাজে তার প্রয়োজন আছে আর তার হাতের ছুরি মানুষের রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে না। আমি বুঝতে পারি না. এই সমস্ত খুনীগুলোকে মানুষ কী করে সহ্য করে।

সালটা তখন ১৮৬৮। এপিভেঁত তখন একদল সৈন্য নিয়ে বুয়েন শহরে এসে বসবাস করছিলেন। এই শহর রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। বুয়েন শহরের প্রায় সমস্ত মানুষ খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে চিনে ফেলল। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ ব্যুদে মলের কমেডি নামের এক রেস্তোরাঁয় অ্যাবসিনয়ে নামে এক ধরনের তেতো মদ আর কফি পান করতে আসতেন।

শহরের লাইসেন্স·পাওয়া বারবনিতাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা, একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত, সকলের আগে কে তাঁকে তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। তারাও ঠিক বিকেল পাঁচটায়, ব্যুদে মলে এসে উপস্থিত হত। হাঁটার সময় তারা তাদের স্কার্ট অনেকটা ওপরে উঠিয়ে দিয়ে আবার নীচে নামিয়ে দিত। তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় লীলায়িত ভঙ্গিতে বাঁকা চোখের কটাক্ষে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলোকে প্রদর্শন করে তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করত।

এক দিন সন্ধ্যায় শহরের সেরা সুন্দরী ইর্মার গাড়ি এসে থামল কমেডির দরজার সামনে। লোকে বলে সে নাকি ধনী ব্যবসায়ী এম. তেম্পলিয়ার প্যাপনের রক্ষিতা হয়ে তার সঙ্গে বসবাস করত। সে গাড়ি থেকে নেমে, নকশা খোদাইকারী মিঃ পলার্ডের জন্য কিছু কাগজপত্র বা ভিজিটিং কার্ড কেনার ভান করল, এর পর অফিসারদের টেবিলের পাশ দিয়ে গিয়ে এপিভেঁতের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত করল, তার চোখ দুটো যেন বলতে চাইল তুমি কখন...। তার চোখের অভিব্যক্তি, তার অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা এত বেশি পরিষ্কার, এত বেশি স্পষ্ট এবং বোধযোগ্য হয়ে উঠেছিল যে, কর্নেল প্রুন যিনি তাঁর লেফটেন্যান্টএর সঙ্গে বসে সবুজ মদ পান করছিলেন, তাঁকে খুব নীচু গলায় বললেন, ওকে বাগে আনার চেষ্টা করো। এ সুযোগ হাত ছাড়া কোরো না।

সেই রাত্রেই তারা তাদের দেহ আদানপ্রদানের মাধ্যমে হয়ে উঠল পরস্পরের একান্ত আপনজন। এতদিন যেন তারা মনের মানুষ খুঁজে পায়নি, আজ যেন তা পেল। এর পর থেকে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না, কেউ আর তারা অন্য কোনো নারী বা পুরুষের সন্ধান করে না। কিছু দিনের মধ্যে ইর্মা তেম্পলিয়ারের কাছে যাওয়া ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল। সমস্ত শহরের লোকে তাদের প্রেম নিয়ে কানাকানি করতে লাগল। নানারকম উদাহরণ দিয়ে রসালো গল্প জুড়ে দিল। ইর্মার প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা বলতেন না এপিভেঁত, ইর্মা আমাকে এই বলেছে, কাল ডিনারের সময় ইর্মা আমাকে এই কথা বলেছিল, ইত্যাদি। বছরখানেক ধরে তারা গোপনে বা প্রকাশ্যে চুটিয়ে প্রেম করে বেড়াল। তার সংস্পর্শে, তার উষ্ম সান্নিধ্যে এসে এপিভেঁত অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। তিনি সে-কথা গর্বের সঙ্গে বলে বেড়াতেন। ইর্মাও তাঁর মতো সুদর্শন, বলিষ্ঠ একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিল। সে-কথা সে তার পরিচিত মহলে সকলের সঙ্গে গর্ব করে বলে বেড়াত।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো ফ্রান্স আর প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যথারীতি এপিভেঁতকে তার সৈন্যদল নিয়ে সেই যুদ্ধে যোগ দিতে বলা হল। আজ রাত্রেই তাঁকে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে এরকম নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

ইর্মার কাছে যখন এপিভেঁত বিদায় নিতে গেলেন, তখন ইর্মা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মতো চুল ছিঁড়তে লাগল। অস্থির আবেগে মাথা কুটতে লাগল এপিভেঁতের পায়ে। এপিভেঁত তাকে অনেক করে বোঝালেন, বললেন, তুমি এভাবে কেঁদে আমার মনকে অস্থির করে তুলো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আবার আমি তোমার কাছেই ফিরে আসব।

তবু ইর্মা কেঁদেই চলল। ইর্মার ব্যাকুলতা দেখে এপিভেঁতের মতো বহু নারীতে আসক্ত একজন সামরিক অফিসারও দুঃখ বোধ না করে পারলেন না। তার কান্না তাঁর মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করল। তাঁর চোখ দুটোও সজল হয়ে উঠল। কোনো বিবাহিতা নারীও তার স্বামীর বিদায়ক্ষণে এমনভাবে অস্থির বা ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। তিনি ভেবেছিলেন ইর্মা শুধু তাঁর রূপ ও অর্থের মোহে ভুলে তাঁকে এভাবে ভালোবেসেছে। কিন্তু ইর্মার মতো নারীর মধ্যে যে এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকতে পারে তা ভেবে তিনি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

মাস কয়েকের মধ্যে এপিভেঁত যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এলেন রুয়েন শহরের সেই সেনানিবাসে। কিন্তু ইর্মাকে তিনি সেখানে দেখতে পেলেন না। অনেক দিন ধরে তার খোঁজ করলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। কোথাও তিনি তাঁকে খুঁজে পেলেন না।

কেউ কেউ বলল, ইর্মা কোনো একজন প্রাশিয়ান অফিসারকে বিয়ে করে তার সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। নানা লোক তার এই অন্তর্ধান সম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করল কিন্তু কেউই সঠিক সংবাদ দিতে পারল না। এপিভেঁত তার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। এক দিন সকালে ওই সেনানিবাসে তাঁর নামে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়ে গেল একজন সংবাদবাহক। যথাসময়ে চিঠিটা হাতে পেয়ে তিনি সেটা পড়ে দেখলেন। তাতে লেখা আছে, প্রিয়তম, আমি অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘদিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি। তুমি যদি এক দিন এখানে আস, তাহলে তোমাকে দেখে আমি একটু শান্তি পাব।

চিঠির নীচে ইর্মার নাম স্বাক্ষর করা ছিল।

সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে তিনি হসপিটালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

সেখানে পৌঁছে তিনি একজন গাইডের সাহায্যে নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে চললেন। তার কাছ থেকে তিনি খোঁজ করে ইর্মার বেড-নাম্বারও জেনে নিয়েছিলেন। তার বেড-নাম্বার ছিল ২৯। কিন্তু ওয়ার্ডের প্রধান প্রবেশপথের দরজায় বড়ো বড়ো হরফে লেখা ছিল, 'সিফিলিস'। ক্যাপ্টেন সেটা পড়ে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ মুখ সব লাল হয়ে উঠল। যে এটেন্ড্যান্টটি ওয়ার্ডের দরজার কাছে বসে একটা টেবিলে রোগীদের জন্য ওষুধ তৈরি করছিল, তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে ইর্মার বেডটি দেখিয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত সেই বেডটার কাছে এসে কতকগুলো কাপড়চোপড়ের বোঝা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। মাথাটা এমনভাবে ঢেকে রাখা হয়েছিল যে তাকে চেনাই যাচ্ছিল না। রোগজীর্ণ শীর্ণ মুখটা শুধু বাইরে বেরিয়েছিল।

ক্যাপ্টেন এপিভেঁত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক হাতে টুপিটা ধরে অন্য হাতে তরবারিটা মাটিতে রেখে তার ওপর সামান্য ভর দিয়ে কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সীমাহীন বিরক্তিতে তাঁর মুখটা ভরে উঠেছিল।

তিনি অত্যন্ত মৃদু স্বরে তার নাম ধরে ডাকতেই আচ্ছন্নের মতো চোখ তুলে তাকাতেই এপিভেঁতকে সে দেখতে পেল।

অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে সে আবেগের স্বরে বলল, "অ্যালবার্ট, অ্যালবার্ট তুমি, আমি এত খুশি হয়েছি!" তার চোখ দুটো দিয়ে স্রোতের মতো জলের ধারা বেরিয়ে আসতে লাগল। অ্যাটেন্ড্যান্ট একটা চেয়ার এনে তাঁকে বসার জন্য অনুরোধ করল। তিনি চেয়ারে বসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে?"

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সেটা তুমি আগেই দেখেছ। দরজায় লেখা আছে।"

এই বলে বিছানার চাদরে সে তার মুখ ঢেকে ফেলল। বিষণ্ণ এবং লজ্জিত এপিভেঁত জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করে তোমার এমন রোগ ধরল?"

সে বলল, "ওই প্রাশিয়ান পশুগুলো আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারাই আমার শরীরটাকে বিষে জর্জরিত করে দিয়েছে।"

তাঁর কিছুই বলার ছিল না।

সে বলল, "আমার মনে হয় না আমি আর কখনও ভালো হয়ে উঠব।"

এর পর সে অফিসারের বুকে ক্রুশ লক্ষ করে কান্নার আবেগে বলল, "তুমি বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছ, আমি এতে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। তুমি কি আমায় একবার জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবে?"

সে কথা শুনে সীমাহীন ভয় ও বিরক্তিতে তাঁর সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠল। সেই মুহূর্তে তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন ওই মহিলাকে যেন দ্বিতীয়বার আর দেখতে না হয়।

কীভাবে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন তা ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি তখন সাবধান হওনি?''

ইর্মার চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলে উঠল, সে বলল, ''নিজে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে প্রতিশোধের একটা তীব্র বাসনা আমার মনের মধ্যে বাসা বাঁধল। আমিও তাদের শরীরেও ওই সর্বনাশা রোগের বিষ ছড়িয়ে দিলাম রোয়েনে যতজন ছিল তাদের সকলের মধ্যে। আমার নিজের কথা তখন আর মনে নেই। যাদের মধ্যে আমি এই মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছে। আমি যে এইভাবে খানিকটা প্রতিশোধ নিয়েছি সেটাই আমার সান্ত্বনা।''

সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এপিভেঁত কর্নেলের মিথ্যা দোহাই দিতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলে ইর্মা বলল, ''তুমি একবার আমায় চুম্বন করবে?''

অত্যন্ত ঘৃণা ও বিরক্তি সত্ত্বেও তিনি তার কপালে একটা চুম্বন করলেন। ইর্মা তখন তীব্র আবেগের সঙ্গে দুহাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর নীল জ্যাকেটের ওপর এলোপাথাড়ি চুমু খেতে লাগল। তারপর বলল, ''তুমি কথা দাও, আগামী বৃহস্পতিবার বেলা দুটোয় তুমি আমার এখানে আসবে।''

''কথা দিলাম—''

সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর সহকর্মীরা জিজ্ঞেস করল, ''ভালো কথা, ইর্মা কেমন আছে?''

তিনি বললেন, ''ওর ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে। ভীষণ খারাপ অবস্থা।''

কিন্তু একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট তাঁর আচার-আচরণে অন্য এক গন্ধ পেয়ে হেড কোয়ার্টারে ফিরে গেল। পরের দিন ক্যাপ্টেন মেসে গেলে তাঁকে দেখে সকলের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। ঠাট্টাতামাশার মধ্যে তারা তাঁকে অভ্যর্থনা করল। তাদের কাছ থেকে জানা গেল, প্রাশিয়ান একজন মেজরকে সে বিয়ে করেছিল। তাকে অনেকে ব্লু রেজিমেন্টের কর্নেল এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছে।

বৃহস্পতিবার তিনি ঠিক বেলা দুটোর সময় হাসপাতালে গেলেন। কিন্তু অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে বললেন, ''আমি তোমার এখানে আর কখনই আসতে পারব না। কারণ প্রাশিয়ান অফিসারদের সঙ্গে তুমি যে কীর্তি করে বেড়িয়েছ, তাতে শহরে তোমার নামে ঢিঢি পড়ে গেছে। কলঙ্ক আর লজ্জায় মুখ দেখানো আমার পক্ষে দায় হয়ে উঠেছে।''

সে বলল, ''আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আমি নিজের কথা চিন্তা না করে

আমি তাদের মধ্যে রোগের বিষ ছড়িয়ে দিয়ে আমি তাদের মারতে চেয়েছিলাম এবং সে কাজে আমি সফল হয়েছি।''

তিনি দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, ''সে যাই হোক, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা।''

ইর্মা বলল, ''লজ্জার কথা বলছ? তুমি ক্রুশ লাভ করে যে জয়ের সম্মান অর্জন করেছ, তার থেকে অনেক বেশি কৃতিত্ব পাওয়ার যোগ্য আমি—কারণ আমি তোমার থেকে অনেক বেশি প্রাশিয়ান অফিসারকে মারার কৃতিত্ব অর্জন করেছি।''

সে বারবার একই কথা বলতে লাগল। ''তুমি যত প্রাশিয়ান অফিসারকে মেরেছ তার থেকে অনেক বেশি আমি মেরেছি। এবার তুমি এসো, কাপুরুষ কোথাকার।''

তিনি দ্রুত হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হোঁচট খেতে লাগলেন এবং সেখান থেকে দৌড়িয়ে পালিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

পর দিন শুনলেন, ইর্মা মারা গেছে।

একটি বড়োদিনের কাহিনি
A Christmas Tale

একটা আরাম কেদারায় বসে স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ডঃ বেনেফা অস্ফুট স্বরে বললেন, বড়োদিনের একটা ঘটনা, আমার স্মৃতিতে সেটা স্পষ্ট হয়ে আছে। এর পর হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, হ্যাঁ ঘটনাটা মনে পড়েছে। ভারী অদ্ভুত সে ঘটনা। অলৌকিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। অসম্ভব সেই ঘটনাটা ঘটেছিল বড়োদিনের রাত্রিতে।

আমি যে প্রকৃতির মানুষ তাতে অলৌকিক বা অসম্ভব ঘটনায় আমার কোনো বিশ্বাস নেই। সেই আমি যখন অলৌকিক অলৌকিক বলে চিৎকার করছি, তখন নিশ্চয়ই আপনারা খুবই অবাক হচ্ছেন। মনে করছেন, এ যে দেখি ভূতের মুখে রাম নাম। কিন্তু সেদিন রাত্রে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তাকে অলৌকিক বা অবাস্তব বললে বেশি বলা হয় না। সেটা আমি নিজের চোখেই ঘটতে দেখেছি, আমার এই চর্মচক্ষু দিয়েই দেখেছি।

ঘটনাটা আমি আপনাদের কাছে সবিস্তারে বিবৃত করছি।

আমি সেসময়ে একটি গ্রামে গিয়ে ডাক্তারি করতাম। বাস করতাম নরম্যানডির রোলেভিল শহরে। সে বছর এমন হাড়কাঁপানো কনকনে ঠান্ডা পড়েছিল, সবকিছু যেন জমে যাচ্ছিল। এক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত এত বেশি কুয়াশা পড়তে শুরু করল—এক হাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। সেটা ছিল নভেম্বরের শেষ। তারপর শুরু হল প্রচণ্ড তুষারপাত। একটা রাত্রির মধ্যে মাঠ ঘাট জঙ্গল সমতলভূমির সমস্ত কিছুই সাদা বরফে ঢেকে গেল। গাছপালা, নদীনালা, খালবিল, বাড়িঘর আলাদা করে আর কিছুই চেনা যায় না। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সাদা বরফ। সবকিছুই বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে।

মনে হল গোটা গ্রামটায় বিরাজ করছে এক সীমাহীন নৈঃশব্দ্য। কোথাও জনপ্রাণীর কোনো সাড়া নেই। শুধু এক ঝাঁক কাক আকাশের একটি জায়গা ঘিরে চক্রাকারে উড়ছে। মাঝে মাঝে খাবারের সন্ধানে নীচে নেমে আসছে আর বরফের মোটা আস্তরণটাকে তাদের শক্ত ঠোঁটে খুঁচিয়ে চলেছে খাবারের আশায়। এছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ শুনতে পাওয়া গেল না। শুধু শোনা গেল ঝিরঝির করে বরফ পড়ার মৃদু শব্দ। দেখতে দেখতে পাঁচ ফুট পুরু বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে গেল সবকিছু।

মনে হল কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দন নেই, সবকিছু যেন মৃত্যুর গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। গাছপালা, ঘরবাড়ি, নদী, জলাশয়, পুষ্করিণী—সবকিছু সমাধিস্থ হয়েছে মোটা বরফের চাদরের নীচে। মাঝে মাঝে চিমনির ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে মনে হল কিছু মানুষ এখনও নিশ্চয়ই বেঁচে আছে আর সেই চিন্তায় মনে

খানিকটা সাহস পেলাম। জমাট বাঁধা বরফের চাপে মাঝে মাঝে গাছ ভেঙে পড়ছে, ভয় হতে লাগল পাছে কোনো বরফ ঢাকা গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে সেখানে আমার সমাধি ঘটে। এই আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তা নিয়ে কাছাকাছি যে কয়জন রোগী আছে তাদের বাড়িতে দরকারমতো যাতায়াত করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম এলাকার সমস্ত মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যে কারণে তারা এভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে—সে কারণটা নাকি খুব সাধারণ বা স্বাভাবিক নয়। রাত্রিবেলা শুয়ে থেকে তারা যেন কার শিস দেওয়ার শব্দ শুনতে পায়। আবার মাঝে মাঝে শুনতে পায় কারা যেন বিকট স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমি অবশ্য তাদের কথার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পেলাম না। আমি আতঙ্কের কারণটাকে বিশ্লেষণ করে বুঝলাম শিসের বা কান্নার মতো শব্দগুলো পরিযায়ী পাখিদের ডাক ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা যখন রাতের অন্ধকারে উড়তে উড়তে চলে যায় কোনো এক অজানা সুদূরে তারা তখন ওইভাবে ডাকে। কিন্তু গাঁয়ের মানুষদের কাছে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বললেও তারা বুঝলেও বুঝতে চাইবে না বা সেভাবে তাদের আতঙ্ক দূর করা যাবে না। তারা ব্যাপারটাকে অপার্থিব বা ভৌতিক কিছু বলে ধরেই নিয়েছে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে গিয়ে যে রাস্তাটা মিশেছে, সেই রাস্তার এক পাশে বুড়ো ভ্যাটিনেলের কামারশালা। সে রাস্তাটা বরফে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় সেটা যে কোনো সময়ে একটা রাস্তা ছিল তা আর বোঝা যায় না আর বরফে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে সেটা এখন পথচারীদের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অবিরাম তুষারপাত হতে থাকলেও মানুষকে খাদ্যের সন্ধানে বেরোতেই হয়। না খেয়ে তো আর ঘরে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। সুতরাং সে স্থির করল খাবারের জোগাড় করতে সে গ্রামের মধ্যে ঢুকবে, দেখবে কোথাও কিছু পাওয়া যায় কি না। সে এই ভেবে ওই বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গ্রামে গিয়ে পৌঁছোল। গ্রামের যে জায়গাটায় গিয়ে সে উপস্থিত হল সেটা ছিল ওই গ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে সে কয়েকটি বসতবাড়ি দেখতে পেল। সেই সমস্ত বাড়ি থেকে সে কয়েকটা রুটি জোগাড় করল। আর শুনতে পেল সেই আতঙ্কের খবর—যে আতঙ্কে এলাকার মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। এর পর সে বেলা থাকতে থাকতেই নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর তার মনে হল সামনে কিছুটা দূরে বরফের ওপর একটা ডিম পড়ে আছে। সে আর একটু এগোতেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল। হ্যাঁ ওটা একটা ডিম। ডিম ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু ডিমটা এল কোত্থেকে। কারও বাড়ি থেকে কোনো মুরগি বেরিয়ে এসে এখানে কি ডিম পেড়ে গেছে? বুড়ো কামার কিছু বুঝতে না পেরে বেশ অবাক হয়ে গেল। যা হোক ডিমটাকে কুড়িয়ে নিয়ে সন্ধের মুখে সে বাড়ি এসে পৌঁছোল।

সে তার স্ত্রীকে ডিমটা দেখিয়ে বলল, দেখ, বরফঢাকা রাস্তার ওপর এই ডিমটা পড়ে ছিল। তার স্ত্রী অবিশ্বাসের সুরে বলল, রাস্তার বরফের ওপর ডিম কুড়িয়ে

পেয়েছ! চারিদিকে বরফে ছেয়ে গেছে, মানুষই রাস্তায় বেরোতে পারছে না—আর মুরগি এসে রাস্তার ওপরে ডিম পেড়ে গেল! বুড়ো বয়সে কি তোমার ভীমরতি ধরেছে না নেশাভাং করেছ?

আরে না, নেশাভাং কিছুই করিনি। দেখলাম ডিমটা রাস্তার ওপরে একটা বেড়ার ধারে পড়ে আছে। হাত দিয়ে দেখো, এখনও গরম আছে। যাতে ঠান্ডায় জমে না যায় সেজন্য কাপড়ের মধ্যে করে নিয়ে এসেছি। রাত্রে ডিমটা রান্না কোরো।

এর পর ঝোল রান্নার পাত্রে ডিমটাকে রেখে দেওয়া হল। গ্রাম থেকে সে যে আতঙ্কের গল্পটা শুনে এসেছিল—সেটা তার স্ত্রীকে বলতেই সে বেশ ভয় পেয়ে গেল।

সে বলল, আমিও ওরকম শিস দেবার শব্দ শুনেছি। ভেবেছিলাম ওটা চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোবার শব্দ।

এর পরে তারা আর বেশি কথা না বলে খাবার টেবিলে খেতে বসে প্রথমে স্যুপ দিয়ে খাওয়া শুরু করল। তারপর কামার যখন রুটিতে মাখন লাগানোয় ব্যস্ত ছিল তখন তার স্ত্রী ঝোলের পাত্র থেকে ডিমটা তুলে নিল। সন্দেহের চোখে ডিমটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর কামারকে জিজ্ঞাসা করল, ডিমটা যদি বিষাক্ত হয় বা অন্য কোনো পাখির ডিম হয় যা খেলে মানুষের ক্ষতি হতে পারে।

কামার বলল, "মুরগি ছাড়া অন্য কীসের ডিম হবে?"

"সেটা আমি কী করে বলব, দেখে তো মুরগির ডিম বলেই মনে হচ্ছে।"

"আরে অত চিন্তা কোরো না তো, ডিমটা খেয়ে নাও।"

কামারের স্ত্রী ডিমের খোলা ছাড়িয়ে ফেলে, খাবে কি খাবে না ভেবে ইতস্তত করতে লাগল। তারপর ডিমটাতে একটা কামড় দিয়ে স্বাদ বোঝার চেষ্টা করল, তারপর আবার একটু কামড় দিল। এইভাবে গোটা ডিমটা খেয়ে ফেলল। তারপর কিছুক্ষণ স্বামীর দিকে অপলকে বোবা চোখে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে সেই চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠতে লাগল ভয়ংকর আতঙ্কের ছায়া। তার মাথার ওপর হাত দুটো তুলে সেই হাতে মোচড় দিতে দিতে ঘুরতে লাগল। দেখা গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার সমস্ত শরীরটা ভয়ংকরভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। তারপর সারারাত ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে চিৎকার করে কেঁদে চলল। মাঝে মাঝে এমন বীভৎস স্বরে আর্তনাদ করতে শুরু করল, যে বুড়ো কামার বেচারি ভয়ে আতঙ্কে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ল।

কামারের স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বারবার একটাই কথা বলতে থাকল, উঃ কী যন্ত্রণা, আর সহ্য করতে পারছি না, তোমরা আমাকে মেরে ফেলো।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই একজন আমায় ডাকতে এল। যন্ত্রণা কমাবার যত রকমের ওষুধ আমার জানা ছিল, নিয়মানুযায়ী সবগুলোই প্রয়োগ করলাম কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না। কামারের স্ত্রী তখন পুরোপুরি উন্মাদ। ওইধরনের ভয়ংকর তুষারপাতে সমস্ত পথঘাট ঢেকে গেলেও কামারবৌকে ভূত ধরেছে এ

সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে মোটেই দেরি হল না। চারিদিক থেকে লোক আসতে লাগল কামারবৌকে দেখার জন্য। তারা এসে ঘরের সামনে ভিড় করতে থাকল কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢোকার কারও সাহস হল না—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কামার বৌ-এর ওই বীভৎস আর্তনাদ তারা শুনতে লাগল। তারা ভাবতেই পারছিল না কোনো মানুষের মুখ থেকে ওইধরনের ভয়ংকর হাড় হিমকরা শব্দ বেরিয়ে আসতে পারে।

কাছাকাছি গির্জার পুরোহিতকে এখবর দেওয়া হলে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তারপর মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে দাঁড়িয়ে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। সে কাজ শেষ করে সামনের দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। কামারের স্ত্রী তখন তাঁকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল কিন্তু জনাচারেক লোক এসে তাকে সজোরে চেপে ধরল। মহিলাটির শরীরে তখন মত্ত হাতির শক্তি। তাকে ধরে রাখতে চারজনের কালঘাম ছুটে যাওয়ার উপক্রম হল। স্ত্রীলোকটির মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠে তার সমস্ত মুখ ভরে গিয়েছিল। চোখ দুটো হয়ে উঠেছিল জবাফুলের মতো লাল।

কিছু দিন পরেই বড়োদিন। আবহাওয়া রয়ে গেল একইরকম। ক্রিসমাস ইভ এর সকালবেলা গির্জার পুরোহিত আমাকে এসে জানালেন যে তিনি ভূতগ্রস্তা স্ত্রীলোকটিকে গির্জার প্রার্থনা সভায় নিয়ে যাবেন বলে স্থির করেছেন। তাঁর আশা, যে বিশেষ মুহূর্তে মা মেরি প্রভু যিশুকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন সেই শুভ মুহূর্তে তাঁর প্রভাবে রোগিণী হয়তো সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।

আমি বললাম, আপনার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। প্রকৃতই যদি এই পবিত্র প্রার্থনার প্রভাব পড়ে এই রোগিণীর ওপর তাহলে সে অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবে আর সেটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তখন অন্য কোনো ওষুধ খাওয়ারও প্রয়োজন হবে না— তা ছাড়া অনেক ওষুধ প্রয়োগ করে তো দেখলাম কোনো ওষুধেই কোনো কাজ হয়নি।

বৃদ্ধ পুরোহিত তখন বললেন, ভগবানের অসীম শক্তি বা তাঁর অমোঘ প্রভাব সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা বা বিশ্বাস নেই। তবুও তোমার কাছে আমার অনুরোধ, তুমি এ ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য কর।

আমি বললাম, আপনি এমনভাবে বলছেন কেন? আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব।

এর পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃতির বুকে নেমে এল রাত্রি। গির্জার থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মনে হল সেই ঘণ্টাধ্বনি জমাটবাঁধা বরফের পরিত্যক্ত পরিবেশে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগত করুণ এক বিষণ্ণ সুর। আকাশের পূর্ণ চাঁদের কিরণ কুয়াশায় ঘেরা বরফের আস্তরণের ওপর পড়ে নিস্তব্ধ চরাচরে ছড়িয়ে দিয়েছে ম্লান আলো। তা যেন সকরুণ আর্তি হয়ে মিশে যাচ্ছে বাতাসে ভেসে আসা ঘণ্টাধ্বনির করুণ আর্তনাদের সঙ্গে। চারজন বলিষ্ঠ চেহারার যুবককে সঙ্গে করে আমি কামারবাড়ির দিকে রওনা হলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম ভূতগ্রস্তা স্ত্রীলোকটিকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সে তখনও সমানে চিৎকার করে চলেছে। তার বীভৎস তীক্ষ্ণ চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছিল। যা হোক বহু কষ্টে তাকে পোশাক পরিয়ে গির্জায় নিয়ে আসা হল। কৌতূহলী দর্শকদের ভিড়ে গির্জার সামনের মাঠটায় তিলধারণের জায়গা ছিল না। এর মধ্যে স্ত্রীলোকটিকে গির্জার রান্নাঘরে আটকিয়ে রেখে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। প্রার্থনা শুরু হলে তাকে বাইরে বের করে আনব এই ভেবে।

আমি স্থির করেছিলাম, খ্রিস্টের পর্ব চুকে গেলে তাকে বের করে আনব। পুরোহিত তাঁর ধর্মীয় রীতি অনুসারে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রভুর গুণকীর্তন করলেন। উপস্থিত দর্শকরা সেই সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করল সমবেত কণ্ঠে। সঙ্গীত শেষে পাদরি সকলের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন পবিত্র জল।

এর পর সেই ভূতগ্রস্তা স্ত্রীলোকটিকে ঘর থেকে নিয়ে আসা হল। চারিদিকে আলো, ধূপের পবিত্র গন্ধ, ঘণ্টাধ্বনি, পাদরির সুললিত স্বরে মন্ত্রপাঠ—এই পরিবেশের মধ্যে এসে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। যারা তাকে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সেটা করতে না পেরে করুণ আর্ত চিৎকারে ভরিয়ে তুলল সমস্ত পরিমণ্ডলের বাতাস। দর্শকদের মধ্যে অনেকে তার বীভৎস চেহারা দেখে আর বিকৃত কণ্ঠের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তার বিকৃত বীভৎস মুখভঙ্গি দেখে মনে হল সে কোনো অতীন্দ্রিয় লোকের অধিবাসী। সে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে কখনও পাক খেতে লাগল, কখনও হাত-পা মুড়ে চোখ মুখের ভয়াল ভঙ্গি করে নাচতে লাগল। কখনও আবার দাঁত কিড়মিড় করে চোখ দুটো করমচার মতো লাল করে সামনে বসে থাকা লোকগুলোকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। কিন্তু সেই চারজন বলিষ্ঠ যুবক তাকে জোর করে চেপে ধরে শুইয়ে রাখল মেঝের ওপর।

পাদরি এবার উঠে দাঁড়ালেন। এর পর স্বর্ণবন্ধনীতে জড়ানো একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রভু যিশুর পাদদেশ থেকে টেনে নিলেন। সেই ধর্মগ্রন্থখানির ওপরে ঠিক মাঝের অংশে সাদা রংএর চকচকে খানিকটা আঠা লাগানো ছিল। বইখানি হাতে করে তিনি তার দিকে এগিয়ে এলেন। তারপর একেবারে সামনে এসে বইটাকে একটু ওপরে তুলে তার ভয়ার্ত চোখের সামনে চকচকে আঠালো অংশটাকে তুলে ধরলেন, সে সেদিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তারপর ভয়ংকর আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল। পাদরিও ভাবলেশহীন চোখে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এভাবে খানিকটা সময় কেটে গেলে, মনে হল স্ত্রীলোকটি যেন বেশ ভয় পেয়ে গেছে। সেই বইয়ের সাদা চকচকে অংশটার দিকে তাকিয়ে ভীষণ আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করল। মনে হল সে সেখান থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করে তার চোখ দুটোকে সেদিকে টেনে রেখে দিয়েছে। একসময় তার কাঁপুনি থেমে গেল। আবার সে আগের মতো চিৎকার করতে শুরু করল, কণ্ঠস্বর তেমনি বীভৎস, তেমনি বিকৃত। কিন্তু সেই চিৎকারের শব্দও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল।

সেসময় অনেক চেষ্টা করেও বইএর ওই চকচকে সাদা অংশটা থেকে চোখ দুটোকে সরাতে পারল না, তখন সে গোঙাতে শুরু করল এবং এক সময় সে গোঙানির শব্দ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় থেমে গেল। এবার গভীর ক্লান্তি আর ভয়ংকর অবসাদে সে ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়তে লাগল। উপস্থিত দর্শকরা প্রভু যিশুর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাল।

স্ত্রীলোকটি কয়েকবার যিশুর মূর্তির দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ নামিয়ে নিল। মনে হল সেদিকে তাকিয়ে থাকতে সে ভয় পাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পরে লক্ষ করলাম, ধীরে ধীরে তার চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল। পাদরি বাবা আর একবার যিশুর কাছে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন। জনতা সমবেত কণ্ঠে সেই প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করল।

এর পর কামারের স্ত্রী এক নাগাড়ে দুদিন ঘুমিয়ে রইল। যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে ইতিউতি চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কখনও যে ও ধরনের ঘটনা ঘটেছিল তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ ছিল না তার মধ্যে। সেসব কথা তার কিছুই মনেও ছিল না। এই ঘটনাটা আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম। সেটা অলৌকিক বা অন্য কিছু তা আপনারা বিচার করবেন।

দৈত্যদের মাতা
The Mother of Demons

যে ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি, এমন একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত সেই ভয়ংকর বিস্ময় সৃষ্টিকারী সেই মহিলার কথাও আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। একটা উঁচু জায়গা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম। সে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বেলাভূমির ওপর দাঁড়িয়েছিল। তরুণী স্ত্রীলোকটিকে প্যারির সকলেই চিনত। সে ছিল অসাধারণ সুন্দরী, লাস্যময়ী ছিল তার দেহভঙ্গিমা। সকলেই তাকে প্রেম নিবেদন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত।

ঘটনাটা বহু প্রাচীন হলেও এর বিশেষত্ব বা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সেটাকে ভুলতে দেয়নি।

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শহরতলির যে বাড়িটাতে বাস করত, সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবার জন্য সে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। বন্ধু যে জেলা-শহরে বসবাস করত তা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং কতখানি গৌরবময় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ তা বোঝাবার জন্য আমাকে সমস্ত শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার আগ্রহের আতিশয্যে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম আর দেখলাম, বিশাল বিশাল সব দুর্গ—যেগুলো ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। দেখলাম—চকমিলানো জমিদার বাড়ি, কয়েকটি বড়ো বড়ো শিল্পকেন্দ্র এবং অসংখ্য ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ এবং গির্জা, স্তম্ভ, গথিক শিল্পে তৈরি বড়ো বড়ো অট্টালিকা এবং আরও অনেক কিছু।

দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে সত্যি আমি আনন্দ পেলাম এবং তাতে আমার মধ্যে যে উৎসাহ সে লক্ষ করল তাতে সে খুশি হল। সামনের বিরাট মহিরুহের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমি ক্লান্তি দূর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। কিন্তু সে ভয় পেয়ে আমাকে বাধা দিল। বলল, ওই গাছের নীচে কেউ যায় না—ওখানে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ দানবদের মা থাকে ওখানে।

আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে আবার কী, কে দানবদের মা?

সে উত্তর দেয়, 'সে এক ভয়ংকর স্ত্রীলোক, যেন এক রাক্ষসী। সে প্রতিবছর ওখানে জন্ম দেয় অনেকগুলো বীভৎস আকৃতির বিকট চেহারার রাক্ষস-সন্তান। সে আবার তাদের বিক্রি করে দেয় ঘুরে ঘুরে যারা মুরগি কেনাবেচার ব্যবসা করে, তাদের কাছে।

'ওই সমস্ত যাযাবর ব্যবসায়ীদের আচার-আচরণ চালচলন সভ্য সমাজে সম্পূর্ণ বেমানান। ওই রাক্ষস-মা যখন তার সন্তান প্রসব করে তখন তারা এসে সেখানে উপস্থিত হয় এবং তার কাছ থেকে তারা তাদের কিনে নিয়ে যায়।

'এযাবৎ সে এ ধরণের এগারোটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং তাদের বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। তোমার হয়তো মনে হচ্ছে, আমি তোমার কাছে আষাঢ়ে

গল্প ফাঁদছি। কিন্তু জেনে রেখো আমি যা বলছি, তার একবর্ণও মিথ্যা নয়।

'তোমাকে আজ সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখাব। তারপর কীভাবে সে বছরের পর বছর এমন সব দানব-সন্তানের জন্ম দিয়ে চলেছে, সে কাহিনিও তোমাকে বলব সবিস্তারে।'

এর পর সে সেই দানব-মাতাকে দেখাবার জন্য আমাকে নিয়ে গেল শহরতলির একেবারে শেষ প্রান্তে।

স্ত্রীলোকটি রাস্তার পাশের একটা ছিমছাম ছোট্ট সুন্দর বাড়িতে বাস করে। বাড়ির সামনে একফালি ছোট্ট বাগান—সেখানে ফুটে আছে রং বেরং-এর নানারকম ফুল। বাতাসে মিশে আছে ফুলের সুবাস।

একজন ভৃত্য আমাদের দেখতে পেয়ে বৈঠকখানায় এনে বসাল। কয়েক মুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা করার পর দানব-মাতা আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দীর্ঘাঙ্গী, শক্তপোক্ত চেহারা, দেখলে মনে হয়, চাষি পরিবারে মানুষ হয়েছে বা চাষি পরিবারের গৃহিণী। অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমে নারীসুলভ সমস্ত কমনীয়তা হারিয়েছে। চেহারাটা হয়ে উঠেছে পুরুষকঠিন। তাকে দেখে দর্শকের মনে যে কী ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে—সে বিষয়ে সে যথেষ্ট সচেতন ছিল। সুতরাং সে তিক্ত কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল, মশাইদের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী?

উত্তরে আমার বন্ধু জানায়, "শুনলাম সম্প্রতি আপনি যে শিশুটির জন্ম দিয়েছেন, তার আকার আকৃতি নাকি স্বাভাবিক, আপনার অন্যান্য সন্তানদের মতো নয়—ব্যাপারটা সত্যি কি না সেটা জানার জন্যই আমরা এখানে এসেছি।"

আমাদের অহেতুক কৌতূহল দেখে মনে হল সে বেশ বিরক্ত হয়েছে। সুতরাং গলার স্বরে সেই ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, কে বলেছে আপনাদের সে-কথা, বরং সে তার অন্যান্য ভাইদের থেকেও অনেক বেশি বীভৎস আর কুৎসিত চেহারা নিয়ে জন্মেছে। ভগবান কেন আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর সে কথা আজও পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।

কথা বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল কান্নার শব্দ। সে তখন মুখ নীচু করে কেঁদে চলেছিল। সেই দুঃখ যন্ত্রণাও যেন তার পরুষসুলভ কঠোরতা বা কর্কশতাকে ম্লান করতে পারল না। ওই করুণ কান্না তার চেহারা আর আকার আকৃতির কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ ও বেমানান মনে হল।

বন্ধু বলল, আপনার ওই ছেলেটিকে যদি একবার দেখান।

সে-কথা শুনে স্ত্রীলোকটি যেন একটু লজ্জা পেল। আর সেই লজ্জার প্রতিক্রিয়া রক্তাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার সমস্ত মুখে। অদ্ভুত ব্যাপার! এমন তো হওয়ার কথা নয়, তবে কি সেটা আমার চোখের ভুল?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে একটু রূঢ় স্বরে বলল, কী জন্য আমার ছেলেকে আপনারা দেখতে চাইছেন—ওকে দেখে কী করবেন আপনারা? প্রশ্নটা করে সে অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে।

আমার বন্ধু এবার অত্যন্ত রুক্ষস্বরে বলে, 'বাচ্চা দেখাতে আপনার কি খুব আপত্তি

আছে? কই, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার পর অন্য অনেককে বাচ্চা দেখাতে তো আপত্তি করেন না—কাদের কথা বলছি, সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই আপনার অসুবিধা হচ্ছে না?'

বন্ধুর কথা শেষ হতেই স্ত্রীলোকটি যেন খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। আর সেই ভাব গোপন করতে সে ভয়ংকর রাগে চিৎকার করে ওঠে, ''সেইজন্যই বোধহয় আমাকে নিয়ে রসিকতা করার জন্য এই নরকে এসে হাজির হয়েছেন? আমি কি কিছুই বুঝতে পারছি না ভেবেছেন? আমি কি একেবারেই বোকা গাধা? আমি আমার সন্তানকে দেখাব না, কিছুতেই না—ভালো চান তো এই মুহূর্তে আমার এখান থেকে বেরিয়ে যান—আমি জানি কোন্ বদ মতলবে আপনারা আমার কাছে এসেছেন? আমি জানি আপনাদের উদ্দেশ্য একটাই—আমাকে এভাবে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়ে আঘাত করা।''

এই কথা বলতে বলতে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো। তার ওই ক্রুদ্ধ চিৎকারে ঘরের ভিতর থেকে অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—শব্দটা খানিকটা গোঙানির মতো অথবা রোগাক্রান্ত কোনো বিড়ালের ডাক। সেই বিজাতীয় বীভৎস শব্দে আমার হাড়ে কাঁপন ধরে।

আমরা এর পর ওখান থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টায় দরজার দিকে দ্রুত পা ফেলতে শুরু করি। যাওয়ার সময় বন্ধু ওকে শোনাবার জন্য বলে, ''একটু সাবধানে থাকার চেষ্টা কোরো, মহিলাটি একটা রাক্ষসী ছাড়া আর কিছু নয়, সুযোগ পেলেই তোমার ভয়ংকর সর্বনাশ করবে।''

বন্ধুর কথাগুলো তার কানে ঢোকামাত্রই সে রাগে পাগল হয়ে গিয়ে বলতে থাকে, ''অসভ্য, জানোয়ার, বদমাশ, ইতর কোথাকার—এই মুহূর্তে এখান থেকে দূর হয়ে যাও।'' কথা বলতে বলতে সে এমনভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল মনে হল সে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অবশ্য সে সুযোগ সে পায়নি। তার আগেই আমরা দরজার বাইরে চলে এসেছি রীতিমতো ভয় পেয়ে।

বাইরে বেরিয়ে বন্ধু আমাকে বলল, কী বলেছিলাম তোমাকে, এখন দেখলে তো?

আমি বললাম, ওর জীবনের করুণ কাহিনি যদি তোমার জানা থাকে বল, আমি শুনব।

মাঠের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা অনেক দূর চলে গেছে, সেই পথে পায়চারি করতে করতে বন্ধু আমাকে এক মর্মান্তিক কাহিনি শোনাল।

আজ লোকে যাকে দানব-মাতা বলে জানে, সে তার ছেলেবেলায় একটা খামারে কাজ করত। নিজের কাজের ব্যাপারে তার যেমন ছিল নিষ্ঠা সে তেমনি ছিল পরিশ্রমী। ব্যবহার বা আচার-আচরণও ছিল চমৎকার। নিয়ম মেনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সে তার কাজগুলো করে ফেলত। তার যে-কোনো প্রেমিক ছিল এমন কথা কখনও শোনা যায়নি বা সে সমস্ত ব্যাপারে যে তার কোনো দুর্বলতা আছে তার আচার-ব্যবহারে সেটা কখনও প্রকাশ পায়নি।

তখন ফসল কাটার সময়। এই সমস্ত অসহায় মেয়েরা পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে

সাধারণত যে অবস্থার শিকার হয় তারও সেই অভিজ্ঞতা হল। আকাশে তখন কালো মেঘের ঘনঘটা, ঝড়ের পূর্বলক্ষণ। মেয়েটিকে তখন একজন লোক পাকা ফসলের গাদার ওপর চিৎ করে ফেলে দিয়ে তার সমস্ত পোষাক একটা একটা করে খুলে নিল—তারপর তার সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শরীরটাকে বিধ্বস্ত করতে লাগল, মন্থন করতে লাগল তার শরীরের সব থেকে মাদক আকর্ষণের বস্তুটিকে। আর সেই মন্থনের তালে তালে লোকটির সমস্ত শরীর আন্দোলিত হতে লাগল, ঘামে ভিজে উঠল সমস্ত শরীর। যৌবনের সন্ধিক্ষণে সে প্রথম অনাস্বাদিত যৌনস্বাদ উপভোগ করল।

এর কিছু দিন পরে সে অনুভব করল তার গর্ভে সন্তানের উপস্থিতি। লজ্জা ভয়ে সে একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন তার একমাত্র চিন্তা কী করে সেই এই কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাবে। ভাবতে ভাবতে সে এক বিচিত্র উপায় আবিষ্কার করল। কাঠ আর দড়ি দিয়ে সে তার পেটটাকে খুব শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধল। সময় যত পেরিয়ে যায় ততই সেই বাঁধন শক্ত হতে থাকে। এইভাবে তার উদরের স্ফীতিকে লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে থেকে আড়াল করতে সক্ষম হল সে এবং তাতে তার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেল।

এইসব উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন করার জন্য তাকে দিবারাত্র অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করতে হত। তবু সে মুখ বুজে সাহসের সঙ্গে সে যন্ত্রণা সহ্য করত। সেই কষ্ট সে এমনভাবে চেপে রাখত যাতে তার ভাবভঙ্গি বা চালচলনে তা প্রকাশ হয়ে না পড়ে এবং সে ব্যাপারে কেউ যেন তাকে সন্দেহ করতে না পারে।

সে বুঝতে পারে তার শরীরের মধ্যে আর একটি শরীর ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠতে চাইছে—সুতরাং সেই বৃদ্ধির যাতে আর বিস্তার না ঘটে সেজন্য নিজের পেটটাকে বেশ কয়েকবার জোরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে আরও শক্ত করে দড়ি ও কাঠ দিয়ে পেটটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলে। তার পোশাকের নীচে সন্তান হত্যার অদ্ভুত এক মারণাস্ত্র সে যে অতি সংগোপনে লালন করে চলেছে—বাইরে থেকে তা কেউ বুঝতে পারে না। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে সে এইভাবে তিল তিল করে হত্যা করে চলেছে এই অভিনব চেষ্টায়। যে উপায় সে আবিষ্কার করেছে তার ফলে তার গর্ভস্থ সন্তানের আকার আকৃতি ক্রমশ হয়ে উঠছে বিকৃত, বীভৎস। তাকে প্রসব করতে হবে এক বিরাট ও বিকৃত চেহারার একটি শিশু। মাথার আকারটা হয়ে গেছে কোনো সমতল বস্তুর মতো চ্যাটালো থ্যাবড়া। কপালটা ক্রমশ সরু হতে হতে একটা বিন্দুর মতো হয়ে গেছে। সেই কপালে দুটো চোখ, অনেকটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হাত-পায়ের গাঁটগুলো অকেজো হওয়াতে সেগুলো লতার মতো ঝুলে থেকে দোল খায়। মাকড়সার দেহের আকার পেয়েছে আঙুল এবং পায়ের পাতা। বুকটা বিকৃত হয়ে ছোট হয়ে গেছে—আর হয়ে উঠেছে সুপারির মতো গোলাকার।

বসন্তকালের এক সকালবেলায় সে খোলা মাঠের মধ্যে ওই বীভৎস বিকৃত চেহারার জীবটিকে প্রসব করল। তাকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে মাঠের আশপাশের

বাড়িগুলো থেকে অনেক স্ত্রীলোক তার সাহায্যে ছুটে এসেছিল কিন্তু সদ্যোজাত শিশুটির ভয়ংকর বীভৎস রূপ দেখে তারা এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস করেনি। লোকে বলাবলি করতে থাকে মেয়েটার পেটে একটা দানবের জন্ম হয়েছে। বিকৃত চেহারার শিশুটির জন্ম দেওয়ার পর থেকে সকলের কাছে সে দানব-মাতা বলে পরিচিত হল।

খামারমালিক তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিল। আয়ের রাস্তা তার বন্ধ হয়ে গেল। বেঁচে থাকতে হল তাকে অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে। হয়তোবা তার গোপন প্রেমিকদের সাহায্যে সে বেঁচে রইল। তার সৌন্দর্য ও যৌবনপুষ্ট শরীরের আকর্ষণে অনেক রিপুজর্জরিত মানুষ নরকের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পেত না।

মায়ের ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে বড় হতে থাকে দানব শিশুটি।

এক দিন যাযাবর শ্রেণির কয়েকজন মানুষ ওই দানব শিশুর কাহিনি শুনে তার মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং শিশুটিকে দেখার ইচ্ছা জানায়। শিশুটিকে দেখে তারা পছন্দ করে এবং নগদ পাঁচশো ফ্রাঁ দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে যায়—ওই অদ্ভুত চেহারার জীবটিকে লোক-সমাবেশে দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করবে বলে।

প্রথমে সে শিশুটিকে দেখাতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু যখন সে বুঝল এই পৃথিবীতে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার অন্য কোনো উপায় নেই, তখন সে তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। এছাড়া তারা কথা দিয়েছিল ওই শিশুটিকে দেখিয়ে তারা যে অর্থ উপার্জন করবে, তা থেকে তারা বছরে চারশো ফ্রাঁ হিসাবে তাকে দিয়ে যাবে।

অপ্রত্যাশিত এধরনের সৌভাগ্যে এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের আকর্ষণে সে একটার পর একটা দানব-সন্তানের জন্ম দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, একমাত্র এই উপায়েই তার পক্ষে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে অপরের দ্বারস্থ না হয়ে।

জমি যেখানে যথেষ্ট উর্বর সেখানে ফসল তো ফলবেই। আর তার গর্ভের উর্বরতা তাকে ফলদানে বঞ্চিত করল না। সে এর পর থেকে ওই একই পদ্ধতিতে একটার পর একটা দানব-সন্তানের জন্ম দিয়ে চলল অবশ্যই তার প্রেমিকদের সঙ্গে যৌন সহবাসে আনন্দ লাভ করে। নিজের জঠরে সন্তানের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করার পর থেকে নূতন নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে ভূমিষ্ঠ শিশুর বিকৃতি ও বীভৎসতার মধ্যে বৈচিত্র্য এনে তাকে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। গর্ভস্থ ভ্রূণের ওপর কঠোর নির্যাতনের ফলে সে কয়েকটি মৃত সন্তান প্রসব করল আর তাতে তার যে লোকসান হল—তাতে সে অত্যন্ত দুঃখবোধ করল।

তার যে সন্তানগুলো বেঁচে থেকে তাদের মায়ের সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছে—তাদের সংখ্যা বর্তমানে এগারো। তাদের মা বছরে এখন দু'হাজার ফ্রাঁ উপার্জন করে। তার শেষ সন্তানটিকে এখনও পর্যন্ত সে নিজের কাছে রেখেছে—যাযাবর শ্রেণির লোকগুলোর কাছে তাকে এখনও বিক্রি করেনি। কিন্তু নামকরা বড়ো বড়ো সার্কাস কোম্পানি ওই খবর পেয়ে তার কাছে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছে।

প্রদর্শন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে তার সন্তানদের নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে কত বেশি দামে তার সন্তানদের কিনে নিতে পারে—আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে বদ্ধপরিকর।

বন্ধু এবার চুপ করল। বন্ধু যে ঘটনার কথা শোনাল তাতে স্ত্রীলোকটির ওপর ঘৃণা ও রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল। মনে হচ্ছিল শয়তানি স্ত্রীলোকটিকে ধরে বেশ ঘাকতক লাগিয়ে দিই।

কিন্তু ওদের ঔরসদাতাটি কে?—আমি সাগ্রহে জানতে চাই।

"নির্দিষ্ট কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। অন্য লোককেও সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে শুনিনি। প্রেমিক তার একজনও হতে পারে আবার অনেক হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে তারা অত্যন্ত গোপনে এবং সতর্কতার সঙ্গে কাজ সারে। মনে হয় ঔরসদাতাও আয়ের একটা অংশ পায়।"

কিছুদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ভুলে যেতে বসেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার দেখে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল।

এক দিন বিকেলের দিকে সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে যেতেই একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেখানে দেখলাম এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলাকে যাকে ঘিরে আছে বহু চাটুকার এবং যাকে সম্মান জানানোর জন্য প্যারিসের বহু লোক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বেড়াতে বেরোবার সময় এক ডাক্তার-বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে সেই ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে মিনিট দশেক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, সমুদ্র তীরের বালির ওপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে বিকৃত দেহের তিনটি শিশু আর তাদের সামলাচ্ছে একজন নার্স। শিশু তিনটির হাত পা ও শরীরের আকৃতি এতটাই বিকৃত যে তাকে মানুষ বলে চিনে নেওয়া সত্যিই আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল।

ডাক্তার বন্ধু বলল, "যে সুন্দরী মহিলাটিকে ঘিরে এত স্তাবকের ভিড় দেখছ—এগুলো ওই মহিলারই সন্তান।"

আমি বললাম, "ওই শিশু তিনটির জন্য আমার যতটা কষ্ট হচ্ছে তার থেকে বেশি করুণা হচ্ছে ওদের অভাগিনি মায়ের জন্য। কিন্তু এমন সব সন্তানের জন্ম দিয়েও ওই মহিলাটি দিব্যি স্তাবকদের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে।"

ডাক্তার বলল, "ওদের মায়ের জন্য যে তুমি এতটা করুণা বোধ করছ, তেমন কিছুই ঘটেনি, তবে শিশুগুলোর জন্য যে তুমি দুঃখবোধ করছ সেটা খুবই স্বাভাবিক।"

স্ত্রীলোকটি তার গর্ভেই এভাবে তার সন্তানদের বিকৃত করে তোলে শুধুমাত্র চেহারার জৌলুস বজায় রাখার জন্য। আর সেজন্য সে মোটেই অনুতপ্ত নয়, বরং সানন্দে সে এ ধরনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আর সেজন্য সে এখনও পর্যন্ত একইরকমভাবে আকর্ষণীয় রয়ে গেছে।

বন্ধুর কথা শুনে আমার সেই দৈত্যদের মা সেই সুন্দরী স্ত্রীলোকটির কথা মনে পড়ে গেল।

আর্দালি
Orderly

কবরখানার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু বিভিন্ন পদাধিকারী সামরিক অফিসার। চার দিকটা যেন ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে। এইমাত্র এক সুন্দরী তরুণীর মৃতদেহটিকে নামিয়ে দেওয়া হল কবরের নীচে। সেই কবরের নীচের দিকে যেখানে মৃতদেহটি শায়িত রয়েছে, সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্নেল লিমোসিন। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেছে। দুঃসহ শোক আর দুঃখের আঘাতে তিনি ভিতরে ভিতরে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন কিন্তু তাঁর অসম্ভব মানসিক দৃঢ়তা তাঁর আচরণ বা মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ হতে দেয়নি। তাঁর মনে হচ্ছিল সেই কবরের নীচের দিকটা যেন কোনো সীমাহীন গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে আর সেইসঙ্গে তাঁর নিজের সমস্ত সত্ত্বা এবং অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে সেই নিঃসীম অন্ধকারে।

তিনি দুঃসহ দুঃখ ও শোকের আঘাতে এত বেশি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁব সমস্ত শরীর ও মন এক জড় বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে চলে যাওয়ার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ওই অবস্থা লক্ষ করে জেনারেল গুরমঁত নামের একজন সামরিক অফিসার তাঁকে হাত ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এর পর তিনি নীরবে ধীরে ধীরে তাঁর নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ টেবিলের ওপর একখানি চিঠির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। দেখলেন সেখানে তাঁর স্ত্রীর নিজের হাতে লেখা ঠিকানাসহ একখানি খাম পড়ে আছে।

কর্নেল লিমোসিন টেবিল থেকে খামটা তুলে নিলেন। এর পর খামটা খুলে চিঠি বের করে পড়তে শুরু করলেন।

কর্নেলের চেহারার মধ্যে বয়সের ছাপ পড়েছে। তাঁব শীর্ণ দীর্ঘ আকৃতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় যে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর কোটরাগত চোখ দুটোর মধ্যে তারুণ্যের সেই দীপ্তি এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সে দুটো এখন ম্লান ও নিষ্প্রভ। আজ প্রায় তিন বছর তিনি এক সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করেছেন। সে তাঁর এক সহকর্মীরই মেয়ে। সেই সহকর্মীর হঠাৎ মৃত্যুতে সে তার পিতা ও একমাত্র আত্মীয় ও অভিভাবককে হারিয়ে সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বাধ্য হয়েই সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলেন। তাঁর কন্যাসন্তান থাকলে সে এতদিন তারই বয়সি হত।

তাঁদের দুজনের বয়সের মধ্যে এতটাই প্রভেদ যে প্রথম দিকে তাঁর তরুণী বধূ তাঁকে বাবা বলে ডাকতে শুরু করে। কর্নেলও সময় সময় সব কিছু ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে তাঁর নিজের মেয়ের মতো ব্যবহার করতে থাকেন। সেই তরুণী বধূও সময় সময় তাঁর ছোট্ট মেয়েটির মতো তাঁর কোলে বসে কতরকমের আবদার করত, যেমন ছোট্ট কোনো আদরের মেয়ে তার বাবার কাছে আদর আবদার করে।

চিঠিটা পড়তে শুরু করে দেখলেন তাতে লেখা আছে, আগেও যেমন তোমাকে বাবা বলে সম্বোধন করতাম—আজও চিঠি লেখার সময় সেই বাবা নামেই সম্বোধন করছি। মনে কোরো না এই চিঠি লিখে তোমার কাছে আমি দয়া ভিক্ষা করছি বা আমার পাপমুক্তির জন্য তোমাকে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবার অনুরোধ করছি। আমি কোনো কিছু গোপন না করে প্রকৃত সত্য ঘটনাটাকে প্রকাশ করতে চাই। কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আমাকে পাড়ি দিতে হবে মৃত্যুর অন্ধকার জগতে।

আমার বাবার মৃত্যুর পর আমাকে চূড়ান্ত অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে, পরম আদরে ভালোবাসায় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে। সেজন্য তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণের অন্ত নেই। তোমাকে আমি আমার বাবার মতোই ভালোবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমরা যখন শহরে আমাদের বাড়িতে এলাম তখন একজনের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লাম। তার প্রতি ভালোবাসার আবেগে আমি অন্ধ হয়ে যেতে বসেছিলাম।

প্রথম দিকে প্রেমের তীব্র আবেগ ও ইচ্ছায় নিপীড়িত হলেও আমি ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমি আমার মন ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছিলাম কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি সম্পূর্ণ হেরে গিয়ে সেই অসংযত আবেগ ও ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। নরকের অন্ধকারে আমার পতন ঘটল। যাই হোক, আমার সেই প্রেমিকের নাম তুমি জানতে চেয়ো না আর চাইলেও জানতে পারবে না। আমি তাকে সত্যিকারের ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তুমি যদি তাকে ঘৃণা কর তাহলে আমি সত্যিই ভীষণ দুঃখ পাব। যে দশ-পনেরোজন অফিসার আমাকে প্রেমনিবেদন করার জন্য সর্বদা ব্যগ্র হয়ে থাকত, সে ছিল তাদেরই একজন। সুতরাং তাকে তুমি আলাদাভাবে চিনে নিতে পারবে না।

আমরা এক দিন ঠিক করলাম বেকাসে দ্বীপের একটি নির্জন স্থানে আমরা মিলিত হব। স্থির হল আমি সাঁতরে দ্বীপের পাড়ে উঠে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকব অথবা সে সেখানে আগে পৌঁছিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেখলাম সে আমার জন্য আগে থেকে সেই ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। কিন্তু সেখানে হঠাৎ তোমার আর্দালি ফিলিপ্পিকে দেখতে পাব স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। তাকে দেখে আমার সমস্ত হাত-পা ভয়ে অসাড় হয়ে গেল। ফিলিপ্পি আমাকে অভয় দিয়ে বলল, ম্যাডাম, আপনি ভয় পাবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান।

তার পরদিন ফিলিপ্পি এসে বলল, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না—যদি কোনো চিঠি দেওয়ার থাকে দিতে পারেন, আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।

ফিলিপ্পি আমাদের চিঠি আদানপ্রদানের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। তার হাত দিয়ে আমি সমস্ত চিঠি পাঠিয়ে দিই। সে ব্যাপারে তার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। চিঠির মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ রেখেছিলাম।

এইভাবে মাস দুই কেটে যাবার পর আমরা চিঠির মাধ্যমে সেই দ্বীপের নির্জন ঝোপে নির্দিষ্ট একটি সময়ে তাকে আসতে বলি। ফিলিপ্পি সে কথা জানতে পেরে আগে থেকে সেই ঝোপে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সে তার দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ করার জন্য আমার প্রেমিককে সে চিঠি পৌঁছে দেয়নি। সে আমার শরীর ভোগ করতে চেয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ে বলে আমি যদি তার সঙ্গে সহবাস করতে আপত্তি করি তাহলে সে সমস্ত চিঠির কথা ফাঁস করে দেবে। তোমার কাছে সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই। এইভাবে একটি নরক থেকে আর একটি নরকে আমি ডুবে যাই। ফিলিপ্পি আমার দুর্বলতা ও অসহয়তার সুযোগ নিয়ে আমার যৌবনপুষ্ট শরীরটাকে যথেচ্ছভাবে বারবার ভোগ করে।

কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন আমার শরীরটাকে এইভাবে ব্যবহার করে চলেছে—সেটা আমাকে ভয়ংকর যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে। অবলা ও নিরীহ কোনো পশুকে যেভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তিল তিল করে হত্যা করা হয়, আমি যেন ফিলিপ্পির হাতে সেইভাবে নির্যাতিত হয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চললাম। সুতরাং স্থির করলাম নদীতে স্নান করতে যাব আর নদীর অতলে তলিয়ে গিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। এই চিঠি যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছোবে তখন আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছি। আমার প্রেমিকের কাছেও একটা চিঠি পাঠিয়েছি। সেটাও যথাসময়ে তার কাছে পৌঁছে যাবে।

তোমাকে আর আমার কিছুই বলার নেই। আমার কৃত অপরাধের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। জীবিত অবস্থায় যে কথা বলার সাহস হয়নি, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে-কথা জানাতে আমার মোটেই ভয় নেই। কারণ মৃত্যুতেই সমস্ত ভয়ের অবসান ঘটে। তোমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি।

চিঠি পড়া শেষ করে লিমোসিন তাঁর আর্দালিকে ডেকে পাঠালেন। আর্দালি তাঁর ডাক পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। তিনি তখন তাঁর ড্রয়ার থেকে গুলিভরা রিভলবারটা বার করে নিয়ে বললেন, "তুমি যদি আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নাম জানো তো এক্ষুণি বল।"

তাঁর কথা শুনে ভয়ে ভাবনায় আতঙ্কে তার সমস্ত মুখটা কালো হয়ে উঠল। সে আমতা আমতা করতে লাগল।

কর্নেল এবার বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান, শিগগির তার নাম বল।"—তাঁর কণ্ঠস্বরে বজ্রের গর্জন।

ফিলিপ্পি তখন বলল, "ক্যাপ্টেন অ্যালবার্ট।"

সঙ্গে সঙ্গে লিমোসিনের হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠল। গুলিটা গিয়ে লাগল ফিলিপ্পির ঠিক কপালের মাঝখানে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখলেন তার দেহে প্রাণ নেই।

কালা ও বোবা
The Deaf And Dumb

হে প্রিয় বন্ধু আমার, প্যারিসে না ফেরার কারণ সম্বন্ধে তুমি জানতে চেয়েছ। কিন্তু কারণটা যখন জানতে পারবে তুমি ভীষণ অবাক হয়ে যাবে।

আমার প্যারিসে ফিরে না যাওয়ার জন্য তুমি হয়তো ভাববে, প্যারিসের মতো এমন একটা সুন্দর সমৃদ্ধ শহর আমার পছন্দ নয় বা সেখানে থাকতে ভালোবাসি না। কিন্তু শরতের সোনালি দিনগুলোতে আমি গতানুগতিক জীবনযাত্রার বাইরে বেরিয়ে এসে একটু বৈচিত্র্যের জন্য বেরিয়ে পড়ি শিকারের সন্ধানে কারণ শিকার করতে আমি ভালোবাসি। ঘরের ভিতরে বন্দি থাকা এবং ঘরের বাইরে বেরিয়ে খোলা বাতাসে মুক্তির নিশ্বাস নেওয়ার মধ্যে যে কতটা প্রভেদ তা তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। প্যারিস শহরের জনবহুল রাজপথগুলোকে দেখলে মনে হয় চার দেয়ালের মধ্যে আমি বন্দি হয়ে পড়েছি। ঠিকভাবে শ্বাস নিতে পারছি না। তবে বর্তমানে আমি যে প্যারিসে ফিরছি না, তার কারণ অবশ্যই ওটা নয়। তার কারণ হল শিকারে বেরিয়ে আমি প্রচুর মোটাসোটা বনমুরগির সন্ধান পেয়েছি।

এই জঙ্গল থেকে একটু দূরে যে পাহাড়ি উপত্যকা আছে—সেখানে নরম্যান যুগের পুরোনো একটা বাড়িতে আমি বর্তমানে বসবাস করছি। বাড়ির সামনে থেকে ছোট্ট একটি নদী রুপোলি রেখায় এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে। এই বাড়ি থেকেই শিকার করা সহজ হয়। যেদিন শিকারে রুচি থাকে না বা সেটা একঘেয়ে মনে হয়, আমি সেদিনটা বই পড়ে কাটিয়ে দিই। এখানে আমার একমাত্র সহচর ও বন্ধু দ্য ওরগেমন ও তার ভাই।

শীতের শুরুতে বরফ পড়তে আরম্ভ করলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব ক্যান্নেততে।

ওরগেমন ও তার ভাইএর চেহারা ঠিক দৈত্যদের মতো। ওদের দেহে বইছে নরম্যান রক্ত আর ভয় যে কী জিনিস তা ওরা জানে না।

ওরগেমনের ভাই এক দিন বলল, চার দিক সাদা বরফে ঢেকে যেতে শুরু করেছে।

এর দিন দুই পরে আমরা একটা হান্টিং ওয়াগনে চড়ে ক্যান্নেততের পথে পাড়ি দিলাম। তুষারপাতের জন্য আমার খুব শীত করছিল। সমস্ত দিন ধরে ওয়াগনটা চলার পর আমরা ক্যান্নেততে পৌঁছোলাম।

সেখানে মাস্টার পিকত নামের এক চাষির বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম। পিকত ছিল বেঁটেখাটো শক্ত মজবুত চেহারার একজন মানুষ। সব সময় মুখভর্তি হাসি। কিন্তু মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকলেও তাকে দেখলে বেশ চতুর ও বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়।

যেখানে আমরা উঠেছিলাম সেটা ছিল একটা খামারবাড়ি। ওরগেমনরা ছিল এই খামারবাড়ির আসল মালিক আর তার দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল পিকতের। গত পনেরো বছর ধরে প্রতিবছর শরৎকালে আমি ওরগেমন ভাইদের সঙ্গে তাদের খামারবাড়িতে যাচ্ছি। শরৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন বনমুরগি শিকারে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন ওরগেমনদের খামারবাড়িতে যেন উৎসব শুরু হয়ে যায়। খামারের চারিদিকে সারি দেওয়া আপেল আর বিট গাছ আর তার মাঝখানে লাল ইঁটের ছোট্ট একটা পাকাবাড়ি। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে সবসময় গাছগুলো লড়াই করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

রান্নাঘরের পাশেই ছিল খাবার ঘর। খাবার সময় সেখানে গিয়ে দেখলাম, পিকতের স্ত্রী বেশ হিসেব করেই সংসার চালায় এবং ঝিচাকরদের ওপর তার বেশ কড়া নজর।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই সবরকমভাবে তৈরি হয়ে আমরা শিকারে বেরিয়ে পড়লাম। শীতের সকালে যখন সোনা রোদের ঝিকিমিকি খেলে যায় গাছের পাতায়, নদীর জলে, ঝোপেঝাড়ে জঙ্গলে আর বনের ভিতরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সোনা রোদের আলো ঝরে প'ড়ে আলোছায়ার অপূর্ব পরিবেশ তৈরি করে, তখন এক অপরূপ আনন্দে সমস্ত মন আপ্লুত হয়ে ওঠে, রোমাঞ্চকর কিছু করার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমরা পিকতকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমরা আসলে নেকড়ে শিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিলাম। শুধু বনমুরগি শিকার করতে বেরোলে তার পিছনে সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়াতে হয়—শিকার পাওয়া যেতেও পারে আবার নাও পারে। কিন্তু অন্য কোনো জন্তু শিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে বেরোলে মাঝে মাঝে দু-একটা বনমুরগি বন্দুকের নিশানার মধ্যে এসে পড়ে।

হঠাৎ একটা লোকের দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম লোকটা গার্গন। সে মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের নীচে বসে কী যেন বুনছে আর তার ভেড়াগুলো মাঠের চারিদিকে চরে বেড়াচ্ছে। ওর বয়স হয়তো খুব বেশি নয় কিন্তু ওর মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি থাকার জন্য ওকে দেখে বুড়ো বলে মনে হয়। ও জন্ম থেকেই কালা আর বোবা। বহুদিন ধরে এই খামারে ও ভেড়া চরিয়ে আসছে। ভেড়াগুলোর সঙ্গে ওর এমন ভালোবাসার সম্পর্ক যে ও কথা না বললেও ওর প্রতিটি ইঙ্গিত ভেড়াগুলো আতি সহজে বুঝতে পারে।

হঠাৎ পিকত ওকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাকে বলল, আপনি বোধহয় জানেন না ওর বউকে ও নিজের হাতে খুন করেছে!

আমি তার কথা শুনে চমকে উঠলাম। ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে বললাম, বল কী! ওই কালা বোবা নিরীহ লোকটা ওর বউকে খুন করেছে!

পিকত বলল, খুনের অপরাধে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল, রুয়েনে মামলা চলল বেশ কিছুদিন ধরে। তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক টাকাপয়সা খরচ করে ওকে ছাড়িয়ে আনলাম।

পিকতের বাবার সময় থেকেই গার্গন এই খামারে কাজ করে। ও খুব ভালো ভেড়া

চড়াতে পারে দেখে পিকতের বাবা ওকে ভেড়া চরানোর কাজে বহাল করে। পিকতের বাবার মৃত্যুর পর পিকতের ওপর যখন খামারবাড়ির দেখাশোনার ভার দেওয়া হয় তখন গার্গনের বয়স প্রায় ত্রিশ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকার জন্য ওকে বয়স্ক একজন লোক বলে মনে হত। যাহোক, সেসময় ওই অঞ্চলে মাদাম মার্তেন নামে এক মহিলা তার পনেরো বছরের একমাত্র মেয়েকে রেখে মারা যায়। ফলে মেয়েটা সম্পূর্ণ অনাথ ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। সে এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াতে থাকে। সেইভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মেয়েটা খামারবাড়িতে এসে হাজির হয়। তাকে মাঝে মাঝে খামারের কাজকর্ম করতে বলা হত। কখনও ইচ্ছে হলে সেগুলো করত আবার ইচ্ছে না হলে করত না। মেয়েটা ছিল আধপাগলা গোছের। তার নির্দিষ্ট কোনো শোয়ার জায়গা ছিল না বলে সে যেখানে-সেখানে খড়ের গাদায় গিয়ে যার তার সঙ্গে গিয়ে শুয়ে পড়ত। ওকে মদের নেশায় পেয়ে বসেছিল। দু-এক পাত্র মদের জন্য সে যারতার সঙ্গে রাত কাটাতে বা তার শরীরটাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে দিতে আপত্তি করত না।

কিন্তু দেখা গেল মেয়েটি গার্গনের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। কেন গার্গনের প্রতি সে এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং তার সঙ্গে শুতে শুরু করেছে সে-কথা কেউ জানে না। ফলে গার্গনও মেয়েটিকে ধীরে ধীরে ভালোবাসতে শুরু করল। এইভাবে ক্রমে তাদের মধ্যে এক গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হল। এর পর থেকে ওই খামারেই দুজন স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে থাকে। পরে গির্জায় নিয়ে গিয়ে ওদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিয়ের পরেও তার স্বভাব একইরকম রয়ে গেল। মদ ছাড়া সে এক মুহূর্তও থাকতে পারত না। মদের ফোঁটা যদি ওর গলায় না পড়ত তাহলে ওর গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। সেইজন্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছেই ও 'মদের ফোঁটা' নামেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এবং সকলে ওই নামেই চিৎকার করে তাকে ডাকত।

গার্গন কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। সে সারাদিন ধরে একমনে ভেড়া চরাত। তার বউ মদের লোভে কার সঙ্গে শুচ্ছে বা কোথায় কার সঙ্গে কী করে বেড়াচ্ছে—সে নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাত না।

একদিন মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটল। মেয়েটার যৌবনপুষ্ট শরীর দেখে অনেক পুরুষই তার পিছনে ঘুরে বেড়াত। তারা সবাই জেনে গেছিল মেয়েটার শরীর ভোগ করতে শুধু একপাত্র মদই যথেষ্ট। সুতরাং তারা মদের লোভ দেখিয়ে তাকে কোনো ঝোপের আড়ালে বা গোপন কোনো জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে তার দেহটা যথেচ্ছ ভোগ করত। এরই মধ্যে সামোভিল থেকে একটি চ্যাংড়া ছেলে এসে দিনের বেলাতেই মেয়েটাকে নিয়ে যায় একটা মিলের পিছনে। গার্গনের তখন ভেড়া চরাবার সময়। ভেড়া চরাতে চরাতে ব্যাপারটা তার নজরে পড়ে—সে তাদের আপত্তিজনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদের দিকে পাগলের মতো ছুটে যায়। ছেলেটি তাকে ভয়ংকর মারমুখী মূর্তিতে ছুটে আসতে দেখে তার কাজ অসমাপ্ত রেখে সেখান থেকে

পালিয়ে যায়। গার্গন প্রায় নগ্ন মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে সজোরে তার গলা টিপে ধরে। মেয়েটার চিৎকারের শব্দ শুনে চারিদিক থেকে ছুটে আসে লোকজন। তারা সেখানে পৌঁছোবার আগেই মেয়েটার মৃত্যু হয়। তার জিভটা বেরিয়ে আসে এবং নাক আর মুখের দুপাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে।

খবর পেয়ে পুলিশ আসে এবং গার্গনকে ধরে নিয়ে যায়। মামলা ওঠে বুয়েনের আদালতে। ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়তেই আদালতে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়। উকিলরা তাকে কোনোরকম জেরা বা প্রশ্ন করলে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। শুধু আমি প্রশ্ন করলে সে হাত-পা বা মাথা নেড়ে ইশারায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিত।

গার্গন তার স্ত্রীকে কেন এবং কীভাবে খুন করেছিল সম্পূর্ণ ঘটনাটা ইঙ্গিত ইশারা বা হাবেভাবে প্রকাশ করল। তার বর্ণনা বা প্রকাশভঙ্গি এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ঘটনাটা বুঝতে কারও অসুবিধা হল না। তার স্ত্রী একপাত্র মদের লোভে অন্য পুরুষকে অতি সহজেই দেহ দান করত। শেষ পর্যন্ত সে মিলের পিছনে কী দেখতে পায়—তা সে বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়। তারপর সে তার বউএর গলা কীভাবে টিপে ধরেছিল তাও বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়।

অবশেষে গার্গনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হল। গার্গন আগের মতোই ভেড়া চরায়। এত বড়ো যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, তাকে দেখে মনে হয় তা তার মনে আদৌ কোনো রেখাপাত করতে পারেনি।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দে আমার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হল। ভাবলাম নিশ্চয়ই কোনো বনমুরগি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। এখন কেন যে আমি প্যারিসে ফিরতে পারছি না বা ফিরছি না—সে-কথা বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

কাপুরুষ
The Coward

সম্ভ্রান্ত মহলে তাকে সবাই সদাশয় সিগনলস্ নামে জানত। তার পুরো নাম ভাইকাউন্ট গোনত্রাস যোশেফ দ্যঁ সিগনলস্। মা বাবা তার অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। প্রচুর উপার্জন। লোকের ধারণা সে খুব সাহসী এবং বেশ বুদ্ধিমান। দেখতেও বেশ সুন্দর। সে যখন কথা বলত, তখন তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আভিজাত্য ও অহংকার। তার পুরুষ্টু গোঁফজোড়া আর ইঙ্গিতপূর্ণ চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর চৌম্বক আকর্ষণে মেয়েদের কাছে টানে।

সকলে জানে যৌবনোচিত প্রেম বা ভালোবাসা সম্বন্ধে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তার জীবনযাত্রা অবাধ প্রাচুর্য, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উদ্দাম গতিতে ছন্দোবদ্ধ। এছাড়া সে যতটা দক্ষ তলোয়ার চালনায়, ততোধিক দক্ষ পিস্তলের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করতে।

ডুয়েল লড়তে গেলে সে বলে, সে অস্ত্র হিসাবে পিস্তলকে বেশি পছন্দ করে কারণ ওই অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে শেষ করে দেওয়া তার কাছে সহজ বলে মনে হয়।

এক দিন সন্ধেবেলা সে তার দুজন বান্ধবীকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যায়। বান্ধবীদের স্বামীরাও তাদের সঙ্গী হয়েছিল। থিয়েটারের শেষে সে তাদের টরটরিনের কাফেতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। সেখানে খেতে খেতে সে লক্ষ করল খানিক দূরে যে লোকটা বসে আছে সে বারবার তার এক বান্ধবীর দিকে তাকাচ্ছে, তার চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় অশালীন ও অভব্য আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। ওই দৃষ্টির সামনে বসে বান্ধবীটি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে। সে চাপা স্বরে তার স্বামীকে সে-কথা জানায় এবং সে জানতে চায় সে তাকে চেনে কি না।

যা হোক স্বামী ভদ্রলোক কাউকে দেখতে না পেলেও উত্তরে বলে সে তাকে চেনে না।

বান্ধবীটি একটু হেসে ভ্রুকুটি করে বলল, রাগে যেন গা জ্বলে যায়, আমার মুডটাই অফ করে দিল।

স্বামী ভদ্রলোক অবশ্য তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলে, "ওকে মোটেই পাত্তা দিয়ো না তো। ওদিকে তোমার তাকানোরও বা কী দরকার। ওসব লোকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে—জেনে রেখো।"

ভাইকাউন্ট এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল এবং সেটা সহ্য করছিল, কিন্তু তার অসভ্যতা ও ইতরামির মাত্রা সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতেই ভাইকাউন্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠল। লোকটার অভব্য আচরণের জন্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের আনন্দ সে নষ্ট হতে দিতে পারে না। বান্ধবীর অপমানের অর্থ তারই অপমান। সুতরাং লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

এর পর সে লোকটার দিকে এগিয়ে এসে তাকে ক্রোধের স্বরে বলল, "দেখুন, আপনি ভদ্রলোক কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওই মহিলাদের দিকে আপনি যে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তাতে আপনাকে ভদ্রলোক ভাবতে আমার আপত্তি আছে। ব্যাপারটা আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি আর সেটা আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছে। কাফেতে এসেছেন, ভদ্রসন্তানের মতো চুপচাপ খাওয়াদাওয়া করে চলে যান।"

লোকটাও ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে, "থামুন মশাই, অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছেন।"

ভাইকাউন্টের চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠল। সে দাঁতে দাঁত চেপে, চোয়াল দুটো শক্ত করে বলল, "সাবধান, আমাকে ভদ্রতার সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য করবেন না। তাতে ফল ভালো হবে না।"

এর পর লোকটা এমন একটা অশ্লীল মন্তব্য করে—যেটা কোনো রুচিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। সেই কুৎসিত মন্তব্যের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে কাফেতে উপস্থিত সকলের মধ্যে। তারা সকলে ভীত স্তম্ভিত।

যারা সেদিকে পিছন ফিরে ছিল তারা এবার ঘুরে তাকায় এবং কুৎসিত মন্তব্যকারীকে দেখতে থাকে সীমাহীন বিরক্তির সঙ্গে। সকলেই বিস্মিত স্তব্ধ।

এর পর কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। ছুঁচ পড়লেও যেন সেশব্দ আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যায়।

তারপর একটা ভয়ংকর আঘাতের শব্দ শোনা যায়। ভাইকাউন্ট প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মেরেছে লোকটার মুখে। কোনো ভয়ংকর দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে রোধ করতে সকলে তাদের দিকে ছুটে আসে এবং ব্যাপারটাকে বেশি দূর গড়াতে দেয় না। কিন্তু এরপর দুজনে পরস্পরকে ডুয়েল লড়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়। তারা দুজনে দুজনের নাম ঠিকানা জেনে নেয়। নির্দিষ্ট দিন এবং সময় স্থির হয়ে যায় ডুয়েল লড়াইএর জন্য।

বাড়ি ফিরে উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার জন্য ভাইকাউন্ট ঘরের পাশের লম্বা টানা বারান্দায় ক্রমাগত পায়চারি করতে থাকে। তার মনে শুধু একটাই চিন্তা—ডুয়েল লড়তে হবে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে সে। সে তো কোনো অন্যায় করেনি বরং অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেছে সে। তার মতো মানুষ যদি ওইটুকু সাহস দেখাতে না পারে, তাহলে বৃথাই তার বেঁচে থাকা। তাকে এভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দেখে সকলে নিশ্চয়ই তার প্রশংসা করছে।

এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে রাগে তার হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। সে চিৎকার করে ওঠে, "শালা, হাউন্ডের বাচ্চা!"

কথাটা উচ্চারণ করার পর সে নিজের আসনে বসে ভাবতে থাকে। অবশ্যই তাকে ডুয়েল লড়তে হবে। কিন্তু ডুয়েলে সাহায্যকারী হিসাবে কাদের সে নির্বাচন করবে। সব থেকে নির্ভরযোগ্য এবং নামকরা সাহায্যকারীদের নামগুলো সে এক এক করে

মনে করতে থাকে। তাদের মধ্যে দুজনকে নির্বাচন করবে বলে সে স্থির করে। একজন হলেন মারকিউস দ্য লা তুর নোর এবং কর্নেল বুঁরদিন। একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ আর অন্যজন পেশায় সামরিক অফিসার। সাহায্যকারী হিসাবে এই দুই ব্যক্তির দক্ষতার কথা কারও অবিদিত নয়। লোকে কাগজে এঁদের নাম দেখতে পেলে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় তার পিপাসা পায়। ঢকঢক করে কয়েক গ্লাস জল খেয়ে সে আবার পায়চারি করতে থাকে। এই মুহূর্তে সে নিজেকে যতটা সাহসী বোধ করছে, ডুয়েল লড়ার সময় যদি সেই সাহস ও একাগ্রতা সে বজায় রাখতে পারে তাহলে তার জয় সুনিশ্চিত এবং তার সেই সাফল্যের কথা সকলে জানতে পেরে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাবে।

একটা কাগজে লিখে তাকে যে নাম আর ঠিকানাটা দিয়েছিল লোকটা সেটা সে পকেট থেকে বের করে আরও একবার পড়ে দেখল। এর মধ্যে কয়েকবার সেটা সে দেখেছে। কাগজে লোকটার নাম আর ঠিকানা লেখা আছে, জর্জ লা মিল, ৫১ রু মনসি।

জর্জ লা মিল, কে ওই লোকটা, ওর কি ভদ্রতাবোধ বলে কিছু নেই? কোনো ভদ্রলোক কি ওইভাবে কোনো মহিলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে তাকে গিলতে থাকে? ওই চিন্তায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। তখন আবার সে চিৎকার করে, শালা হাউন্ডের বাচ্চা!

গালাগালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মধ্যে এক ভয়ংকর কাঠিন্য অনুভব করে। শূন্য মস্তিষ্কে সে কার্ডখানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এর পর এক ধরনের ভয়ংকর অস্বস্তি তার সমস্ত সত্ত্বায় ছড়িয়ে পড়ে। সামনে পড়ে থাকা ধারালো ছুরিখানাকে তুলে নিয়ে সে আদিম হিংস্রতায় লোকটার নাম ঠিকানা লেখা কাগজটাতে বিঁধিয়ে দেয়।

এর অর্থ লড়াই-এর জন্য সে সর্বতোভাবে প্রস্তুত। এবার অস্ত্র হিসাবে কোন্‌টাকে বেছে নেওয়া তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে—তাই নিয়ে সে চিন্তা করতে থাকে। তরোয়াল না পিস্তল। যেহেতু সে অপমানিত পক্ষ, সেইহেতু তার অস্ত্র বেছে নেওয়ার অধিকার আছে—আর সেটাই রীতিসিদ্ধ। তরোয়াল নিয়ে লড়াই করলে জীবনের ঝুঁকি প্রায় থাকে না বললেই চলে। অন্যদিকে পিস্তলের লড়াইয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকেই যায়।

যা হোক অনেক চিন্তাভাবনার পর সে অস্ত্র হিসাবে পিস্তলকে বেছে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য লোকে তাকে একজন সাহসী বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি লড়াইয়ের সময় পিস্তল ব্যবহারের কথা জানতে পেরে ভয়ে চ্যালেঞ্জ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় তাহলে বিপুল সম্মানলাভের সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হবে।

আমার এই সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও সরে আসব না, তাতে নিশ্চয়ই লোকটা ভয় পেয়ে যাবে।

নিজের গলার স্বর যেন নিজের কাছে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। তাতে সিগনলস্ ভয় পেয়ে যায়। সে যেন তার শরীরের মধ্যে কম্পন অনুভব করে। বিস্ফারিত চোখে সে চারিদিকে তাকাতে থাকে যেন সে কোনো একটা নির্ভরতার আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইছে। এই সমস্ত চিন্তা তার মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত করে তোলে। স্নায়ুগুলো ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়। ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে, পোশাক খুলে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

সে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে, আগামীকাল সমস্ত দিনটা চিন্তা করার সুযোগ পাব। এখন না ঘুমোতে পারলে এই দুশ্চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খাবে।

এবার সে মনকে শান্ত করে ঘুমোবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোথায় ঘুম! সারাক্ষণ ধরে সে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। পিপাসায় তার গলা বুক শুকিয়ে ওঠে। সর্বদা গভীর এক অস্বস্তি তাকে যেন ঘিরে রেখেছে। সে কোনোমতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। সে উঠে গিয়ে বেশ খানিকটা জল খেল, আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। সে নিজের কাছেই প্রশ্ন করে সে কি সত্যি ভয় পেয়েছে? ঘরের মধ্যে কোথাও কোনো শব্দ হলেই সে চমকে উঠতে লাগল। দেয়ালঘড়িটা যখন ঢং ঢং শব্দে রাত্রির সময় ঘোষণা করল, তখন সে ভীষণভাবে চমকে উঠল। দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল তার। এই অবস্থাটাকে সে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ বা বোঝার চেষ্টা করে।

সে কি তবে ভয় পেয়েছে? না, ভয় সে পায়নি আর তা সে পাবেও না। সে তো নিজেই ডুয়েল লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ডুয়েল লড়বে বলে। তবে সে ভয় পাবে কেন—নানাভাবে নিজের চিন্তাগুলোকে নিয়ে সে বিশ্লেষণ করতে থাকে তবুও এক ধরনের অস্বস্তি আর অস্থিরতা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এই অস্থিরতা, আতঙ্ক আর সন্দেহ তাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে আর সেই ভয়ভীতিতে মাঝে মাঝে সে কেঁপে উঠছে। তাকে অবশ্যই ডুয়েল লড়তে যেতে হবে, কিন্তু সে সময় যদি সে এমন ভাবে কাঁপতে থাকে তাহলে তার ছোঁড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা চিন্তা তিরের মতো ছুটে এসে তাকে ভীষণ অসহায় দুর্বল করে তোলে। আগামীকাল এই সময়, সে এই পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যাবে, সে আর দুচোখ ভরে সূর্যের আলো দেখতে পাবে না।

হঠাৎ সে তার নিজের বিছানাটাকে যেন ভয় পেতে শুরু করল। বিছানাটার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার প্রাণহীন শবদেহটা যেন সেখানে পড়ে আছে। ভয়ংকর আতঙ্ক, উদ্‌বেগ আর মানসিক যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর যেন অসাড়, পঙ্গু হয়ে পড়ে। চোয়াল দুটো ঝুলে পড়ে, হাত-পায়ের সমস্ত শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলে।

মাতালের মতো টলতে টলতে সে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। ভোরের আলোয় তখন সমস্ত প্রকৃতির ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে। স্নিগ্ধ শান্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে পাখির কলতান।

প্রভাতসূর্যের কিরণমালা যেন তার মধ্যে সঞ্চার করে নূতন উদ্যম, সাহস আর আত্মপ্রত্যয়। কিছুক্ষণ আগে কেন সে এভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। কেন সে এভাবে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে তো আদৌ জানে না—জর্জ লা মিল শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে রাজি হবে কি না। কী আজেবাজে চিন্তায় তাকে এমন ভয়ংকর উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাতে হচ্ছে!

এইসব ভাবতে ভাবতে সে সাহসী হয়ে ওঠে। সে এবার হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ে। সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে থাকে। সে নিজের মনেই বারবার উচ্চারণ করতে থাকে, আমাকে সাহস সঞ্চয় করতে হবে, কিছুতেই আমি পরাজয় স্বীকার করব না, আমি প্রমাণ করে দেব যে ভয় নামক শব্দটিকে আমার অভিধান থেকে মুছে ফেলেছি।

ডুয়েল লড়াই-এর জন্য মার্কুইস ও বুঁরদিন নামের যে দুজন সহকারীকে সে নির্বাচন করেছিল—তাদের সঙ্গে দেখা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করল। লড়াই-এর শর্তগুলো তাঁরা জেনে নিলেন।

কর্নেল বুঁরদিন জিজ্ঞেস করলেন, "এই ধরনের ভয়ংকর লড়াইয়ে আপনার কোনো দ্বিমত নেই তো?"

"না, মোটেই না, এ ব্যাপারে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।"

মার্কুইস জিজ্ঞেস করলেন, "অস্ত্র হিসাবে তাহলে পিস্তলকেই বেছে নিলেন।"

"নিশ্চয়ই।"

অন্য কোনো শর্ত থাকলে, সেগুলোও আমাদের জানান।

"কুড়ি পায়ের দূরত্ব থাকবে দুজনের মধ্যে। সিগন্যাল দেওয়ার সময় হাত তুলতে হবে, তারপর আর হাত নামানো চলবে না। দুজনের মধ্যে একজন মারাত্মকভাবে জখম না হওয়া পর্যন্ত কেউ গুলি বিনিময় থেকে বিরত হবে না।" কথাগুলো বলার সময় ভাইকাউন্ট বুঝতে পারে তার গলার স্বর কাঁপছে।

খুশির গলায় কর্নেল মন্তব্য করলেন, "সত্যিই নিয়মগুলো একেবারে নিখুঁত। পিস্তল চালানোয় আপনার দক্ষতার কোনো তুলনাই নেই। সেই হিসাবে বলা যায় এই লড়াইয়ে আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। আর সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।"

এরপর যখন সে বাড়ি ফিরে এল, তখন একইরকম অনুভূতি তাকে আবার আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই একইধরনের ভয়, আতঙ্ক আর অস্থিরতায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

খাওয়ার ইচ্ছেটাই সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে। টেবিলে সাজানো আছে মহার্ঘ সমস্ত খাদ্য কিন্তু সেগুলো সে খেতে পারছে না।

সে ভাবল, মদ্যপান করলে নিশ্চয়ই তার হৃত সাহস সে ফিরে পাবে। এই ভেবে সে তার ভৃত্যকে দিয়ে কয়েক বোতল মদ আনিয়ে নেয় এবং পর পর দু'বোতল মদ খেয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে তার স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে, মনের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও দৃঢ়তা। সমস্ত শিরা উপশিরা ও অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গে যেন আগুনের উত্তাপ। সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সে যেন অতিমাত্রায় অস্থির হয়ে ওঠে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই তার সমস্ত সাহস, উৎসাহ আর উদ্দীপনা কর্পূরের মতো উবে গেল। মদের প্রভাবে স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসতেই আগের সেই অবস্থা তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করতে শুরু করল।

ভয়ংকর এক অস্থিরতা এবং উদ্‌বেগের মধ্যে এইভাবে তার সমস্ত দিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসতেই সে দরজায় বেলের শব্দ শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আতঙ্কে চমকে উঠল। স্থবিরের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। উঠে গিয়ে সে যে দরজা খুলে দেবে সে ক্ষমতাটুকুও তার যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

কোনোরকমে দরজা খুলে দিয়ে তার দুজন সহকারীকে সে দেখতে পেল। ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সৌজন্যবোধটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। 'শুভ সন্ধ্যা'—শব্দ দুটোও উচ্চারণ করতে সে ভুলে গেল।

বুঁরদিন বললেন, "আপনার শর্তগুলো আপনার প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি এবং সেগুলো সে মেনে নিতে আপত্তি করেনি। প্রথম দিকে আপনার প্রতিপক্ষ অপমানিত পক্ষ হিসাবে নিজের দাবি ছেড়ে দিতে আপত্তি করেছিল, কিন্তু পরে সে আমার যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সামরিক বিভাগের দুজন অফিসার তার সহকারী হিসাবে কাজ করতে রাজি হয়েছেন।"

ভাইকাউন্ট তাঁদের ধন্যবাদ জানায়।

মার্কুইস দ্বিতীয়বার কতকগুলো দরকারি কথা বলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেন, মাফ করবেন, আমরা শুধু এসে আপনাকে কতকগুলো খবর জানিয়ে চলে গেলাম—এমন হওয়া তো মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। আরও এমন কিছু করার আছে, যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মারাত্মকভাবে আহত হলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের প্রয়োজন হবে এবং সেজন্যই একজন ডাক্তারকে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া যেখানে লড়াই হবে, তার কাছাকাছি কোনো বাড়ি থাকার দরকার। কারণ আহত যোদ্ধাকে প্রথমেই সেই বাড়িতেই নিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া ছোটোখাটো আরও কতকগুলো কাজ সেরে ফেলতে হবে—তাতে দু-তিন ঘণ্টা সময় লেগে যেতে পারে।

ভাইকাউন্ট আর একবার তাঁদের ধন্যবাদ জানায়। তাঁরা যখন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তখন তার একাকীত্ব তাকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনল। একইভাবে ভয়ে আতঙ্কে আবার সে দিশাহারা হয়ে পড়তে লাগল। পরিচারক এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে। লেখার টেবিলের সামনে বসে ভাইকাউন্ট লিখতে শুরু করে। বার কয়েক লিখে সেগুলো আবার কেটে দেয়।

শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তাভাবনা করে সে একটুকরো কাগজের ওপর লিখে ফেলে, 'এই আমার দলিল।'—এই শব্দ ক-টা লেখার পর সে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করে। হারিয়ে ফেলে সমস্ত স্নায়ুর ক্ষমতা। চেয়ার থেকে উঠে সে অস্থিরভাবে ঘরের

মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। শত চেষ্টা করেও ভয়ংকর উদ্‌বেগ আর অস্বস্তিকে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সুতরাং ডুয়েল তাকে লড়তেই হবে আর সেটাকে এড়িয়ে যাবার অন্য কোনো উপায় তার জানা নেই। অবশ্যম্ভাবী ডুয়েলের ছবিটা সে মনে মনে আঁকার চেষ্টা করে। সে ভাবতে থাকে কীভাবে তার প্রতিপক্ষ তাকে আক্রমণ করবে। তারও একটা ছবি সে মনে মনে কল্পনা করে নেয়।

হঠাৎ তার মনে হল, আচ্ছা তার প্রতিপক্ষ কি নিয়মিত শুটিং গ্যালারিতে গিয়ে শুটিং প্র্যাকটিস্ করে? লক্ষ্যবিদ হিসাবে কি ওর যথেষ্ট নামডাক আছে? তাহলে একবার ব্যারন ভ্যাঙ্কের বইখানা খুঁজে দেখবে সে। কিন্তু বইটার কোনোখানে জর্জ লা মিলের নাম সে খুঁজে পেল না। কিন্তু এ বিষয়ে সে নিশ্চিত যে লোকটা নিশ্চয়ই একজন পাকা ডুয়েল লড়িয়ে—না হলে সে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হত না।

বইটা রেখে দিয়ে ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা সে বার করে আনে। কখন যে পিস্তলটাতে সে গুলি ভরে রেখেছে সে-কথা তার মনে পড়ল না। কাঁপা হাতে সে সেটাকে নিয়ে লক্ষ্যভেদের নানারকম কায়দা করতে থাকে। কিন্তু তার হাত-পা সমস্ত শরীর এভাবে কাঁপছে কেন? এভাবে সে কী করে ডুয়েল লড়বে!

ডুয়েল লড়তে গেলে চাই পূর্ণ একাগ্রতা। এমন মানসিক অস্থিরতার মধ্যে সেই একাগ্রতা আনা অসম্ভব। যতই সে দক্ষ লক্ষ্যবিদ্ হোক না কেন, তার নিজের স্থৈর্য ও একাগ্রতা সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। আর এখন আর তার পিছিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। কারণ সেই-ই প্রথমে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

গুলিভরা পিস্তলটা হাতে নিয়ে সে নানারকম চিন্তা করতে থাকে লড়াই সম্বন্ধে। এমনিতেই সে বুঝে গেছে প্রতিপক্ষের গুলিতে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাতে মৃত্যুর পরেও সে যে মানুষের কাছে একজন ভীরু কাপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত হবে—সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হঠাৎ সে তার নিজের কপাল লক্ষ করে ট্রিগারে চাপ দেয়।

গুলির শব্দ শুনে ছুটে আসে খানসামা। দেখল, ভাইকাউন্ট উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে বুঝল তার দেহে প্রাণ নেই। একটা কাগজের টুকরোর উপর দিয়ে বয়ে চলেছে রক্তের ধারা আর সেটাতে লেখা আছে রক্তে ভেজা, 'এই আমার দলিল।'

ব্রানিজার ভেনাস
The Venus Of Braniza

বেশ কয়েক বছর আগে ব্রানিজাতে একজন ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন তাঁর স্ত্রীর অতুলনীয় সৌন্দর্যের খ্যাতি যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর অসাধারণ জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের জন্য। ধর্মভীরু একজন মানুষ হিসাবেও তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

এমন একটি প্রচলিত প্রবাদে মানুষ বিশ্বাসী যে ইহুদি দার্শনিকদের স্ত্রীরা সাধারণত কুশ্রী হয় অথবা তাদের শারীরিক কোনো ত্রুটি থাকে।

ইহুদি পণ্ডিতটি এই প্রবাদের ব্যাখ্যা করে বলতেন, এটা সকলেই জানে যে বিবাহ বিধিনির্দিষ্ট এবং একটি পুত্রসন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিধি স্থির করে দেন কে হবে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রী। একই কথা প্রযোজ্য কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রেও। বিবাহের ক্ষেত্রে এটা বিধিনির্দিষ্ট ব্যবস্থা। ঈশ্বর এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। যারা দর্শনশাস্ত্রে প্রকৃত পণ্ডিত বা জ্ঞানী তাদের কাছে নারীর রূপ বা সৌন্দর্য অত্যন্ত তুচ্ছ বা মূল্যহীন। সুতরাং যে সমস্ত কুরূপা বা কুশ্রী নারীদের অন্য পুরুষরা গ্রহণ করবে না, ঈশ্বর এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের ঘাড়ে তাদের চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

কিন্তু এই ইহুদি পণ্ডিতের ক্ষেত্রে তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন এবং এই পণ্ডিতকে দেবী ভেনাসের মতো অপরূপা সুন্দরী এক নারীরত্নকে দান করেছেন। তার অনুপম অতুলনীয় সৌন্দর্যের জন্য সে সকলের কাছে ভেনাস নামে খ্যাত হয়েছিল। ইন্দ্রিয় সুখবর্ধক দীর্ঘকায় শরীর, যৌবন, স্বাস্থ্য ও লাবণ্য কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডলে অপরূপ সৌন্দর্যের আলো, টানাটানা ডাগর দুই কালো চোখের তারায় বিদ্যুতের ঝলক। সুন্দর ছোট্ট মাথাটা শোভমান হয়ে উঠেছে গোছা গোছা কালো চুলে। নিটোল ফরসা ঘাড়ের দুপাশ বেয়ে নেমে গেছে দুটি বেণি। তার কোমল শুভ্র হাত দুটো দেখে মনে হয়, সে দুটো যেন হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অপূর্ব এক শৈল্পিক ব্যঞ্জনায়।

প্রকৃতির অকৃপণ দানে যে নারী-সৌন্দর্য গড়ে উঠেছিল এবং যা মূর্ত হয়ে উঠেছিল ইহুদি পণ্ডিতের স্ত্রীর মধ্যে, তার আকর্ষণে মানুষ ভৃত্যের মতো তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে দ্বিধা বোধ করত না। শিল্পীর তুলি, ভাস্করের ছেনি এবং কবির কল্পনাকে দিবারাত্র নিযুক্ত রাখত তার সৌন্দর্যের মহিমা।

ভেনাস বহু মূল্যবান একটি আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় সারাদিন বসে বসে রাস্তার দিকে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে থাকত।

ঈশ্বর তখনও তাকে সন্তানের আশীর্বাদে ধন্য করেননি। ইহুদি পণ্ডিতের কিন্তু ও সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। তিনি সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত

পূজার্চনা, প্রার্থনা আর শাস্ত্রপাঠে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থ বিত্তের যথেষ্ট প্রাচুর্য থাকার কারণে ভেনাসকে ঘরকন্নার কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না। সবকিছু চলত স্বচ্ছন্দ গতিতে। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসত না বা সে কখনও ঘর থেকে বাইরে বেরোত না। সারাদিন ধরে স্বপ্নালু চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে আলস্য বিলাসে সময় কাটিয়ে দিত।

এক দিন যখন বজ্র বিদ্যুতের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল গোটা শহরটার ওপর দিয়ে তখন নিজের আরাম কেদারায় বসে শরীর দোলাতে দোলাতে তার প্রার্থনারত স্বামীকে প্রশ্ন করল, "কবে, ডেভিডের পুত্র মেসিয়াস ইহুদি জাতির মধ্যে আবির্ভূত হবেন?"

দার্শনিক উত্তর দিলেন, "যখন সমগ্র ইহুদি জাতি ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মাত্মা হয়ে উঠবে অথবা তাদের পাপের ভারা পূর্ণ হবে—তখন তিনি ইহুদিদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন। একথা ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে।"

ভেনাস আবার প্রশ্ন করল, "তোমার কি বিশ্বাস হয়, ইহুদিরা সকলেই একসঙ্গে পুণ্যাত্মা হয়ে উঠবে?"

"আমি সে-কথা কীভাবে বিশ্বাস করব?"

"তাহলে নিশ্চয়ই যখন সকল ইহুদি একযোগে পাপের পাঁকে ডুবে যাবে, তখনই মেসিয়াস আবির্ভূত হবেন।"

দার্শনিক তার কাঁধ ঝাঁকালেন অর্থাৎ তার প্রশ্নগুলোকে আতি তুচ্ছ জ্ঞান করে আবার পূজার্চনা ও প্রার্থনায় মনোনিবেশ করলেন। বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে চলেছিল। সুন্দরী ভেনাস তখন তার স্বপ্নালু দৃষ্টি মেলে দিয়ে বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে ছিল আর অন্যমনস্কভাবে তার পদ্মকলিকার মতো আঙুলগুলো ধীরে ধীরে চালনা করছিল তার চমৎকার পোশাকের ওপর।

এক দিন ইহুদি দার্শনিককে যেতে হল পাশের এক শহরে। সেখানে ধর্মীয় রীতিনীতি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। সত্যিই অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য। ওই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বার করতে তাঁর যতটা সময় লাগবে বলে মনে করেছিলেন—তার অনেক আগেই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর তৈরি করে ফেললেন এবং পর দিন সকালে ফিরে আসার পরিবর্তে, যেমন তিনি ভেবে রেখেছিলেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ফিরে এলেন। বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে সেই বন্ধুটি তাঁর থেকে কিছু কম ছিলেন না। তিনি তাঁর গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বাড়িতে ঢুকলেন। তাঁর সমস্ত বাড়ি আলোয় আলোকিত হতে দেখে এবং তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন পদস্থ অফিসারের আর্দালিকে পাইপে করে ধূমপান করতে দেখে তিনি ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। সম্ভবত আর্দালিটি সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

দার্শনিক বন্ধুত্বের স্বরে প্রশ্ন করলেন, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?"

"আমার ওপর পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি লক্ষ রাখছি পাছে সুন্দরী ভেনাসের স্বামী হঠাৎ এসে উপস্থিত হন।"

"ও, তাই বুঝি, তাহলে ঠিকভাবে লক্ষ রাখো।"

এই কথা বলে তিনি চলে যাওয়ার ভান করলেন। কিন্তু তিনি বাগানের পিছন দিকের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তিনি প্রথম ঘরটায় ঢুকে দেখলেন, টেবিলে দুজনের মতো করে খাবার সাজানো হয়েছে এবং তাঁর স্ত্রী যথারীতি তার শোয়ার ঘরের জানালার কাছে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তার গাল দুটো হয়ে উঠেছে লাল এবং হরিণীর মতো কালো চোখের দৃষ্টি থেকে অবসাদের ভাব অদৃশ্য হয়েছে। হঠাৎ তার স্বামীকে দেখে তাঁর দিকে বিদ্রূপের তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেই মুহূর্তে মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটি জিনিসের সঙ্গে তাঁর পায়ের ধাক্কা লাগল এবং তা থেকে একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ হল। তিনি সেটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে উজ্জ্বল আলোয় পরীক্ষা করে দেখলেন, বস্তুটি কোনো অশ্বারোহীর এক জোড়া জুতোর কাঁটা।

দার্শনিক জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার অনুপস্থিতিতে এ বাড়িতে তোমার কাছে কে এসেছে?"

ইহুদি রমণীটি অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তার কাঁধ নাচাল কিন্তু কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

"তোমার সঙ্গে কে রাত্রিবাস করেছে? হুসারের ক্যাপটেন রাত্রিবাসে তোমাকে নিশ্চয়ই দারুণ তৃপ্তি ও আনন্দ দিয়েছে?"

ভেনাস তার নরম জ্যাকেটে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, "কেন সে রাত্রিবাসে তার সঙ্গ দিয়ে আমাকে তৃপ্ত করবে না, বলতে পার?"

"ওহে দ্বিচারিণী মহিলা, তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেছ?"

ভেনাস উত্তরে বলল, "আমি খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক আছি।"

তার কামনামদির ঠোঁট দুটো থেকে অদ্ভুত একটা বিদ্রূপের হাসি ঝরে পড়তে লাগল, "যাতে ইহুদি জাতির মুক্তির জন্য মেসিয়াসের খুব দ্রুত আবির্ভাব ঘটে, সেজন্য আমি আমার ভূমিকা ও কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করেছি।"

একটি বিদঘুটে ভোজপর্ব
An Odd Feast

যে সময়ের ঘটনাটা বলব, সেটা শীতকাল। তবে কোন্ বছর বা সাল—সেটা আমি ভুলে গেছি। জুলে দ্য ব্যানভাইলের সঙ্গে আমার দাদা-ভাই-এর সম্পর্ক। নরম্যানডির একটা পুরোনো খামারবাড়িতে একজন চাকর আর ঝি নিয়ে সে বাস করত। এই তিনজনকে নিয়েই তার পরিবার। একবার সে আমাকে চিঠি লিখে তার ওখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে বলেছিল। সুতরাং যাওয়ার জন্য মনস্থির করে ফেললাম। শিকারের নেশা আমার মারাত্মকরকমের আর ওই নেশাতেই আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতাম।

ধূসর রংএর পুরোনো কেল্লাটিকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য পাইন আর ওক গাছ। ওখানে গেলেই মনে হবে বহু যুগ ওই কেল্লাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। কেল্লার বিরাট বিরাট ঘরগুলোতে শুধু সাজানো রয়েছে পুরোনো আমলের ভারী ভারী কিছু আসবাবপত্র আর দেয়ালে টাঙানো রয়েছে জুলের পূর্বপুরুষদের কয়েকটা তৈলচিত্র। ওই সমস্ত ঘর দীর্ঘদিন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এই বিরাট কেল্লার মধ্যে মানুষের বাসের উপযোগী মাত্র একখানা ঘর ছিল আর তার লাগোয়া যে রান্নাঘরটি ছিল, সেটা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠেনি। ওই ঘরখানির দেয়ালের পলেস্তারা খসে যাওয়ার কারণে যে সমস্ত গর্ত তৈরি হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে ইঁদুরদের যাতায়াত হয়ে উঠেছিল অবাধ। সুতরাং সেগুলোতে নূতন করে পলেস্তারা দিয়ে ঘরটাকে বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছিল। আমরা থাকতাম সেই ঘরটাতেই। চুনকাম করা দেয়ালগুলোতে টাঙানো ছিল ভারী ভারী বন্দুক আর বিভিন্ন আকারের শিঙ্গা। শীতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিরাট চুল্লিটাতে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই চুল্লির আগুনের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসতাম। আমাদের কুকুরগুলো চুপ করে বসে থাকত ওই ঘরের এখানে-ওখানে। ওই আগুনের তাপে আমাদের ঝিমুনি এলে আমরা কাঁপতে-কাঁপতে আমাদের বিছানায় গিয়ে গরম কম্বলের তলায় আশ্রয় নিতাম।

ঠান্ডাটা সেদিন বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। আমরা আগুনের ধারে বসে খোশগল্পে মেতে ছিলাম। এক দিকে উনুনে সিদ্ধ হচ্ছিল গোটা তিনেক খরগোশ আর চারটে বালিহাঁস। মাংসের গন্ধে আমাদের জিভগুলো লালাসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

গল্পগুজবের মাঝখানে এক সময় জুলে বলে উঠল, আজকে এত প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে, রাত্রে খুবসম্ভব আমরা কেউ ঘুমোতে পারব না।

নির্লিপ্ত স্বরে বললাম, ঘুম হবে না ঠিক, তবে কাল সকালে প্রচুর শিকার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পরিচারিকা ঘরের এক দিকে আমাদের খাবার পরিবেশন করে অন্য দিকে নিজেদের জন্য খাবার সাজাতে সাজাতে বলল, "আজ যে ক্রিসমাস ইভ, সে-কথা কি আপনারা জানেন?"

এই উৎসবের দিনটা সম্বন্ধে আমরা মাথা ঘামাইনি। সুতরাং সে ব্যাপারে আমাদের মোটেই খেয়াল ছিল না। তাই একবার ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে তাকালাম। আমার ভাই জুলে বলল, "ও, সেইজন্য বোধহয় গির্জার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আজকের এই উৎসব উপলক্ষ্যে নিশ্চয় ওখানে ভজন গানের অনুষ্ঠান হবে।"

পরিচারিকা জানাল যে বুড়ো ফোরনেল হঠাৎ মারা যাওয়ার জন্যও গির্জায় ঘণ্টা বাজতে পারে।

ফোরনেল বয়সে বৃদ্ধ। মেষপালন তার পেশা। এ অঞ্চলে সকলেই তাকে চেনে। তার বয়স হয়েছিল ছিয়ানব্বই। এই বয়সেও বেশ সুস্থ সবল ছিল। তাকে অসুখবিসুখে বিশেষ ভুগতে দেখা যায়নি। এক মাস আগেও সে বেশ সুস্থ ছিল। এক দিন বাড়ি ফেরার পথে সে অন্ধকারের মধ্যে একটা পুকুরে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ জলে থাকার জন্য তার ঠান্ডা লাগে আর তাতেই সে মারা যায়।

জুলে আমাকে লক্ষ করে বলল, "এই দরিদ্র মেষপালকটিকে আমাদের একবার দেখতে যাওয়া উচিত। তোমার ইচ্ছা হলে যাওয়া যেতে পারে।"

আটান্ন বছরের এক নাতি, তার থেকে এক বছর কম বয়সের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছিল বুড়ো মেষপালকের সংসার। তবে ছেলেমেয়েরা এখন আর কেউ নেই, সকলেই মারা গিয়েছে। গ্রামে ঢোকার মুখে যে পুরোনো ভাঙাচোরা ছাতলা আর নোনা ধরা একটা বাড়ি ছিল, সেখানেই তারা বাস করত।

আমাদের বাড়ির এই নির্জন পরিবেশে আমাদের ক্রিসমাস ইভের উৎসবটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল। সেদিন আমরা জমিয়ে আড্ডা দিলাম আর গল্প করলাম। ভালোমন্দ খাবার দিয়ে আমরা ডিনার করলাম। পাইপ টেনে আমরা অনেক তামাক পুড়িয়ে ফেললাম। দীর্ঘদিনের পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে বেশ আনন্দ পেলাম অনেক দিন পরে। পরের দিনের শিকারের পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম। এই গভীর নির্জনতা, এই প্রাচীন পরিবেশ আমাদের ভালোবাসার, আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধনকে যেন আরও দৃঢ় করল। আমরা মনে প্রাণে একাত্ম হয়ে গেলাম।

পরিচারক এসে বলল, "অনুমতি দিলে আমি গির্জায় যেতে পারি।"

জুলে বলল, "এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছ, কী ব্যাপার?"

সে বলল, "বারোটা বাজতে আর খুব দেরি নেই।"

জুলে বলল, "তাহলে আমাদেরও আর ঘরের মধ্যে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আমরাও গির্জার দিকে এগিয়ে যাই। মাঝরাতে ভজন গান শুনতে খারাপ লাগবে না।"

আমি আপত্তি করলাম না। এর পরে মোটা মোটা শীতের পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে আমরা গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। এত ঠান্ডা যে সবকিছু জমাট বেঁধে

যাচ্ছে। কিন্তু রাত্রির নির্মেঘ নীল আকাশে অসংখ্য তারার ভিড়। মনে হচ্ছে অসংখ্য আলোর ফুল ফুটে আছে সেখানে, সেগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। বরফাস্তীর্ণ মাটির ওপরে চাষিদের কাঠের জুতোর ঠকঠক শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে গির্জা থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টার শব্দ। চাষিদের অনেকেই হাতে লণ্ঠন নিয়ে স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। রাস্তাটা যেন মৃদু আলোর মালায় সেজেছে। গ্রামে ঢোকার মুখে এসে জুলে বলল, "এখানে ফোরনেল তার নাতি আর নাতবৌকে নিয়ে থাকে। চলো আমরা ভিতরে যাই।"

এই বলে এগিয়ে এসে আমরা অনেকক্ষণ ধরে দরজায় ধাক্কা দিলাম। কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। সেসময় রাস্তা দিয়ে একজন চাষি যাচ্ছিল। আমাদের ওভাবে দরজায় ধাক্কা দিতে দেখে বলল, "ওরা কেউ বাড়িতে নেই, ঠাকুরদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সবাই গির্জায় গেছে।"

লোকটার কথা শুনে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে গির্জায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম ভজন শুরু হয়ে গেছে। যিশুর মূর্তির চারিদিকে মোমবাতি জ্বেলে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোটা পরিবেশটা আলোয় ঝলমল করছে। পুরুষরা শ্রদ্ধা জানাবার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর মেয়েরা নতজানু হয়ে জোড়হাতে প্রার্থনা করছে।

কিছুক্ষণ পরে জুলে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিশফিশ করে বলল, "এই পরিবেশে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে, চলো আমরা বাইরে যাই।"

এর পর আমরা বাইরে বেরিয়ে জনহীন পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে ফোরনেলদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর একটা রেখা বেরিয়ে আসছে।

জুলে বলল, "মৃতদেহটাকে বুড়োর নাতি আর নাতবৌ খুবসম্ভব পাহারা দিচ্ছে, এবার ভিতরে চলো, আমাদের দেখলে ওরা আনন্দই পাবে।"

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। অপরিসর ঘরের সিলিং এত নীচু যে একজন লম্বা লোক সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার মাথা ঠুকে যাওয়ার সম্ভাবনা। চারিদিকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে কেরোসিনের একটা কুপি জ্বলছিল। ঘরের মধ্যে দমবন্ধ করা পরিবেশ, একটা বিদঘুটে ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে ছিল বাতাসে। সেখানে ফোরনেলের নাতি আর নাতবৌ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল। তাদের মুখের ওপর নেমে এসেছে শোকের বিষণ্ণ ছায়া। সামনে রাখা আছে, ক্রিসমাস ইভের প্রচলিত খাবার- এক প্লেট পুডিং। সেই পুডিং তারা ছোটো ছোটো টুকরোয় কেটে রুটির সঙ্গে মিশিয়ে খাবে। লোকটা মদের গ্লাস খালি করে দিলেই তার স্ত্রী আবার ভরতি কলশি থেকে মদ ঢেলে দেবে লোকটার গ্লাসে।

তারা আমাদের তাদের সঙ্গে খেতে অনুরোধ করল। কিন্তু ওই পরিবেশ এবং ওদের ওই মনের অবস্থার মধ্যে আমাদের কিছুই খাওয়ার ইচ্ছা হল না বলেই আমরা ওদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। এবার তারা খেতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ

পরে জুলে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "অ্যানথাইম, তোমার ঠাকুরদার কি মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ স্যার, আজ বিকেল চারটে নাগাদ।"

কী জিজ্ঞেস করব ঠিক না করতে পেরে আমি বললাম, "নিশ্চয়ই তোমার ঠাকুরদার অনেক বয়স হয়েছিল।"

অ্যানথাইমের স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ, তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়ানব্বই। এই পৃথিবীতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছিল।"

বুড়ো ফোরনেলকে একবার দেখার খুব ইচ্ছা হল আমার। আমি তাদের দেখার ইচ্ছার কথা জানাতেই তারা যেন হতভম্ব দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বুড়োর মৃতদেহটাকে তারা দেখাবে কি না সে ব্যাপারে তারা অত্যন্ত দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। জুলেও সেটা লক্ষ করল। এবার জুলে মৃতদেহটিকে দেখাবার জন্য অ্যানথাইমকে বারবার বলতে লাগল। কিন্তু সে কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। তখন জুলের জেদ বেড়ে গেল ভীষণরকমের। তখন বুড়োর নাতি বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার, তাতে কি আপনাদের কোনো লাভ হবে?"

জুলে বলল, "লাভলোকসানের কথা জানি না কিন্তু মৃতদেহ দেখাতে তোমাদের আপত্তি কেন?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু রাগের গলায় বলল, "না, আপত্তি কিছুই নেই। তবে মৃতদেহটা এখন নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না।"

এর পরে তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে নানারকম চিন্তাভাবনা উদয় হল। দেখলাম, মৃতদেহ দেখাবার তাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। তাদের সেখান থেকে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখলাম না। এমন ভাব দেখাতে লাগল, আমরা চলে গেলে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

এবার জুলে বলল, "এসো অ্যানথাইম, ঘরের ভিতরটা একবার ভালো করে দেখি।"

"তাতে কোনো লাভ হবে না স্যার, কারণ মৃতদেহ ওখানে নেই।"

এবার অ্যানথাইমের স্ত্রী বলল, "শুনুন তাহলে, মৃতদেহ সংরক্ষণ করার মতো যথেষ্ট জায়গা নেই আমাদের সুতরাং সেটাকে আমরা ময়লা ফেলা ঝুড়ির মধ্যে ফেলে রেখেছি।"

এর পর চার পাশ ঢাকা টেবিলের ওপরের অংশটা উঁচু করে তুলে ধরে আমাকে কুপিটা নিয়ে আসতে বলল, কুপির আলোয় দেখলাম, মেষপালকের পোশাক পরে জরাজীর্ণ চেহারার বৃদ্ধটি ময়লার গাদার মধ্যে মরে পড়ে আছে। তার সমস্ত শরীরটা শুকনো রুটির মতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যে টেবিলের খোলের মধ্যে মৃতদেহটাকে তার নাতি রেখে দিয়েছে সেটাকে খাবার টেবিল হিসাবে ব্যবহার করছে।

মৃত আত্মার প্রতি এই অসম্মান, অশ্রদ্ধা দেখে জুলে প্রচণ্ড রেগে গেল। সে চিৎকার করে বলল, "পাজি বদমাশ কোথাকার, বুড়োর মৃতদেহটাকে তার বিছানায় শুইয়ে রাখতে পারনি? ঠাকুরদা বলে যার পরিচয় দিচ্ছ, তার প্রতি এই সামান্য কর্তব্যটুকু পালন করতে পারনি, তোমাদের লজ্জা করে না?"

অ্যানথাইমের বউ জুলের বাক্যবাণে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "স্যার, সত্যি বলতে আমাদের কিছু করার ছিল না। আমাদের এই ছোট্ট ঘরখানাতে একটামাত্র বিছানাই সম্বল। উনি যখন বেঁচেছিলেন তখন আমরা ছোটো চৌকিটার ওপর তিনজনে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আমি ও আমার স্বামী মেঝেতে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। এই হাড় হিম করা ঠান্ডায় মেঝেতে শুয়ে থাকতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তাই আজ বিকেলে যখন তিনি মারা গেলেন তখন আমরা স্থির করলাম, টেবিলের খোলে, ময়লা ফেলার জায়গায় মৃতদেহটাকে রেখে দেব। কারণ মৃত মানুষের কাছে বিছানা আর ময়লা ফেলার জায়গার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আর মরা মানুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকাও সম্ভব না।"

তার যুক্তি শুনে আরও রেগে গেল জুলে। দরজাটা ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দুপদাপ শব্দে হেঁটে তিরের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। তার পিছনে পিছনে আমিও বেরিয়ে এলাম। আমার চোখ দুটো তখন জলে ভরে উঠেছে। দারিদ্র্য মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে!

শিল্পী
The Artist

বৃদ্ধ বাজিকর আমাকে বলল, ব্যাপারটা আর কিছুই নয় মঁসিয়ে, এ ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করতে গেলে শুধু প্রয়োজন অভ্যাস আর অনুশীলনের। তবে ঈশ্বরদত্ত কিছু প্রতিভারও প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে মাখনের মতো নরম আঙুল হলে সাফল্য অর্জন করা সহজ হবে না। সব থেকে যে জিনিসটা বেশি প্রয়োজন, তা হল, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং বহু বছর ধরে প্রত্যহ অনুশীলন।

তার ভদ্রতা ও শিষ্টতাবোধ আমাকে সব থেকে বেশি অবাক করল। কারণ যেসব অন্যান্য বাজিকরের সংস্পর্শে আমি এসেছি তারা যতটা না দক্ষ তার থেকে অনেক বেশি দাম্ভিক। কিন্তু এই বাজিকরটি যতটা দক্ষ ততটাই বুদ্ধিমান ও চতুর। বহুবার আমি তার খেলা দেখেছি। সার্কাস বা অন্যান্য জায়গায় যখন সে খেলা দেখায়, আমার মতো সকলেই সেই খেলা দেখে। তার যে খেলাটা দর্শককে সব থেকে বেশি আকৃষ্ট করে ও আনন্দ দেয় সেটা হল, একটা কাঠের তক্তার গায়ে একজন পুরুষ বা মহিলাকে হেলান দিয়ে দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়াতে বলা হয় আর সে তাদের আঙুলের ফাঁকে এবং মাথার পাশে বেশ খানিকটা দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে কাঠের সঙ্গে বিঁধিয়ে দেয়। এর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই। যে এই খেলার কৌশল বেশ ভালোভাবে রপ্ত করেছে তার কাছে খেলাটা অসাধারণ কিছু নয়। যে দ্রুতগতিতে চকচকে ছুরিটা অর্ধবৃত্তাকারে জীবন্ত মানুষটির দিকে ছুটে যায় তা প্রদর্শনীতে এক ভয়ংকর ভীতির সৃষ্টি করে। তবুও যে-কোনো প্রদর্শনীতে এটা অত্যন্ত সাধারণ খেলা এবং এই খেলা দেখাবার জন্য প্রয়োজন শুধু মাঝারি রকমের দক্ষতা।

এই খেলায় না আছে বিশেষ ধরনের কোনো কৌশল, না আছে কোনো প্রতারণা বা চোখে ধুলো দেওয়ারও কোনো ব্যাপার। একান্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই খেলাটা দেখানো হয়। এই ছুরিগুলো ক্ষুরের মতো ধারালো আর বৃদ্ধ বাজিকরটি আঙুলের ফাঁকে যে কোণ তৈরি হয় সেখানকার চামড়া ঘেঁসে বিঁধিয়ে দেয় সেই ক্ষুরের মতো ধারালো ছুরি। সে ছুরিগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাথার চারি পাশে কাঠের গায়ে এমনভাবে বিঁধিয়ে দেয়, মাথার চারপাশ ঘিরে তৈরি হয় একটা বৃত্ত। গলার পাশের ছুরিগুলো গলার চারিদিকে কলারের মতো আটকে থাকে। ক্যারোটিড আর্টারি না কেটে পুরুষ বা মহিলাটিকে সেখান থেকে বের করে আনা অসম্ভব। এই খেলাটাকে আরও কঠিন করে তোলার জন্য বাজিকরটি চোখ বন্ধ করে খেলা দেখায়। তার সমস্ত মুখমণ্ডলটা পুরু অয়েলক্লথ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবে সমস্ত বড়ো বড়ো শিল্পীদের মতো মানুষ তাকে বুঝতে পারেনি বা সাধারণ দর্শকের কাছে সে কোনো স্বীকৃতি পায়নি। তাদের কাছে ওটা ছিল সাধারণ

একটা কৌশল আর অয়েলক্লথে চোখ ঢাকার ব্যাপারটা ছিল স্রেফ একটা ধাপ্পা—এ সমস্ত খেলায় যেটা অত্যন্ত সাধারণ।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা যেত, লোকটা আমাদের খুব বোকা ভাবে। চোখ বন্ধ করে ওইভাবে লক্ষ স্থির করা কি কখনও সম্ভব?

তারা মনে করত ওই অয়েলক্লথের মধ্যে এমন সব সূক্ষ্ম ছিদ্র করা আছে—যা দর্শকদের পক্ষে দূর থেকে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে দর্শকদের কাছে অয়েলক্লথটা পরীক্ষা করতে দিয়েও বিশেষ লাভ হত না। সেখানে কোনো ছিদ্র খুঁজে না পেয়ে তারা মনে করত তাদের রীতিমতো ঠকানো হচ্ছে। এই সব খেলা দেখতে এসে তাদের যে প্রতারিত হওয়া উচিত, সেটা কি তারা জানত না?

আমি কিন্তু এই বৃদ্ধ বাজিকরটির মধ্যে এক অসাধারণ শিল্পীকে আবিষ্কার করেছিলাম। আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, কোনোরকম শঠতা বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া এই লোকটির পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আমি যখন তার খেলার প্রশংসা করছিলাম, তখন তাকে আমি সে-কথা বলেছিলাম। আর তার সম্বন্ধে আমার মতামতও প্রকাশ করেছিলাম। আমার কাছ থেকে প্রশংসা ও সুবিচার পেয়ে সে সত্যিই ভীষণ অভিভূত হয়েছিল। এইভাবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিপ্রদ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। সে তখন সত্যিকারের কৌশলের কথা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে বলল যে দর্শক সেটা বোঝে না বা বুঝতে চায় না। কৌশলটি আর কিছুই নয়, দীর্ঘদিন ধরে নিরন্তর অভ্যাস আর অনুশীলন।

তার পক্ষে যে কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া যে অসম্ভব আমার এই কথাগুলো তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে বলেছিল, সত্যিই সেটা অসম্ভব —এতটাই অসম্ভব যে আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না। কিন্তু সে-কথা দর্শকদের বোঝাতে যাওয়া স্রেফ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তার সমস্ত মুখটা আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো হয়ে গেল। চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। আমি তার বিশ্বাসে আঘাত করার সাহস পেলাম না। আমার চোখে দৃঢ় বিশ্বাসের আভাস লক্ষ করে সে বলল, একমাত্র আপনাকেই আমি বলতে পারি। আপনিই একমাত্র আমাকে বুঝতে পারবেন। এর পরে হঠাৎ সে ক্রুদ্ধ হিংস্র স্বরে বলে উঠল, কেউ না বুঝলেও সে অন্তত বোঝে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কে?

"কে আবার, আমার দ্বিচারিণী স্ত্রী," সে বলল, "কীধরনের ঘৃণ্য একটি প্রাণী সে, আপনি যদি তা জানতেন! আমার কৌশলটা যে কী, সেটা সে বুঝত, বেশ ভালোভাবেই বুঝত এবং সেই কারণেই তাকে আমি ভীষণভাবে ঘেন্না করি। আমাকে প্রতারণা করার জন্য যতটা না তার থেকে বেশি এই কারণে। কারণ ওটা একটা স্বাভাবিক অপরাধ এবং সেটা ক্ষমার যোগ্য কিন্তু অন্য অপরাধটা মারাত্মক।

যে স্ত্রীলোকটি কাঠের নিশানাটার সঙ্গে গা-লাগিয়ে হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে এবং আঙুলগুলোকে ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকত এবং যাকে লক্ষ করে ক্ষুরের মতো

ধারালো ছুরিগুলো একটার পর একটা ছুঁড়ে তার মাথার চারিদিকে একটা বৃত্ত তৈরি করত, সে স্ত্রীলোকটি ছিল তার স্ত্রী। চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স, দেখতেও মন্দ নয় কিন্তু তার মানসিক বিকৃতির প্রতিফলন ঘটেছিল তার সৌন্দর্যে। তার মুখের মধ্যে ফুটে উঠত সীমাহীন ঔদ্ধত্য এবং সেই মুখের প্রতিটি রেখায় প্রকাশ পেত তার বিকৃত জৈব ক্ষুধা। তার নীচের ঠোঁটটা ছিল যতটা মোটা, ওপরের ঠোঁটটা ছিল সেই তুলনায় পাতলা এবং শুকনো।

আমি বহুবার লক্ষ করেছি, বাজিকর যতবার একটা করে ছুরি ছুঁড়ে বোর্ডটাকে বিঁধেছে, ততবার সে এত মৃদুস্বরে হেসে উঠেছে যার শব্দ শোনা যায় না বললেই চলে। কিন্তু কেউ যদি কখনও সেই হাসির শব্দ শুনতে পেত, তাহলে সে বুঝতে পারত সেই হাসি অত্যন্ত কঠিন এবং তাতে মিশে আছে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ। আমি সেই হাসিটিকে খেলার অঙ্গ এবং পরিবেশের উপযুক্ত মনে করেছিলাম। কিন্তু বাজিকর আমাকে যে কথাগুলো বলল তা শুনে আমি চরম বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

"ওর হাসিটা লক্ষ করেছেন? ওই হাসির মধ্য দিয়ে ও আমাকে বিদ্রুপ করে, আমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। কারণ সে জানে তার কিছুই হবে না, সে নিশ্চিতভাবে জানে আমি শত চেষ্টা করেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারব না।"

"তুমি কী করতে চাও?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বুঝলেন না? আমি তাকে এইভাবে খুন করতে চাই।"

"তাকে খুন করতে চাও? কেন না সে..."

"কেন না সে আমাকে ভীষণভাবে ঠকিয়েছে, আপনি হয়তো একথা ভাবছেন। কিন্তু মোটেই তা নয়—আমি আপনাকে আবার বলছি। তার ওই অপরাধ বহুকাল আগেই ক্ষমা করেছি আর সে সমস্ত ব্যাপার দেখা বা শোনা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু সব থেকে মারাত্মক ভুলটা আমি কী করেছি জানেন? তাকে প্রথম ক্ষমা করার সময় আমি বলেছিলাম তার গলা কেটে আমার প্রতি তার এই ঘৃণ্য জঘন্য আচরণের প্রতিশোধ নেব। লোকে মনে করবে ওই খুনের পেছনে আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না এবং সেটা নেহাত একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"ওহ্, তাহলে তুমি সে-কথাই তাকে বলেছিলে।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলেছিলাম এবং আমার ইচ্ছাও ছিল সেইরকমই। আমি ভেবেছিলাম, খুনটা আমি করতে পারব আর তার জন্য আমার হাত বিন্দুমাত্র কাঁপবে না। কারণ আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সেটা করার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ভেবে দেখুন তো, কাজটা কত সহজ, কত সাধারণ আর লোভনীয়। সামান্য আধ ইঞ্চির একটা ভুল, তার গলার কাছে যে জুগুলার ভেন বা শিরাটা আছে সেটা কেটে দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে। ব্যস্ সব খেল খতম্। রক্তের স্রোত বয়ে যেতে থাকবে—তারপর সব শেষ। সে মারা যাবে আর আমার প্রতিশোধের স্পৃহা চরিতার্থ হবে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কথাটা ভয়ংকরভাবে সত্যি।"

"আর সেজন্য আমার কোনো ঝুঁকি নেওয়ার দরকার হবে না। ওটা নিছক একটি

দুর্ঘটনা হিসাবে প্রমাণিত হবে। নেহাতই অদৃষ্ট, আমাদের এই সমস্ত খেলায়, ভুলবশত এ ধরনের দুর্ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। কেউ তাতে আমাকে অভিযুক্ত করতে পারবে না, অভিযোগ করার কথা কল্পনাই করতে পারবে না। একমাত্র এই বলে অভিযোগ করতে পারে, আমি হঠকারিতা বা ভুলবশত নরহত্যা করেছি। অভিযোগ করার থেকে আমাকে তারা দয়া দেখাবে। আমি কান্নাভেজা স্বরে বলতে থাকব, আমার স্ত্রী, আমার হতভাগ্য স্ত্রী! বলব, ওঃ, আমার স্ত্রী আমাকে কীভাবেই না আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। আমার বুটি বুজিতে আমাকে কীভাবে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করেছে। আমার নিত্যদিনের খেলার সাথি ছিল সে।'' আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এভাবে বললে লোকে নিশ্চয়ই আমার প্রতি করুণা দেখাবে।

''নিশ্চয়ই, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।''

''আর একথা আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, প্রতিহিংসা নেওয়ার ধরনটা ভারী চমৎকার। এইভাবে প্রতিহিংসা নিতে পারলে আমি সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকব এবং আমার নিরাপত্তা বজায় থাকবে।''

''আমারও সেইরকমই মনে হচ্ছে।''

''বেশ! কিন্তু আমার স্ত্রীকে যখন আমার ইচ্ছার কথাটা জানালাম, তখন সে কী বলল জানেন?''

''বলল, তুমি একজন সৎ এবং সুন্দর মানুষ, এমন ভয়ংকর কাজ করা তোমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।''

''ছিছি, ছি, আপনি যেমন ভাবছেন তেমন ভালো মানুষ আমি নই। আমি যে রক্ত দেখে আদৌ ভয় পাই না সেটা আমি অনেক আগেই প্রমাণ করেছি। যদিও কীভাবে এবং কোথায় তার প্রমাণ দিয়েছি—সে-কথা আপনাকে বলা নিরর্থক হবে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু সেটা আমার স্ত্রীর কাছে প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ সে বেশ ভালো করেই জানে অনেক ভালো জিনিস করার আমার ক্ষমতা আর যোগ্যতা আছে যথেষ্ট পরিমাণে। অপরাধের ক্ষেত্রেও আমি সমান দক্ষ, বিশেষত একটি অপরাধের ক্ষেত্রে আমি অসাধারণ দক্ষতা প্রমাণ করতে পারব।

''তোমার স্ত্রী খুব ভয় পেয়েছিল বলে আমার মনে হয় না।''

''আপনি ঠিকই ধরেছেন। সে মোটেই ভয় পায়নি। সে কেবল বলছিল, আমি যা বলেছি, তা আমি কখনই করতে পারব না। একবার ভেবে দেখুন, আমি নাকি কখনই পারব না।''

''কেন পারবে না?''

''আহ্, মঁসিয়ে, আপনাকেও ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি না। কেনই বা আপনি বুঝতে পারছেন না? আমি কি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলিনি যে দীর্ঘদিনের নিরন্তর অভ্যাস ও অনুশীলনে আমি এই বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছি।''

''তাতে কী হল?''

"বাঃ আপনি সেটা বুঝতে পারলেন না? কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল—আমার হাত দুটো আমার আদেশ মেনে চলবে না—কারণ আমি যদি এখন ইচ্ছাও করি, তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার শত চেষ্টাতেও আমার লক্ষ ব্যর্থ হবে না। নির্দিষ্ট লক্ষে গিয়ে বিদ্ধ হবে আমার নিক্ষিপ্ত ছুরি।

"এও কি কখনও সম্ভব?"

"আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে এর থেকে সত্য আর কিছুই হতে পারে না। কারণ আমি সর্বদা আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার স্বপ্ন দেখেছি এবং যেটা করা অত্যন্ত সহজ মনে করেছিলাম।

"অসভ্য মহিলাটির ঔদ্ধত্য এবং নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে এতটা বিশ্বাস দেখে আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আমি বহুবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছি এবং ছুরিগুলো ছুঁড়ে তার মাথার চারিদিকে বৃত্ত তৈরি করার সময় সেগুলোকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় আমি আমার সমস্ত দক্ষতা এবং শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করেছি। সেগুলোকে প্রায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ এমনভাবে ছুঁড়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে তার গলাটা কাটা পড়ে। কিন্তু আমি কখনও সে কাজে সফল হতে পারিনি। ফলে সেই বেশ্যাটা সর্বদা আমাকে বিদ্রুপ করে হেসেছে।"

সে যখন কথা বলছিল, দেখলাম তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। সে রাগে প্রায় গর্জন করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপনি আমার দক্ষতা, আমার ধৈর্য, আমার একাগ্রতার যতটা পরিচয় পেয়েছেন এবং আমি নিজেকে যতটা জানি বা চিনি তার থেকে ওই বেশ্যাটা আমাকে অনেক বেশি চেনে বা জানে। আমি যে একটি নির্দোষ যন্ত্রে পরিণত হয়েছি, সেটা সে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। সে জানে ওই যন্ত্রটাকে নিয়ে যথেষ্ট পরিহাস করা যায়, সেটাকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রিত করা যায় আর এটাও জানে ওই যন্ত্রটা কখনও বিগড়ে যাবে না। সে জানে, ভুল আমি করতে পারব না, কখনই না।

নদীর বুকে
On The River

গত বছর গ্রীষ্মকালে, প্যারিস থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে সেন নদীর তীরে আমি একটা ছোট্ট কটেজ ভাড়া নিয়েছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমি সেই কটেজে গিয়ে কিছুটা সময় কাটাতাম। কিছু দিন পরে এক প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এ ধরনের অদ্ভুত চরিত্রের খেপাটে লোক আমি আগে কখনও দেখিনি। নৌকো আর নদী সম্বন্ধে তার আকর্ষণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত। নৌকোই ছিল তার জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এক কথায়, সে ছিল জলের পোকা। নৌকো আর নদী ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তাকে কখনও কথা বলতে শুনিনি। নিশ্চয়ই নৌকোতেই তার জন্ম হয়েছে আর নৌকোর মধ্যেই এক দিন কেউ তার মৃতদেহটাকে খুঁজে পাবে।

এক দিন সন্ধ্যায় যখন আমরা নদীর ধার দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম তখন তার কাছে জলের মধ্যে নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দু-একটা ঘটনার কথা জানতে চাইলাম।

সে বলল, এ বিষয়ে কত স্মৃতি যে মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। তোমরা যারা শহরে বাস কর তারা জান না নদী কী! নদী সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু কোনো জেলে যখন নদী সম্বন্ধে কথা বলবে, তখন লক্ষ করবে তার মধ্যে কী এক অপূর্ব ভাবের স্ফূরণ ঘটেছে। তার কাছে নদী এক অজানা রহস্য। নদী যেন তাদের কাছে এক অদ্ভুত মরীচিকা, এক অপার্থিব স্বপ্ন। যে সমস্ত জিনিসের প্রকৃতই কোনো অস্তিত্ব নেই, রাত্রিতে নদীর চরে, তার চারিদিকে সে সমস্ত অদ্ভুত জিনিস দেখা যায় আর অদ্ভুত সব শব্দ বা চিৎকার শোনা যায়। গভীর রাত্রিতে কবরখানার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় যে সমস্ত দৃশ্য দেখা যায় বা যে সমস্ত শব্দ শোনা যায়—তার কারণ খুঁজে না পেয়ে পথিক কেমন অদ্ভুত রহস্যময় এক ভয়ে কেঁপে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে নদী হল কবর ছাড়া একটি কবরস্থান। এই নদীর গর্ভে তলিয়ে গেছে কত জীবন্ত মানুষ, যেখানে তাদের সলিলসমাধি ঘটেছে আর সেই কবরের নীচে তারা চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে আছে।

একজন জেলে মাটির সীমানা খুঁজে পায় কিন্তু জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে তার কাছে মনে হয় নদী যেন অনন্ত, অসীম। কোনো রহস্যময় অজানা দিগন্তে তা যেন হারিয়ে গেছে। সাগরের বুকের একজন নাবিকের কিন্তু তেমন অনুভূতি হয় না। সমুদ্র ভয়ংকর নিষ্ঠুর কিন্তু এর ফেনিল রূপ আর ভয়ংকর গর্জন মিশে থাকে বাতাসে। সমুদ্র আমাদের সতর্ক করে দেয়, কিন্তু নদীর নীরবতা বিশ্বাসহন্তার রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। নদী বয়ে চলে অতি সংগোপনে—শোনা যায় না এর কলকল শব্দ অনন্তকাল ধরে,

মৃদুগতিতে বয়ে যাওয়া এই নদীর রূপ, সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ আর ক্রুদ্ধ গর্জনের থেকে আমার কাছে অনেক বেশি ভয়ংকর।

সমুদ্রের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা বলেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে আছে এক বিস্তীর্ণ নীল অরণ্য। সেই সমস্ত অরণ্য অথবা স্ফটিকের গুহায় মাছেরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু নদীর পঙ্কিল গহ্বরে আছে শুধু কালো কালো কাদা। কিন্তু যখন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় নদীর জলে এবং যখন ছন্দে ছন্দে তালে তালে সেই নদীর জল চলকে পড়ে ভেঙে যায় তীরের ওপরে তখন সে অপূর্ব এক শোভায় সুন্দরী হয়ে ওঠে।

তুমি যখন শুনতে চাইছ, তখন আমার অভিজ্ঞতার একটা কাহিনি তোমাকে আমি বলছি।

ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। সেসময় আমি থাকতাম বৃদ্ধ মাদার লাফাঁর বাড়িতে। এক দিন সন্ধেবেলা আমি যে বারো ফুট নৌকোটা নিয়ে বেরোতাম, সেটার দাঁড় টানতে টানতে আমি ভীষণ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সেই অবস্থায় প্রায় মাতালের মতো টলতে টলতে বাড়ি ফিরে আসছিলাম। রেলব্রিজ থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা নলখাগড়ার জঙ্গলের কাছে নৌকোটাকে রেখে ভাবলাম কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব। আবহাওয়া ছিল চমৎকার। চাঁদের রুপোলি আলো নদীর জলে প্রতিফলিত হয়ে গলিত রুপোর মতো ঝিকমিক করছে, সেইসঙ্গে মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসছে কত জানা অজানা ফুলের গন্ধ। প্রকৃতির সেই স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করল। আমার তখন মনে হল প্রকৃতির এই সুন্দর পরিবেশে পাইপে তামাক ভরে ধূমপান করে আমি বেশ তৃপ্তি লাভ করব। এই সীমাহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি কোথাও কোনো স্পন্দন অনুভব করলাম না। মাঝে মাঝে শুধু তীরের ওপর শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বাতাসের ছোঁয়ায় শরগাছগুলোর মৃদুকম্পন। কিন্তু সেদিকে তাকাতেই আমার কেমন যেন এক অদ্ভুত অপার্থিব অনুভূতি হতে লাগল।

নিস্তরঙ্গ শান্ত নদী এবং চারিদিকের এই নিবিড় নিস্তব্ধতা আমাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করল। জলার নৈশকালীন গায়ক ব্যাঙগুলোর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল না। হঠাৎ আমার ডান দিকে একটা ব্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ শব্দে ডেকে উঠল। আমি সেই শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ব্যাঙটা তার ডাক বন্ধ করতেই প্রকৃতি ডুবে গেল সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে। নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগলাম। কিন্তু ধূমপানে আমার অস্বাভাবিক আসক্তি সত্ত্বেও সেটা আমার কাছে বিস্বাদ মনে হল। আমি তখন নিজের মনে গুনগুন করে গান গাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার নিজের কণ্ঠস্বরে আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম।

কিছুই আমার ভালো লাগছিল না বলে আমি নৌকোর পাটাতনের ওপর শুয়ে চাঁদের আলোয় আলোকিত আকাশের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হল নৌকোটা যেন সামান্য দুলে উঠল। শুধু তাই নয়, মনে হল নৌকোটাকে কেউ

যেন এক দিক থেকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। এর পর ভয়ে বিস্ময়ে আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি হারিয়ে গেল। মনে হল কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন নৌকোটাকে তীর থেকে নদীর জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং নৌকোটাকে আবার এমনভাবে তীরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যাতে সেটা গড়গড়িয়ে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে। মনে হল যেন একটা ঝড়ের দাপট আমাকে উলটে ফেলে দেবে। বিভিন্নরকমের অদ্ভুত সমস্ত শব্দ আমার কানে আসতে লাগল। কিন্তু কীসের শব্দ তা আমার বোধগম্য হল না। আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। দেখলাম, চাঁদের আলোয় নদীর জল ঝিকমিক করছে—আর প্রকৃতি তেমনি নিস্তব্ধতার গভীরে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমার সমস্ত শরীরে মৃদু কাঁপুনি অনুভব করলাম। তারপর কেমন এক অদ্ভুত ভয়ে ওই জায়গা ছেড়ে চলে আসব বলে মনস্থ করলাম। আমি এর পর নৌকোর শিকল খোলবার জন্য এগিয়ে গেলাম এবং শিকল ধরে টানতে লাগলাম। নৌকোটা খানিকটা এগিয়ে এল। নৌকোর শিকলটা খোলার চেষ্টা করতেই মনে হল বিপরীত দিক থেকে কে যেন জোর করে শিকলটাকে টেনে ধরে রেখেছে এবং সেই টানের শক্তি এত প্রচণ্ড যে শত চেষ্টা করেও আমি শিকলটা খুলতে পারলাম না।

নিজের মনে এক বিন্দু সাহস খুঁজে পেলাম না। হতাশ হয়ে সেখানে বসে এই দুর্দৈবের কথা ভাবতে লাগলাম। এই মনোরম আবহাওয়া আমাকে ভাবতে সাহস জোগাল, নিশ্চয় কোনো জেলে এদিকে আসবে আর আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। এই দুর্ঘটনা আমাকে এত বেশি শান্ত করে তুলেছিল যে আমার গলা দিয়ে একটাও শব্দ বেরোল না। আমার সঙ্গে এক বোতল রাম ছিল। তা থেকে তিন-চার গ্লাস খেয়ে ফেললাম আর নিজের শোচনীয় অবস্থা দেখে নিজেই হাসতে শুরু করলাম। এই মদটা ছিল ভীষণ কড়া এবং সেটা আমার সমস্ত শরীরকে এত বেশি উত্তপ্ত করে তুলেছিল, সারারাত বাইরে কাটালেও কিছুই মালুম হত না।

হঠাৎ নদীর জলের উপরিভাগে একটা সাদা কুয়াশার চাদর কে যেন বিছিয়ে দিল। সুতরাং আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন নদীর স্রোত, আমার নিজের হাত এমনকি এত বড়ো নৌকোখানাও দেখতে পাচ্ছিলাম না সেই কুয়াশার আবরণ ভেদ করে। মনে হল অদ্ভুত সাদা রং-এর একটা কম্বলের মধ্যে আমার কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে। বিচিত্র অতিলৌকিক সমস্ত দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হল, কে যেন হামাগুড়ি দিয়ে আমার নৌকোয় ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে আমি অনেক চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না। ঘন কুয়াশায় ঢাকা নদী যেন অদ্ভুত কিছু জীবে ভরতি হয়ে গেছে আর তারা আমার চারিদিকে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয়, উত্তেজনা আর আশঙ্কায় আমার সমস্ত মাথাটা দপদপ করতে লাগল। আমার হৃৎপিণ্ডটা এমন সাংঘাতিকভাবে লাফাতে শুরু করল—মনে হল তার গতি এখনই বন্ধ হয়ে যাবে। এর পর, আমি নিজের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম আর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে ওঠার জন্য তৈরি হলাম। কিন্তু এই চিন্তা আমার সমস্ত চেতনাকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার মনে হল

তাহলে আমি নিশ্চয়ই ঘন কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাব, আমাকে তীরের সন্ধানে দিশাহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে জলজ লতাগুল্ম আর শরগাছের জঙ্গালের মধ্যে। কিন্তু আমি তীর বা আমার নৌকোটাকে খুঁজে পাব না। আবার মনে হল নিশ্চয়ই কেউ আমাকে আমার পা দুটো ধরে অন্ধকার জলের নীচে টেনে নিয়ে যাবে।

আমি এ ধরনের ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলাম। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম, কিছুতেই আমি ভয় পাব না। ভয়ের বিরুধ্বে অনেক যুক্তি খাড়া করলাম কিন্তু তা যেন ক্রমশ আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করতে চাইল। কিন্তু অদম্য ইচ্ছায় আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলাম। আবার ব্র্যানডির বোতলটা উঁচু করে বেশ খানিকটা গলায় ঢেলে দিলাম, তরল আগুনের প্রবাহ নামতে লাগল আমার গলা দিয়ে।

হঠাৎ আমি যথাসম্ভব উঁচু গলায় চিৎকার করতে লাগলাম। চেঁচাতে চেঁচাতে যখন আমার গলা দিয়ে আর শব্দ বেরোচ্ছিল না, তখন অনেক দূরে কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম।

আমি আরও খানিকটা রাম গলায় ঢেলে দিয়ে নৌকোর তলায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টা দুই সেখানে ওই অবস্থায় পড়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলাম নদীর বুক থেকে কুয়াশার আবরণ অদৃশ্য হয়েছে এবং নদীর দুই তীরে সেগুলো সরে গিয়ে এমন আকার নিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন দুটো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেই কুয়াশার ছোটো ছোটো সাদা পাহাড়ের ওপর যখন চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল, তখন সেই আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে সমস্ত প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে দিল এক অপূর্ব উজ্জ্বল আলো। ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, আমার পাশ দিয়ে একটা ছায়া সরে গেল। আমি সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। সে উত্তর দিল, কণ্ঠস্বরটা ছিল একজন জেলের। আমি তাকে ডেকে আমার দুরবস্থার কথা জানালাম। সে তার নৌকোটা নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমরা দুজনে শিকলটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। কিছুক্ষণ পরে আর একটা নৌকো দেখতে পেলাম—যথারীতি তাকে ডেকে তার সাহায্য চাইলাম। এবার তিনজনে হাত লাগাতেই শিকলটা খুলে এল। এর পর নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল কিন্তু সেটা খুব ভারী বোধ হল। শেষে কালো স্তূপের মতো কিছু একটা দেখতে পেয়ে সেটাকে নৌকোয় টেনে তুললাম। সেটা ছিল এক হতভাগী বৃদ্ধার মৃতদেহ, তার গলায় একটা বিরাট পাথর বাঁধা ছিল।

কুৎসিত
The Ugly

মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কাছে আজকের যুগটা সব থেকে উপযুক্ত এবং প্রশংসনীয় একটি যুগ। আজকের যুগের মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষের সাম্যবাদের প্রতি সীমাহীন আস্থা। আজকের যুগটা যেন একটি ঘৃণিত আয়তক্ষেত্র। অ্যাডগার অ্যালান পোর মতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সাদৃশ্য বা সাযুজ্যের স্বপ্ন দেখে। সুতরাং কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একজন হোটেল পরিচারকের পার্থক্য নির্ধারণ করার ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব। এই সমস্ত দিনগুলো ভবিষ্যতের সুন্দর শুভ ও আশীর্বাদধন্য কিছু দিনের লক্ষণ সূচনা করছে—যেদিন পৃথিবীর সমস্ত জিনিস এমন একটি মাত্রায় নীরস, নিরানন্দ হয়ে উঠবে, প্রত্যেকের কুৎসিত হয়ে ওঠার অধিকার থাকবে বরং কুৎসিত হয়ে ওঠাটা একটা কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

লেবু সেই অধিকারটিকে নিষ্ঠুর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই কর্তব্য তিনি পালন করেছিলেন ভয়ংকর বীরত্বের সঙ্গে এবং বিষয়টিকে আরও কুৎসিত করে তুলতে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর জন্মের সময়ে নাম রাখা হয়েছিল লেবু। নিয়তির কৌতুকের দোসর একজন বিচক্ষণ ধর্মপিতা তার নামকরণ করেছিলেন অ্যান্টিনাস। সমসাময়িক যুগে যাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠতম কুৎসিত হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন, কুৎসিতের মাপকাঠিতে তাঁদের অতিক্রম করে গিয়েছিলেন আমাদের এই অ্যান্টিনাস লেবু। কিন্তু মির‍্যাবুর মতো কুৎসিত হওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করতে পারেননি। লোকে এই মির‍্যাবুকে শ্রেষ্ঠতম কুৎসিত হিসাবে অভিহিত করত।

না, মির‍্যাবুর মতো কুৎসিত তিনি হতে পারেননি। কুৎসিতের সৌন্দর্য তাঁর ছিল না। তিনি কুৎসিত ছিলেন, ওইটুকুই তার একটু বেশিও না কমও না। তাঁর পিঠে ছিল না কোনো কুঁজ বা বাঁকা হাঁটু নিয়ে তিনি জন্মাননি। তিনি ছিলেন কুৎসিতভাবে কুৎসিত। হাঁটু দুটো বড়োও ছিল না ছোটোও ছিল না। কিন্তু তাঁর শরীরে কোথাও এমন একধরনের অসামঞ্জস্য ছিল যা শুধু একজন চিত্রকরের চোখেই নয় সকলের চোখেই ধরা পড়ত। কারণ লোকে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত তখন তাঁর দিকে একবার পিছন ফিরে না তাকিয়ে পারত না। তাদের মুখ দিয়ে শুধু একটা কথাই বেরিয়ে আসত, ওহ, কী বস্তু!

তাঁর মাথার চুলের রংএ কোনো বিশেষত্ব ছিল না, হালকা বাদামি রং-এর সঙ্গে মেশানো ফিকে হলুদ রং। তাঁর মাথায় যেটুকু চুল ছিল তাতে তাঁকে টেকো বলা চলে না। চাঁদির সামান্য অংশটাতেই শুধু একটুখানি টাক। টাকের অংশটা ছিল মাখন রং-এর। না, ঠিক কি মাখন রং-এর? না, মার্জারিনের রং-এর মতো বললে ঠিক বলা হবে। অবশ্য সেই মার্জারিনের রং বিবর্ণ, তাঁর মুখের রংটাও ছিল মার্জারিনের মতো কিন্তু সেটা ভেজাল মার্জারিন।

আমি তাঁর মুখের যে বর্ণনা দিলাম—তাতে তিনি যে কতটা কুৎসিত তার কিছুই বলা হল না। মোটকথা কিছুই না। কুৎসিতের মাত্রাটা শুধু কল্পনা করে নিতে হবে। নাহলে সেটা লিখে বা বলে বোঝানো যাবে না।

ধরে নিন, তাঁর কুৎসিত রূপ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারিনি। তাঁর কুৎসিতের মাত্রাটা বর্ণনা করতে যাওয়াটা বোকামি বা নিরর্থক হবে বলে আমার মনে হয়। সুতরাং সেই রাস্তা দিয়ে না যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শুধু এটুকু বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে, "তাঁর কুৎসিত রূপ বর্ণনা করা অসম্ভব।" কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যান নি যে অ্যান্টিনাস লেবু কুৎসিত। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা অবশ্যই বিশেষভাবে প্রভাবিত হবেন এবং অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারবেন না—আগে কখনও এমন কুৎসিত কোনো মানুষকে দেখেছেন কি না। দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত শিকার হিসাবে তিনি যে এমন কুৎসিত রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন—একথা তিনি নিজেও জানতেন।

এটা থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে তিনি নির্বোধ বা মন্দ লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনে সুখ ছিল না বা তিনি সুখী ছিলেন না। একজন অসুখী মানুষ সর্বদা নিজের দুঃখ, যন্ত্রণা আর দুর্ভাগ্যের কথাই চিন্তা করে। লোকে তাঁর রাত্রিতে ঘুমের সময় ব্যবহৃত টুপিটাকে নির্বোধের টুপি বলে মনে করে। মানুষের সেই মহত্ত্ব শ্রদ্ধা অর্জন করে—যা আনন্দ আর প্রফুল্লতার স্পর্শে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। অ্যান্টিনাস লেবু একজন বদমেজাজি নির্বোধ মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হলেন সকলের কাছে। সেইজন্য তাঁর হতকুচ্ছিত চেহারার জন্য কারও সমবেদনা বা সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হলেন।

তাঁর জীবনে একটিমাত্র সুখানুভূতি, একটিমাত্র আনন্দ ছিল, গভীর রাত্রিতে অন্ধকার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এবং রাতের পথিকদের কাছ থেকে শোনা, সুন্দর আঁধারের কৃষ্ণবর্ণের মানুষ, তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে এসো।

কিন্তু হায়, এই গোপন আনন্দের ভাগ তিনি কাউকে দিতে পারতেন না। তিনি জানতেন এ আনন্দ মিথ্যা, এ ক্ষণস্থায়ী। "অন্ধকারের মানুষ তুমি আমার বাড়ি এসো"—এই বলে নিশাকালের যে পথিকটি আহ্বান জানাত, সে যদি বৃদ্ধা এবং মাতাল হত—তাহলে তিনি সেই আহ্বানে কিছুটা হয়তো লাভবান হতেন, কিন্তু চিলেকোঠার ঘরের আলোটা যখন জ্বলে উঠত, সেই আলোতে যখন সে তাঁকে দেখতে পেত তাঁকে আর 'অন্ধকারের মানুষ' বলে সম্বোধন করত না বা আহ্বান জানাত না। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধারা বার্ধক্যের ভারে আরও বেশি জীর্ণ, জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ত। আর মাতাল স্ত্রীলোকদের নেশা কেটে গিয়ে তারা ভদ্র শান্ত হয়ে উঠত। তাদের মধ্যে অনেকে বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠে তাঁর মুক্ত হস্তে দানের অর্থ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে বলত, "আপনার চেহারাটা সত্যি অতি কুৎসিত।"

যা হোক, শেষ পর্যন্ত সেই শোকাবহ আনন্দকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন যেদিন তিনি একজন কুৎসিত এবং জঘন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার বাড়ি যাচ্ছিলেন। সেদিন সেই কুৎসিত স্ত্রীলোকটি না বলে থাকতে পারল না, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত।

তিনিই নিতান্ত ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, হায় রে অসুখী, হতভাগ্য মানুষ। সামান্য একটু

প্রেম, একটু ভালোবাসার জন্য তিনি ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল বুঝি সেই প্রেম ভালোবাসা, প্রীতি বন্ধুত্ব সবকিছু এই জগত থেকে হারিয়ে গেছে। তাঁর ইচ্ছা হল না রাস্তার নোংরা কুকুরের মতো বেঁচে থাকতে তাঁর এই হতকুচ্ছিত চেহারাটাকে নিয়ে। তিনি মনুষসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী এই নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে চাইলেন না।

সব থেকে কুৎসিত, সব থেকে জঘন্য কোনো স্ত্রীলোক তাঁকে যদি কুৎসিত না বলে বা ভয় বা ঘৃণাতে শিউরে না ওঠে, তাহলে সে তাঁর কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসাবে বিবেচিত হবে।

তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে এক দিন তাঁর সঙ্গে একজন কুৎসিত স্ত্রীলোকের দেখা হল, এবং তাঁকে প্রচুর ভিক্ষে দিয়ে তাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন। কারণ ভিক্ষে নেওয়ার পর সে তাঁর হাতে চুম্বন করেছিল। স্ত্রীলোকটির কুৎসিত রূপের বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় তার সমস্ত মুখ বড়ো বড়ো ব্রণে ভর্তি হয়ে আছে, সেগুলো ফেটে গিয়ে তা থেকে পুঁজ, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মদ্যাসক্তির চিহ্ন তার সমস্ত শরীরে, পরনে একইভাবে ব্যবহৃত বহুদিনের নোংরা জামা, শতছিন্ন পেটিকোট। নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে শিকনি আর মুখ দিয়ে অবিরাম ঝড়ে পড়ছে লালা। তিনি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে পরিষ্কার করলেন, তাকে পরালেন সুন্দর পোশাক। এইভাবে তার যত্ন নিতে লাগলেন। তাকে তাঁর পরিচারিকার দায়িত্ব দিলেন, তারপর দিলেন সংসারের ভার। তারপর তাকে তাঁর রক্ষিতার আসনে বসালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করলেন।

স্ত্রীলোকটি প্রায় তাঁরই মতো কুৎসিত। প্রায় কিন্তু ঠিক তাঁর মতো অতটা নয়। সে ছিল বিকটদর্শনা। কিন্তু তার বিকট রূপের মধ্যে নিশ্চয়ই সৌন্দর্য এবং এমন কিছু ছিল যার দ্বারা একজন নারী একজন পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে। তাঁকে প্রতারিত করে স্ত্রীলোকটি সেই সত্যটাকে প্রমাণ করল এবং সে যে আর একজনের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে তার সঙ্গে রাত কাটাল, সেটা তিনি দেখতে পেলেন।

কুৎসিতের বিশেষণে লোকটি আরও এক ধাপ উঁচুতে। শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের থেকে তিল তিল সৌন্দর্য নিয়ে যেমন তিলোত্তমাকে গড়ে তোলা হয়েছিল—তেমনি পৃথিবীর সমস্ত কুৎসিততম রূপ থেকে তিল তিল করে নিয়ে লোকটিকে গড়ে তোলা হয়েছিল। শুধু তাই নয় চরিত্রের দিক থেকেও সে ততটাই কুৎসিত। জেলের ঘানি টেনেছে বেশ কয়েকবার। ছোটো ছোটো মেয়েদের নিয়ে কেনাবেচার কাজ করেছে। ভবঘুরের জীবন কাটিয়েছে। তার হাঁটার ভঙ্গির সঙ্গে তুলনা করা যায় নোংরা একটা ব্যাঙ-এর থপথপ করে চলার ভঙ্গি। ঈল মাছের মতো মুখ, আর একজন মৃতব্যক্তির মুণ্ডুর মতো মুণ্ডুতে নাকের জায়গায় দুটো গর্ত ছাড়া আর কিছু নেই।

সেই অসতী ব্যভিচারিণী স্ত্রীর স্বামী এক দিন তাকে বললেন, ওইরকম একটা জঘন্য ও ঘৃণ্য লোকটির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে তুমি আমার সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করেছ এবং সেটা করেছ আমারই বাড়িতে থেকে এবং প্রকাশ্যে এমনভাবে

সেটা করেছ যাতে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত থাকাকালীন আমি তোমাদের দেখতে পাই। নোংরা ইতর কোথাকার, কেন তুমি এমন করেছ? আমার থেকে অনেক বেশি কুৎসিত দেখেও তুমি কেন আমাকে এইভাবে প্রতারিত করলে?

স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে উঠল, তুমি আমাকে ব্যভিচারিণী বা নোংরা বেশ্যা, যা খুশি বলতে পার কিন্তু একথা বোলো না যে সে তোমার থেকে কুৎসিত।

তার কথা শুনে সেই অসুখী মানুষটি বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্ত্রীলোকটি এবার তার অসম্পূর্ণ কথাগুলোকে সম্পূর্ণ করল, কারণ সে কুৎসিত এবং বিশেষরকমের কুৎসিত—তার কুৎসিত রূপের মধ্যে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তুমি অন্যান্য অনেক কুৎসিতদের মতোই কুৎসিত। তোমার কুৎসিত রূপের মধ্যে কোনো বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। তুমি অত্যন্ত সাধারণভাবে কুৎসিত।

ম্যাডাম ব্যাপটিস্ট
Madam Baptist

লোবেঁর স্টেশনের ওয়েটিংরুমে ঢুকেই আমি দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্যারিসে যাওয়ার এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য আমাকে আরও দুঘণ্টা দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

হঠাৎ অত্যন্ত ক্লান্তবোধ করতে লাগলাম। মনে হল আমি কুড়ি মাইল পথ হেঁটে এসেছি। কীভাবে এতটা সময় কাটানো যাবে, সেই ভেবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এর পর আবার স্টেশনের গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম কীভাবে এতটা সময় কাটাব।

একটা বিড়াল রাস্তা পার হয়ে খুব সাবধানে চিলেকোঠার ওপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। একটা কুকুর খাবারের আশায় প্রতিটি গাছের নীচে ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু একজন মানুষের ছায়াও চোখে পড়ল না। তখন আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। নিজেকে কেমন যেন হতাশ বিষণ্ণ মনে হল। বুঝতে পারছিলাম না, কী করে এতটা সময় কাটাব? রেলস্টেশনের কাছে যে সমস্ত ছোটো ছোটো কাফে থাকে সেখানে গিয়ে নিকৃষ্ট মানের দুই এক বোতল বিয়ার আর একখানা অস্পষ্ট ছাপার সংবাদপত্র নিয়ে সময় কাটাব কি না ভাবছিলাম। সেসময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল—একটা শোকমিছিল উলটোদিকের রাস্তা থেকে বেরিয়ে আমি যে রাস্তাটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম সেদিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। শোকযাত্রাটাকে দেখে খানিকটা স্বস্তি পেলাম, সেটা দেখে অন্তত মিনিট দশেক সময় তো কাটানো যাবে।

আমার কৌতূহলটা হঠাৎ ভীষণ বেড়ে গেল। দেখলাম, শবাধারের পিছন পিছন আসছেন ভদ্রচেহারার আটজন মানুষ। তাঁদের মধ্যে একজন কাঁদছিলেন আর বাকি সাতজন সমবেত স্বরে প্রার্থনার পদগুলো উচ্চারণ করছিলেন। ওই শোকমিছিলের সঙ্গে গির্জার কোনো ফাদারকে না দেখতে পেয়ে বেশ অবাক হলাম। ভাবলাম—এই শেষকৃত্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই ধর্মীয় কোনো ব্যাপার যুক্ত নয়। লোবেঁর মতো শহরে নিশ্চয়ই কম করে একশোজন স্বাধীন চিন্তার মানুষ আছেন যাঁরা এইভাবে তাঁদের মতামতকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

দ্রুতগতিতে শোকমিছিলটাকে এগিয়ে যেতে দেখে নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে শবদেহটিকে কোনোরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই সমাহিত করা হবে।

আমার নিশ্চিত ধারণাটা যে কতটা অমূলক সেটা কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম। শোকমিছিলটি যখন অনেকটাই এগিয়ে এসেছে, তখন অদ্ভুত একটা আইডিয়া এল আমার মাথায়। সেই আটজন ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে যাব বলে ঠিক করলাম, তাতে আমার এক ঘণ্টার মতো সময় স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। সেই ভেবে মুখে দুঃখের ভাব নিয়ে তাঁদের পিছনে পিছনে হেঁটে চললাম।

আমাকে এভাবে তাঁদের সঙ্গে যেতে দেখে শেষের দুজন আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলতে লাগলেন, খুবসম্ভব আমি এই শহরের মানুষ কি না সেটাই তাঁরা আলোচনা করছিলেন। এর পরে তাঁরা আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন—যাতে আমি বেশ বিরক্তবোধ করলাম। আর সেটা কাটাবার জন্য সোজা তাঁদের সামনে গিয়ে তাঁদের অভিবাদন করে বললাম, "আপনাদের আলোচনায় বাধা দেবার জন্য আমি দুঃখিত। এটাকে সাধারণ একটা শোকযাত্রা মনে করেই আমি এই মিছিলে যোগ দিয়েছি। অবশ্য মৃত ভদ্রলোকটিকে আমি চিনি না।"

ওঁদের মধ্যে এক ভদ্রলোক বললেন, মৃতা একজন স্ত্রীলোক। আমি তাঁর কথা শুনে খুব অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা একটা সাধারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, তাই না?

অন্য ভদ্রলোকটি, যিনি ব্যাপারটা আমাকে বলার জন্য উৎসুক হয়েছিলেন, বললেন, হ্যাঁ অথবা না—দুটোই বলা যায়। পুরোহিত আমাদের গির্জায় ঢোকার অনুমতি দেননি।

তাঁর কথা শুনে আমার মুখ থেকে বিস্ময়ের একটা শব্দ বেরিয়ে এল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, এটা একটা দীর্ঘ কাহিনি। এই তরুণী স্ত্রীলোকটি আত্মহত্যা করেছে বলে তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে না। যে ভদ্রলোক চোখের জল ফেলতে ফেলতে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন তিনি স্ত্রীলোকটির স্বামী।

কিছুটা সংকোচের সঙ্গে আমি বললাম, "আপনার কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি, ব্যাপারটা জানার জন্য আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে আমার কি অভদ্রতা হবে?"

ভদ্রলোক পরিচিত মানুষের মতো আমার একটা হাত ধরে বললেন, মোটেই না, মোটেই না। আসুন আমরা দল থেকে একটু আলাদা হয়ে যাই। ঘটনাটা সত্যিই দুঃখজনক। ওই যে দূরে পাহাড়ের কাছে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওখানেই কবরখানা। ওখানে পৌঁছোতে আমাদের বেশ অনেকটা সময় লেগে যাবে।

তাঁর কথা শেষ করে ঘটনাটা বলতে শুরু করলেন।

পাশের শহরের ধনী ব্যবসায়ী মসিয়ে ফনটানেলের এই মেয়েটির নাম, ম্যাডাম পল হ্যামট। সে যখন এগারো বছরের একটা ছোটোমেয়ে—সেসময় তার ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাদের বাড়ির একজন পরিচারক তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে, আর তাতে তার মারা যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। একটা সাংঘাতিক ফৌজদারি মামলা করা হল তার বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত জানা গেল তিন মাস ধরে ভৃত্যটি তার ওপর একইভাবে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে গিয়েছিল আর সেই অপরাধে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

এই অপযশ আর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মেয়েটি বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। সঙ্গীহীন অবস্থায় তার নিঃসঙ্গ জীবন কাটতে লাগল। বয়স্ক মানুষরা তাকে সর্বদা

এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। তাকে সকলে চুম্বন করতে ভয় পেত—পাছে তার সংস্পর্শ তাদের শরীরকে দূষিত করে। শহরের মানুষদের কাছে সে বিকট একটা প্রাণী হয়ে দাঁড়াল। সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত তখন সকলে ভয়ে এক দিকে সরে যেত। তাকে বাইরে নিয়ে বেড়াবার জন্য তার বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেও একজন নার্স খুঁজে পেলেন না অর্থাৎ কোনো নার্স তার সংস্পর্শে আসতে চাইল না। অন্যান্য চাকর-বাকরও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাদের ভয় হতে লাগল, যে তার সংস্পর্শে আসবে—তার দেহে ওর দেহের বিষ ছড়িয়ে পড়বে।

মেয়েটির অবস্থা হয়ে উঠল একান্তই করুণ। বিকেলে যখন ছেলেমেয়েরা খেলা করত তখন সে তার পরিচারিকার হাত ধরে এক পাশে ম্লান বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা তাকে দেখে মজা পেত। এক এক সময় অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশে খেলা করার জন্য তার ভীষণ ইচ্ছা হত। অনেক চেষ্টা করেও সে তার ইচ্ছাটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত না। খুব ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত লজ্জা ও সংকোচের সঙ্গে সে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ত। তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে অন্যান্য মেয়েদের মা বা পরিচারিকারা ছুটে এসে তার নিজের মেয়েটিকে সেখান থেকে জোর করে টেনে নিয়ে যেত।

ছোট্ট ফনটানেল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে একা একা দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে—কাঁদতে কাঁদতে পরিচারিকার বুকে গিয়ে মুখ লুকোত।

বয়স তার যত বাড়তে লাগল, তার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠল। সে যেন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছে—এইভাবে মেয়েদের বাপমায়েরা তাদের মেয়েদের তার থেকে সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখত। পড়াশোনা তার কিছুই হয়নি। বিয়ের রাত্রিতে মেয়েদের যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়—সে অভিজ্ঞতা সে ভালো করেই লাভ করল বিয়ের আগেই।

গভর্নেসকে সঙ্গে নিয়ে যখন সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত তখন লজ্জা, কলঙ্ক আর গ্লানিতে সে তার মাথাটাকে নীচু করে রাখত। অন্যান্য মেয়েরা, একই দোষে দোষী হলেও, তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিত পাছে তাদের পরস্পরের চোখে চোখে পড়ে যায়। লোকে তাকে অভিবাদন জানাত না, কয়েকজন চ্যাংড়া ছেলে তাকে বিদ্রুপ করে ম্যাডাম ব্যাপটিস্ট বলে সম্বোধন করত। যে চাকরটা তার জীবনটাকে এমন এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তার নাম ছিল ব্যাপটিস্ট।

তার মানসিক যন্ত্রণার কথা সে মুখ ফুটে কারও কাছে বলত না। তার মুখে কেউ কখনও হাসি দেখেনি। তার বাবামাও তার উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করতেন। যেন তার সেই অপূরণীয় অপরাধের জন্য সে-ই দায়ী আর তাতে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও সম্ভ্রম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সৎ বা ভদ্র কোনো তরুণ এই ধরনের একজন অপরাধীকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। নিজের ছেলে এ ধরনের অপরাধ করলে তার বাপ মাও তার বিয়ে দিতে রাজি হবেন

না। মঁসিয়ে আর ম্যাডাম ফনটাসনেলও তাঁদের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা মাথা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিলেন। মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী হলেও তার চেহারাটা ছিল বিবর্ণ। সে সেই দুর্ভাগ্যের শিকার না হলে, তাকে আমার বেশ ভালোই লাগত।

দেড় বছর আগে যখন এখানে একজন নূতন সাবপ্রিফেক্টকে নিয়োগ করা হল, তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন অদ্ভুত ধরনের একজন মানুষ, বাস করতেন ল্যাটিন কোয়ার্টার-এ। ম্যাদময়জেল ফনটানেলকে দেখে তিনি তার প্রেমে পড়ে গেলেন। তিনি যখন সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলেন, তাতে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ওটাই হবে আমার গ্যারান্টি। আমি বলব, বিয়ের পরে না ঘটে, বিয়ের আগেই যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটাই মঙ্গ ল। ফলে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব।

সেক্রেটারি ভদ্রলোক ঠিকানা খুঁজে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। তাঁর সৎসাহসের যে অভাব নেই এবং কিছুই যে ঘটেনি সেটা প্রমাণ করার জন্য বিবাহের প্রীতি অনুষ্ঠানে অনেককে নিমন্ত্রণ করলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল। অনেকে আবার ভোজের অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সকলের মন থেকে মুছে যেতে লাগল এবং সেক্রেটারি ভদ্রলোকের স্ত্রী হিসাবে সমাজে সে তার পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান ফিরে পেল। সমাজজীবনে তাকে ফিরিয়ে আনাব জন্য এবং সামাজিক সম্মানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে তার স্বামীকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত। যে সাহস এবং তেজস্বিতার সঙ্গে তার স্বামী সমস্ত অপমান আর অসম্মানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের কুৎসিত সমালোচনা, নিন্দা আর বিদ্রুপের তীব্র প্রতিবাদ করে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন, সেই স্বামীর চরিত্রগুণে সে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তাঁর প্রতি তার সমস্ত অন্তর গভীর ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে গেল।

তার মধ্যে যখন মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিল এবং সবাই যখন সে-কথা জানতে পারল, তখন এতদিন ধরে যারা তার সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করেছে, যারা তার সম্বন্ধে এতদিন ধরে হীন কদর্য মন্তব্য করেছে—তারাই তাদের দরজা খুলে দিয়ে তাকে সাদরে বরণ করে নিল। কারণ তাদের মনে হল মাতৃত্বের গৌরব তাকে সমস্ত অপরাধের গ্লানি আর কলঙ্ক থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে শুদ্ধ, পবিত্র করেছে।

ব্যাপারটা কৌতুককর হলেও সত্যি। সবকিছু স্বচ্ছন্দে, সুন্দরভাবে চলতে লাগল। এদিকে আমাদের শহরে প্যাট্রন সেন্ট-এর উৎসব শুরু হল। সেই উৎসবে সঙ্গীতের যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল তাতে সভাপতিত্ব করলেন সাবপ্রিফেক্ট। সঙ্গে ছিল তাঁর অফিসের লোকজন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি পল হ্যামট সকল প্রতিযোগীদের হাতে মেডেল তুলে দিতে লাগলেন।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এই পৃথিবীতে হিংসা আর রেষারেষি কীভাবে মানুষের সততা ও ন্যায়পরায়ণতাকে দূষিত করে। সমবেত মহিলারা মঞ্চের ওপর উঠে এল। এরপরে মঞ্চের ওপর উঠে এল মোরমিলিয়ন গ্রামের ব্যান্ডমাস্টার। এই

ব্যান্ডমাস্টারের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির মেডেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ আপনি নিশ্চয়ই সকলকে প্রথম শ্রেণির মেডেল দিতে পারেন না। সেই হিসাবে ব্যান্ডমাস্টারের ত্রুটিযুক্ত পারফরম্যান্সের জন্য তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির মেডেলটি দেওয়া হল। কিন্তু প্রাইভেট সেক্রেটারি যখন সেই মেডেলটি তার হাতে তুলে দিলেন তখন সে সেটাকে তাঁর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "ব্যাপটিস্টের জন্য এই মেডেলটি আপনি রেখে দিন। আমাকে যেমন প্রথম শ্রেণির মেডেলটা আপনার দেওয়া উচিত—তেমনি এই ধরনের একটা মেডেল আপনার কাছে তার প্রাপ্য।"

তার কথা শুনে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অনেকে হাসতে আরম্ভ করল। সাধারণ মানুষের মধ্যে রুচি ও উদারতার যথেষ্ট অভাব আছে। এবার প্রত্যেকে হতভাগ্য স্ত্রীলোকটিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। মঁসিয়ে, কোনো স্ত্রীলোককে কি আপনি উন্মাদ হয়ে যেতে দেখেছেন? আমরা কিন্তু নিজের চোখে সেই দৃশ্য দেখলাম। স্ত্রীলোকটি তিনবার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল এবং তিন-তিনবারই চেয়ারের ওপর পড়ে গেল। সে মনে করেছিল সে সেখান থেকে ছুটে পলিয়ে যাবে কিন্তু মানুষের ভিড় ঠেলে সে সেখান থেকে বেরোতে পারল না। তখন ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, ও, ওহ্, ম্যাডাম ব্যাপটিস্ট।

সভার মধ্যে প্রচণ্ড হইচই চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। হোহো করে হাসতে লাগল সবাই। সকলে কথাটা বারবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল। সেই অসুখী হতভাগ্য স্ত্রীলোকটিকে দেখার জন্য সবাই তাদের পায়ের আঙুল-এর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। স্বামীরা তাকে তাদের স্ত্রীদের দেখাবার জন্য তাদের হাত ধরে উঁচু করে তুলল।

"কই, কই দেখি! ওই নীল রং-এর পোশাক পরে যে বসে আছে?"

চ্যাংড়া ছেলেগুলো মোরগের মতো করে ডাকতে লাগল। সমস্ত জায়গাটায় হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

স্ত্রীলোকটি চেয়ারের ওপর থেকে এক ইঞ্চিও সরে এল না। মনে হল জনতার প্রদর্শনীর জন্য তাকে চেয়ারের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। সে নড়াচড়াও করতে পারছিল না, সেখান থেকে উঠে যেতে পারছিল না বা মুখটাকে ঢাকতেও পারছিল না। মুখের ওপর জোরালো কোনো আলো পড়লে মানুষ যেভাবে তাকায় সে সেইভাবে আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাতে লাগল। কোনো ঘোড়া যখন খাড়া পাহাড়ি পথ পার হওয়া সময় হাঁপাতে থাকে সে সেইভাবে হাঁপাতে লাগল। ইতিমধ্যে মঁসিয়ে হ্যামট একজন দুর্বৃত্তের গলা টিপে ধরেছেন—এর পর দুজনে তারা ধস্তাধস্তি করতে করতে মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। ফলে অনুষ্ঠান সভার মধ্যে যে হইচই আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল তাতে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা কাজকর্ম সব বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে হ্যামটদম্পতির বাড়ি ফেরবার সময় ম্যাডাম হ্যামট একটাও কথা বলল না। সে শুধু থরথর করে কাঁপছিল। একটা সেতু পার হওয়ার যাওয়ার সময় সে একেবারে আচমকা তার স্বামী কিছু বুঝতে পারার আগেই নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভদ্রলোক বাধা দেবার কোনো সুযোগই পেলেন না। যেখানে ম্যাডাম

ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, সেখানকার জল ছিল অত্যন্ত গভীর। প্রায় দুঘণ্টা চেষ্টার পর তার মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গেল।

ভদ্রলোক দম নেওয়ার জন্য একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, তার অবস্থায় পড়লে এছাড়া আর কিছু করার থাকত না। মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা থাকে যেগুলোকে মুছে ফেলা যায় না—এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পাদরি কেন মৃতদেহটিকে নিয়ে আমাদের গির্জায় ঢোকার অনুমতি দেননি।

আমরা সিমেট্রির দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। আমি যে ঘটনার কথা শুনলাম তাতে আমার মনটা এক অব্যক্ত ব্যথায় ভরে উঠল। মহিলাটিকে নামানো হলে আমি হতভাগ্য স্বামীটির পাশে গিয়েঁ দাঁড়ালাম। তিনি তখন ভীষণভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমি তাঁর হাতে বেশ জোরে চাপ দিতেই তিনি জলভরা দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকালেন।

'মঁসিয়ে, সহানুভূতি জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

খানিকটা সময় নষ্ট করে আমি যে শোকমিছিলটার অনুসরণ করেছিলাম তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

ভয়ংকর
The Horrible

বাগানবাড়ির বৈঠকখানায় বসে মেয়েরা খোশগল্পে মেতে উঠেছিল। ঘরের বাইরে সবুজ ঘাসের লনের ওপর চেয়ার পেতে বসে পুরুষরা গল্প করছিল। তখন সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে প্রকৃতির বুকে। পুরুষরা তখন একটা দুর্ঘটনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। এই দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকাল। বাগানবাড়ির পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে গেছে, সেই নদীতে ডুবে মারা গেছে পাঁচজন—তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ আর তিনজন স্ত্রীলোক। সকলে ওই দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিল। 'কী ভয়ংকর দুর্ঘটনা'—তাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল।

কিন্তু পুরুষদের মধ্যে ছিল একজন সামরিক অফিসার। সে বলল, ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও আক্ষরিকভাবে একে ভয়ংকর বলা যাবে না। যে সমস্ত ঘটনা মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং যে দুঃখ বা হতাশার দ্বারা সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে কিন্তু ভয়ংকর বলা যাবে না অথবা নিষ্ঠুর কোনো মৃত্যু বা রক্তপাতের ঘটনাকেও অনেক সময় ভয়ংকর বলা যাবে না। ভয়ংকর—এই শব্দটির সংজ্ঞাটি যে কী তা সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে এক যা বলা যায় যে, ঘটনাটিকে 'ভয়ংকর' আখ্যা পেতে হলে সেটাকে হতে হবে অস্বাভাবিক এবং সেটি সমস্ত সত্তা এবং ইন্দ্রিয়কে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করবে। একটা ভয়ংকর ঘটনার কথা তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি।

যে সময়ে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা ছিল ১৮৭০ সাল। তখন ফরাসি ও জার্মানদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। প্রাশিয়ান বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়ে আমরা পশ্চাদপসরণ করছিলাম। আমাদের অর্থাৎ ফরাসি পক্ষের প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী অনাহার, অনিদ্রা এবং বিজয়ী পক্ষের তাড়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে নিরাপদ স্থানের জন্য ছুটে চলেছিল দিশাহারা হয়ে। সে সময় তাদের মনে সাহস জুগিয়ে তাদের পুনর্গঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা রুয়েন থেকে বেরিয়ে হাভারের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিলাম। প্রাশিয়ান সৈন্যরা তখন আমাদের সন্ধান পাওয়ার জন্য সবরকমভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন সবেমাত্র শীতের শুরু হলেও নর্মান্ডি অঞ্চলের হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাবার মতো অবস্থা হয়। গাছপালা, ঝোপঝাড়, জঙ্গল সব বরফে তখন ঢেকে গেছে। পর পর দুদিন আমরা অভুক্ত রয়ে গেলাম। কারণ আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত খাবারদাবার ছিল সব ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছিল।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মারাত্মক ঠান্ডার প্রকোপ আর তুষারপাত সহ্য করতে না পেরে বহু সৈন্য মারা গেল। আমরা বাকি সৈন্যদের নিয়ে এগোতে লাগলাম। আমার ওপর

তখন এক রেজিমেন্ট সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ওরকম চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ কারও কথা মেনে চলার প্রয়োজন মনে করছিল না। সামনের দিকে এগিয়ে চলাই তখন আমাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এক দিন দেখলাম, বৃদ্ধ একজন সৈনিককে ঘিরে ফেলেছে আমাদের দলের কয়েকজন সৈনিক। তারা তাকে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছে। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই আমাদের সৈন্যরা বৃদ্ধ সৈনিকটিকে গুলি করে মেরে ফেলল। তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় এতটা কাতর হয়ে পড়েছিল যে তারা তাদের দাঁড়াবার বা হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। যারা তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী তাদের প্রতি ভয়ংকর আক্রোশবশত শত্রুপক্ষের গুপ্তচরটির ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা উন্মাদ হয়ে উঠল এবং কোনো চিন্তাভাবনা না করেই তাকে গুলি করে মারল। তাদের ক্রোধ শান্ত হলে, আমার দুজন রক্ষীকে আদর্শে করলাম মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। দেখলাম, মৃত ব্যক্তিটি বৃদ্ধ সৈনিকের ছদ্মবেশে এক বৃদ্ধা নারী। খোঁজ নিয়ে জানা গেল—সে তার ছেলের সন্ধানে এই দিকে এসেছিল। মৃত অসহায় বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে আমার মনটা করুণায় ভরে উঠল, এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে পরে আমার দলের সৈন্যরা, "প্রাশিয়ানরা আমাদের পিছনে তাড়া করে আসছে, ওই দেখ প্রাশিয়ানরা আমাদের ধরতে আসছে" এইরকম চিৎকার করতে করতে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। সম্ভবত দূরে তারা কোনো কিছু দেখতে পেয়েছিল।

সৈন্যরা দলে দলে ভাগ হয়ে গিয়ে যে যেভাবে পারল পালাতে শুরু করল। বাকি যে সমস্ত সৈন্যরা রয়ে গেল, খাদ্যের অভাবে তাদের না খেয়ে থাকতে হল। কারণ ইতিমধ্যে সমস্ত মজুত খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে খাবার জোগাড় করার চিন্তা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আমাদের কাছে নূতন করে খাদ্য বা সৈন্য সরবরাহ করতে তাদের আরও কিছু দিন সময় লাগবে।

সৈন্যরা যখন দেখল, খিদের জ্বালা তাদের কাছে এমন অসহ্য হয়ে উঠেছে নিজেদের মধ্যে একজন কাউকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে খিদের যন্ত্রণা মেটাতে হবে এবং জীবনধারণ করতে হবে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটা নিয়ম তৈরি করল। সকলে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু বিভিন্ন পথে আলাদা আলাদাভাবে—যাতে একজন অন্য আর একজনের বন্দুকের নিশানার মধ্যে না থাকে এবং তাকে গুলি করে না মারতে পারে।

এইভাবে সমস্ত দিন ধরে তারা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেত। দিনের শেষে তারা কোনো নদী বা ঝরনার কাছে গিয়ে সেই জল আকণ্ঠ পান করে তাদের তৃষ্ণা মেটাত কিন্তু এক একজনকে পৃথকভাবে সেখানে যেতে হত। তারপর আবার তারা নিজেদের মধ্যে সমান দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলত নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

যথারীতি আমরা নিয়ম মেনে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ এক দিন সকালে একটা ব্যাপার লক্ষ করে চরম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা এমন ভয়ংকর এমন সাংঘাতিক যা চিন্তা করতে গেলে ভয় আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যেতে হয়। ঘটনাটা এত ভয়ংকর যার থেকে ভয়ংকর আর কিছুই হতে পারে না। দেখলাম, পথ চলতে চলতে একজন সৈন্য নিজেদের তৈরি নিয়ম অমান্য করে অন্য আর একজন সৈনিকের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। অন্য সৈনিকটি সেই সৈনিকটিকে নিয়ম ভেঙে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে, তার বিপদ বুঝে মাটিতে শুয়ে পড়ে এগিয়ে আসা সৈনিকটিকে লক্ষ করে গুলি চালাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই গুলি লক্ষভ্রষ্ট হল এবং সেটা তার গায়ে না লেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার সেই সৈনিকটি, যাকে লক্ষ করে গুলি করা হয়েছিল, এক মুহূর্ত দেরি না করে শুয়ে পড়া সৈনিকটিকে লক্ষ করে গুলি চালাল এবং সেই গুলিতেই তার মৃত্যু হল। তখন গুলির শব্দ শুনে চারিদিক থেকে সৈন্যরা ছুটে এসে হত্যাকারী সৈনিকটিকে ঘিরে ধরল। সে তখন নিহত সৈনিকটির শরীরটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে এক এক খণ্ড সকলকে ভাগ করে দিল এবং তারা সকলে মিলে সেই কাঁচা নরমাংস গোগ্রাসে গিলতে লাগল। আবার তারা আগের মতো নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে ফেলল, এই ধরনের ঘটনা যদি আবার ঘটে, তাহলে তারা আবার এক জায়গায় এসে মিলিত হবে।

এইভাবে তারা আরও দুদিন নরমাংস অর্থাৎ নিজেদের মৃত সহকর্মীর দেহের অবশিষ্ট মাংস খেয়ে জীবনধারণ করল। দুদিন পরে আবার সেই অসহ্য ক্ষুধায় তারা পাগল হয়ে উঠল। যে সৈনিকটি তার সহকর্মীকে হত্যা করে দুদিন নিজেদের ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়েছে, সে আবার আর একজনকে হত্যা করল এবং তার দেহ থেকে মাংস কেটে নিয়ে সকলের মধ্যে ভাগ করে দিল, তারপর সেই সব নরভুক্-এর দল আবার এগিয়ে যেতে লাগল নিজেদের গন্তব্যের দিকে। শেষ পর্যন্ত মানুষের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য এসে পৌঁছোল।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ভয়ংকর ব্যাপারটা কী এবং তার গুরুত্ব কতখানি।

ভাঁড়
The Mountebanks

থিয়েটারের সমালোচকরা ইডেন বুনিস থিয়েটারের ম্যানেজারের নাম দিয়েছিল কম্পার্ডিন। তার থিয়েটারের ব্যাবসা এতদিন চলছিল রমরম করে এবং লাভলোকসানের কথা চিন্তা না করে এই ব্যবসার পিছনে তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ঢেলে দিয়েছিল সে। কিন্তু সম্প্রতি গত কয়েক মাস ধরে তার ব্যাবসা মন্দা যাচ্ছিল। প্রায় একটি সপ্তাহ ধরে পরবর্তী অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে, বাড়ির দেয়াল, বড়ো বড়ো গাছ, দোকানের সামনের অংশ, চলন্ত গাড়ির পিছনের অংশ-প্রায় সমস্তই ঢেকে গিয়েছিল। প্যারিসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র শুধু কম্পার্ডিনের পরবর্তী অভিনয়ের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনে দেখা গেল বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান দুজন লোকের প্রতিকৃতি। তাদের দেখলে মনে হবে প্রাচীন রোমের দুজন দৌড়বীর। কম বয়সের যুবকটি হাত দুটো ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার ক্যানভাসের হাসি আর দ্বিতীয় তরুণটির পরনে মেক্সিকোর ফাঁদপাতা শিকারিদের পোশাক। সমস্ত কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে আগামী সোমবার ইডেন বুনিস থিয়েটারে এই দুই বীর আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আপনাদের আনন্দ দেবে। রংচঙে মনকাড়া বিজ্ঞাপনের মহিমায় সমস্ত শহর জুড়ে হইচই শুরু হয়ে গেল। এই মনতিফিয়ার দুজন তুচ্ছ জিনিসপত্র বা খেলনার মতো রোজপিচির খালি জায়গাটা কিছুটা পূরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই থিয়েটারে অভিনয় করতে এসেছিল। রোজপিচি নামের এই হঠকারী, মন্দ স্বভাবের স্ত্রীলোকটি ওসকার ইসকার নাটকের অভিনয় পর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ অংকের মাঝখানে ইউনিভার্সিটিতে সদ্য অ্যাডমিশন পাওয়া একটি সতেরো বছরের যুবককে নিয়ে ভালোবাসার স্বাদ মেটাতে ভেগে পড়েছিল। এ কাজে বিপদ, রক্তপাত এমনকি মৃত্যুর সম্ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। সে সমস্ত ব্যাপারগুলোকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। এই ঘটনা সম্ভবত ইডেন বুনিস থিয়েটারের ম্যানেজারের কপাল খুলে দিয়েছিল। ফলে এত বেশি টিকিট বিক্রি হতে লাগল যে বেশ কয়েকদিনের অ্যাডভান্স বুকিং ছাড়া কারেন্ট টিকিট পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। ম্যানেজার কম্পার্ডিন আনন্দে আটখানা হয়ে বলল, আমার ট্রাম্পের কার্ডখানা এবার উলটে গেছে।

কাউন্টেস রেজিনা ডি ভিলেগবি তাঁর নিজের খাসকামরায় কুশন মোড়া সোফার ওপর শুয়ে অলসভাবে পাখার হাওয়া খাচ্ছিলেন, তিনি সেদিন মাত্র তিন-চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারা তাঁর কাছে বসে গল্পগুজব করছিল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন, যার নাম সেন্ট মার্স মাতালভি, সে খুব নীচু স্বরে অশ্লীল প্রেম সম্বন্ধে সবে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন, তখন কাউন্টেস তার আঙুলে সামান্য

আঘাত করে বললেন, ''পাত্রগুলোতে চা ঢালতে পারবে?'' এর পর ভদ্রলোক ছোটো ছোটো চায়না কাপগুলোতে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করলেন, ''মিথ্যাবাদী খবরের কাগজগুলো যেভাবে মনতিফিয়ারদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে, তারা কি সত্যি অত ভালো অভিনয় করে এবং অতটা প্রশংসা তাদের প্রাপ্য?''

এর পর টম শেফিল্ড এবং অন্যান্যরা সেই আলোচনায় যোগ দিলেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, তাঁরা এত ভালো অভিনয় আগে কখনও দেখেননি।

কাউন্টেস রেজিনা চুপ করে বসে তাঁদের আলোচনা শুনছিলেন এবং একটা গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ছিলেন তাঁর ম্যানিকিওর করা নোখ দিয়ে।

তাঁদের আলোচনা শুনে ম্যাডাম ডি রোহেলের মাথা ঘুরছিল। তিনি উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে বললেন, ওদের অভিনয় দেখার আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি কম্পার্ডিনের থিয়েটারের দিকে ছুটে যাই।

তাঁর কথা শুনে একজন ধর্মপ্রচারকের মতো উদাত্ত গম্ভীর স্বরে কাউন্টেস বললেন, বোন, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মহিলার ওরকম একটা বাজে জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে ভয় পাওয়া উচিত।

সকলেই তাঁর কথা একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন। তা সত্ত্বেও দিন দুই পরে মনটিফিয়রসদের পারফর্ম্যান্স দেখার জন্য ইডেন বুনিস থিয়েটারে গিয়ে হাজির হলেন। সমস্ত শরীর কালো পোশাকে ঢেকে মাথায় মোটা কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে একেবারে পিছন দিকে বক্স-সিটে গিয়ে বসে পড়লেন।

ম্যাডাম ডি ভিলেগবির মনটা ছিল ইস্পাতের তৈরি ঢাল এর মতো ঠান্ডা। আবেগ, উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা নামক হৃদয়বৃত্তিগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না তাঁর মনের মধ্যে। সে সমস্ত ব্যাপার তাঁকে আদৌ প্রভাবিত করতে পারত না। কনভেন্টের লেখাপড়ার শেষ করার পর তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর প্রতি তাঁর কোনো ভালোবাসা ছিল না, সম্ভবত তিনি ভদ্রলোককে পছন্দও করতেন না। রবিবারের দিনগুলোতে তিনি যখন প্রার্থনা শেষে ম্যাডেলিন-এর গির্জার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেন তখন তাঁর শান্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হত, অনূঢ়া নারীর পবিত্রতায় তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

কাউন্টেস রেজিনা খানিকটা ভয়ে ভয়ে নিজের শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলেন এবং কোনো শিল্পী যখন তার বেহালার তারে উদ্দাম সুর সৃষ্টি করে এবং তাতে যেভাবে তারগুলো ভয়ংকরভাবে কাঁপতে থাকে, সেইভাবেই কাঁপতে থাকলেন কাউন্টেস রেজিনা। তিনি তাঁর হাত দুটো মুঠো করে, হামবড়া লোক দুটোর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন যাদের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, প্রতিটি পদক্ষেপের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে দর্শকরা হাততালি আর প্রশংসায় ফেটে পড়ছিল। কাউন্টেস প্রচণ্ড ঘৃণা ও অহঙ্কারের ভাব নিয়ে মুক্ত পরিবেশ ও খোলা হাওয়ার মধ্যে বেড়ে ওঠা বন্যজন্তুদের মতো বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান এই দুজন তরুণের সঙ্গে হাড় জিরজিরে রিকেট রোগাক্রান্ত ইংরেজ বরের পোশাকে অত্যন্ত বেমানান অতি কুৎসিত লোকটার তুলনা করলেন।

কাউন্সিলর জেনারেলের নির্বাচনের কাজগুলো শেষ করার জন্য তাঁকে আবার গ্রামে যেতে হল। তিনি ওই পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। যেদিন সন্ধেবেলা তিনি গ্রামের দিকে রওনা দিলেন সেদিনই সন্ধেবেলায় কাউন্টেস থিয়েটারে এসে উপস্থিত হলেন। অত্যন্ত কামপীড়িত হয়ে, কামের অসহ্য জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি একটা কাগজের টুকরোর উপর হিজিবিজি করে দু-ছত্র লিখে ফেললেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলারা চিরকাল যে কথাগুলো লিখে আসছে, সেই কথাগুলোই তিনি লিখলেন।

পারফর্ম্যান্সের পরে স্টেজের দরজার কাছে একটা গাড়ি আপনার জন্য অপেক্ষা করবে।

আপনার পূজারিণী এক অজ্ঞাত রমণী

সেই কাগজের টুকরোটা থিয়েটারে একজন বক্স-ওপনারের হাতে দিলেন পিস্তল স্যুটিং-এ চ্যাম্পিয়ন বলিষ্ঠদেহী সেই মন্টিফিয়রকে দেওয়ার জন্য।

কাউন্টেস তাঁর কাজ শেষ করে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে গিয়ে চুপ করে অপেক্ষা কবতে লাগলেন। দুর্গন্ধযুক্ত ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বসে বসে কামবাসনা মেটাবার জন্য এইভাবে চুপচাপ উপযুক্ত সঙ্গীর জন্য বসে বসে অপেক্ষা করা তাঁর কাছে কষ্টকর হয়ে উঠল। তবুও তিনি সে সমস্ত সহ্য করে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কারণ কামের জ্বালা যে বড়ো জ্বালা। বক্সের ওপর বসে যে কোচম্যানটি ঝিমোচ্ছে তাকে জাগিয়ে তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে সেদিকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে বলতে তিনি ভয় আর অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। যা হোক তিনি গাড়ির জানালায় ঠেস দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অভিনেতাদের প্রবেশপথে যে গ্যাসের আলো জ্বলছিল সেখানকার অন্ধকার প্যাসেজটার দিকে লক্ষ রাখতে লাগলেন। এই প্যাসেজটা দিয়ে পুরুষরা জোরে জোরে কথা বলতে বলতে পুড়ে যাওয়া চুরুটের শেষ অংশটা চিবোতে চিবোতে অবিরাম যাতায়াত করছিল।

অভিনেতাটি ব্যাপারটাকে রসিকতা বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে সে গাড়ির কাছে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু কাউন্টেস একটি কথাও বলতে পারলেন না বা তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। কারণ অসৎ আনন্দের উত্তেজনা ভেজাল মদের মতো মানুষকে প্রভাবিত করে। তাকে দেখতে পেয়েই তাঁর সমস্ত লজ্জা সংকোচ বিসর্জন দিয়ে তিনি তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন। প্রথমে সে ভাবল তাকে একজন রাস্তার বেশ্যাকে তৃপ্তি দিতে হবে। কাউন্টেসের সমস্ত শরীর অদ্ভুত এক মাদকতায় রোমাঞ্চিত হতে লাগল। তিনি তার শরীরের সঙ্গে সেঁটে বসলেন। তিনি কতটা তরুণ, কত সুন্দরী এবং পরম কামনার ধন সেটা বোঝাবার জন্য তিনি বারবার তাঁর ঘোমটাটা তুলতে লাগলেন। মল্লযোদ্ধারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যেমন একটাও কথা বলে না, তারাও কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। কাউন্টেসের প্রচণ্ড ইচ্ছে হল অভিনেতাটিকে ভীষণ জোরে জড়িয়ে ধরার, তার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দেবার। সতীত্বের মোড়কে নিজেকে ঢেকে রাখার জন্য তিনি এতদিন যে নৈতিক অপরিচ্ছন্নতার স্বাদ থেকে

বঞ্চিত ছিলেন—সেই স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। কামোন্মত্ত হরিণ-হরিণীর মতো হোটেলের একটা ঘরে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটাবার পর অভিনেতাটি নিজেকে টেনে তুলে একজন অন্ধলোকের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। রেজিনার ঠোঁটের কোণে তখন অল্প হাসি। তখন তাকে দেখে সতীত্বের গরিমায় পবিত্র একজন নারী বলে মনে হচ্ছিল। প্রার্থনা শেষে রবিবারের দিনগুলোতে গির্জার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় তাঁকে দেখে যেমন মনে হয়।

এর পর তিনি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের অভিনেতাটিকে অধিকার করলেন। সে ছিল ভীষণ সেন্টিমেন্টাল এবং তার মাথাটা ভরতি হয়ে ছিল রোমান্টিক চিন্তাভাবনায়। যে অজ্ঞাতপরিচয় রমণীটি তাকে নিছক একটা খেলার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করছে—সে ভেবেছিল সে তাকে ভালোবাসে। সুতরাং তাদের এ ধরনের গোপন মিলন তাকে খুশি করতে পারেনি। এ ব্যাপারে সে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেছিল, মিনতি করেছিল অনেক করে কিন্তু তার কথাগুলো তিনি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর পর তিনি পর্যায়ক্রমে দুজনকে দিয়ে নিজের শরীরটাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করাতে লাগলেন। তিনি যে এইভাবে দুজনকেই দেহদান করে চলেছেন—সেটা তাদের কাছে গোপন রেখেছিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে নিষেধ করে দিয়েছিলেন তারা যেন একে অন্যের কাছে ব্যাপারটাকে প্রকাশ না করে দেয়। যদি তারা তা করে তাহলে তাঁর সঙ্গে আর তাদের কখনই দেখা হবে না—এইভাবে তাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে এক দিন রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের অভিনেতাটি তাঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বলল, তুমি আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছ এবং আমাকে পেতে চেয়েছ—তাতে তোমার অন্তরের দাক্ষিণ্য, উদারতা ও মহত্ত্বেরই প্রকাশ ঘটেছে। ভেবেছিলাম এই ধরনের ভালোবাসার সুখের কথা শুধু নাটক নভেলেই খুঁজে পাওয়া যায় আর তোমাদের মতো উচ্চশ্রেণির স্ত্রীলোকরা আমাদের মতো ভবঘুরে, অতি তুচ্ছ অভিনেতাদের নিয়ে শুধুই তামাশা করে।

তার কথা শুনে রেজিনা তাঁর সুন্দর ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করলেন।

"আমার উপর রাগ কোরো না," সে বলল, "আমি তোমার পিছনে পিছনে গিয়ে তোমার বাড়িটা দেখে এসেছি। সেইসঙ্গে তোমার নামটাও আমি জেনে এসেছি আর তুমি যে খুব ধনী সে-কথাও আমি জানতে পেরেছি।"

ভয়ংকর রাগে কাঁপতে-কাঁপতে রেজিনা চিৎকার করে উঠলেন, "মূর্খ কোথাকার। একজন মানুষ শিশুদের যেমন সহজে বিশ্বাস করায় তেমনি সহজে তারা তোমারে বিশ্বাস উৎপাদন করেছে।"

যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। সে-তাঁর নাম জেনে ফেলেছে এবং এখন হয়তো তাঁর সঙ্গে কোনো সমঝোতায় আসতে চাইবে। তা ছাড়া ইলেকশানের আগেই কাউন্টের ফিরে আসার সম্ভাবনাই বেশি। এর পর কম বয়সের অভিনেতাটি দেহমিলনে লিপ্ত হল, কিন্তু তাঁর কোনো অনুভূতি হল না। তাদের দুজনকে তিনি দাসত্বে বেঁধে

ফেলেছেন। তাদের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে। এখন অন্য কোথাও তাঁকে আনন্দের সন্ধান করতে হবে।

পরের দিন রাত্রে তিনি চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগিরকে বললেন, "শোনো, কোনো কিছুই আমি তোমার কাছে গোপন করব না। আমি তোমার সঙ্গীটিকে পছন্দ করি। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ তার কাছে বিলিয়ে দিয়েছি। তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখার আমার আর ইচ্ছা নেই।"

"আমার সঙ্গী!"

"হ্যাঁ, তাতে কী? পাত্র পরিবর্তনে আমি খুবই আনন্দ পাই।"

তাঁর কথা শুনে সে ভয়ংকর আক্রোশে চিৎকার করে উঠল। হাত দুটো মুঠো করে রেজিনার দিকে ছুটে গেল। রেজিনা ভাবলেন সে তাকে খুন করবে—ভয় পেয়ে তিনি চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললেন। কিন্তু যে দেহটিকে সে এত আদর করেছে, নানাভাবে ভোগ করে তৃপ্তি পেয়েছে—সেই দেহে আঘাত করতে তার মন চাইল না। এর পর দুঃখ আর হতাশায় তার মাথাটা নুয়ে এল। সে রুক্ষ স্বরে বলল, "ঠিক আছে! তোমার যখন ইচ্ছা, তখন আমাদের আর দেখা হবে না।"

যথারীতি আবার খেলা শুরু হয়েছে। ইডেন রুয়েন থিয়েটারে অন্য দিনের মতো ভিড় উপচে পড়েছে। পরস্পরের থেকে প্রায় বারো গজ দূরত্বে মন্টিফিয়রস দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কম বয়সের কুস্তিগিরের মুখের ওপর বৈদ্যুতিক আলো ফেলা হয়েছে। সে সাদা রং-এর একটা লক্ষের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কুস্তিগিরটি তার ছায়া লক্ষ্য করে খুব ধীরে ধীরে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়ছিল। সে অসাধারণ দক্ষতা ও একাগ্রতার সঙ্গে কার্ডবোর্ডের ওপর গুলি ছুঁড়ছিল। সেখানে কালো কালো বিন্দুর সাহায্যে তার একটা অবয়ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল। করতালি আর দর্শকদের প্রশংসায় অর্কেস্ট্রার বাজনা চাপা পড়ে গেল। ঠিক তখনই, তীক্ষ্ণ একটি আর্তনাদের শব্দ প্রেক্ষাগৃহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। মহিলারা মূর্ছা গেল। থেমে গেল বেহালার বাজনা। দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কার্ডবোর্ড লক্ষ করে যখন নবম গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল—তখন কম বয়সি খেলোয়াড়টি সশব্দে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল। একটা বুলেট তার কপালে বিদ্ধ হয়ে গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি করেছে। অন্য কুস্তিগিরটি স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের মধ্যে উন্মত্ততার ছাপ সুস্পষ্ট। কাউন্টেস ডি ভিলেগবি তাঁর বক্সের আসনে হেলান দিয়ে বসে শান্তভাবে পাখা নেড়ে হাওয়া খেতে লাগলেন। তখন তাঁকে দেখে পুরাণের কোনো নিষ্ঠুর দেবীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

পরের দিন বেলা চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কাউন্টেস তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে জাপানি কায়দায় সাজানো নিজের স্বল্লোষ্ণ খাসকামরায় বসেছিলেন। তাঁর গলা থেকে নির্বিকার স্বরে যে কথাগুলো বেরিয়ে এল—তা শুনে অবাক হয়ে যেতে হয়।

"লোকে বলছে ওই বিখ্যাত ভাঁড়দের একজন নাকি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কী যেন লোকটার নাম, মন্টা না মন্টি—টম, লোকটার কী নাম?"

"মন্টিফিয়রস, ম্যাডাম।"

ব্যাবেতি
Babette

বৃদ্ধ অথর্বদের ওই আশ্রমটি পরিদর্শন করার ব্যাপারে আমাব বিশেষ ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ওখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভদ্রলোকের পীড়াপীড়িতে আমি সেখানে গেলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ভদ্রলোক খুব বেশি কথা বলতেন কিন্তু পরিসংখ্যান সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। যে ভদ্রমহিলা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নাতি সর্বদা আমাদের সঙ্গ দিতেন এবং সমস্তকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতে পারলে তিনি বেশ খুশি হতেন। ভদ্রমহিলার নাতিটি বেশ চমৎকার মানুষ। বিশাল এক ফরেস্ট-এর তিনি মালিক। আর সেই ফরেস্ট-এ আমাকে শিকাব কবাব অনুমতিও দিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁব ঠাকুমার এমন একটি জনহিতকব কাজের আমি যে একজন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক—এমন একটা ভাব দেখানো ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে সুপারিন্টেন্ডেন্টের দীর্ঘ ও একঘেয়ে অসংখ্য কাহিনি আমাকে শুনে যেতে হত এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেভাবে তারিফ করে বলতে হত, "সত্যি, আশ্চর্য! আপনাব মুখ থেকে না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না—এসব ঘটনা ঘটতে পারে।"

তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে কী বা কী ধরনের মন্তব্য করতাম, তখনই সেটা ভুলে যেতাম। তবে আমি যদি সেখানে একা একা অলসভাবে ঘুরে বেড়াতাম তাহলে সেখানকার মানুষজন এবং জিনিসপত্র সম্বন্ধে আমি সম্ভবত বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠতাম এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতাম, আচ্ছা এই ব্যাবেতি নামের মেয়েটি কে বলুন তো? আশ্রমের লোকেরা তার সম্বন্ধে সর্বদাই এত বেশি অভিযোগ করে যে মেয়েটি কে তা জানার জন্য আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।

পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রায় জনবারো লোক আমাদের কাছে সর্বদাই তার সম্বন্ধে বলে যেত। কখনও করত অভিযোগ আবার কখনও করত প্রশংসা। যখনই তারা সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দেখতে পেত চিৎকার করে বলত, মঁসিয়ে শুনুন, ব্যাবেতি আবার... তাদের কথা শুনে তাঁর ভদ্রস্বরটি হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠত। তিনি বলতেন, শুনেছি, শুনেছি, আর কতবাব শুনব?

অন্য সময় তিনি একগাল হেসে কোনো বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করতেন, "আশা করি আপনারা এখানে বেশ সুখেই আছেন।"

তাদের মধ্যে অনেকে গভীর কৃতজ্ঞতার স্বরে উত্তর দিত। তার মধ্যে ব্যাবেতির নামও উচ্চারণ করত বেশ প্রশংসার সঙ্গে। তাদের সেইভাবে কথা বলতে শুনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আনন্দে ডগমগ হয়ে হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, ওহ্, ব্যাবেতি! স্ত্রীলোকদের মধ্যে সত্যিই একটি রত্ন, সত্যিই অসাধারণ।

তাহলে নিশ্চয়ই সেই স্ত্রীলোকটি কেমন তা জানার কৌতূহল হবে সকলেরই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এর বেশি কিছু জানার কৌতূহলকে নিবৃত্ত করে রাখলাম। কারণ আমি নিজের মনে তার একটা সুন্দর প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেছিলাম আর সেটা আমার মনের মধ্যে এত সুন্দর, এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল তাকে স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা আমার ছিল না। প্রাসঙ্গিকভাবে যখন আশ্রমের বৃদ্ধ মানুষগুলো তার সম্বন্ধে কথা বলতেন, তাঁদের মুখের উপর খুশি আর আনন্দের ছবি দেখতে পেতাম আর সেটাই তাকে আমার কাছে প্রিয়তর করে তুলেছিল। কিন্তু বৃদ্ধারা যখন তার বিরুদ্ধে নানাভাবে অভিযোগ করত আমি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতাম। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে সব থেকে বেশি অবাক করেছিল-তাহল যে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অন্যদের মুখে তার প্রশংসার কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে উঠতেন, তাঁকেই ব্যাবেতির সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি—কারণ সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা জাগেনি।

ব্যাবেতি সম্বন্ধে আমার মনে যে সমস্ত ধারণা তৈরি হয়েছিল, সেগুলো ছিল অস্পষ্ট। কারণ তার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো ধারণা তৈরি করার কষ্ট বা অসুবিধাগুলো আমি স্বীকার করে নিতে চাইনি। তাকে নিয়ে ভাবার থেকে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আশ্রম থেকে চলে আসার পর সেবিষয়ে বোধ করি সবকিছুই ভুলে যেতাম এমনকি ব্যাবেতির কথাও যদি না রক্তমাংসের ব্যাবেতিকে হঠাৎ সেদিন আমি দেখতে পেতাম। আমার কল্পনার তুলিতে আঁকা ব্যাবেতির সঙ্গে বাস্তবের ব্যাবেতির এতটা পার্থক্য লক্ষ করে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

আমরা সবে পিছনের ছোটো একটা উঠোন পেরিয়ে অন্ধকার একটা প্যাসেজে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ প্যাসেজটার শেষ প্রান্তের একটা দরজা খুলে গেল এবং তার ভিতর থেকে একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। আমরা সেখানে একটা অস্পষ্ট নারীমূর্তি দেখতে পেলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্কশ স্বরে ব্যাবেতি, ব্যাবেতি বলে চিৎকার করে উঠলেন। এর পর তিনি দ্রুত চলতে শুরু করলেন, প্রায় দৌড়োতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। যে দরজার মধ্য দিয়ে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তিনি সেই দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার শেষে সিঁড়ি। তিনি আবার তার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন কিন্তু উত্তরে শুধু একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। সেই হাসির শব্দ শুনে পিলার আঁটা রেলিংটার উপরে ঝুঁকে আমরা নীচের দিকে তাকালাম, দেখলাম একটি নারী আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সে যে একজন বৃদ্ধা—সেটা তার মুখের কোঁচকানো চামড়া এবং সাদা চুল দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু তার চোখ দুটো দেখলে তাকে তরুণী বলেই মনে হবে। তার চোখের দৃষ্টি গভীর আর সেখানে বেগুনে নীলের হাতছানি। সেই দৃষ্টিতে মিশে আছে শিশুর সরলতা।

হঠাৎ সুপারিন্টেন্ডেন্ট চিৎকার করে উঠলেন, আবার তুমি লা ফ্রেজির সঙ্গে মেলামেশা করছ?

বৃদ্ধা কোনো উত্তর দিল না, উচ্ছ্বসিত হাসিতে সে ভেঙে পড়তে লাগল তারপর

ছুটে চলে গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন বলতে চাইল, তোমাকে আমি পাত্তাই দিচ্ছি না।

ওই অপমানজনক কথাগুলো যেন তার মুখের ওপর স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে লক্ষ করলাম তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সেই মুহূর্তে তার চোখ দুটোকে কোনো বাঁদর বা হিংস্র কোনো বেবুনের চোখ বলে মনে হল।

এবার কিন্তু আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে জিজ্ঞেস না করে পারিনি, "ওই বৃদ্ধাই আপনাদের ব্যাবেতি, তাই না?"

আমি ওই স্ত্রীলোকটির অপমানজনক চাহনির অর্থ যে ধরতে পেরেছি, সেটা অনুমান করেই তিনি রাগে লাল হয়ে গিয়ে 'হ্যাঁ' বলে ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে তাঁর ভদ্রতাটুকুই বজায় রাখলেন।

"এই কি আপনার সেই রমণীরত্ন?" আমার স্বরে বিদ্রুপ। আমার পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভয়ে তিনি দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'হ্যাঁ, সে-ই।'

কিন্তু আমার কৌতূহল তখন তুঙ্গে। সুতরাং বললাম, এই ফ্রেজিকে আমি দেখতে চাই। কে এই ফ্রেজি?

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। তাকে দেখে আপনি কোনো ইন্টারেস্ট পাবেন না। তাকে দেখে কী লাভ? তাকে দেখতে গিয়ে মিছিমিছি আপনার সময় নষ্ট হবে।"

কথাগুলো বলে তিনি সিঁড়ির দুটো করে ধাপ এক একবারে পার হতে লাগলেন। যে ব্যক্তি প্রতিটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি সে সমস্ত জিনিস তড়িঘড়ি করে দেখানোর ও বোঝানোর কাজ শেষ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পরের দিন আমি ব্যাবেতির সম্বন্ধে কিছু না জেনেই ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেলাম। ফিরে এলাম মাস চারেক পরে। তখন শিকারের সীজন্ শুরু হয়ে গেছে। আমি কিন্তু ব্যাবেতির কথা ভুলতে পারিনি। কারণ তার চোখ দুটো যে একবার দেখেছে সে কিছুতেই তাকে ভুলতে পারবে না। সুতরাং স্টেশন থেকে বন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত এই তিনটি ঘণ্টার এই যাত্রার ক্লান্তিকে ভুলে থাকার জন্য আমার একজন সহযাত্রীকে পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। তিনি সমস্ত পথটা ব্যাবেতির কথা বলেছিলেন।

ভদ্রলোক ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট যাঁর সঙ্গে আগে থেকেই আমার পরিচয় ছিল। বয়সে তরুণ হলেও ভদ্রলোক ছিলেন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে তিনি সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণ করতেন।

তিনি সেদিন যখন এই রহস্যময়ী ব্যাবেতির কাহিনি বললেন, সেদিন তাকে তত বেশি আকর্ষণীয় মনে হল না।

ব্যাবেতি যখন দশ বছরের ছোট্ট একটা মেয়ে, তখন তার নিজের বাবা তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। তেরো বছর বয়সে তার চরিত্র শোধনের জন্য তাকে এক

সংশোধনাগারে পাঠানো হল। কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে তাকে কাছাকাছি বাড়িগুলোতে ঝি-এর কাজ করতে হয়। কিন্তু স্থায়ীভাবে কোথাও সে টিঁকে থাকতে পারেনি এবং মোটামুটি সব জায়গাতেই তাকে বাড়ির মালিকের রক্ষিতা হয়ে থাকতে হয়েছিল। বহু পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছে, সেগুলোকে ধ্বংস করেছে। তার জন্য সে কোনো অর্থবিত্ত বা অধিকার অর্জন করতে পারেনি। তারই কারণে একজন দোকানদারকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। ভদ্রবংশের একজন যুবককে চোর বদমাইশ হয়ে অসমাজিক জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

তার দুবার বিয়ে হয়েছিল এবং দুবারই সে বিধবা হয়েছে আর তার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রায় দশ বছর ধরে ওই শহরের একমাত্র বারবনিতা হিসাবে সকলেই তাকে চিনত।

"নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিল?"

"না, না, সুন্দরী সে মোটেই ছিল না। যৌবনেও সে যে সুন্দরী ছিল—একথা কারও মনে পড়ে না।"

"তাহলে আপনি কী বলবেন?"

"কীভাবে?" ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "ওই যে তার চোখ দুটি। নিশ্চয়ই সেগুলো দেখার আপনার সৌভাগ্য হয়নি।"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন," আমি বললাম, তার ওই চোখের মধ্যে অসংখ্য সুন্দর জিনিসের বর্ণনা খুঁজে পাবেন। তার চোখ দুটোর মধ্যে ফুটে আছে শিশু পবিত্র সরলতা।

তিনি তাঁর কণ্ঠস্বরে আবেগ আর উৎসাহ মিশিয়ে বলতে লাগলেন, ক্লিওপেট্রা, ডায়ানা—যাঁরা প্রেমের রানি হিসাবে সকলের পূজ্য ছিলেন, তাঁদের চোখগুলো নিশ্চয়ই তার মতো ছিল। যে স্ত্রীলোকের এইরকম দুটো চোখ থাকে সে বৃদ্ধ হতে পারে না। ব্যাবেতি যদি একশো বছরও বেঁচে থাকে তাহলে আজও যেমন লোকে তাকে ভালোবাসে, সেদিন তারা তাকে সেইরকমই ভালোবাসবে।

"কিন্তু এখন তাকে কারা ভালোবাসে?"

"আশ্রমের বৃদ্ধ মানুষগুলো তাকে সত্যিই ভালোবাসে।"

"আপনার কি সেরকম মনে হয়েছে?"

"নিশ্চয়ই, কে তাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে জানেন? আশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভদ্রলোক।"

"অসম্ভব।"

"আমি আমার মাথা বাজি রেখে বলতে পারি, কিন্তু ওই লা ফ্রেজি কে?"

"লা ফ্রেজি, আগে কসাই-এর কাজ করত। সম্প্রতি অবসর নিয়েছে। ১৮৭০ সালের যুদ্ধে তার দুটো পা-ই কাটা যায়। ব্যাবেতি তাকে অসম্ভব ভালোবাসে। লোকটার পা-দুটো কাঠের এবং বয়স তার তিপান্ন হলেও সে যথেষ্ট শক্তিশালী। সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাকে খুব হিংসা করে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন হোস্ট ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম, দেখলাম, সকলে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেখানে। দেখলাম পুলিশ এসেছে এবং ওই আশ্রমের মালিক তাদের সঙ্গে থেকে সবকিছু বলার বা বোঝাবার চেষ্টা করছে। আমরা সেই মুহূর্তে তাদের দলভুক্ত হলাম। শুনলাম, লা ফ্রেজি, সুপারিন্টেন্ডেন্টকে খুন করেছে। আশ্রমের লোকেরা যে খুনের বর্ণনা দিল, তা সাংঘাতিক। যে আগে কসাইয়ের কাজ করত, সে একটা দরজার পিছনে লুকিয়ে ছিল এবং যে মুহূর্তে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘরে ঢোকে, সেই মুহূর্তে, মোটেই দেরি না করে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে দুজনে জাপটা জাপটি করে গড়াগড়ি খেতে থাকে। এর পর ভয়ংকর ক্রোধে তার গলা কামড়িয়ে ধরে তার করোটিড আর্টারি ছিঁড়ে আনে। আর সেখান থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসে খুনীর মুখটা ভরতি করে দেয়।

লা ফ্রেজিকে দেখলাম, মুখে তখনও রক্তের দাগ লেগে আছে। এরকম একটা ঘটনার পর মুখটাকে নিশ্চয়ই সে ভালো করে ধুতে পারেনি। তার কপালটা ছোট্ট, চোয়াল দুটো বর্গাকারের ছুঁচালো কান দুটো মাথার সঙ্গে আটকে আছে, মাথা ও নাকের গঠন বন্যজন্তুর মতো। সে সময় ব্যাবেতিকে দেখলাম, তার মুখ আর চোখ দুটো শিশুর পবিত্র সরলতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অতিথিসেবক বৃদ্ধার নাতি আমাকে মৃদুস্বরে বললেন, হতভাগ্য স্ত্রীলোকটি, বার্ধক্যজনিত স্নায়ুবিকারের শিকার হয়েছে। সেইজন্য এমন একটা ভয়ংকর দৃশ্য দেখার পরেও তার চোখ মুখের ভাবের যে কোনো পরিবর্তন হয়নি তা তার স্নায়ুর রোগের জন্য।

"আপনার কি সেরকমই মনে হচ্ছে?" ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, মনে রাখবেন, ওর বয়স এখন ষাট হয়নি। আমার মনে হয় না এটা কোনো বার্ধক্যজনিত স্নায়ুবিকারের ব্যাপার। তা ছাড়া এই খুনের ঘটনা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

"তাহলে সে হাসবে কেন?"

"কারণ, লা ফ্রেজি যা করেছে, তাতে সে খুশি হয়েছে।"

"না, না, তা কী করে সম্ভব?"

ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ ব্যাবেতির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "মনে হয় কী ঘটেছে তুমি সেটা জান আর কেন ঘটেছে, সেটাও তোমার অজানা নয়।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে তার মুখের সুন্দর হাসিটা মুছে গেল। শিশুর সরলতা মাখানো তার সুন্দর চোখ দুটো বাঁদরের চোখের মতো কুৎসিত হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ সে তার পেটিকোটটা উপরে তুলে তার যৌনাঙ্গটা সকলের সামনে মেলে ধরল। ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক কথাই বলেছিলেন, স্ত্রীলোকটি ডায়ানা, ক্লিওপেট্রার মতো প্রেমের দেবী হিসাবে সকলের ভালোবাসা লাভ করেছে। দেখলাম তার যৌনাঙ্গটি শিশুর যৌনাঙ্গের মতো অপরিণত রয়ে গেছে।

লা ফ্রেজি আমাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল, "শুয়োরের বাচ্চা, সব শুয়োরের বাচ্চা। তোমরাও কি ওর শরীরটাকে ভোগ করতে চাও?"

দেখলাম, অন্যায় অসৎ কাজে লিপ্ত কোনো মানুষ ধরা পড়ে গেলে তার মুখটা বিবর্ণ ও কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, কাঁপতে থাকে তার ঠোঁট আর হাত দুটো, ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোকও তেমনি একই অবস্থার শিকার হলেন।

ওয়েটার, এক বোতল বীয়ার দাও
Waiter A Bock

কেন এই বিশেষ দিনটিতে আমি একটা বীয়ারের দোকানে এসে ঢুকে পড়লাম, তা আমি নিজেই জানি না, তবে ভয়ংকর ঠান্ডা পড়েছিল সেদিন।

কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি রাস্তায় বেরোইনি, ডিনারের পর শুধু খানিকটা পায়চারি করব বলে বেরিয়েছিলাম। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ একটা বেশ বড় কাফে আমার নজরে পড়ল। সেখানে খুব বেশি ভিড় ছিল না—কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই ভিতরে ঢুকে পড়লাম। মদ খাবারও আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। সেখানে গিয়ে একজন লোকের পাশে বসে পড়লাম। তাকে দেখে আমার বৃদ্ধ বলেই মনে হল; সে সস্তার একটা মাটির পাইপে ধূমপান করছিল। তার টেবিলে সাত-আটটা বীয়ারের খালি বোতল পড়েছিল। সে যে একা একাই এতটা বীয়ার খেয়েছে সেটা ওই খালি বোতলগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

আমি তার পাশে বসে যখন নিজের মনে এইসব কথা ভেবে চলেছিলাম তখন এই অদ্ভুত লোকটি শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, ''কেমন আছ?''

আমি তার মুখের দিকে ভালো করে তাকালাম, আমার ভ্রূ দুটো তখন কুঁচকে উঠেছে। তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে ভালো করে লক্ষ করতে লাগলাম।

সে তখন বলল, ''মনে হচ্ছে তুমি আমায় চিনতে পারনি, আমি ডেস ব্যারেট।''

আমি চরম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ও আমার কলেজলাইফের বন্ধু, কাউন্ট জ্যাঁ ডেস ব্যারেটস। আমি তার হাতটা ধরে বললাম, ''আশ্চর্য! তুমি? কেমন আছ?''

সে শান্ত স্বরে বলল, ''আমি? যেমন দেখছ।''

এর পর সে চুপ করে গেল। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''তুমি এখন কী করছ?''

''দেখছ আমি কী করছি।''

আমার মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ''প্রত্যেক দিন?''

সে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ''প্রতিটি দিন আমার কাছে সমান।'' এর পর সে টেবিলে শব্দ করে ওয়েটারকে ডেকে বলল, ''দুবোতল বীয়ার দিয়ে যাও।''

এর পর ওয়েটার বীয়ারের দুটো বোতল এনে দুটো গ্লাস ভর্তি করে দিয়ে গেল।

ডেস ব্যারেটস একচুমুকে তার গ্লাসটা খালি করে ফেলল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, ''কোনো নূতন খবর আছে কি না বল।''

আমি বললাম, ''বলার মতো নূতন কোনো খবর নেই। আমি এখন ব্যাবসা করে খাই।''

ব্যারেট বলল, ''ব্যাবসার কাজে তুমি আনন্দ পাও?''

''না, এর দ্বারা তুমি কী বোঝাতে চাইছ? নিশ্চয়ই তুমি কিছু কর।''

"এটার অর্থ তুমি কী বোঝাতে চাইছ?"

"আমি বলতে চাইছি, তুমি কী করে সময় কাটাও?"

"কাজকর্ম করেই বা কী লাভ? সত্যি বলতে আমি কিছুই করি না, কখনও কিছু করিওনি। কাজকর্ম করে কী লাভ বল। তুমি কি নিজের জন্য কাজ কর না অপরের জন্য? তুমি যদি নিজের জন্য কাজ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সে কাজে আনন্দ পাও আর তার একটা অর্থও খুঁজে পাও, কিন্তু তুমি যদি পরের জন্য কাজ করো—তাহলে তুমি লাভ করবে শুধুই অকৃতজ্ঞতা।"

এর পর পাইপের নলটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সে ওয়েটারকে ডেকে আর এক গ্লাস বীয়ার দিতে বলল। "এইভাবে ওয়েটারকে ডাকলে আমার মদ খাওয়ার ইচ্ছাটা বেড়ে যায়। আমি ঠিক এই সমস্ত ব্যাপারে যথেষ্ট অভ্যস্ত নই। এইভাবে আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে আর ক্রমশ আমি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুর সময় কোনো কিছুর জন্য আমার আপশোশ বা ক্ষোভ থাকবে না। আমার না আছে স্ত্রী, না আছে সন্তান, কারও জন্য আমাকে চিন্তা করতে হয় না, আমার কোনো দুঃখ নেই। জীবন আমার সম্পূর্ণ নিরুদ্‌বিঘ্ন। একজনে মানুষের পক্ষে সেটাই সব থেকে ভালো।"

আমি তার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, "তুমি তো আগে কখনও এমন ছিলে না।"

"মাফ কোরো ভাই, কলেজজীবন শেষ হওয়ার পর থেকে।"

"এভাবে জীবন কাটানো ঠিক নয়—সেটা নিশ্চয়ই তুমি বোঝ। আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবেসেছ, নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু আছে আর তাদের বন্ধুত্বের ভালোবাসা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হওনি।"

"না, আমি দুপুর বারোটায় ঘুম থেকে উঠি। তারপর এখানে এসে ব্রেকফাস্ট করি। তারপর গ্লাসের পর গ্লাস মদ শেষ করি। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকি, রাতের খাবার খাই, তারপর আবার বেশ কয়েক গ্লাস বীয়ার খেয়ে রাত একটার সময় এখান থেকে বেরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি—কারণ তখন কাফের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে এই কাফের কোণের দিকের বেঞ্চটাতে আমার জীবনের ছয়-দশমাংশ কেটে গেছে আর বাকি সময়টা কেটেছে আমার বিছানায়। গত দশ বছর, কখনও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।"

আমি বললাম, "আশা করি তুমি সত্যি কথাই বলবে। নিশ্চয়ই জীবনে বেশ বড়ো কিছু আঘাত পেয়েছ। নিশ্চয়ই সেটা কোনো ব্যর্থপ্রেমের আঘাত। তোমাকে দেখে বোঝাই যায় যেন বারবার চরম দুর্ভাগ্যের আঘাত তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তোমার এখন বয়স কত?"

"মাত্র ত্রিশ, কিন্তু দেখে মনে হয় কম করে পঁয়তাল্লিশ।"

আমি তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। তার চেহারাটা যেন কেমন কুঁকড়ে গেছে, অযত্নে তা মলিন হয়ে উঠেছে। মাথায় টাক পড়েছে, মুখে কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ির জঙ্গল।

আমি বললাম, "চরম কোনো হতাশার আঘাতে তুমি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছ।"

সে বলল, "না তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি আমার জীবনে। আমি বাইরের খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই না বলে অকালবার্ধক্য আমাকে আক্রমণ করেছে। কাফের এই অন্ধকার কোণটা ছাড়া বৈচিত্র্য বলতে জীবনে আমার কিছুই নেই।"

আমি বললাম, "তোমার সমস্ত কথা আমার শোনা দরকার। কত বছর বয়সে তোমার জীবনে হতাশা এসেছিল? তোমার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নয়। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।"

"খুব ছেলেবেলায় আমি একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। সেটাই আমার জীবনকে গভীর অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই অন্ধকারের আবর্তে হাবুডুবু খেতে খেতে এক দিন তার মধ্যে হারিয়ে যাব।"

"ব্যাপারটা কী ঘটেছিল?"

"আমি যে বাড়িটাতে বড়ো হয়ে উঠেছিলাম, সেটার কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে। ছুটির সময় প্রায়ই তুমি আমাদের বাড়ি যেতে। পার্কের মাঝখানে ধূসর রং-এর বাড়িটার কথাও নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি। আমার বাবা-মার কথাও নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?

"আমার বয়স তখন মাত্র তেরো। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে, লাইসিতে অ্যাডমিশান নেওয়ার কয়েক দিন আগে আমি এক দিন পার্কের মধ্যে গিয়ে ছোটাছুটি করছিলাম, কখনও গাছে চড়ছিলাম, কখনও আবার গাছের ডালে পা-দুটো ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমার বাবা মা পার্কের পাশের একটা রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

"ব্যাপারটা মনে হচ্ছে গতকালের। সেদিন খুব ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। পার্কের ঝোপগুলো তখন অন্ধকার। ওই অন্ধকার ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে তাঁদের সামনে বেরিয়ে আসব ঠিক করলাম। ভাবলাম তাতে ওঁরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে চমকে উঠবেন।

আমার বাবা হঠাৎ চিৎকার করে আমার মাকে বললেন, তোমার মা একটি বোকা। কিন্তু তোমার মা এখানে কোনো প্রশ্ন নয়-তোমাকেই বলছি, আমার টাকার দরকার। আর সেজন্য তোমাকে এই কাগজটাতে সই করতে হবে।

আমার মা দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি ওটাতে সই করব না। ওই সম্পত্তি জ্যাঁর প্রাপ্য। প্রাণ দিয়ে তা আমি রক্ষা করব। কিন্তু তোমাকে কোনোভাবেই সে সম্পত্তি পেতে দেব না, তাহলে মেয়েছেলে নিয়ে স্ফূর্তি করে সমস্ত টাকা উড়িয়ে দেবে।

এর পর আমার বাবা, ভীষণ রেগে গিয়ে এক হাতে আমার মায়ের গলা টিপে ধরে অন্য হাতে গালে চড় মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিলেন।

মা পড়ে যাবার পরেও আমার বাবা পাগলের মতো তাঁকে মারতে লাগলেন। মা, দুই হাতে মুখ ঢেকে এদিক থেকে ওদিকে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

এমন একটা নিদারুণ দৃশ্য দেখে মনে হল পৃথিবী থেকে সমস্ত স্নেহ, মায়া মমতা, ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভয়ংকর ভয় আর আতঙ্কে আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। প্রচণ্ডভাবে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। বাবা আমার কান্নার শব্দ শুনে আমার দিকে ছুটে এলেন, মনে হল তিনি আমাকে খুন করবেন। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে ঝোপ জঙ্গালের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলাম।

আমি প্রায় এক ঘণ্টার মতো ওইভাবে ছুটেছিলাম, দু' ঘণ্টাও হতে পারে। সেটা আমার এখন আর মনে নেই। তখন চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা ঝোপের কাছে শুয়ে পড়লাম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় আর দুঃখে আমি তখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কনকনে ঠান্ডায় তখন সবকিছু জমে যাচ্ছে। আমি সারাটা রাত ওইভাবে কাটিয়ে দিলাম, আমার সেখান থেকে উঠে বাড়ি ফিরে যাওয়ার মতো ক্ষমতা বা সাহস হল না পাছে বাবার মুখোমুখি হয়ে তাঁর আক্রমণের শিকার হতে হয়। তাঁর মুখের দিকে তাকাবারও তখন আমার প্রবৃত্তি ছিল না।

ওরকম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে, খিদে আর ঠান্ডায় আমি সেদিন নিশ্চয়ই মারা যেতাম। কিন্তু জঙ্গালের পাহারাদার আমাকে ঝোপের কাছে দেখতে পেয়ে আমার বাবা মায়ের কাছে নিয়ে গেল। বাবা-মাকে দেখে আমার খুব সহজ স্বাভাবিক মনে হল। মা বললেন, ''তুমি আমাকে এত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে, দুষ্টু ছেলে। জানো সেদিন আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি।''

আমি কোনো কথা না বলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বাবা কিন্তু একটাও কথা বললেন না।

আট দিন পরে আমাকে লাইসির স্কুল-বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বন্ধু, এই হল আমার কাহিনি। আমি শুরুতেই জীবনের যে খারাপ দিকটা দেখে ফেলেছিলাম, তারপর থেকে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কিছুর মধ্যে ভালো কিছু আর খুঁজে পাইনি। সেদিনের পর থেকে আমার মনের মধ্যে কী হয়েছিল, ওই অদ্ভুত ব্যাপারটাতে আমার মনে যে কী একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—সেটা আমি বলতে পারব না। তবে সেই থেকে কোনো কিছুর প্রতি আমার রুচি ছিল না, কোনো কিছুব জন্য বিন্দুমাত্র আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কারও প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল না, জীবনের সমস্ত লক্ষ উদ্দেশ্য সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাবার হাতে মায়ের নির্যাতিত হওয়ার দৃশ্যটা সর্বদাই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে আমার মা মারা যান। বাবা এখনও বেঁচে আছেন। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।''

কথাগুলো বলে ব্যারেটা তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এক দরিদ্র বালিকা
A Poor Girl

সেদিন রাত্রিতে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা বোধ করি এ জীবনে কখনই ভুলতে পারব না। যে মানুষ কখনও খনির অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করেনি, ডুলিতে করে সেখানে নামার সময় তার মধ্যে যে ভয়ের অনুভূতি জাগে, সে যেভাবে শিহরিত হয়ে ওঠে, মানুষের সীমাহীন চরম দারিদ্র্যের ভয়ংকর রূপ দেখে—আমি একই অনুভূতির শিকার হলাম। মানুষকে সময় সময় এমন দুঃসহ দারিদ্র্য ও অভাবের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, সে সমস্ত আদর্শ, নীতি, সততা বিসর্জন দিয়ে পাপের পঙ্কিল গর্ভে তলিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

সেদিন সন্ধে থেকে শুরু হয় মুশলধারে বৃষ্টি। কিছুক্ষণের বৃষ্টিতে সমস্ত রাস্তায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি, বৃষ্টি থামারও কোনো লক্ষণ নেই। রাস্তার ওপর ক্রমশ জল বাড়তে লাগল। কেউ রেনকোটে নিজেকে ঢেকে, কেউ আবার ছাতা মাথায় দিয়ে খুব সাবধানে হাঁটু সমান জল ভেঙে যে যার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছিল। আমাকে যেতে হবে দ্রুয়ত স্ট্রিট। সেই বুদেভিল থেকে হাঁটতে শুরু করেছি। যে রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, সেটা ছিল বেশ্যাপল্লি। জলে ডোবা রাস্তার দুধারের বাড়ির সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত তাদের ফ্রকগুলোকে উঁচু করে তুলে ধরে রেখেছিল। পথচারীদের দিকে মাঝে মাঝে অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে রসিকতা করছিল আর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে হাসছিল খিলখিল করে। হঠাৎ দেখলাম, ওদের মধ্যে তিনটি মেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে আমার দিকে। ওদের একজন আমার সামনে এসে দুহাতে আমার হাতটা চেপে ধরে কাতর স্বরে বলল, ''স্যার, ভীষণ বিপদে পড়েছি, দয়া করে আমাকে বাঁচান, আমাকে দয়া করুন।''

আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললাম, ''কোনো ভয় নেই। কী হয়েছে বল।''

মেয়েটি করুণস্বরে বলল, ''আপনি কী একবার আমাকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবেন?''

আমি বললাম, ''না। সেটা কখনই সম্ভব নয়। কারণ বাড়িতে আমার স্ত্রী আছেন।''

তা সত্ত্বেও সে বারবার আমাকে কেঁদে কেঁদে মিনতি করতে লাগল। তখন কোনো উপায় না দেখে একরকম বাধ্য হয়েই আমি তাকে কিছু টাকা দিলাম। তখন সে তার পরিবর্তে আমাকে তার দেহদানে সন্তুষ্ট করতে চাইল। এর পর সে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, ''আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন, তার কথা কোনো দিন ভুলতে পারব না। আপনার এই দানের জন্য আমি আপনার কাছে সমস্ত জীবন ঋণী হয়ে রইলাম।'' তারপর একটু থেমে আবার বলল, ''জানেন, এ জীবনের বোঝা আর বইতে পারি না। এই ক্লেদ আর পাঁকের জীবন আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।''

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই জীবন কেন বেছে নিলে?"

মেয়েটি বলল, "আমাকে সেজন্য দোষ দিতে পারবেন না।"

তার জীবনের কাহিনি শোনার আমার খুব ইচ্ছা হল। যদিও তখন মধ্যরাত্রি এবং সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন, তবুও তার কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম। তাকে বললাম, "তোমার সব কথা আমাকে খুলে বল, আমি শুনতে চাই।"

সে তার জীবনের ঘটনা বলতে শুরু করল, "আমি তখন ষোলো বছরের এক কিশোরী। প্রায় এক বছরের ব্যবধানে আমার বাবা, তারপরে আমার মা মারা যান। তাঁদের মৃত্যুতে আমি একেবারে অনাথ হয়ে গেলাম। কাজ ধরলাম লোকের বাড়িতে। ইভেতৎ-এ আমি তখন মঁসিয়ে লেরেব্ল্ নামের এক বয়োপ্রবীণ ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করি। ধর্মের প্রতি ভদ্রলোক ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান। প্রতি রবিবার তিনি গির্জায় গিয়ে ভক্তিভরে প্রার্থনায় যোগ দিতেন। কিন্তু আমার দিকে কেমন যেন লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর মনের কথা বুঝতে পারব না, এত বোকা আমি ছিলাম না। এক দিন সুযোগ বুঝে আমাকে একটা নির্জন ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সঙ্গে যৌনসংসর্গ করেন।

"লেরেবেল্-এর বাড়ির সামনে যে মুদির দোকান ছিল, সেখানে কাজ করত এক যুবক। তাকে দেখতে ছিল যেমন সুন্দর তেমনি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছিল তার শরীর। শুধু তার চেহারা দেখে আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। এক দিন গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে রাত্রিতে আমার ঘরে তাকে আসতে বললাম। জানিয়ে দিলাম শোবার ঘরের দরজা খোলা থাকবে। যথাসময়ে সে এসে উপস্থিত হল কিন্তু লেরেব্ল্ আওয়াজ পেয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে এবং আমার প্রেমিককে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করে। আমি ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। পরে জানতে পারি বুড়ো লেরেব্ল্ আমার প্রেমিককে খুন করেছে। আমি ওই রাত্রিতেই রুয়েনের পথ ধরে হাঁটতে থাকি, কোথায় যাব, কী করব, সেসব নিয়ে তখন আমি কোনো চিন্তা করছিলাম না, শুধু দিশাহীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। রাতের কয়েকজন পাহারাদার আমাকে দেখতে পেয়ে দূরের একটা ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তারা পর পর আমার ওপর বলাৎকার করে। সত্যি বলতে তাদের কুৎসিত প্রস্তাবে আমাকেই বাধ্য হয়ে রাজি হতে হয়েছিল। তা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো পথও খোলা ছিল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে নির্জন রাস্তায় আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। সুতরাং আমার রাজি হওয়ায় বা না হওয়ায় কিছুই এসে যেত না। তারা আমার শরীরটাকে ভোগ করতই। যা হোক আমার শরীরটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে তারা শুধু আমাকে এক গ্লাস মদ দিয়ে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করেছিল।

"তারপর অবসন্ন ক্লান্ত দেহে হাঁটতে হাঁটতে এক শহরে এসে পৌঁছোলাম। তখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত প্রকৃতির বুকে। এর পর একজন লোক আমাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে কৃত্রিম সহানুভূতি নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে এবং

আমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে বলে কথা দেয়। আমরা কথা বলতে বলতে নদীর দিকে এগিয়ে যাই। সেসময় নদীর তীরটা ছিল নির্জন। সেই সুযোগে আচমকা সে আমার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—আমার পোশাক টেনে খুলে দেয়। তারপর আমার নগ্ন শরীরটা দেখে কামের তাড়নায় পর পর কয়েকবার আমাকে ধর্ষণ করে। তারপর গভীর অবসন্নতা আর ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। লম্পট লোকটা ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এর পর আমাকে দেখে কয়েকজন পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তারা আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। পরে আমাকে আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জজসাহেব সমস্ত ঘটনা শুনে আমাকে বেকসুর খালাস করে দেন। আমি জজের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম, জজের আসনে যিনি বসে আছেন —তিনি মঁসিয়ে লেরেব্‌ল্ ছাড়া আর কেউ নন। আমাকে চিনতেও তাঁর ভুল হয়নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আদালতের মধ্যে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে দেওয়ার সাহস হয়নি আমার। অবশ্য সেটা করলে তিনি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতেন এবং আমাকে হয়তো নিজের হঠকারিতার জন্য সারাটা জীবন জেলের অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে কাটিয়ে দিতে হত।

"যা হোক, আমি সেদিনই আদালতের কাজের শেষে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার হাতে কুড়ি ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিয়ে প্রতি সপ্তাহে দুদিন তাঁর কাছে যেতে বলেন তাঁর কামের ক্ষুধা মিটিয়ে দেবার জন্য। এছাড়াও আমি বাইরের অন্যান্য খদ্দেরও জোগাড় করে নিতাম। এইভাবে পুরোপুরি দেহব্যবসায়ে লিপ্ত হলাম। বলুন, এছাড়া আর কীই বা আমি করতে পারতাম।

"এক দিন এক শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধ তাঁর কামবিকৃতি তৃপ্ত করার জন্য আমাকে ভাড়া করে একটা হোটেলে নিয়ে তুললেন। কিন্তু আমি যখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম, তিনি এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করে মারা গেলেন। যথারীতি পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে গেল। বিচারে আমার তিন মাসের জেল হয়। লাইসেন্স ছাড়া দেহব্যাবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে ওই শাস্তি দেওয়া হল।

"তারপর আমি প্যারিসে এসে এই পাড়াতেই একটা ঘর ভাড়া করি। এখানে দেবব্যাবসার প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলে। কিন্তু তাতে আমি অনেকটাই পিছিয়ে আছি বলে অনেক দিন একবেলারও খাবারের পয়সা জোটাতে পারি না। তা ছাড়া ঝড়বৃষ্টির সময়েও ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যেতে হয়। একজনও কাস্টমার পাওয়া তখন দুষ্কর হয়ে ওঠে।"

এর পর সে তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য খুব কাকুতিমিনতি করতে লাগল। কিন্তু আমি তাকে আমার কথা জানিয়ে দিলাম। বললাম, "সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, কারণ বাড়িতে আমার স্ত্রী আছেন।"

দেখলাম, যৌবনেই বুড়িয়ে যাওয়া মেয়েটি, মুখে রং মেখে যৌবনকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এর পর সে মাথা নীচু করে ম্লান বিষণ্ণ মুখে এগিয়ে যেতে যেতে রাতের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। তখনও অঝোরধারে বৃষ্টি পড়ে চলেছিল।

রোজ
Rose

ল্যান্ডো গাড়ির মধ্যে তরুণী দুজনকে দেখে মনে হল তারা ফুলের নরম বিছানার মধ্যে ডুবে গেছে। বিরাট ল্যান্ডো গাড়িটায় মাত্র তারা দুজন। অসংখ্য ফুলের তোড়া দিয়ে গাড়িটাকে এমনভাবে বোঝাই করা হয়েছে—সেটাকে দেখলে ফুলে ভরতি একটা ঝুড়ির কথাই মনে পড়ে যায়। গাড়ির সামনের দিকের বসার জায়গাটায় রাখা আছে দুটো ঢাকনা আঁটা ফুলের ঝুড়ি। ঝুড়ি দুটো সুন্দর সুন্দর ভায়োলেট ফুলে ভরতি। ঝুড়ি দুটোকে সাদা সাটিনে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভল্লুকের চামড়ায় ঢাকা তরুণী দুজনের হাঁটুর উপরে সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা গোলাপ, রজনিগন্ধা, কমলাফুলের গুচ্ছগুলো স্তূপীকৃত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ফুলের চাপে তাদের কোমল দেহ দুটো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। এই ফুলের উৎসবে ঢাকা পড়ে যাওয়া তাদের সমস্ত শরীরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শুধু তাদের দুটো হাত, কাঁধ ও ব্রেসিয়ারের কিছু অংশ। সে দুটোর একটার রং নীল, অন্যটার লাইলাক।

কোচম্যানের চাবুকটি অ্যানিমোন ফুলের মোড়কে ঢাকা। ঘোড়ার মাথাগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়ালফ্লাওয়ারে। গাড়ির চাকাতে গুচ্ছ গুচ্ছ নানা বর্ণের নানা জাতের ফুল, লণ্ঠন রাখার জায়গায় বড়ো মাপের গোলাকার দুটি ফুলের তোড়া। সে দুটোকে দেখলে ফুলে ঢাকা একটা প্রাণীর দুটি অদ্ভুত উজ্জ্বল চোখ বলে মনে হবে।

অ্যান্টিব স্ট্রিটের ওপর দিয়ে ল্যান্ডোটা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। সামনে পিছনে ফুলে ফুলে ঢাকা আরও অনেকগুলো গাড়ি। তার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা গুচ্ছ গুচ্ছ ভায়োলেট ফুলের স্তূপের মধ্যে হারিয়ে গেছে। কারণ কেনস্-এ আজ ফুলের মহোৎসব।

এরা সকলে বুলেভার্ডে এসে উপস্থিত হল। এখানে পুষ্পোৎসবের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিরাট রাস্তাটার সমস্তটা জুড়ে, দুপাশে প্রান্তহীন দীর্ঘ ফিতের মতো ফুলে ভরতি গাড়িগুলো অবিরাম যাতায়াত করছে। এক গাড়ির সওয়ারি অন্য গাড়ির সওয়ারিকে লক্ষ করে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে। ফুলগুলো বলের মতো শূন্যে উঠে গিয়ে সুন্দর সুন্দর মুখের ওপর পড়ে ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রাস্তার চ্যাংড়া ছেলেগুলো সেগুলোকে কুড়িয়ে নিচ্ছে।

রাস্তার ওপর অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ফুলের মেলায় শামিল হয়েছে—তারা হইচই করছে, আনন্দ করছে, ফুলের উৎসবকে উপভোগ করছে—কিন্তু সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদল পুলিশ বিরাট জনতাকে যথাস্থানে থাকতে বাধ্য করছে। যারা অতিরিক্ত কৌতূহলবশে রাস্তার ওপর নেমে আসছে তাদের পায়ের

ধাক্কায় আবার ঠেলে ভিতরে পাঠিয়ে দিচ্ছে যাতে ধনীদের সঙ্গে সাধারণ বা দরিদ্র মানুষেরা মিলেমিশে একাকার না হয়ে যায়।

গাড়ির মধ্যে যারা বসে ছিল তারা পরস্পরকে চিনতে পেরে ডাকাডাকি করছিল, প্রীতি আর শুভেচ্ছা বিনিময় করছিল গোলাপ ছুঁড়ে ছুঁড়ে। শয়তানের মতো লাল পোশাক পরা সুন্দরী সুন্দরী তরুণীরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সকলের তাদের সুন্দর মুখগুলোর দিকে আটকে ছিল। এক ভদ্রলোক যাঁকে দেখতে চতুর্থ হেনরির মতো—সিল্কের সুতোয় বাঁধা এক একটা বেশ বড়ো আকারের ফুলের গোছাকে ইলাস্টিক একটা দড়ির সাহায্যে বারবার অন্যদের গায়ে ছুঁড়ে মারছিল আর হো হো করে হেসে উঠছিল। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার ভয়ে মহিলারা মাথা নীচু করে চোখগুলোকে হাত দিয়ে ঢেকে ফেলছিল। এই প্রক্ষেপক বস্তুটি বাতাসে একটি বাঁকা রেখা তৈরি করে নিক্ষেপকারীর হাতেই ফিরে আসছিল, সে আবার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে নূতন মুখ লক্ষ করে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

দুজন তরুণী দুহাতে উজাড় করে দিল তাদের অস্ত্রের ভাণ্ডার এবং পরিবর্তে পেল কয়েক পশলা ফুলের তোড়া। এইভাবে ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ করে তারা শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রোপকূলের দিকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিল কোচম্যানকে। পূর্ব দিগন্তে অস্তগামী সূর্য দিকচক্রবালে আগুনের মতো লাল রং ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপরে কালো তুলির টানে এঁকে দিল বহুদূর বিস্তৃত পর্বতমালার ছায়াচিত্র। শান্ত নীল সমুদ্র এবং এর স্বচ্ছ জলরাশি দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বহুদূরদিগন্ত পর্যন্ত তা প্রবাহিত হয়ে নীল আকাশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সাগরতটে নোঙর করা জাহাজগুলোকে দেখে বিশালাকারের একদল ভয়ংকর জন্তু বলে মনে হয়।

দুই তরুণী নিজেদের দেহে ফারের তৈরি গরম কম্বল টেনে দিয়ে সেটার দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "এই মনোরম সন্ধ্যায় সবকিছু কত সুন্দর মনে হচ্ছে, তাই না মারগট?"

মারগট বলল, "নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু কোনো কোনো জিনিসের অভাব বোধহয় থেকেই যায়।"

"সেটা কী মারগট? আমার কথা যদি বল, তাহলে বলব আমি সত্যিই সুখী, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।"

"তা হতে পারে, কিন্তু আমাদের শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যও যতই থাক না কেন, মনের দিক থেকে আমাদের অনেক কিছুই চাওয়ার থাকে।"

মারগট একটু হেসে বলল, "সেইসঙ্গে একটু ভালোবাসা থাকলেই বোধ করি সব কিছু পাওয়া হয়ে যায়।"

"হ্যাঁ, আমি সে-কথাই বলছি।"

এর পর তারা চুপ করে গিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের মধ্যে যার নাম মারগট সে বলল, "ভালোবাসা ছাড়া জীবন অর্থহীন, ভালোবাসাতেই খুঁজে

পাওয়া যায় জীবনের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভরতা। আমি কিন্তু ভালোবাসার কাঙাল এবং সকলেই, তুমি যা-ই বল না কেন, সাইমন।"

"না না, কেউ আমাকে ভালোবাসুক আর না-ই বাসুক আমি যে—সে লোকের ভালোবাসা পেতে চাই না। তুমি কি মনে কর, যে-কোনো লোকের ভালোবাসাকে আমি স্বীকার করে নেব? এই যেমন ধর...

যে তাকে ভালোবাসবে, সমস্ত শহরের মধ্যে এমন একটি মানুষের নাম মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু তেমন পছন্দমতো নাম খুঁজে না পেয়ে তার নজর পড়ল কোচম্যানের পিঠের দুটো চকচকে বোতামের দিকে। তারপর হাসতে হাসতে বলল, মনে কর, ওই কোচম্যানটা যদি তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা আমার জন্য উজাড় করে দেয়, তা কি আমি গ্রহণ করব, না তাতে আমি সুখী হব?

ম্যাদময়জেল মারগট না হেসেই বলল, আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, বাড়ির পরিচারক বা ভৃত্যরা যদি তোমার প্রেমে ডুবে যায় তাহলে ব্যাপারটা খুব মজার হয়। আমার জীবনে দু-তিনবার এমন ঘটনা ঘটেছে। তারা এমন অদ্ভুতভাবে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত আমি হাসতে হাসতে মরে যেতাম। যত বেশি তারা একটি মেয়েকে ভালোবাসবে, তাকে ততটাই কঠিন হয়ে উঠতে হবে। কারণ কেউ যদি ব্যাপারটা লক্ষ করে, তাহলে অতি সামান্য কারণেই তাকে তার কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠতে হবে।

ম্যাদময়জেল সাইমন সামনের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। সে বলল, "আমার ভৃত্যের হৃদয় আমাকে ভালোবাসার জন্য যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে যে তোমার কোনো ভৃত্য তোমাকে ভালোবেসেছিল।"

"অন্যদের ক্ষেত্রে যেভাবে বুঝতে পারি। এক্ষেত্রেও ঠিক সেইভাবেই বুঝেছিলাম। প্রেমে পড়লে যে মানুষ বুদ্ধু বনে যায়, সেটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়।"

"কিন্তু সকলে প্রেমে পড়ে তো বোকা হয়ে যায় না।"

"শোনো বন্ধু, তারা সত্যিকারের বোকা বনে যায়। তারা না পারে ঠিকভাবে কথা বলতে, না পারে কোনো কথার উত্তর দিতে। আবার অনেক সময় সাধারণ কথাগুলো ঠিকভাবে বুঝতেও পারে না।"

"যদি কখনও কোনো চাকর তোমার প্রেমে পড়ে, তাহলে তোমার কেমন অনুভূতি হবে, তা কি তোমার মনের মধ্যে কোনোই প্রভাব ফেলবে না? আনন্দে গর্বে তুমি কি একটুও বিচলিত হবে না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছুটা হব। কোনো পুরুষ, কোনো নারীর প্রেমে পড়লে, তার একটু-আধটু ওই ধরনের অনুভূতি তো হবেই আর সেটাই তো স্বাভাবিক।"

"কথাগুলো তুমি ঠিকই বলেছ, মারগট।"

"হ্যাঁ, বন্ধু। আমার জীবনে এমন একটা রোমান্সের ঘটনা ঘটেছিল। সেটা শুনলে বুঝতে পারবে সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের মনে কতসব অদ্ভুত ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে থাকে।"

"ঘটনাটা ঘটে এখন থেকে বছর চারেক আগে। সময়টা শরৎকাল। সেসময় আমার একজনও পরিচারিকা ছিল না। আমি পর পর পাঁচ-ছ'জনকে রেখে দেখলাম কিন্তু একজনকে পেলাম না কাজেকর্মে যে বেশ চৌকস। যখন তেমন কোনো কাজের লোকের আশা একদম ছেড়েই দিয়েছি, সেসময় খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। এমব্রয়ডারি, সেলাই এবং হেয়ারড্রেসের কাজে এক্সপার্ট একজন যুবতী কাজ করতে ইচ্ছুক। দরকার হলে সে নামি লোকদের পরিচয়পত্রও দেখাবে। সে ইংরেজিতেও ভালো করে কথা বলতে পারে।

"আমি দেরি না করে, সেদিনই নির্দিষ্ট ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। আর পরের দিনই যুবতীটি এসে হাজির হল। মেয়েটি লম্বা, রোগা, গায়ের রং একটু ফ্যাকাশে, মনে হল বেশ ভীরু স্বভাবের। কিন্তু মেয়েটির চোখ দুটি ভারী সুন্দর। তার কাজলকালো চোখ দুটোতে যেন ভীতা হরিণীর চকিত দৃষ্টি। তাকে দেখে আর তার সঙ্গে কথা বলে আমি বেশ খুশি হলাম। আমি তার পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে ইংরেজিতে লেখা একখানা পরিচয়পত্র সে আমাকে দেখাল। বলল, সে লেডি রিসওয়েলের বাড়িতে দশ বছর কাজ করেছে। তার সার্টিফিকেটে লেখা ছিল, মেয়েটি স্বেচ্ছায় ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছে। তার দীর্ঘদিনের চাকরিজীবনে এমন কোনো গর্হিত কাজ সে করেনি যার জন্য তাকে তিরস্কার করা যায়। তবে ফরাসি ন্যাকামিতে তার সামান্য কৃতিত্ব দেখতে পাওয়া যাবে।

"পরিচয়পত্র পড়ে ইংরেজি কেতায় সামান্য একটু হাসলাম মাত্র। আমি সেদিন তাকে কাজে নিয়োগ করলাম। মেয়েটির নাম ছিল রোজ।

"মাসখানেকের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম, সে একটি রত্ন, এক গুপ্ত ঐশ্বর্য ছাড়া আর কিছু নয়।

"অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সে আমার চুল বেঁধে দিত। সেই চুলের সাজ হয়ে উঠত অত্যন্ত সুন্দর এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত অতি সহজেই। সে যে-কোনো একজন দক্ষ পেশাদারের থেকে আরও নিপুণতার সঙ্গে টুপিতে লেস লাগাতে পারত এবং তার তৈরি পোশাক পরলে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠত। তার কৃতিত্ব, তার ক্ষমতা আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করল। এমনভাবে আগে কখনও কেউ আমার সেবা করেনি।

"অত্যন্ত নিপুণভাবে সে আমার পোশাক পরিয়ে দিত। তার হাত দুটো ছিল এমন আশ্চর্য হালকা, আমার শরীরে তার আঙুল-এর স্পর্শ অনুভবই করতে পারতাম না। সাধারণত পরিচারিকাদের হাতগুলো এমন শক্ত খসখসে থাকে যা আমি কখনও সহ্য করতে পারতাম না। মেয়েটি এ বাড়িতে আসার পর থেকে অতিরিক্ত অলস হয়ে পড়তে লাগলাম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত, শেমিজ থেকে গ্লাভস পর্যন্ত সে যখন সবকিছু দিয়ে নিজের হাতে আমাকে সাজিয়ে দিত তার হাতের পালকের মতো স্পর্শে আমার সমস্ত শরীর আনন্দে পুলকে শিহরিত হয়ে উঠত। আমি তার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে সেই আনন্দ উপভোগ করতাম। মেয়েটির মুখে সর্বদা একটা লজ্জার রক্তিম আভা ছড়িয়ে থাকত। সে একরকম চুপ করেই থাকত। স্নানের পরে

আমার গা ঘসে দিত, সমস্ত শরীর ম্যাসেজ করে দিত। তাতে আমি ডিভানের ওপরে শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়তাম। সে গরিব হলেও, তাকে একজন পরিচারিকা না মনে করে তাকে বন্ধুই মনে করতাম।"

এক দিন সকালে, দারোয়ান আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল, তার চোখে মুখে কেমন এক রহস্যের গন্ধ পেলাম। কিছুটা অবাক হলেও তাকে আমি ভিতরে আসতে বললাম। সে আগে সামরিক বিভাগে কাজ করত। এক সময় সে আমার স্বামীর আর্দালি হিসাবেও কাজ করত। কথাটা বলতে গিয়ে সে ইতস্তত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তোতলাতে তোতলাতে বলল, "ম্যাডাম, পুলিশের বড়োবাবু নীচের ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

"কেন?"

"তিনি আপনার ঘর সার্চ করতে চান।"

"সমাজে পুলিশের যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে সে-কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু সত্যি বলতে ওই বিশেষ শ্রেণিটিকে আমি ঘৃণা করি। আমার মতে সেটা কোনো মহৎ পেশার পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং বিরক্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? সার্চ করবে কেন? কী কারণে সার্চ করবে? এখানে কোনো চুরি ডাকাতি হয়নি।"

দারোয়ান বলল, "তিনি বলছেন এ বাড়ির কোথাও একজন অপরাধী লুকিয়ে আছে।"

কথাটা শুনেই আমি ভয় পেলেও পুলিশকর্তাটিকে ভেতরে নিয়ে আসতে বললাম, ব্যাপারটা কী জানার জন্য। পুলিশ অফিসারটি সত্যিই ভদ্র। তিনি যে লিজিয়ন অফ অনার-এর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, সেটা তাঁর পোশাকে আঁটা পদকটা দেখলেই বোঝা যায়। তিনি আমার কাছে বিনীতভাবে মাফ চেয়ে নিয়ে বললেন, আমার বাড়ির চাকরদের মধ্যে একজন জেল-আসামি পরিচয় গোপন করে কাজ করছে।

তাঁর কথা শুনে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। আমি বেশ জোর গলায় বললাম, আমার বাড়ির চাকরবাকরদের মধ্যে কেউ জেল-আসামি নয় আর সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি এক-একজনের নাম বলতে লাগলাম।

"পিটার কোটিন, একজন পুরোনো সৈনিক।"

"না, সে নয়।"

"ফ্রান্সিস পিনাগু, আমার কোচম্যান। চাষবাস তার পেশা। আমার বাবার চাষের জমিতে ওর বাবা চাষাবাদ করে।"

"না, এদের কেউ নয়।"

"তাহলে, আপনি নিশ্চয়ই ভুল খবর পেয়েছেন।"

"মাফ করবেন ম্যাডাম, আমি নিশ্চিত আমি সঠিক খবর পেয়েই এখানে এসেছি। তাকে দেখলে মনেই হবে না সে একজন অপরাধী। আপনি দয়া করে আপনার সব চাকরদের কি আমার সামনে হাজির হতে বলবেন? যারা যারা আপনার এখানে কাজ করে তাদের সকলকেই?"

প্রথমে আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু পরে তাঁর কথায় রাজি হয়ে সকলকেই ডেকে পাঠালাম—ঝি-চাকর সকলকেই।

একবার তাদের দেখে নিয়ে বললেন, "আর কেউ নেই?"

আমি বললাম, "মাফ করবেন স্যার, এছাড়া আমার যে ব্যক্তিগত পরিচারিকাটি আছে, তাকে নিশ্চয় জেলপালানো আসামি বলে শনাক্ত করবেন না।"

"তাঁকে একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

আমি বেল টিপতেই রোজ এসে হাজির হল। সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টরের সংকেত পেয়ে যে দুজন লোক দরজার আড়ালে লুকিয়েছিল, তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার হাত দুটো চেপে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। পুলিশের লোক দুজন কখন যে দরজার আড়ালে এসে লুকিয়েছিল তা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি।

প্রচণ্ড রেগে গেলাম আমি। আমি তাদের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর চেষ্টায় ছুটে গেলাম তাদের কাছে। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "আপনি যাকে আপনার ব্যক্তিগত পরিচারিকা হিসাবে আপনার কাছে রেখেছেন—সে মেয়ে নয়, সে একজন পুরুষ। এর নাম জিন নিকোলাস লিকাপেত। ১৮৭৯ সালে একটি মেয়েকে বলাৎকার এবং হত্যার অপরাধে একে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে তার এই মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। চার মাস আগে ও জেল থেকে পালায়। তারপর থেকে আমরা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সমস্ত ব্যাপারটা জেনে আমি বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার বিশ্বাসই হল না এমন ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ অফিসারটি হাসতে হাসতে বললেন, "আমি আপনাকে একটা প্রমাণ দিতে পারি। ওর ডান হাতটা একবার দেখুন, সেখানে উলকি করা আছে।"

জামার আস্তিন গুটিয়ে দিলে অফিসারটির কথা সত্য বলে প্রমাণিত হল। পুলিশ অফিসারটি এবার যে কথাটি বললেন, তা ঠিক আমার মনঃপূত হল না। তিনি বললেন, অন্যান্য প্রমাণের জন্য আমাদের ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে।

এর পর আমার পরিচারিকাটিকে নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।

"তুমি যদি ঘটনাটা বিশ্বাস কর, তাহলে বলব, যে অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল—তা হল আমাকে এইভাবে প্রতারিত করার জন্য, আমার অমর্যাদার জন্য সীমাহীন ক্রোধ। ওই লোকটা যে আমাকে পোশাক পরিয়েছে, আমাকে বিবস্ত্র করেছে, আমার শরীরটাকে তার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, তার আঙুলের স্পর্শ দিয়েছে আমার শরীরের সর্বত্র—তাতে আমার লজ্জার কিছু নেই, কিন্তু সে যা করেছে তাতে আমার নারীত্বের সম্মান, নারীত্বের মর্যাদা ভয়ংকরভাবে আহত হয়েছে। এখন বুঝতে পারলে?"

"না, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"বোঝনি? একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। একটি মেয়ের ওপর বলাৎকার করার জন্য তার শাস্তি হয়েছিল এবং সেই ব্যাপারটাই আমাকে তীব্র অপমানে বিদ্ধ করেছে। অথচ দেখ, এমন সুন্দর সুযোগ পেয়েও... এটা নারীত্বের অমর্যাদা, অসম্মান নয়?"

ম্যাদময়জেল সাইমন, মারগটের কথার কোনো উত্তর দিল না, সে শুধু কোচম্যানের পিঠের দুটো চকচকে বোতামের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে মহিলাদের ঠোঁটের কোণে যে স্ফিংস-এর মুখের রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে সেই হাসি দেখা গেল ম্যাডাম সাইমনের ঠোঁটের কোণে।

খরগোশ
The Rabbit

অন্যান্য দিনের মতো সকাল পাঁচটা থেকে সোয়া পাঁচটার মধ্যে বৃদ্ধ লিকাচির এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। তিনি প্রতিদিন ওই সময় তাঁর লোকজনকে কাজ শুরু করার তাগাদা দেন। হাতের তালুর উলটো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো ঘষতে ঘষতে খামারবাড়ির চার দিকটা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। খালধারের বীচ ও আপেলগাছগুলোর মধ্য দিয়ে সূর্যকিরণ তেরছাভাবে এসে পড়েছে উঠোনের ওপর। ভোরে আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখে মোরগগুলো গোবরের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে কোঁকর-কোঁ শব্দে ডেকে উঠল আর পায়রাগুলো বক-বকম্, বক-বকম্ করতে করতে ছাদের ওপর ঘুরতে লাগল। গোয়ালের খোলা দরজা দিয়ে গোবরের কটু গন্ধের সঙ্গে আস্তাবল থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধ ভোরের তাজা বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। ঘোড়াগুলো ভোরের আলোর দিকে তাকিয়ে ডাকছিল।

পাতলুনের বেল্টটা কোমরে ভালো করে আটকে দিয়ে লিকাচির খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে প্রথমেই মুরগির ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলেন। কটা ডিম পেড়েছে সেটা এখন গুণে দেখবেন। কয়েক দিন ধরে তাঁর মনে হচ্ছিল, চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে। সেসময় কাজের মেয়েটা হাত দুটো মাথার ওপর তুলে তাঁর দিকে ছুটে এসে চিৎকার করে বলল, 'মাস্টার মাস্টার, কাল রাতে একটা খরগোশ চুরি হয়ে গেছে।'

'খরগোশ!'

'হ্যাঁ, মাস্টার, বাঁ দিকের খরগোশের ঘরে ধূসর রং এর যে মোটাসোটা খরগোশটা ছিল সেটাই কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।'

তার কথা শুনে লিকাচির সহজ গলায় বললেন, 'দেখি।'

তিনি খরগোশের ঘরে গিয়ে দেখলেন, তালা ভেঙে কে খরগোশটা চুরি করে নিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন একটু ভাবলেন, তারপর কাজের মেয়েটিকে বললেন, 'এক্ষুণি যাও, থানায় গিয়ে পুলিশ ডেকে আন।'

ওই গ্রামের মেয়র ছিলেন লিকাচি। তিনি তাঁর অর্থ আর পদের অহংকারে অত্যাচারী শাসকের মতো সর্বদা তাঁর অধিকার ফলাতেন। কাজের মেয়েটি চলে গেলে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দরজার কাছে এসে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'শুনছ, কেউ খরগোশের ঘর থেকে সব থেকে বড়ো খরগোশটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলছ তুমি? খরগোশ চুরি করে নিয়ে গেছে?'

'ওই যে ধূসর রংএর সব থেকে বড়ো খরগোশটা।'

ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খুব খারাপ। কে চুরি করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

সে ব্যাপারে লিকাচির-এর নিজের একটা ধারণা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই হইএটা পোলাইতের কাজ। সে ছাড়া আর কেউ এ-কাজ করতে পারে না।'

তার স্ত্রী হঠাৎ তিরবেগে উঠে দাঁড়িয়ে খেপে গিয়ে বলল, 'পোলাইতের কাজ' না? শয়তান পোলাইত করেছে। তাই না! আমি বলছি ও ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করেনি। এখন কী করবে তাই বল।'

'পুলিশ ডাকতে পাঠিয়েছি।'

পোলাইত এই খামারে মাত্র কয়েক দিন ধরে একজন শ্রমিক হিসাবে কাজ করছিল। কিন্তু তার উদ্ধত আচার-ব্যবহারের জন্য তিনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে আগে ছিল একজন সৈনিক। আফ্রিকায় থাকাকালীন সে লাম্পট্য আর লুঠপাটে হাত পাকিয়েছিল। সে বেঁচে থাকার জন্য সবরকম কাজ করে দেখেছে। কিন্তু কোথাও সে বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। সুতরাং কাজের সন্ধানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই খামারে কাজে যোগ দেওয়ার প্রথম দিন থেকে লিকাচির-এর স্ত্রী তাকে ঘেন্নার চোখে দেখত। আর এখন ভদ্রমহিলা নিশ্চিত হয়ে গেল—পোলাইত ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করেনি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুজন পুলিশ এসে হাজির হল। ব্রিগেডিয়ার সেনাটুরের চেহারা লম্বা আর রোগা, দ্বিতীয়জন, যার নাম লিনিয়েট—সে বেঁটে আর মোটা। লিকাচির তাদের বসিয়ে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললেন। লিকাচির এর কাছ থেকে সবকিছু শুনে খরগোশের খাঁচাটা তারা দেখতে গেল লিকাচির এর কথাগুলো মিলিয়ে নেবার জন্য। কাজ শেষ করে তারা যখন ফিরে এল, গৃহকর্ত্রী তাদের জন্য কিছু মদ নিয়ে এসে তাদের গ্লাসগুলো ভরতি করে দিয়ে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা কি চোর ধরতে পারব?'

যে ব্রিগেডিয়ারের কোমরে তরোয়াল ঝুলছিল, তাকে বেশ চিন্তান্বিত মনে হল। চোরকে যদি কেউ দেখিয়ে দিতে পারে তাহলে সে তাকে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে। কিন্তু সেটা যদি না হয়, তাহলে সে তাকে ধরতে পারবে এ বিষয়ে সে নিজেই নিশ্চিত নয়। অনেকক্ষণ ভেবে সে একটা সহজ প্রশ্ন করল। 'আপনারা কি চোরকে চেনেন?'

লিকাচির ধূর্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তাকে চিনতে পারিনি কারণ আমি তো তাকে চুরি করতে দেখিনি। যদি আমি তাকে দেখতাম, তাহলে আমি তাকে ওটা মাংস, চামড়া আর লোম সমেত কাঁচাই খাওয়াতাম। এক ফোঁটা সিডারও দিতাম না ওটা ধোয়ার জন্য। যদি নিশ্চিতভাবে কারও নাম বলতে বলেন, তাহলে আমি বলতে পারব না, তবে আমার ধারণা সেই অকর্মার ধাড়ি পোলাইতই এ কাজ করেছে।'

তারপর লিকাচির পোলাইতের উদ্ধত আচার-আচরণের কথা, তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করার কথা, তার বদনামের কথা—সবকিছু খুলে বললেন। ব্রিগেডিয়ার মদের

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। এর পর সে অধস্তন পুলিশকর্মীটির দিকে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের এখনই স্যাভেরিনের বউএর কাছে গিয়ে ওদের বাড়িটা একবার খুঁজে দেখতে হবে।'

ব্রিগেডিয়ারের কথা শুনে পুলিশকর্মীটি একটু হেসে তিনবার তার ঘাড়টা নাড়ল।

স্যাভেরিন নামের মেষপালকটি বোকার একেবারে হদ্দ। সে নিছক একটা জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়, মেষ চরিয়ে এবং তাদের সঙ্গে থেকে সে বড়ো হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে ভেড়া আর ভেড়া চরানো ছাড়া আর কিছুই জানে না। চাষিদের সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী সে কিছু সঞ্চয় করেছিল এবং সেগুলোকে গাছের কোটরে বা পাহাড়ের ফাটলে রেখে দিত। এছাড়া পশুদের চিকিৎসা করে সে কিছু টাকাপয়সা জমিয়েছিল। এরপর হঠাৎ এক দিন সে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ করে একটুকরো জমির সঙ্গে একটা ছোটো কুঁড়েঘর কিনে ফেলল। এর মাস কয়েক পরে সকলে জানতে পারল, সে সরাইখানার চাকরানিকে বিয়ে করবে। মেয়েটার স্বভাবচরিত্র মোটেই ভালো ছিল না। গাঁয়ের ছেলেছোকরারা বলত, স্যাভেরিনির অবস্থা একটু ভালো হয়েছে দেখে মেয়েটা রোজ রাত্রে তার কুঁড়েতে যেত এবং আস্তে আস্তে তাকে ভুলিয়েভালিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করল স্যাভেরিনিকে। বিয়ের পর সে স্যাভেরিনির কেনা বাড়িতে গিয়ে উঠল আর স্যাভেরিনি দিনরাত্রি ভেড়ার পাল নিয়ে চরিয়ে বেড়াতে লাগল পাহাড়ের নীচের ঘাসের জমিগুলোতে।

ব্রিগেডিয়ার বলল, গত তিন সপ্তাহ ধরে পোলাইত ওই মেয়েটার বাড়িতে গিয়ে ঘুমোচ্ছে—কারণ হতভাগাটার থাকার কোনো জায়গা নেই।

পুলিশকর্মীটি একটু রসিকতা করে বলল, মেষপালকের কম্বলটার মধ্যেই হয়তো দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে।

ম্যাডাম লিকাচির এবার বিবাহিতা মহিলার নোংরা কাজের জন্য খেপে লাল হয়ে বললেন, আমি নিশ্চিত, ওই মেয়েটাই একাজ করেছে, এক্ষুণি গিয়ে ওকে ধরুন।

কিন্তু ব্রিগেডিয়ার মোটেই ব্যস্ত হল না। সে শান্তভাবে বলল, ম্যাডাম, এক মিনিট, দুপুর বারোটা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কারণ পোলাইত ঠিক ওই সময় ওখানে খেতে যায়। তখন দুজনকে আমরা বামাল সমেত আটক করব।

ঘড়িতে ঠিক বারোটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার তার সহকারীটিকে নিয়ে গ্রাম থেকে পাঁচশো গজ দূরে জঙ্গলের এক দিকে একটা নির্জন বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার টোকা দিল। তারা এমনভাবে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যাতে ভেতর থেকে কেউ ওদের দেখতে না পায়। কারও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ব্রিগেডিয়ার মিনিট দুই-তিন পরেই আবার দরজায় টোকা দিল। বাড়িটা এত নির্জন, মনে হল কেউ সেখানে বাস করে না। কিন্তু ব্রিগেডিয়ারের সহকারীটি কান খাড়া করে শুনল ভিতরে কেউ যেন চলাফেরা করছে। ব্রিগেডিয়ার সিনেটর হঠাৎ ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আইনরক্ষককে যে এক মুহূর্তের জন্য বাধা দেবার চেষ্টা করবে—তাকে সে উপযুক্ত শাস্তি দেবে। এবার সে তরোয়ালের ডগা

দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'দরজা খোল।'

এতেও যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন লিনিয়েন্ট বলল, দরজা না খুললে, তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকব। আমরা পুলিশের লোক, আমার নাম লিনিয়েন্ট।

কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই দরজাটা খুলে গেল। সিনেটর দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ মোটাসোটা একজন মহিলা। তার মুখ লাল, নোংরা চেহারা আর মাথার চুলগুলো আলুথালু, ভারী স্তনদুটো অনেকটাই ঝুলে পড়েছে। পেটের আকার বিরাট আর পাছাটা অনেকটাই চওড়া। লালমুখো এই কামুকী মহিলাই স্যাভেরিনির বউ।

ঘরে ঢুকল ব্রিগেডিয়ার। সে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমার ঘরটা সার্চ করে দেখতে চাই। ঘরে ঢুকেই সামনের টেবিলটায় প্লেট, জাগ, আধখাওয়া মদের গ্লাস দেখে সে বুঝতে পারল—এতক্ষণ খাওয়াদাওয়া করছিল ওরা। সরকারি পুলিশটি অফিসারটির দিকে মিটিমিট করে তাকিয়ে বলল, 'দারুণ গন্ধে জিভে জল এসে গেল। হলফ করে বলতে পারি, এটা খরগোশের স্টু ছাড়া আর কিছু নয়।'

স্যাভেরিনির বউ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি একটু ব্র্যান্ডি নেবেন?'

'না, ধন্যবাদ। তোমরা যে খরগোশটা খাচ্ছ, তার চামড়াটা চাই শুধু।' চাষির বউ ব্যাপরটা না বোঝার ভান করল কিন্তু তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'কোন্ খরগোশের কথা বলছেন, স্যার?'

ব্রিগেডিয়ার চেয়ারে বসে শান্তভাবে কপালের ঘাম মুছল।

'তুমি কী আমাকে বোঝাতে চাইছ তুমি ঘাস খেয়ে বড়ো হয়েছ? ডিনারে তোমরা কী খাচ্ছিলে?'

'আমি? দিব্যি করে বলছি—মাখন মাখানো একপিস রুটি...'

'আ হা হা, মাখন মাখানো একপিস রুটি? আমি আর কিছু বুঝি না? তোমার বলা ভুল হয়েছে, বলা উচিত ছিল খরগোশের স্টুতে অনেকটাই মাখন ঢেলেছ। তোমার মাখনের গন্ধটা কিন্তু ভারী সুন্দর, এটা নিশ্চয়ই স্পেশাল বাটার, মুরগি বা খরগোশের স্টু বানানোর জন্য বিশেষ ধরণের মাখন, এটা তো সাধারণ মাখন নয়।'

সহকারীটি হাসিতে ফেটে পড়ল, না, এটা সাধারণ মাখন হতেই পারে না।

রসিকতা করে ব্রিগেডিয়ার সিনেটর বলল, 'তোমার এই স্পেশাল মাখনটা রেখেছ কোথায়?'

'আমার মাখন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার।'

'কেন মাখন রাখার পাত্রে, এই জারের মধ্যে।'

''তাহলে সেই জারটাই বা কোথায়?''

লালমুখো স্ত্রীলোকটি বলল, 'এই তো।'—এই বলে একটা নোংরা কাপ বের করে আনল, সেটার তলার দিকে সামান্য একটু মাখন পড়ে আছে।

ব্রিগেডিয়ার গন্ধ শুঁকে মাথা নাড়ল, 'না—এটা সেই মাখন নয়, যে মাখনে

খরগোশের গন্ধ পাচ্ছি, আমি সেটাই চাই। লিনিয়েন্ট, একবার এদিকে এসো। সাইডবোর্ডের নীচেটা একবার ভালো করে দেখ, আমি দেখছি বিছানার নীচে।'

দরজাটা বন্ধ করে এবার সে খাটটার দিকে এগিয়ে গেল এবং সেটাকে টেনে সরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা দেয়ালের সঙ্গে এমন শক্ত হয়ে সেঁটে ছিল, এক চুলও নড়ল না। সম্ভবত পঞ্চাশ বছর ওটা কেউ নড়ানোর চেষ্টা করেনি। এর পর আরও ভালো করে চেষ্টা করার জন্য যেইমাত্র নীচু হয়ে বসতে গেল—সেই মুহূর্তে তার ইউনিফর্ম ফালাফালা হয়ে ছিঁড়ে গেল আর কয়েকটা বোতাম উড়ে বেরিয়ে গেল।

এর পর সিনেটর লিনিয়েন্টকে ডেকে বলল, 'একবার এদিকে এসো তো, তুমি বিছানার নীচেটা একবার দেখ—আমি লম্বা বলে নীচু হতে পারছি না। সাইডবোর্ডটার আশপাশ আমি একবার খুঁজে দেখছি।'

মোটা আর বেঁটে লিনিয়েন্ট তার হেলমেটটা খুলে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে, তারপর খাটের নীচের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি, পেয়েছি!'

'কী পেয়েছ, খরগোশ?'

'না, চোর।'

'চোর! শিগগির টেনে বার করে আনো।'

লিনিয়েন্ট তখন তার হাত দুটো খাটের নীচে ঢুকিয়ে একটা জিনিস ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে টানতে লাগল। অনেক টানাটানির পর একটা বুটপরা পা টেনে আনতে পারল। ব্রিগেডিয়ার সেই পা ধরে টানতে টানতে চিৎকার করতে লাগল, 'টানো, টানো, খুব জোরে টান দাও।'

এর পর লিনিয়েন্ট হাঁটু মুড়ে বসে আর একটা পা টেনে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু ফাঁদে পড়া লোকটা তখন মরিয়া হয়ে খুব জোরে জোরে পা ছুঁড়তে লাগল। সুতরাং তাকে টেনে আনতে দম ফেটে মরার মতো উপক্রম হল। এর পর ব্রিগেডিয়ারের উৎসাহ পেয়ে অনেক কষ্টের পর লিনিয়েন্ট যাকে টেনে বের করে আনল, সে পোলাইত ছাড়া আর কেউ নয়। তখন সে হাত দুটো লম্বা করে দিয়ে খাটের নীচে পড়ে ছিল।

তার ছড়ানো হাতের কাছেই ছিল একটা সসপ্যান আর তার মধ্যে ছিল রান্না করা খরগোশের মাংস। 'চোর ধরেছি, চোর ধরেছি'—আনন্দে চিৎকার করে উঠল ব্রিগেডিয়ার। লিনিয়েন্টের ওপর লোকটার ভার দেওয়া হল। খরগোশ চুরির অকাট্য প্রমাণ হিসাবে বিছানার তলা থেকে পাওয়া গেল খরগোশের চামড়া—যার রং ধূসর। চোরকে বেঁধে বামাল সমেত ওরা গ্রামে ফিরে এল। আনন্দে আর গর্বে ওদের বুক ফুলে উঠেছে।

সপ্তাখানেক পরে, ব্যাপরটা নিয়ে এত হই চই শুরু হয়েছিল যে লিকাচির সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মিউনিসিপ্যাল অফিসে আসছিলেন। তিনি শুনলেন, মেষপালক স্যাভেরিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করছে।

লিকাচির দেখলেন কোণের দিকের একটা চেয়ারে সে চুপ করে বসে আছে। মেয়রকে দেখতে পেয়েই, সে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানাল। টুপিটা খুলে একটা হাতে ধরে রাখল। তারপর বলল,

'সুপ্রভাত মঁসিয়ে'—এইটুকু বলেই সে বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

লিকাচির বললেন, 'কী চাই তোমার?'

'মঁসিয়ে এটা কি ঠিক যে গত সপ্তাহে আপনার বাড়ি থেকে কেউ একজন একটা খরগোশ চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ, স্যাভারিন কথাটা ঠিক। তুমি কিছু ভুল শোননি।'

'কে চুরি করেছিল?'

'পোলাই অ্যাস্কাস।'

'বেশ বেশ, আর এটাও নিশ্চয়ই ঠিক যে আমার খাটের তলায় পাওয়া গিয়েছে রান্না করা খরগোশ আর তার চামড়াটা।'

'হ্যাঁ, খরগোশ আর পোলাইত—দুটোই।'

'হ্যাঁ, স্যাভেরিন, কথাটা সত্যি। কিন্তু শুনলে কার কাছে?'

'সকলেই জানে ব্যাপারটা। এবার বুঝেছি। আপনি ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন। আপনি নিশ্চয়ই বিয়ের সমস্ত নিয়মকানুন জানেন।'

'বিয়ের নিয়মকানুন বলতে কী বোঝাতে চাইছ?'

'আমি অধিকার সম্বন্ধে জানতে চাইছি।'

'অধিকার মানে?'

'স্বামী বা স্ত্রীর নিজের নিজের অধিকার?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানি।'

'তাহলে মঁসিয়ে দয়া করে বলুন, আমার স্ত্রীর কি পোলাইতের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানোর অধিকার আছে?'

'নিশ্চয়ই নেই, নিশ্চয়ই নেই।'

"বেশ, কেন আমি অধিকার সম্বন্ধে জানতে চাইলাম, সে-কথা আপনাকে বলছি। গত সপ্তাহে এক দিন রাত্রে সন্দেহ হওয়ায় আমি হঠাৎ ভিতরে চলে এলাম এবং আমার স্ত্রী আর পোলাইতকে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি সেই মুহূর্তে পোলাইতকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলাম। সে যেন অন্য কোথাও তার শোয়ার ব্যবস্থা করে—একথাও তাকে জানাতে আমার ভুল হল না। ব্যস, ওইটুকুই। এর বেশি আর কিছু করতে পারিনি। কারণ আমার কতটা অধিকার আছে—সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। বর্তমানে আমি তাদের খারাপ অবস্থায় দেখিনি কিন্তু লোকের মুখে অনেক কথা শুনেছি। তবে, আমি যদি তাদের কখনও খারাপ অবস্থায় ধরতে পারি তাহলে এমন উত্তমমধ্যম দেব যাতে ওইসব নোংরা কাজ করার ইচ্ছা তাদের ঘুচে যায়। মঁসিয়ে, এইটুকু শুধু শুনে রাখুন, আমি যা বললাম, তাই-ই করব, আমার নাম স্যাভেরিন।"

জলাতঙ্ক
Hydrophobia

জিনিতিভ, প্রিয় বান্ধবী আমার, তুমি আমার মধুচন্দ্রিমাযাপনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছ। কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে আমাকে একটা কথাও বলে দাওনি। একটা ইঙ্গিত পর্যন্ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করনি। আঠারো মাস তোমার বিয়ে হয়েছে—আর এ সমস্ত ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা কিছু কম হয়নি। মোটামুটিভাবে সমস্ত ব্যাপারটা যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে তাহলে আমার প্রগলভতা ও বোকামির জন্য আমার স্বামীর কাছে এভাবে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠতে হত না। যে বোকামি আমি করে ফেলেছি তার জন্য আমার লজ্জার আর অন্ত নেই—আর আমার বোকামির কথা যখনই তাঁর মনে পড়বে তখনই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসবেন।

তোমাকে আমি সমস্ত ঘটনাটাই লিখে জানাচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছে আমার অনুরোধ, চিঠিটা পড়ে তুমি বেশি হাসতে পারবে না।

এটা একটা নাটকীয় ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিয়ের দিনের কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি। ওই দিন রাত্রিতেই মধুচন্দ্রিমাযাপনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব বলে আমরা স্থির করে রেখেছিলাম।

লাঞ্চের শেষে খবর এল গাড়ি এসে গেছে। তখন বিকেল পাঁচটা। অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড় হালকা হয়ে এসেছে। আমিও বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। বাবা অশ্রু গোপন করে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সোনা মেয়ে আমার, নূতন সংসারে গিয়ে যেন ভয় পেয়ো না।" মা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে অনেকভাবে সান্ত্বনা দিলেন, অনেকভাবে বোঝালেন। এই সমস্ত বিদায়কালীন আবেগ, উচ্ছ্বাস আর বিষণ্ণ পরিবেশের মধ্য থেকে আমার স্বামী আমাকে বের করে আনার চেষ্টা করলেন। বিদায়ক্ষণে আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল।

হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার পোশাক ধরে টানছে, ঘুরে তাকিয়ে দেখি আমার সব থেকে আদরের কুকুর বিজো। আমি তার কথা একেবারেই ভুলে বসেছিলাম। অবলা প্রাণীটি তার বিদায় জানাবার ভাষা প্রকাশ করছে ওইভাবে। তার কাছ থেকেও বিদায় নিতে গিয়ে আমি আবার নূতন করে কেঁদে ফেললাম। তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলাম, তার বুকে মুখে চুমু খেতে লাগলাম গভীর আবেগে।

বিজোও যেন আনন্দে পাগল হয়ে উঠল। সে আমার গলা বুক চাটতে লাগল, আমার গালে তার মুখ ঘষতে লাগল—এইভাবে সে আমাকে আদর জানাতে লাগল। এর মধ্যে এক সময় আমার নাকে সে তার দাঁত দুটো বসিয়ে দিল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিজোকে কোল থেকে নামিয়ে দিলাম। সবাই দৌড়ে এল

ওষুধপত্র নিয়ে। ছুঁচ ফোটানোর মতো দুটো ছোটো ছোটো ছেঁদা হয়ে গিয়েছিল নাকে—ওষুধ লাগাতেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এর পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম কয়েক সপ্তাহ নরম্যানডিতে থেকে জায়গাটা ভালো করে ঘুরে দেখব।

প্রায় মধ্যরাত্রিতে আমরা ডিপিতে পৌঁছোলাম। সমুদ্র দেখার আমার দারুণ শখ। সুতরাং তাঁকে জানালাম, সমুদ্র না দেখে আমি হোটেলে ফিরে যাব না। তিনি আমাকে হোটেলের ঘরে একা পেতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর কথায় রাজি হলাম না। তখন বাধ্য হয়েই তিনি আমার সঙ্গে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চললেন।

গভীর নিশীথে অপার অনন্ত সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দেখতে দেখতে আমরা এক অজ্ঞাত অনুভূতির জগতে হারিয়ে যেতে লাগলাম। দেখলাম, অসীম সমুদ্র মিশে একাকার হয়ে গেছে অনন্ত আকাশের সঙ্গে। মনে হল পাখির মতো দুটো ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাই আকাশে—দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি আকাশটাকে। এমন রাত্রিতে সমুদ্রসৈকতে বসে মনে হয় বিশ্বসৃষ্টির রহস্য যেন উন্মুক্ত হয়ে গেছে। সমুদ্রের বাতাসে ভেসে বেড়ায় যেন কত স্বপ্ন, কত মায়া। রোমাঞ্চে ভরে ওঠে আমার সমস্ত সত্তা। পূর্ণ জ্যোৎস্নার আলো, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়, দিগন্তবিস্তৃত চঞ্চল জলরাশি যেন আমাদের নিয়ে যায় এক স্বপ্নের জগতে। এমন আনন্দঘন মুহূর্ত মানুষের জীবনে বারবার আসে না।

আমার স্বামী ফিরে যাওয়ার জন্য আমাকে তাড়া দিতে লাগলেন। আমি জলের ওপর একটা ফাঁকা নৌকো ভাসতে দেখে—সেখানে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করলাম। বললাম, "চলো না, ওই নৌকোর মধ্যে সাগরের ঢেউয়ে দুলতে দুলতে রাতটা কাটিয়ে দিই।" কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না। আমি তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছি ভেবে তিনি জোর করে আমাকে নিয়ে চলে এলেন হোটেলে।

ঘরের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক লজ্জা, সংকোচ আর জড়তা আমাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ভয়ংকর এক অস্বস্তির মধ্যে আমার সময় কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে শান্ত করে বসার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। হায় বন্ধু, কী করে যে তোমাকে আমার তখনকার মনের অবস্থাটা বোঝাব! বিবাহিত জীবনের অনভিজ্ঞতাকে তিনি আমার লজ্জা বলে ভুল করেছিলেন। আমার সরলতা ও স্বাধীনতা এবং তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার এই চেষ্টাকে তিনি অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তি ও তার কারণ হিসাবে মনে করেছিলেন। প্রথম রাত্রির মিলনের সময় একজন স্ত্রীর সঙ্গে উষ্ণ কোমল ব্যবহার করে তাকে যৌন প্রবৃত্তিতে প্ররোচিত করতে হয়—তা তিনি না করে তিনি আমার ওপর একরকম বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হলেন।

কেন জানি না হঠাৎ আমার যেন মনে হল—তাঁর মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। তাই আমি ভয় ব্যাকুল স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এমন শুরু করেছ, মনে হয় তুমি আমাকে খুন করবে?

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় আর আতঙ্কে আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। খবরের কাগজে আজকাল এ ধরনের ঘটনা রোজ ফলাও করে ছাপা হয়। ভয়ে পাগলের মতো হয়ে উঠলাম—তাঁকে বাধা দিতে লাগলাম প্রাণপণ শক্তিতে। একরকম ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলাম। তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে তাঁর মাথা থেকে এক গোছা চুল ছিঁড়ে ফেললাম, হাতের মুঠোয় ছিঁড়ে নিয়ে এলাম—তাঁর গোঁফের একটা দিক। এইভাবে তাঁর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, বাঁচাও বাঁচাও ব'লে চিৎকার করতে করতে ছুটলাম দরজার দিকে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজার হুড়কোটা বন্ধ করে দিলাম। প্রায় নগ্ন অবস্থায় সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম থরথর করে।

আমার চিৎকারে অন্যান্য বোর্ডাররা নাইট গাউন আর লণ্ঠন হাতে নিয়ে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজনের বুকের সঙ্গে মিশে গিয়ে বললাম, এই পশুটার হাত থেকে আমাকে বাঁচান। সেই লোকটি ঘরের হুড়কোটা খুলে আমার স্বামীকে টেনে বের করে আনল—তারপর দুজনের মধ্যে বেধে গেল যুদ্ধ। এর পর আমার আর কিছু মনে নেই। আমি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

জ্ঞান ফিরে এলে শুনলাম, সবাই হোহো করে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। সমস্ত হোটেল বাড়িটায় হাসির হুল্লোড় চলছে। বারান্দা, শোবার ঘর, সমস্ত জায়গা থেকে অট্টহাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। হাসি চাপতে গিয়ে দারোয়ান আর চাকরবাকরদের দমবন্ধ হবার উপক্রম হল।

সমস্ত গোলমাল ঝামেলা মিটে গেলে আমার স্বামী আমাকে ঘরে নিয়ে ঢুকলেন। তিনি নানারকমভাবে আমার কাছে কৈফিয়ত দিয়ে আমাকে বোঝানোর বা শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই সহজ স্বাভাবিক হতে পারলাম না। সারারাত ধরে কেঁদে চললাম। পরের দিন সকালে হোটেলের গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ওই দিনই আমরা পোরভিলে এসে উপস্থিত হলাম। হেনরি আগের রাতের ঘটনার জন্য মোটেই ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত না হয়ে আমার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতে লাগলেন। গত রাতের ব্যবহারের জন্য আমি নিজেই মরমে মরে যাচ্ছিলাম। একজন নারীকে যে গভীর গোপন এক রহস্য ঘিরে থাকে তা উন্মোচিত করার জন্য হেনরি আমাকে অনেকভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই রহস্যের গভীরে প্রবেশ করতে গিয়ে যে নিদারুণ বিতৃষ্ণা, লজ্জা, ঘৃণা—আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা তোমাকে কীভাবে বোঝাব। এক একসময় মনে হয়েছিল—আমি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসি।

পর দিন আমরা এলাম এট্রেটাটে। সেখানে যাঁরা বেড়াতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম। শুনলাম একটি মেয়ে জলাতঙ্ক রোগে কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। একটা বাচ্চা কুকুরের কামড়ে সে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। খাওয়ার টেবিলে সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল জলাতঙ্ক রোগে

মৃত্যুর ঘটনাটা। এই সমস্ত আলোচনা শুনতে শুনতে ভয়ে আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হল বিজো যেখানে কামড়িয়েছিল সেখানে যন্ত্রণা হচ্ছে। একথা মনে হল সেইমুহূর্ত থেকে যেন শরীরের মধ্যে কেমন আনছান করতে লাগল।

সেদিন সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমোতে পারলাম না। হেনরির কথা একেবারে ভুলেই গেলাম। সর্বদা মনে হতে লাগল আমার জলাতঙ্ক হয়নি তো? একটা বিশ্রী অস্বস্তি আর ভয় নিয়ে সমস্ত দিনটা বাইরে বাইরে ঘুরে কাটালাম। নিজের মনেই সমস্ত ভয় আর অস্বস্তি চেপে রাখলাম। জলাতঙ্ক! কী নৃশংসতম মৃত্যু।

হেনরি জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, তোমাকে এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন?

আমি নিস্পৃহ স্বরে বললাম, কিছু না, এমনিই।

এর পর নাকে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। হেনরিকে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়া দিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাকটাকে ভালো করে পরীক্ষা করলাম। সেখানে কোনো দাগ লক্ষ করলাম না, সব মিলিয়ে গেছে।

খাওয়ার রুচি চলে গেল। কিছুই খেতে পারলাম না। হেনরি ডাক্তার দেখানোর কথা বলল, কিন্তু আমি রাজি হলাম না। নাকের ওপর হাত দিয়ে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করলাম। নাকটা কী একটু ফুলে লাল হয়ে উঠেছে? না, তেমন কিছু লক্ষ করলাম না।

সেদিন রাত্রে স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় আমি যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। মনে হল ও খুব নরম মনের মানুষ। আমি ওর গায়ে ঠেস দিয়ে বসলাম। কী কারণে আমি যে এত ভয় পেতে শুরু করলাম—সেটা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বলতে পারলাম না।

নিজেকে এভাবে শিথিল করে দেওয়ার কারণে সে আমার উলঙ্গ শরীরটাকে নিয়ে এমন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করল তাকে অতি হীন কুৎসিত ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। তখন আমার বাধা দেবার বা তাঁকে প্রতিরোধ করার সমস্ত ইচ্ছা বা ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এর পর দুটো দিন ভয় আর আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠলাম। মাকে আগে একটা সাধারণ চিঠি দিয়েছিলাম। তাতে বিজো কেমন আছে জানতে চেয়েছিলাম। মা চিঠির উত্তর দিলেন, কিন্তু বিজোর কথা উল্লেখ করলেন না।

আবার একটা চিঠি লিখলাম, আমার কিছুই ভালো লাগছে না, বিজোকে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

বিকেলের দিকে আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় এসে পৌঁছোল। হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করল। জল ভরতি গ্লাস তুলতে গিয়ে সেটা মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তখন আমার মনের অবস্থা যে কী দুঃসহ হয়ে উঠেছে—তা যদি তোমায় বোঝাতে পারতাম!

এর মধ্যে গির্জায় গিয়ে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করলাম। ফিরে আসার সময় এক ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নিজের কুকুরে কামড়ানোর কথা না বলে

বললাম আমার এক বন্ধুকে কুকুরে কামড়িয়েছে। তিনি যথারীতি একটা প্রেসক্রিপশান লিখে দিলেন। সেই অনুযায়ী ওষুধগুলো কিনলাম, কিন্তু ওষুধগুলোর কথা মনে করতে পারলাম না।

রাস্তার কুকুর দেখে তাদের ভয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে মনে হত কুকুরগুলোকে কামড়িয়ে দিই। ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলাম। স্বামী সেই অবস্থার সুযোগ নিতে ছাড়লেন না। মায়ের একটা চিঠি এসে পৌঁছোল সকালের ডাকে। তিনি লিখেছেন বিজো ভালোই আছে কিন্তু তাকে ট্রেনে একা পাঠানো অসুবিধাজনক তাই বিজোকে ওইভাবে পাঠানো যাবে না। আমার মনে হল, বিজো নিশ্চয়ই মারা গেছে, তাই মা ওকথা লিখেছেন।

এর পর আমার ঘুম সম্পূর্ণ উবে গেল। হেনরির ঘুমের কোনো অসুবিধা হল না। সে দিব্যি মহা আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। আর বিছানায় ছটফট করতে করতে বিনিদ্র রাত্রি কাটাতে লাগলাম।

পর দিন সমুদ্রে স্নান করতে নেমে আমার ভীষণ শীত করতে লাগল। মনে হচ্ছিল জলটা এত কনকনে ঠান্ডা যে আমার হাত-পা সমস্ত শরীর জমে অবশ হয়ে যাচ্ছে। সব থেকে বেশি যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলাম আমার নাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা হেনরিকে দেখে মনে হল, সে আনন্দে স্ফূর্তিতে একেবারে ডগমগ করছে। হেনরি আমাকে নিয়ে ক্যাসিনোতে গেল কিন্তু নাটক শেষ হওয়ার আগেই সে আমাকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। আমারও বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভালো লাগছিল না।

ঘরে ফিরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম কিন্তু বীভৎস এক আতঙ্কে ছটফট করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে আমার শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। ঘুমোনোর অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম চোখ থেকে উধাও হয়ে গেছে। হেনরিও দেখলাম জেগে আছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করল।

হঠাৎ দারুণ একটা যন্ত্রণা আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ভয়ংকর যন্ত্রণায় আমি পাগলের মতো হয়ে উঠলাম। আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলাম। হেনরি আমাকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করছিল কিন্তু তাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলাম। তারপর দরজার পাল্লায় মুখ চেপে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলাম। আমি একেবারে পাগলের মতো হয়ে উঠলাম।

হেনরি আমার কাণ্ডকারখানা দেখে যারপরনাই অবাক হল। আমাকে একরকম কোলে করে নিয়ে জানতে চাইল—আমার কী অসুবিধা হচ্ছে। আমি তার কথার কোনো উত্তর দিলাম না। উত্তর দেবার মতো আমার ক্ষমতা বা অবস্থা ছিল না। মৃত্যুর জন্য আমি তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হল একটু পরেই আবার আমার এরকম একটা উত্তেজনা দেখা দেবে—তারপরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব।

হেনরি আমাকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। ভোরের দিকে হেনরি আমার

শরীরটাকে ভোগ করল। এর পর আবার আগের সেই উত্তেজনা আমাকে অস্থির করে তুলল। আমার মনে হল, সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিই, ছিঁড়ে খুঁড়ে সব কুটিকুটি করে ফেলি, কামড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। যন্ত্রণাটা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল—এত ভয়ংকর যন্ত্রণা আগে কখনও অনুভব করিনি।

সকাল আটটা নাগাদ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। চার দিন পরে আমি এই প্রথম ঘুমোতে পারলাম।

বেলা এগারোটা নাগাদ ভীষণ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম মা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার চিঠি তাঁকে রীতিমতো দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তাঁর হাতে বড়ো একটা ঝুড়ি। সেই ঝুড়ির ভিতর থেকে বিজোর চিৎকার শুনতে পেলাম। ঝুড়ির ঢাকনা খুলে ফেলতেই বিজো বিছানার ওপর লাফিয়ে পড়ে আমার গাল চেটে তার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

এটাই হল কাল্পনিক ভয় অথবা বীভৎস ধরনের একটা উৎকণ্ঠা। এই কাল্পনিক ভয় যে মানুষের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক সেটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, আমি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়েছি।

কী দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ওই চারটি দিন যে আমার কীভাবে কেটেছে—তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। নিজে নিজেই সে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করে গেছি। মুখ ফুটে একটা কথা কাউকে বলতে পারিনি। আমার স্বামী কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেননি।

হিপ্পোলিটের দাবি
Hippolyte's Claim

আদালতে দখলিস্বত্ব একটি মামলার শুনানি শেষ হওয়ার পর জজসাহেব আর একটি মামলার শুনানি শুরু করলেন। এই মামলাটি ছিল বড়ো অদ্ভুতরকমের। এই মামলার বাদীপক্ষের হিপ্পোলিট ল্যাঙ্কার অভিযোগ এনেছে বিবাদীপক্ষের ম্যাডাম লিনোর বিরুদ্ধে। ম্যাডাম লিনো তাকে একটা কাজ করে দেওয়ার জন্য একশো ফ্রাঁ দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে দিয়ে সে কাজটা করিয়ে নিয়ে তিনি তাঁর কথা রাখেননি। সে একশো ফ্রাঁও পায়নি। সেজন্য সে সঠিক বিচার পাবে বলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে এবং তার ন্যায্য পাওনার জন্য সে মামলা রুজু করেছে।

বিবাদীপক্ষের দুজন সাক্ষী উপস্থিত আছে আদালত গৃহে। প্রথমে জজসাহেব হিপ্পোলিটকে ডেকে তার জবানবন্দি নিলেন। হিপ্পোলিট বলল, হুজুর, আজ থেকে আট-ন মাস আগে এ্যবথিমেলিনোর বিধবা ম্যাডাম লিনো এক দিন সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন তিনি তাঁর বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে চান এবং তিনি সে ব্যাপারে আমার সাহায্যপ্রার্থী।

"তোমার সাহায্যপ্রার্থী—মানে, কী বলতে চাইছ? ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বল।"

হিপ্পোলিট বলল, "হুজুর, ম্যাডাম লিনো আমার কাছ থেকে একটি সন্তান চান।"

জজসাহেবের কাছে তখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি। তাই তিনি বললেন, "তার মানে? সে কি সন্তান পোষ্য নেবার জন্য তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিল?"

হিপ্পোলিট বলল, "তা নয় হুজুর, ম্যাডাম তাঁর গর্ভে একটি সন্তান তৈরি করে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে তিনি আমাকে একশো ফ্রাঁ দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।"

জজসাহেব তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন, "সে তোমায় কেন এ ধরনের অদ্ভুত একটা অনুরোধ করল বলতে পার?"

হিপ্পোলিট বলল, "হুজুর, প্রথমে তার কথার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। তাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে সে ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলে। ম্যাডাম যেদিন তাঁর প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তার দিন সাতেক আগে তার স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু হয়। তখন ম্যাডাম লিনো সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে উকিলের পরামর্শ নেন। উকিল ভদ্রলোক তাঁকে জানান যে এখন থেকে দশ মাসের মধ্যে যদি ম্যাডাম লিনোর কোনো সন্তান হয়, তাহলে সে মঁসিয়ে লিনোর সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি পাবে এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারী হিসাবেই বিবেচিত হবে। অন্যথায় স্থাবরঅস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি লিনোর আত্মীয়পরিজন ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। সেই কারণে ম্যাডাম লিনো একটি সন্তানলাভের আশায়

আমার কাছে দিশাহারা হয়ে ছুটে আসেন। কারণ ম্যাডাম জানতেন আমি আটটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি এবং সন্তান প্রজননে আমার ক্ষমতা অসাধারণ।''

এরপর দম নেবার জন্য একটু থামল হিপ্পোলিট।

জজসাহেব বললেন, ''থামলে কেন? বলে যাও।''

হিপ্পোলিট বলল, ''বলছি হুজুর, ম্যাডাম লিনো তখন আমাকে বললেন, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে সহবাস কর এবং আজ থেকে দুমাস বাদে ডাক্তারের রিপোর্টে যদি দেখা যায় আমি গর্ভবতী হয়েছি তাহলে আমি তোমাকে একশ ফ্রাঁ দেব, কথা দিচ্ছি।' যথারীতি দুমাস পরে জানতে পারলাম ম্যাডাম লিনো আমারই ঔরসের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং সে সেখানে বড়ো হয়ে উঠছে। এর পর তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর কাছে আমি নির্দিষ্ট অঙ্কের ওই টাকাটা চাইলাম, কিন্তু বারবার তাঁর কাছে টাকা চেয়েও সে টাকা আমি পাইনি।''

এর পর জজসাহেব ম্যাডাম লিনোকে জিজ্ঞেস করলেন, ''এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?''

ম্যাডাম লিনো যেমন স্থূলাঙ্গী, তাঁর গলার স্বরটাও অনেকটা পুরুষদের মতো। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন, ''হুজুর, ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। ও যা বলছে, আগাগোড়া বানানো। আমি আমার স্বর্গগত স্বামীর নামে শপথ করে বলছি, আমার গর্ভস্থ সন্তানের ঔরসদাতা ওই লোকটি নয়।''

জজসাহেব তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার গর্ভে যে সন্তান বেড়ে উঠছে, সে যে তার নয়, সে-কথা কি তুমি প্রমাণ করতে পারবে?''

ম্যাডাম লিনো তখন তোতলাতে তোতলাতে বললেন, ''হুজুর, একটু ভাবতে দিন। এই আদালতে আমার যে দুজন সাক্ষী উপস্থিত আছে, তাদের জিজ্ঞেস করলে আপনি সব কথা জানতে পারবেন। হুজুর, সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন, লোকটার সন্তান উৎপাদনের কোনো ক্ষমতাই নেই। ওর যে আটটি সন্তান আছে বলে নিজের পৌরুষের বড়াই করছে, আসলে তারা ওর নিজের ঔরসজাত সন্তান নয়। ওর স্ত্রীর গর্ভে অন্যান্য লোকের ঔরসে ওই আটটি সন্তানের জন্ম হয়েছে।''

জজসাহেব বললেন, ''অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বাদ দিয়ে নিজের কথা বল।''

ম্যাডাম লিনো বললেন, ''হুজুর প্রথমে আমি জানতেই পারিনি ওর কোনো ক্ষমতা নেই। তাই ওর কাছে ওই প্রস্তাবটা নিয়ে গিয়েছিলাম। এর পরে আমি যাই ওই দুজনের কাছে—যারা সাক্ষী হিসাবে এখানে উপস্থিত আছে। আপনি ওদের দয়া করে জিজ্ঞেস করে দেখুন।''

জজসাহেব এবার সাক্ষীদের আলাদা আলাদা ভাবে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ''ম্যাডাম লিনোর গর্ভে যে সন্তান আছে সে কি তোমার দ্বারা উৎপন্ন?''

দুজনেই একই উত্তর দিল, ''হ্যাঁ, হুজুর।''

তাদের কথা শুনে জজসাহেব তাঁর রায়ে ঘোষণা করলেন, ''ম্যাডাম লিনো প্রথমে যেহেতু হিপ্পোলিটের কাছে প্রথমে তার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল সেই হেতু প্রতিশ্রুতিমতো সেই টাকা হিপ্পোলিটকে দিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।''

মা স্যাভেজ
The Mother Savage

বছর পনেরো ভিরেল্যানে আমার যাওয়া হয়নি। এক দিন বন্ধু সারভেল্যান সেখানে শিকারের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বন্ধু সারভেল্যান সেখানে একটা বাগানবাড়ি বানিয়ে রেখেছিলেন। যুদ্ধের সময় প্রাশিয়ান সৈন্যরা সেটা ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমার বন্ধু আবার সেই বাড়িটা নূতন করে তৈরি করিয়েছিল।

অনেক দেশ আমি ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু এমন একটা সুন্দর জায়গা আমি আগে আর কখনও দেখিনি। এর মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশ আমাকে নিয়ে যেত যেন এক স্বপ্নের দেশে। এখানকার অরণ্যঘেরা পরিবেশ আর ছলছল কলকল শব্দে বয়ে চলা নদীর পাড়ের নিস্তব্ধতা আমার সমস্ত অন্তরকে এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে ভরিয়ে তুলত। এই নদীতে ছিপ ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে মাছ ধরতাম আর সেই অরণ্যের মধ্যে শিকার করে বেড়াতাম।

ওখানকার একটা পায়ে চলা পথ ধরে আমি এগিয়ে চললাম। সঙ্গে ছিল আমার দুটি শিকারি কুকুর। যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি। ১৮৬৯ সালে শেষবারের মতো যখন আমি ওখানে গিয়েছিলাম, ওই বাড়িটাকে আমি দেখেছিলাম। ছিমছাম সুন্দর বাড়িটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। বাড়ির চারিপাশটা দ্রাক্ষালতায় শোভমান হয়ে ছিল। লতায় লতায় ঝুলে ছিল থোকা থোকা পাকা আঙুর। উঠোনে ঘুরে বেড়াত মুরগির ঝাঁক। বর্তমানে বাড়িটার ধ্বংসস্তূপ যেন অতীতের করুণ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে।

আমার বেশ মনে আছে একবার আমি খুব ক্লান্ত হয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন ওই বাড়ির একমাত্র মহিলা আমার ক্লান্তি দূর করার জন্য আমাকে যত্ন করে এক গ্লাস মদের সঙ্গে রোস্ট করা কিছুটা মুরগির মাংস খেতে দিয়েছিল। এই বাড়ির মালিকটি অন্ধকারে পরের খেতের ফসল চুরি করত। হঠাৎ এক দিন পাহারাদারের ব্যাপারটা নজরে পড়তেই সে তাকে গুলি করে হত্যা করে। তার লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারার একটি ছেলে ছিল। শুনেছিলাম সে ছিল একজন দক্ষ শিকারি। এরা স্যাভেজ নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিল।

সারভেল্যান জিজ্ঞেস করলাম—এদের কী হল, এরা সব কোথায় গেল?

সারভেল্যান বলল, শোনো বলছি। এই বলে সে তার কাহিনি শুরু করল।

"প্রাশিয়ানরা যখন যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখন স্যাভেজ মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিল। তার মা তখন বাড়িতে একলাই রয়ে গেল। স্যাভেজ তখন তেত্রিশ বছরের এক যুবক। স্যাভেজের মায়ের অর্থবিত্তের অভাব নেই জেনে প্রতিবেশীরা বৃদ্ধাকে নিয়ে

মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি। গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে অরণ্যঘেরা নির্জন পরিবেশে তিনি একাই বাস করতেন। ভয় নামক বস্তুটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। কেউ তাঁকে কখনও হাসতে দেখেনি। গ্রাম্য মজুরদের স্ত্রীরা হাসতে জানত না। দৈন্য, অভাব আর সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে তাদের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যেত। স্যাভেজ মা ছিল একটু রোগাটে ধরনের লম্বা চেহারার একজন মহিলা। তার মেজাজটা ছিল বেশ গম্ভীর প্রকৃতির। হাসি, ঠাট্টা, তামাশা মস্করা তিনি পছন্দ করতেন না—আর সেইজন্য কেউ সেইভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করত না।

"বৃদ্ধা নিজের বাড়ির মধ্যেই থাকতেন। সারাসপ্তাহে মাত্র একটা দিন তিনি গ্রামে যেতেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করার জন্য। অরণ্যের পরিবেশের মধ্যে বাস করতেন বলে সেখানে নেকড়ের উপদ্রব লেগেই ছিল। সেজন্য তিনি গ্রামে যাওয়ার সময় স্যাভেজের পুরোনো বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে চলতেন। বয়সের ভারে তিনি কুঁজো হয়ে পড়েছিলেন আর হাঁটার সময়ে কুঁজো হয়েই হাঁটতেন।

"এক দিন ওই গ্রামে প্রাশিয়ান সৈন্যরা এসে আস্তানা গাড়ল। গ্রামের সকলের বাড়িতে তারা দু-চারজন করে থাকতে লাগল। বৃদ্ধার টাকাপয়সার অভাব নেই জেনে চারজন প্রাশিয়ান সৈনিক সেখানে গিয়ে উঠল। তাদের জন্য বৃদ্ধাকে যাতে বেশি পরিশ্রম না করতে হয় বা তাঁর যাতে টাকাপয়সার অপচয় না হয় সেদিকে প্রাশিয়ানদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তারা তাঁর কাজে সবরকমভাবে সাহায্য করত। তারা বৃদ্ধার জন্য জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনত, জল তুলে আনত, বাসন মেজে দিত, ঘরদোর পরিষ্কার করত, জামাকাপড় কেচে দিত। বৃদ্ধার প্রায় সব কাজই তারা করে দিত। মনে হত তারা যেন বৃদ্ধার চারটি ছেলে। তাঁর সঙ্গে তাদের মায়ের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

"বৃদ্ধা তাতেও কিন্তু মনে শান্তি পেতেন না। সব সময় তিনি নিজের ছেলের কথা চিন্তা করতেন। এক দিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তোমরা বলতে পার, তেইশ নম্বর ফ্রেঞ্চ ইনফ্যান্ট্রি কোন্ ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে। আমার একমাত্র ছেলে তাদের সঙ্গেই আছে।

"তারা উত্তরে জানাত যে সে-কথা তারা বলতে পারবে না—বা সে ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই নেই।

"সন্তানের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা, তাঁর মানসিক যন্ত্রণার কথা বুঝতে পেরে তার উপশম ঘটানোর জন্য তারা যথাসাধ্য তাঁর সেবাযত্ন করত। দেশে তাদের মায়ের কথা মনে করে তারা তাঁর সঙ্গে নিজের মায়েরই মতো ব্যবহার করত। তিনি তাদের মায়ের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন।

"এক দিন সকালে গ্রামের পিয়োনটি তাঁকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তিনি চোখে চশমা এঁটে চিঠিটা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল, স্যাভেজের মা, আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই যে গতকাল যুদ্ধ চলাকালীন একটি কামানের গোলা এসে

আপনার ছেলে ভিক্টরকে আঘাত করে এবং তাতে তার মৃত্যু হয়। আমরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলাম। ভিক্টর কিছু দিন আগে জানিয়ে রেখেছিল, যুদ্ধে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আমি যেন আপনাকে সেই সংবাদ দিতে দ্বিধাবোধ না করি।

"তার ঘড়িটা আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। আমাকে যদি তার পথে না যেতে হয় তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, আমি যখন বাড়ি ফিরে যাব তখন আমি সেটা আপনাকে ফেরত দেব।"

"চিঠিটায় তিন সপ্তাহ আগের তারিখ দেওয়া ছিল।

"চিঠিটা পড়ার পর হতভাগিনী মা চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোটা জল বেরোল না বা তিনি মোটেই হা-হুতাশ করলেন না। ভয়ংকর শোকে তিনি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। কামানের গোলায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া তাঁর একমাত্র সন্তানের মৃতদেহটার কথা বারবার তাঁর মনে পড়তে লাগল। এবার বাঁধভাঙা বন্যার মতো তাঁর চোখ দুটো দিয়ে অবিরাম ধারায় জল বেরিয়ে আসতে লাগল। পাহারাদারদের গুলিতে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে আর প্রাশিয়ানরা মারল তার একমাত্র সন্তানকে।

"হঠাৎ চারজন যুবকের কোলাহলে তাঁর চিন্তার সূত্র ছিন্ন হল। তারা একটা খরগোশ মেরে আনন্দে হইচই করতে করতে বাড়িতে ফিরে আসছিল।

"তাদের আসতে দেখে তিনি চিঠিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। তিনি নিজেকে সংযত করে আবার আগের মতো শান্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

"বৃদ্ধা-খরগোশটি রান্না করলেন খুব সুন্দর করে। তারা সবাই একসঙ্গে খেতে বসল। তারা মহাআনন্দ করে খেতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধা একগ্রাসও খাবার মুখে তুলতে পারলেন না। সেদিকে তারা লক্ষই করল না। হাসি ঠাট্টা গল্প করতে করতে তারা খেতে লাগল। বৃদ্ধা সেখানে ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

"হঠাৎ বৃদ্ধাটি বলে উঠলেন, "আমার এখানে প্রায় এক মাস ধরে বাস করছ কিন্তু তোমাদের নামগুলো এখনও পর্যন্ত জানা হয়নি।"

"বৃদ্ধার কথামতো তারা তাদের নাম বলল। কিন্তু তিনি তাদের নাম, বাবার নাম, দেশের ঠিকানা লিখে দিতে বললেন। জার্মান ভাষায় লেখা তাদের নাম ঠিকানার কাগজটা নিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের কিছু কাজ করে দেবার কথা ভাবছি।"

"এই বলে তিনি খাবার ঘর থেকে উঠে চলে গেলেন। এর পরে যে ঘরে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই ঘরে রাশি রাশি খড় নিয়ে বোঝাই করতে লাগলেন। তারা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাদের জানালেন যে ঘর গরম রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। সে-কথা শুনে তারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এল।

"রাত্রিতেও বৃদ্ধা কিছু খেলেন না। তারা তাঁকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তিনি বললেন তাঁর শরীরটা মোটেই ভালো নেই।

"যুবকদের খাওয়দাওয়া শেষ হয়ে গেলে তিনি আগুনের তাপে হাত-পা গরম করতে লাগলেন। তারা তাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। খড় বোঝাই করার জন্য

ঘরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। তারা খড়ের সোঁদা গন্ধ নিতে নিতে ঘুমোবার উদ্যোগ করতে লাগল। ঘরটা ছিল অনেকটা উঁচুতে। সেখানে মই বেয়ে যাতায়াত করতে হত। এক সময় তিনি মইটা নামিয়ে নিয়ে গেলেন। গভীর রাতে সকলে যখন ঘুমে অচেতন—তখন তিনি মই বেয়ে সেই ঘরে উঠে গিয়ে সেখানকার খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিলেন। তারপর, ঘরে তালা দিয়ে নীচে নেমে মইটাকে নামিয়ে নিলেন।

"খড় বোঝাই ঘরটায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ভেতর থেকে শোনা গেল চার যুবকের মর্মান্তিক আর্তনাদ। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের ছাদ খসে পড়ল, ঘরের জানালা, দরজা, দেয়াল সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের ভিতর থেকে আর কোনো আর্তনাদ শোনা গেল না। লেলিহান আগুনের শিখা তখন সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত আকাশটা তখন লালে লাল হয়ে উঠেছে।

"স্যাভেজের মা তখন তাঁর ছেলের বন্দুকটাতে গুলি ভরে সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। ওদের মধ্যে কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তিনি তাকে গুলি করে হত্যা করবেন। কিন্তু কেউ আর সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল না যখন তিনি বুঝতে পারলেন প্রাশিয়ান সৈনিকদের কেউ আর বেঁচে নেই। তখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন মনে একটা গাছে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

"ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের পর চারদিক থেকে বহু মানুষ ছুটে এল—অন্যান্য প্রাশিয়ান সৈনিকরাও দৌড়ে এল সেখানে। একজন প্রাশিয়ান সেনাপ্রধান বৃদ্ধার কাছে এসে সৈনিক যুবকদের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি তখন কোনো কিছুই গোপন না করে সব কথা তাদের খুলে বললেন, তাঁর সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি যে চারজন প্রাশিয়ান সৈন্যকে পুড়িয়ে মেরেছেন সে-কথা অকপটে স্বীকার করলেন। তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য দুটি কাগজ বের করে দেখালেন—একটাতে রয়েছে তাঁর ছেলে ভিক্টরের মৃত্যুসংবাদ, অন্যটায় চারজন প্রাশিয়ান সৈনিকের নাম আর দেশের বাড়ির ঠিকানা। কাগজ দুটি সেনাপ্রধানটির হাতে দিয়ে বললেন, "তোমরা ওদের বাড়িতে খবর পাঠাও-আমার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছি।"

"এর পর সেনাপ্রধানটির অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। সে তার জাতীয় ভাষায় কয়েকজন প্রাশিয়ান সৈনকে কী যেন নির্দেশ দিল। সেই নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বৃদ্ধাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। এর পর কয়েক হাত দূর থেকে বারোজন সৈন্যের একটা দল বৃদ্ধাকে লক্ষ করে গুলি করল। মুহূর্তের মধ্যে বৃদ্ধার শরীরটি ঝাঁঝরা করে দিয়ে বুলেটগুলো তাঁর পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল।"

বন্ধু এখানে তাঁর কাহিনি শেষ করলেন।

সম্মানচিহ্ন
The Decoration

এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে চিন্তা ও বুদ্ধির যখন বিকাশ ঘটে তখন তারা অনেক ধরনের কামনা বাসনার শিকার হয়ে পড়ে।

মঁসিয়ে স্যাক্রিমেন্টও সেই ধরনের একটা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ছেলেবেলা থেকেই রাজকীয় বেশভূষায় নিজেকে সাজাতে ভালোবাসতেন। অন্যান্য ছেলেরা যেমন সৈন্যদের টুপি পরতে ভালোবাসত তিনি তাদের ব্যতিক্রমে "লিজিয়ন অফ অনারের" দস্তার তৈরি ক্রুশ বুকে ঝুলিয়ে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করতেন।

পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁর আদৌ আগ্রহ বা নিষ্ঠা না থাকার কারণে তিনি সে ব্যাপারে বেশি দূর এগোতে পারেননি। তাঁর অর্থবিত্তের মোটেই অভাব ছিল না বরং প্রাচুর্যের জন্য তিনি অপরের হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে বসলেন। উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের মর্যাদা নিয়ে তিনি প্যারিস শহরে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। দুজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতে পেরে তাঁর বুকটা গর্বে ফুলে উঠত।

বালকবয়সে যে ইচ্ছাটা ভয়ংকরভাবে বিব্রত করত, সেই ইচ্ছাটা তাঁর মনটাকে কুরে কুরে খেত। সেটা হল, লিজিয়ন অফ অনারের বুকের ওপর লাল প্রতীক স্বরূপ ফিতেয় ক্রুশচিহ্ন ঝোলানো দস্তার একটি।

রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বুকে লাল ফিতে ঝোলানো কোনো মানুষকে দেখতে পেলেই হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর হিংসায় তাঁর বুকটা ফেটে যেত। যখনই রাস্তা দিয়ে যেতেন, লাল ফিতে ঝোলানো এত মানুষ তাঁর চোখে পড়ত, তাঁর মনে হত সরকার তো দেখছি সকলকেই খেতাবে ভূষিত করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলেছে, মনে হচ্ছে—তারা যেন অহংকারে ফেটে পড়ছে, তাদের মধ্যে অনেকে আবার মাথা নীচু করে হেঁটে চলেছে সাধারণ মানুষের মতো। প্রথম দলের মানুষদের দেখে মনে হল তারা নিশ্চয়ই লিজিয়ন অফ অনার খেতাবে ভূষিত। সুতরাং যখনই তিনি তাদের মুখোমুখি হতেন, তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে টুপি খুলে তাদের সম্মান দেখাতেন।

তা সত্ত্বেও তিনি এই সমস্ত খেতাবধারী মানুষকে দেখলেই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, তাঁর মনটা বিদ্বেষ ও ঘৃণায় ভরে উঠত। একরাশ উত্তেজনা নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। শাপশাপান্ত করতেন দেশের সরকারের, বলতেন—এইরকম অকেজো সরকার কবে গদিচ্যুত হবে?

তাঁর স্ত্রী তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা লক্ষ করে জিজ্ঞেস করতেন, "কী হয়েছে তোমার?"

তিনি উত্তরে বলতেন, "এই অন্যায় অবিচার আমার কাছে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

কিন্তু ডিনারের পাট চুকিয়ে তিনি আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন। যেসব দোকানে খেতাব সাজানো আছে, সেইসব দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন আর লুব্ধদৃষ্টিতে ওই সব খেতাবগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন আর হা-হুতাশ করতেন। কল্পনার দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেতেন ওই সব খেতাব বুকের ওপর সেঁটে তিনি এক বিরাট শোভাযাত্রার আগে আগে চলেছেন আর কুচকাওয়াজ করতে করতে অন্য সকলে তাঁকে অনুসরণ করছে।

কিন্তু এই খেতাব অর্জন করার সমস্ত অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত—কারণ সে ধরনের কোনো গুণই তাঁর নেই। ভেবে দেখলেন—লিজিয়ন অফ অনারের খেতাবে ভূষিত হতে গেলে তাঁকে সিভিল সার্ভেন্ট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি আকাদেমি অফিসার হতে পারেন।

কিন্তু কীভাবে ওই চাকরিটা পাওয়া যায়, সেটা তাঁর জানা ছিল না—তাই তিনি সেটা তাঁর স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর কথা শুনে রেগে উঠলেন, "তোমার কী যোগ্যতা আছে যে তুমি আকাদেমির অফিসার হবে?"

তিনি শান্তভাবে বললেন, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। আমি ব্যাপারটা জানি না বলেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।"

তাঁর স্ত্রী এবার হেসে ফেললেন, "সত্যি তোমাকে যে কী বলব, তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।"

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। তিনি বললেন, "একবার মঁসিয়ে রোজেলিনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে দেখ না। তিনি একজন ডেপুটি পদাধিকারী ব্যক্তি। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে কোনো উপায় বলে দিতে পারবেন। আমি অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কিন্তু তাতে আমার সম্মান খানিকটা ক্ষুণ্ণ হবে। তুমি কথা বললে সেটা সব থেকে ভালো হবে।"

তাঁর পরামর্শমতো তাঁর স্ত্রী ডেপুটির সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। তারপর স্যাক্রিমেন্টে বারবার পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন, "তোমার সমস্ত যোগ্যতার কথা জানিয়ে সরকারের কাছে একখানা দরখাস্ত করো।"

কিন্তু সব থেকে বড়ো কথা—তাঁর যে কোনো যোগ্যতাই নেই। শেষ পর্যন্ত ভেবে ঠিক করলেন, 'শিক্ষায় জনসাধারণের অধিকার' সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করবেন। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা না থাকায় তিনি সে চেষ্টা থেকে বিরত হলেন। এর পর তিনি আর একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। সেটি হল, শিশুরা নিজের চোখে দেখে কীভাবে শিক্ষা লাভ করবে। অতি কষ্টে প্রবন্ধটি লেখা শেষ করে নিজের

গাঁটের পয়সা খরচ করে সেটা ছেপে প্রকাশ করলেন। সেটার পঞ্চাশ কপি পাঠালেন প্রেসিডেন্টের কাছে, দশ কপি মন্ত্রীর কাছে, দশ কপি করে প্যারিসের প্রতিটি সংবাদপত্রে, আর মফস্‌সলের সংবাদপত্রের অফিসে পাঁচ কপি করে পাঠিয়ে দিলেন।

এর পর যে প্রবন্ধটি লিখলেন, সেটা হল ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধের একটি অংশে লিখলেন, মানুষ আনন্দের সন্ধানে বেশি উৎসাহী, তারা শিক্ষা বা জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হতে আগ্রহী হয় না—সুতরাং আমাদের উচিত শিক্ষার মাধ্যম পুস্তককে তাদের হাতে তুলে দেওয়া।

এইসব প্রবন্ধ বা পুস্তিকা কাউকে প্রভাবিত করতে পারল না। তবু তিনি সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠালেন। কিছু দিন পরে তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন—দরখাস্তের বক্তব্যটি ভেবে দেখা হচ্ছে। খবরটা তাঁকে আশান্বিত করে তুলল। কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করার পরেও তাঁর কাছে যখন কোনো চিঠিপত্র বা খবর এল না—তখন তিনি বেশ হতাশ হলেন। তা সত্ত্বেও খোঁজখবর করার জন্য আবার এক দিন সরকারি অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। একজন সরকারি কর্মচারীকে তাঁর ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই সে জানাল যে তাঁর দরখাস্তটি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে, তিনি যেন আরও কিছুদিন অপেক্ষা করেন। মঁসিয়ে স্যাক্রিমেন্ট কিন্তু নিজের কাজ থেকে বিরত হলেন না। তিনি যথারীতি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এদিকে মঁসিয়ে রোজেলিন তাঁকে তাঁর কাজ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ এক দিন জানতে পারলেন, মঁসিয়ে রোজেলিন খেতাব লাভ করেছেন। কোন্ যোগ্যতার বিচারে তিনি খেতাবটি পেলেন, তা কেউ বুঝতে পারল না।

মঁসিয়ে রোজেলিন তাঁকে জ্ঞানীগুণী সমাজে মেশার সুযোগ করে দিলেন, নূতন নূতন প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করলেন। শুধু তাই নয় তাঁর হয়ে মন্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন। এক দিন তাঁর এক বন্ধুর নিমন্ত্রণ পেয়ে তার বাড়িতে গেলেন লাঞ্চ করতে। তখন বন্ধুটি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, কমিটি ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ তোমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্যারিসের সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে ইতিহাস সম্বন্ধে তোমাকে দরকারি অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

সমস্ত গ্রন্থাগার ঘুরে ঘুরে ইতিহাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। ধূলোর স্তূপ সরিয়ে তিনি বইপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। সপ্তাখানেক পরে এক দিন মধ্যরাত্রিতে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর স্ত্রীকে অবাক করে দেওয়া। তিনি ল্যাচকি দিয়ে গেটের তালা খুলে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজা ঠেলে দেখলেন সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডেকে তাকে দরজা খুলতে বললেন।

ভদ্রমহিলা ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেল এত রাত্রে তাঁর স্বামীর ডাক শুনে। সে তখন বিভ্রান্তের মতো এ ঘর থেকে ও ঘরে ছোটাছুটি করল কিছুক্ষণ ধরে। তারপরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল, "আলেকজান্ডার, তুমিই তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি।"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে নিশ্চিত হয়ে সে দরজা খুলে তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর বলল, "সত্যি আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!"

মঁসিয়ে স্যাক্রিমেন্ট এর পর বাইরের পোশাক ছেড়ে বাড়িতে পরার পোশাক পরলেন। এবার তাঁর কোটটা টেনে নিলেন চেয়ার থেকে। কিন্তু তাঁর কোট তো হ্যাঙারে টাঙানো থাকে। ওটা এখানে এল কী করে? ব্যাপারটা তাঁকে বেশ অবাক করল কিন্তু যখন দেখলেন কোটের বোতামে একটি লাল ফিতে বাঁধা তিনি আরও বেশি অবাক হলেন। তাঁর স্ত্রী দৌড়ে এসে তাঁর হাত থেকে কোটটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, "কী করছ! ওটা আমাকে দাও।"

কিন্তু তিনি সেটা ধরে রাখলেন। "আগে বল এটা কার কোট? কে এখানে এসেছিল? এটা আমার হতেই পারে না। তুমি কি লক্ষ করনি, লাল ফিতের ওপর লিজিয়ন অফ অনার লেখা রয়েছে?"

তাঁর স্ত্রী ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন, "শোনো, ওটা আমাকে দাও, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয় আর তোমাকে ওটা এখন বলা যাবে না।"

"না, না—তোমাকে বলতেই হবে, ওটা কার কোট? কারণ ওটা আমার নয়।"

তাঁর জেদাজেদিতে ভদ্রমহিলা বলতে বাধ্য হলেন, "শোনো তবে, কিন্তু কাউকে কথাটা বলতে পারবে না। তুমি কি জান, তুমি খেতাব পেয়েছ, তা অন্য কিছু নয়, লিজিয়ন অফ অনার।"

মঁসিয়ে স্যাক্রিমেন্ট যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "বল কী, আমি, লিজিয়ন অফ অনার খেতাব পেয়েছি!'

"হ্যাঁ, সেই জন্যই আমি কোটটা তৈরি করিয়ে এনেছি। এখন ব্যাপারটা গোপন রাখ। কারণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওটা ঘোষণা করতে আরও এক মাস সময় লেগে যাবে। মঁসিয়ে রোজেলিনই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দও উচ্চারিত হল না। কিছুক্ষণ হাঁ করে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "রোজেলিন, রোজেলিন সব কিছু করেছেন।"

উত্তেজনায় তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর আনন্দ চাপতে না পেরে কেঁদে ফেললেন।

পনেরো দিন পরে ঘোষণা করা হল, তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে মঁসিয়ে স্যাক্রিমেন্ট যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন তার জন্য তাঁকে 'লিজিয়ন অফ অনার' খেতাবে ভূষিত করা হল।

মাদার সুপিরিয়রের পঁচিশটি ফ্রাঁ
Mother Superior's Twentyfive Franks

প্যাভিলির বয়স অনেক। সে বুড়ো হয়েছে। বিরাট বড়ো মাকড়সার মতো তার পা দুটো বাঁকা। বেঁটেখাটো চেহারা কিন্তু হাত দুটো শরীরের তুলনায় অনেক লম্বা। দাড়িটা ছুঁচালো হয়ে বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথা ঘিরে লাল চুলের গোছা। সব মিলিয়ে তাকে দেখলে একটি ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। আর সত্যি সে একটি ভাঁড়। ভাঁড় সেজেই সে অর্থ উপার্জন করে। তবে লোকটি খুব সরল আর আমুদে—তার মনের মধ্যে কোনো প্যাঁচঘোচ নেই। তার বাপ একজন চাষি। সেও চাষের কাজ করে। সে কখনও লেখাপড়া শেখেনি। গ্রামের যেসব গরিব মানুষ পয়সা খরচ করে থিয়েটার দেখতে যেতে পারে না—প্যাভিলি ভাঁড়ামি করে তাদের আনন্দ দিত। মজা দেখার জন্য তাকে কাফের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখত, নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে তারা তাকে খাবার খাওয়াত, মদ খাওয়াত। সেও বোতল বোতল মদ উড়িয়ে দিত। কাফেতে যারা যাতায়াত করত—তার ভাঁড়ামিতে খুব মজা পেত। হাসতে হাসতে তাদের পেটে খিল ধরে যেত।

চেহারাটা ছিল তার ভারী কুৎসিত। তার অঙ্গভঙ্গি ভাঁড়ামি দেখে মেয়েরা হেসে লুটিয়ে পড়ত। সে তাদের কাঁধে তুলে কোনো আস্তাবল, দেয়াল বা গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে কাতুকুতু দিত—হাসতে হাসতে তাদের পেট ব্যথা হয়ে যেত। হাসি সামলাতে এক হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিত। তাদের ঠেলা খেয়ে সে এমন ভঙ্গিতে পিছন দিকে সরে আসত মনে হত এই বুঝি সে আত্মহত্যা করে বসল। তাই দেখে মেয়েদের হাসির চোটে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। এরপর সে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে এসে তাদের ধরে এমনভাবে ঝাঁকানি দিত—তারা আর কিছু করতে পারত না, তার হাতেই নিজেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

একবার জুন মাসের শেষের দিকে সে বুভিল গ্রামে লে হারিভুর খামারে গেল ফসল কাটার কাজ করতে। সে যতদিন ওই খামারে কাজ করল—ওখানকার চাষি মজুরদের দেহের নানান ভঙ্গি দেখিয়ে তাদের আনন্দ দিল। সেইসব দেখে মজুররা কাজ করতে করতে এমন জোরে হাসতে থাকত, মনে হত সমস্ত মাঠটা যেন তাদের হাসিতে ফেটে পড়ছে। রাত্রিবেলা চারপেয়ে জন্তুর মতো হাত-পায়ে ভর দিয়ে সে মেয়েদের জানালায় গিয়ে উঁকি দিত। তাকে দেখে সবাই হইহই করে উঠে লাঠি নিয়ে তাড়া করত। সেই লাঠির ভয়ে হনুমানের মতো উপ উপ শব্দ করতে করতে লাফিয়ে লাফিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসত। তার ওই পালানোর ভঙ্গি দেখে সবাই হোহো করে হেসে উঠত।

ফসল কাটার কাজ যেদিন শেষ হয়ে গেল সেদিন বুড়ো প্যাভিলি, মেয়েরা যে গাড়িটায় চড়ে ফসল কেটে ঘরে ফিরছিল, তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বিকট অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে লাগল।

এর পর লে হারিভুর খামারের শেষ প্রান্তে এসে গাড়িটা পৌঁছোল। তখন প্যাভিলি চলন্ত গাড়ি থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগে গাড়ির একটা লম্বা কাঠে গোঁত্তা খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে চাকার ওপর। সেখান থেকে ছিটকে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে। মাটিতে পড়েই সে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দেখা গেল তার একটা চোখ খোলা আর একটা চোখ বন্ধ হয়ে আছে। ভয় আর আঘাতের যন্ত্রণায় তখন তার মুখটা নীল হয়ে উঠেছে। তাই দেখে তার সঙ্গীসাথি সকলে গাড়ি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েই তাকে ধরে তোলার চেষ্টা কবল কিন্তু তখন তার উঠে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা ছিল না। সে তখন মাটিতে পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগল।

তার অবস্থা দেখে একজন বলল, নিশ্চয়ই ওর একটা পা ভেঙে গিয়েছে।

পা একটা সত্যি তার ভেঙেছিল।

সকলে মিলে তাকে খামারের মধ্যে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসা হল। খামারমালিক তার চিকিৎসার খরচ জোগাবেন শুনে ডাক্তার তাকে নিজের গাড়ি করে একটা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করে দিলেন। সেইখানে তার পায়ের চিকিৎসা করা হল।

সে যখন নিশ্চিত হয়ে গেল তার পা ভেঙে গেছে, আর তাতে তার মৃত্যুর কোনো সম্ভাবনা নেই, তাকে ভালো ভালো খাবার খেতে দেওয়া হবে, তাকে সেবা শুশ্রূষা করা হবে, তার জন্য তাকে কোনো কাজ করতে হবে না—তখন সে মহাখুশিতে গান গাইতে লাগল, মনের আনন্দ চাপতে না পেরে নিজের মনে হিহি করে হাসতে লাগল।

নার্স যখন তার খোঁজ নিতে আসত তার বেডের কাছে, সে তাকে দেখে মুখ ভেঙাত আর মুখটাকে নানানভাবে বিকৃত করে তুলত। পাশের বেডের রোগীরা তার ভাবভঙ্গি দেখে খুব মজা পেত।

এক দিন প্যাভিলি ভেবে ঠিক করল সে সিস্টারকে গান শোনাবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। গান শুনে সিস্টারের আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু সে সমস্ত গানের পরিবর্তে অন্য গান গাওয়ার জন্য তাকে একটা প্রার্থনার বই কিনে দিল। বইটা হাতে পেয়ে তার খুব আনন্দ হল। তার পা-টাও তখন অনেকটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বইটা হাতে নিয়ে সে বিছানার ওপর উঠে বসে, যিশুর স্তবগান, প্রার্থনা-সঙ্গীত ইত্যাদি গাইতে আরম্ভ করল। আর সিস্টার তার গানের তালে তালে হাততালি দিয়ে দুলে দুলে তার গলায় গলা মিলিয়ে গান গাইতে লাগল। এর পর আস্তে আস্তে সে হাঁটতে আরম্ভ করল। সে যাতে হাসপাতাল থেকেই গির্জার প্রার্থনা-সঙ্গীত গায় সেজন্য মাদার সুপিরিয়র তাকে ওখানে আরও কিছু দিন থেকে যেতে বললেন। সে-কথা শুনে সে তো মহাখুশি। সে আরও এক মাস ওখানে থেকে গেল। সন্ধে হলেই সে গির্জার

প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইত। অনেকে সেইজন্য গির্জায় না গিয়ে হাসপাতালে এসে ভিড় করত তার গলায় প্রার্থনা-সঙ্গীত শোনার জন্য।

এক দিন প্যাভিলির হাসপাতাল ছাড়ার সময় হয়ে এল। সে যখন হাসপাতালের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছিল তখন মাদার সুপিরিয়র তার ওপর খুশি হয়ে তাকে পঁচিশটি ফ্রাঙ্ক বখশিশ দিলেন।

টাকাটা পেয়ে তার আনন্দ আর ধরে না। রাস্তায় এসে সে ভাবল এখনই সে গ্রামে ফিরে যাবে? না, কখনও না—সে এখনই গ্রামে ফিরবে না। তার মনে হল অনেক দিন হল তার পেটে মদের ছিটেফোঁটাও ঢোকেনি। আগে সে পেটপুরে মদ খাবে, তারপর গ্রামে ফেরার কথা ভাববে। এই মনে করে সে একটা কাফেতে ঢুকে পড়ল। বলতে গেলে শহরে তার আসার সুযোগই হয় না। তবে বছরে দু-একবার যে না আসে তা নয়। সে জানে লোকে শহরে আসে মদ আর মেয়েমানুষের জন্য। সেও মনে মনে ঠিক করে ফেলল, মদ আর মেয়েছেলে নিয়ে সে আজ একটু ফুর্তি করবে। তারপর ভেবে ঠিক করবে সে কী করবে আর করবে না।

কাফেতে ঢুকে প্রথমে সে যেটা করল, সে এক গ্লাস কনিয়াক আনতে বলল বেয়ারাকে। বেয়ারা সেটা আনতেই একচুমুকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল। তাতে তার গলাটা ভিজল মাত্র। তারপর সেটা চেখে দেখার জন্য আর এক গ্লাস খেয়ে ফেলল। খাওয়ার পর এমন একটা অসাধারণ আমেজ আর আনন্দ সে অনুভব করল যে, সে পুরো বোতলটাই একেবারে গলায় ঢেলে দেয়। কিন্তু সে ঠিক করে রেখেছে অন্য মদও সে খাবে—সুতরাং এর পেছনে বেশি পয়সা খরচ করা চলবে না। সে পুরো বোতলটার দাম জানতে চাইল। যখন শুনল ওটার দাম তিন ফ্রাঁ—তখন পুরো বোতলটা একচুমুকে শেষ করে ফেলল। এর পর ভরপেট অন্যান্য মদ খেয়ে সে একেবারে মাতাল হয়ে গেল।

কিন্তু মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করার কথা তখন তার মগজে চেপে বসেছে, সুতরাং মাতাল হয়ে একেবারে যাতে বেহুঁস হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে সে সতর্ক হল। চোখের সামনে সে সবকিছু দুটো করে দেখতে পাচ্ছিল। সুতরাং সে সেখান থেকে উঠে একটা বোতল বগলে করে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এসে বেশ্যাপল্লির সন্ধান করতে লাগল। যেতে যেতে সে একজন কোচম্যানকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু সে সেখানকার হদিশ দিতে পারল না। একটা ডাকপিয়োনকে জিজ্ঞেস করতে সে তাকে ভুল রাস্তায় পাঠিয়ে দিল। একটা রুটিওয়ালা তাকে গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিল। শেষমেষ একটা ঠেলাওয়ালা তাকে সঙ্গে করে বেশ্যাপল্লির সামনে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলল, এখানেই কুইনের দেখা পাবেন।

তখনও মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়নি। একটা ঘরে সে ঢুকে পড়ল। সেখানকার ঝি-মেয়েটি তাকে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল। সে তার স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় এমন অঙ্গভঙ্গি করল যে ঝি-মেয়েটি হেসে ফেলল। তারপর সে তাকে তিনটি ফ্রাঁ দেখাতেই মেয়েটি তাকে ওপরে উঠে যেতে বলল। এর পর প্রায়ান্ধকার একটা সিঁড়ি

দিয়ে টলতে টলতে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর একজনকে বলল কুইনকে ডেকে আনতে। এর পর মোটেই দেরি না করে সে মদের বোতল খুলে ঢকঢক করে খানিকটা ঢেলে দিল গলায়।

একটু পরেই ভিতরে ঢুকল মোটাসোটা বিরাট চেহারার এক লালমুখো মহিলা। সে তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে চেয়ারে বসে থাকা মাতালটিকে একবার ভালো করে দেখে নিল তারপর বলল, "এসময় এসেছ কেন? তোমাদের কি লজ্জাশরম নেই?"

সে জড়ানো স্বরে বলল, "কেন সু-ন্দরী, এ-সময় এসে কি কোনো অ-ন্যায় করেছি?"

"দুপুরে কি খেতেও দেবে না তোমরা?"

প্যাভিলি একটু হেসে চোখ দুটো আধখোলা রেখে বলল, "বুঝলে সুন্দরী, যে মানুষের সাহস আছে, তার কাছে সব সময়ই সময়।"

"বুড়ো মাতাল কোথাকার, ভরদুপুরে এসে মাতলামি শুরু করে দিয়েছ?"

বুড়ো কথাটা শুনে প্যাভিলি ভীষণ রেগে গেল। সে বলল, "বড়ো বুড়ো বুড়ো করছ যে! আমি মোটেই বুড়ো নই—আর মাতালও হইনি আমি।"

"মাতাল হওনি?"

"না, মোটেই না।"

"তাহলে সোজা হয়ে দাঁড়াও, টলছ কেন বসে বসে?"

খিদেতে মেয়েটির পেট জ্বলছে, ওদিকে তার আশপাশের মেয়েরা খেতে বসেছে। সে এবার তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল মনে হল তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের ফুলকি ছুটছে।

প্যাভিলি টলতে টলতেই উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল, "পোলকা নাচ দেখবে? দেখ কেমন নাচছি।"

সে যে মাতাল হয়নি, সে যে সোজা হয়ে নাচতে পারে সেটা বোঝানোর জন্য সে চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে নাচের ছন্দ দেখাবার চেষ্টা করল, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে সোজা বিছানার ওপর ছিটকে পড়ল। সুন্দর টানটান বিছানার ওপর তার কাদামাখা দুপায়ের ছাপ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল।

মেয়েটা রাগ সামলাতে না পেরে গালাগালি দিয়ে উঠল, "পাজি, হতচ্ছাড়া, বদমাশ, মেরে তোমার হাড়গোড় ভেঙে দেব, শালা বুড়ো নচ্ছার..."

এই বলে সে প্যাভিলির দিকে ছুটে গিয়ে তার পেটে জুতসই একটা ঘুসি মারল আর সেই ঘুসির ধাক্কায় প্যাভিলি উলটে গিয়ে পড়ল সোফার নীচে। সেখান থেকে ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল টেবিলের গায়ে। তার পাশে ছিল মুখ ধোয়ার বেসিন আর জলের একটা পাত্র। সেই দুটো সমেত সে আবার ডিগবাজি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। সেই যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ আর দুমদাম শব্দ শুনে ছুটে এল সবাই, মঁসিয়ে, ম্যাডাম, ঝি-চাকর সবাই।

মঁসিয়ে তাকে মেঝে থেকে তোলার চেষ্টা করলেন কিন্তু প্যাভিলি উঠতে পারল

না। মেঝের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। তার আর একটা পা ভেঙে গিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসা হল। এই ডাক্তারকে প্যাভিলি চেনে। প্যাভিলি যখন প্রথমে পা ভেঙেছিল—তখন ইনি লা হারিভুর খামার থেকে নিজের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

প্যাভিলিকে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার, "আবার কী পা ভেঙেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে ভাঙল?"

"এই বেশ্যাটার জন্যই আমার ভালো পা-টা ভেঙে গেছে।"

তার এই কথায় সকলে কেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল।

ডাক্তার বললেন, "শুনুন মঁসিয়ে এই দুর্ঘটনার জন্য আপনাকে দায়ী করবেন টাউন কাউন্সিলর। আপনার প্রতি তিনি বিরূপ হয়ে উঠতে পারেন। ব্যাপারটা যদি তাঁরা জানতে পারেন তাহলে তাঁরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন।"

মঁসিয়ে জানতে চাইলেন এই অবস্থায় তাঁর কী করা উচিত?

ডাক্তার বললেন, "কিছুক্ষণ আগে যে হাসপাতাল থেকে ও বেরিয়ে এসেছে, আবার ওকে সেই হাসপাতালে ভরতি করে দেওয়া আর ওর চিকিৎসার জন্য যা খরচ হবে সেই খরচের ব্যবস্থা করা।"

দেখা গেল খরচ দিতে মঁসিয়ের কোনো আপত্তি নেই।

আধ ঘণ্টা আগে যে হাসপাতাল ছেড়ে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সে আবার সেই হাসপাতালে ফিরে এল।

তাকে ফিরে আসতে দেখে মাদার সুপিরিয়রের মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করলেন দুহাত বাড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী হয়েছে?"

সে বলল, "ভালো পা-টা আবার ভেঙেছি।"

"কী করে ভাঙলে? আবার নিশ্চয়ই খড়ের গাদা থেকে পড়ে গিয়েছ?"

কী উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে সে আমতা-আমতা করে বলল, "এবার আর খড়ের গাদা নয়, খড়ের তৈরি শতরঞ্জিতে পা পিছলে।"

মাদার সুপিরিয়র ধারণাই করতে পারলেন না তার পা ভাঙার কারণ, তাকে দেওয়া তাঁর সেই পঁচিশ ফ্রাঁ বকশিশ।

গিলেমত পাহাড়
Guillemot Rock

এই ঋতুতে গিলেমত শিকার করা হয়। এপ্রিল মে মাসের শুরুতে প্যারিস থেকে মানুষ আসে দলবেঁধে স্নান করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তার আগেই ইত্রেতাতের সমুদ্রতীরে কয়েকজন বৃদ্ধকে দেখা যায়। পায়ে হিলতোলা জুতো আর শিকারের পোশাক পরে তাঁরা সেখানে এসে উপস্থিত হন। হোটেল হ্যাভিলিতে চার-পাঁচদিন থাকার পরে তাঁদের আর সেখানে দেখা যায় না। হপ্তা তিন-চার পরে তাঁরা আবার সেখানে ফিরে আসেন। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে বিদায় নেন সেখান থেকে। তাঁরা আবার বসন্তের শুরুতে সেখানে ফিরে আসেন। প্রায় অর্ধশতক আগে এখানে অনেকে শিকার করতে আসতেন—কিন্তু এখন আর আগের মতো ভিড় করে কেউ আসে না। বর্তমান এই কয়েক জন মাত্র আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে আসছেন।

গিলেমত এক শ্রেণির বিরল প্রজাতির বিদেশি পাখি। এরা সারাবছর নিউ-ফাউন্ডল্যান্ডের কাছাকাছি অঞ্চলে এবং সান্ত পেইরী ও মিকিলিন দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। কিন্তু প্রতিবছর যখন তাদের ডিম পাড়ার সময় হয় তখন তারা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই পাহাড়টায় চলে আসে। আর এই পাহাড়টাকে শিকারিরা নাম দিয়েছে গিলেমত পাহাড়। তারা এখানেই ডিম পাড়ে, ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। তারা অন্য কোথাও যায় না। তাই গিলেমত পাখি শিকার করার জন্য প্রতিবছর শিকারিরা আসে, তাদের গুলি করে মারে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি মারা যায় তাদের হাতে। তবুও বছরের ঠিক ওই সময়েই তারা আসে। ছানাগুলো উড়তে শিখলেই মা-পাখিদের সঙ্গে তারা উড়ে চলে যায়।

আর প্রত্যেক বসন্তঋতুতে শিকারিরাও আসেন সেখানে। পাহাড়ি মানুষরা তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছে। যারা যৌবনে গিলেমত পাখি শিকার করা শুরু করেছিলেন, তাঁরা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে তারা প্রতিবছরই এখানে শিকার করতে আসেন এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে—সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক আজও অম্লান—তাই প্রতিবছর সেই মিলনের আনন্দকে উপভোগ করতে তাঁরা এখানে আসেন।

কয়েক বছর আগের এক সন্ধেবেলার ঘটনা সেটা। তখন এপ্রিল মাসের শুরু। চারজন গিলেমত শিকারির তিনজন এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। একজন তখনও এসে পৌঁছোননি। তিনি হলেন মঁসিয়ে দ্য আরনেলস। এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে কোনো সংবাদ আসেনি। অন্য কোথাও শিকার করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না —সেটা তাঁরা বুঝতে পারছেন না—তবে মৃত্যু হলে তাঁরা নিশ্চয়ই সে সংবাদটা পেতেন। তাঁরা আরনেলস-এর জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তবু তখনও তাঁকে ফিরে আসতে না দেখে তাঁরা তিনজনে খেতে বসলেন।

এমন সময় হোটেলের মধ্যে একটা গাড়ি ঢোকার শব্দ শুনতে পেলেন। যিনি গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢুকলেন তিনি আরনেলস, সেই চতুর্থ শিকারিটি।

তিনি একটু ফ্রেশ হয়ে খেতে বসলেন আর খেলেনও খুব তৃপ্তি করে।

খুব ভোরে উঠবেন বলে তাঁরা খুব সকাল সকাল শুতে চলে গেলেন। ভোরবেলা শিকার করতে বেরোনোর মতো আনন্দজনক আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু সেই সময়টা ঠিক ভোর হয়নি—অন্ধকার অতটা ঘন না থাকলেও তখনও সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে অন্ধকার। নক্ষত্রগুলোর আলো কিছুটা কমে মাত্র। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে টুকরো টুকরো বালি-পাথরগুলো নড়তে থাকে। যথেষ্ট গরম পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকলেও ভোরের ঠান্ডা বাতাস শিকারিদের হাড় কাঁপিয়ে দেয় খুব সহজেই।

অভিযানে বেরিয়ে তাঁরা প্রথমে নদীর তীরে বেঁধে রাখা দুটি নৌকোর ওপর উঠে বসেন। তারপর দাঁড়িরা দড়ির বাঁধন খুলে নৌকো দুটিকে ঠেলে দেয়। নৌকো দুটি ক্যানভাস ছেঁড়ার শব্দের অনুকরণে টুকরো টুকরো পাথরের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে নদীর জলে গিয়ে পড়ে। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলে নৌকো দুটি। পালগুলো জোরালো বাতাস পেয়ে পতপত করে শব্দ করে। নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় নদীর অন্য পারের দিকে। তীরের কাছে বসে থাকে অসংখ্য গাংচিল। এর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে গিলেমত পাহাড়।

ঠিক পাহাড় নয়, পাহাড়ের চূড়ায় পাহাড়ের আকারে একটা ছোটো টিপি। টিপির গর্তগুলোর ভিতর থেকে পাখিগুলো তাদের মাথা উঁচু করে নৌকোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে। নৌকোর ওপর লোকজন দেখেও তারা সেখান থেকে উড়ে যায় না—কারণ তাদের সে সাহস হয় না। দেখলে মনে হবে অসংখ্য বোতল লাইন দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের পায়ের আকার খুব ছোটো। যখন তারা এক পা এক পা করে হেঁটে বেড়ায় সেই পাহাড়ের চূড়োয় মনে হয় এক্ষুণি বোধহয় তারা গড়িয়ে পড়ে যাবে নীচে। যখন তারা উড়তে শুরু করে তখন প্রথমেই তারা গতিশীল হয়ে উঠতে পারে না। ফলে অনেক সময় তারা নীচে গড়িয়ে পড়ে। এটাই যে তাদের দুর্বলতা সে-কথা তাদের অজানা নয়। আর এই অবস্থায় যে তাদের বিপদ ঘটতে পারে সে কথাও তারা বুঝতে পারে। পড়ে যাওয়ার পর উড়ে যাবে কি না সে বিষয়ে তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

তাদের ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে জেলে বা মাঝিরা চিৎকার শুরু করে দেয়। নৌকোর কাঠে ঠক ঠক করে শব্দ করে। পাখিগুলো ভয় পেয়ে ঢেউ-এর ওপর দিয়ে উড়তে থাকে, তারপর তাদের ডানা মেলে দিয়ে তিরগতিতে উড়ে যেতে থাকে সমুদ্রের দিকে। সেই সময়ে নৌকোর ওপর বসে উড়ন্ত পাখিগুলোকে লক্ষ করে গুলি করে শিকারিরা। প্রায়শ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। গুলি খেয়েই পাখিগুলো পড়ে যায় নদীর জলে—সঙ্গে সঙ্গে নৌকো নিয়ে ছুটে যায় পাখিগুলোকে জল থেকে তুলে আমার জন্য। পাখিগুলো জলের মধ্যে তলিয়ে যাবার আগেই তারা সেখানে পৌঁছে যায় আর মৃত বা অর্ধমৃত পাখিগুলোকে তুলে নেয় নৌকোর খোলের মধ্যে।

মেয়ে পাখিগুলো কিন্তু এত শব্দ বা চিৎকারে উড়ে যায় না। তারা বসে বসে ডিমে তা দেয়—তখন তাদের গুলি করে মারা খুব সহজ হয়। এইভাবে অসংখ্য মেয়ে গিলেমত মারা পড়ে। তাদের পালকগুলো লাল রক্তে ভিজে ওঠে।

প্রথম দিনে শিকারের সময় মঁসিয়ে দ্য আরনেলসের উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। সেই উৎসাহ নিয়ে তিনি ভোর থেকে শিকার করে বেড়ালেন। কিন্তু বেলা দশটা নাগাদ তিনি যখন শিকার করে ফিরে আসছিলেন—তখন তাঁকে যেন কেমন উদ্‌বিগ্ন মনে হল। তাঁর কাছে ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। তিনি যখন হোটেলে ফিরে এলেন, তখন হোটেলের একজন কালো পোশাক পরা বেয়ারা এসে তাঁকে খুব আস্তে আস্তে কিছু বলল। তার কথা শুনে তিনি কী যেন ভাবলেন। একটু অস্বস্তি বোধ করলেন, তারপর বললেন, আজ নয়, আগামীকাল।

যথারীতি আবার শিকার করতে বেরোলেন পরের দিন। কিন্তু সেইভাবে মনঃসংযোগ করতে পারলেন না। মাঝে মাঝে সঠিক লক্ষ বিদ্ধ করতে ব্যর্থ হলেন আরসেনল। এমনকি যেসব পাখি তাঁর বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ছিল তাদেরও তিনি গুলিবিদ্ধ করতে পারলেন না। বন্ধুরা তাঁর হাবভাব লক্ষ করে তাঁকে নিয়ে রসিকতা শুরু করলেন, তুমি কি নূতন করে প্রেম করতে শুরু করেছ? না বউ হারিয়ে গেছে খবর পেয়েছ? তিনি বললেন, দুশ্চিন্তার ব্যাপারই বটে—আমাকে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যেতে হবে। থাকবার কোনো উপায়ই নেই—এত খারাপ লাগছে, কী আর বলব!

বন্ধুরা সব হইহই করে উঠলেন, চলে যাবে বলছ কী, কেন, চলে যাবে কেন?

''জরুরি দরকার, যেতেই হবে এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।''

লাঞ্চ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সেই কালো পোশাক পরা বেয়ারাটি এসে হাজির হল। আরসেনল তাকে গাড়ির ব্যবস্থা করতে বললেন। বেয়ারাটি বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় তিন বন্ধু তাঁকে চলে না যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। তুমি এখানে দুদিন আছ—কিন্তু তেমন জরুরি ব্যাপারের কথা তো শুনিনি তোমার মুখ থেকে!

ব্যাপারটা নিয়ে তিনি বেশ চিন্তা আর অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি বেশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন—এক দিকে কর্তব্যের ডাক অন্য দিকে আনন্দের হাতছানি।

কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে ব্যাপারটা বলেই ফেললেন। আসল ব্যাপারটা হল—আমার জামাইও আমার সঙ্গে এসেছে।

সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, জামাই? সে কী? কোথায় সে?

আরসেনল বললেন, তোমরা জান না? সে মারা গেছে আর আস্তাবলে পড়ে আছে তার মৃতদেহটা।

সবাই তাঁর কথা শুনে বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বেদনাহত স্বরে আরসেনল বললেন, তার মৃত্যুটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখের। তার অন্ত্যেষ্টির জন্য মৃতদেহটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল বন্ধু তোমাদের সঙ্গে থেকে শিকারের নিয়মটা রক্ষা করে যাই। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন আমি ফিরে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

তখন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, কিন্তু সে তো মৃত—আরও দু-একদিন যদি সে আস্তাবলে কাটায়, তাতে তো তার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না।

তাঁর কথা শুনে আরও দুজন বললেন, ঠিকই তো, তাহলে তোমার থাকার অসুবিধাটা কোথায়?

তাদের কথা শুনে মনে হল তিনি বেশ স্বস্তি পেয়েছেন—তবুও যেন একটু বিব্রতভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সকলের কি সেই মত?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—তোমার জামাই এখন যেখানে পৌঁছে গেছে তাতে আর দু-চারদিনেও তার কোনো অসুবিধা হবে না।

তাদের কথা শুনে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর গভীর একটা শ্বাস ছেড়ে আরসেনল বললেন, তোমাদের কথাই রইল, তাহলে আমি পরশুদিন বা তার পরের দিনও যেতে পারি। তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

হটট ও তার পুত্র
Hautot And His Son

অর্ধেক খামারবাড়ি আর অর্ধেক বসতবাড়ির মতো দেখতে এই বাড়িটা। এখানে আগে ব্যারনরা বাস করতেন। এখন ধনী চাষি পরিবারের অধিকারে। বাড়ির সামনে যে আপেল গাছটা আছে সেখানে বাঁধা আছে কতকগুলো কুকুর। যখন তারা দেখল শিকারের জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে আসছে—শিকাররক্ষক ও কয়েকজন ছেলে তখন তারা ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

বড় রান্নাঘরটায় বসে স্ন্যাক্সের সঙ্গে এক গ্লাস করে মদ খেতে খেতে হটট, তার ছেলে, মঁসিয়ে বার্মত আর মঁসিয়ে মানডরু শিকারের গল্প করছিল।

শিকারের সীজন্-এর আজ প্রথম দিন। খাওয়া শেষ করেই তারা শিকারের জন্য বেরিয়ে পড়বে। হটট তার শিকারে দক্ষতার কথাগুলো বেশ গর্ব করেই বলছিল তার অতিথিদের কাছে। হটটের শরীরে বইছে নর্মান রক্ত। সে শক্তপোক্ত বলিষ্ঠ চেহারার একজন মানুয। তার গায়ে এত শক্তি যে সে একটা আপেলবোঝাই গাড়ি তার কাঁধে তুলে নিতে পারে। চাষি পরিবারে মানুষ হলেও সে ভদ্রলোক। সে তার ছেলেকে পড়াশুনা ছাড়িয়ে চাষের কাজে বহাল করেছে। সে চায় তার ছেলে একজন খাঁটি চাষি হয়ে উঠুক। তার ভয় ছিল, সে যদি লেখাপড়া শেখে তবে চাষবাসে তার মন বসবে না।

হটটের ছেলে সেসারও তার বাবার মতো লম্বা কিন্তু চেহারার গঠন তার বাবার মতো শক্তপোক্ত নয়। তার বাবাকে সে অসম্ভব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

বেঁটে আর মোটা চেহারার মঁসিয়ে বার্মত জিজ্ঞেস করলেন, খরগোশ পাওয়া যাবে তো?

হটট বলল্, হ্যাঁ, পুয়াসভিয়েরের খালগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরগোশ পাওয়া যাবে।

শিকারের আঁটো পোশাক পরা মোটাসোটা চেহারার মঁসিয়ে মানডরু বললেন, আমরা শিকারে বেরোব কখন?

হটট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওই নীচু জায়গাটা দেখছ—আমরা বেরোব ওখান থেকে। প্রথমে আমরা পাখিগুলোর পিছনে ধাওয়া করে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

বন্দুকগুলো ঠিকঠাক আছে কি না সেগুলো সকলে পরীক্ষা করে নিল। এর পর একজন চাকর ও কতকগুলো শিকারি কুকুর সঙ্গে নিয়ে তারা রওনা হয়ে গেল। খামারবাড়ি পার হয়ে তারা ঝোপ জঙ্গলে ঘেরা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

হটট একটা উড়ন্ত বুনো হাঁসের দিকে নিশানা করে বন্দুক ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে

সেটা পাক খেতে খেতে গিয়ে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে। হটট হাঁসটিকে সেখান থেকে নিয়ে আসার জন্য ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ঠিক সেই সময়ে ওরা আর একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল। মঁসিয়ে বার্মত খুশি হয়ে বলল, নিশ্চয় ওখানে খরগোশের দেখা পেয়েছে। মঁসিয়ে মানডরু চিৎকার করে বলল, কী হল হটট, তোমার শিকার খুঁজে পেলে?

কিন্তু ঝোপের ভিতর থেকে কারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সেসার হটটের চাকর যোশেফকে বলল, যাও যোশেফ, ঝোপের ভিতরটা একবার ভালো করে দেখে এসো, আমরা এখানে অপেক্ষা করছে।

যোশেফ খুব সতর্কভাবে ঝোপের মধ্যে ঢুকে সেখানে যে খাল ছিল সেই খালের জলে নেমেই চিৎকার করে উঠল—আপনারা শিগগির আসুন এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তার চিৎকার শুনে সবাই সেইখানে দৌড়ে গেল। দেখল, হটট তার তলপেটের নীচে দুহাত রেখে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। সে যেখানে পড়ে আছে—সেখানকার ঘাসগুলো রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম—সে গুলিভরা বন্দুকটা ফেলে রেখে খালের জলে নামছিল হাঁসটাকে তুলে আনার জন্যে। প্রথম গুলিতেই হাঁসটাকে মারতে পেরে তার এত আনন্দ হয়েছিল যে সে ভুলে গিয়েছিল বন্দুকটায় গুলি ভরা আছে। কিন্তু বন্দুকটা যখন সে তার সামনে ফেলে দিয়ে খালের জলে নেমে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল—তখন বন্দুকটা সশব্দে মাটিতে পড়ে যায় আর সেই ধাক্কাতে গুলি ছিটকে এসে তার তলপেটে বিদ্ধ হয়।

হটটকে সকলে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গেল। তারপর তলপেটে ভালো করে কাপড় পেঁচিয়ে ডাক্তারকে খবর দিল। বোঝা গেল গুলিটা তাকে বেশ ভালোমতো জখম করেছে। সেরে ওঠার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। সুতরাং হটটের যে মৃত্যু হবে একথা ভেবেই তারা পুরোহিতকে খবর দিল।

বাবার মৃত্যু আসন্ন—একথা ভেবে তার বিছানার পাশে বসে সেসার একভাবে কেঁদে চলল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ডাক্তার তাকে বলল, "এরকমভাবে কাঁদলে লোকে তোমায় খারাপ বলবে।"

ডাক্তার হটটের চিকিৎসা শুরু করলেন। ডাক্তার গুলি বের করে ওষুধপত্র লাগিয়ে ক্ষতস্থানটা ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। হটট চার দিকে একবার নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতি ক্ষীণ স্বরে বলল, "আমার মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে।"

ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কয়েক দিন বিশ্রাম নিলে আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

হটট বলল, "আমার সময় যে শেষ হয়ে এসেছে, সে-কথা আমি জানি। সেসারের সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই।"

সেসার তখন তার বাবার মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে হাউহাউ করে কেঁদে চলেছিল। হটট তখন ক্ষীণস্বরে হলেও অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলল, এখন কাঁদার সময় নয়। তোমাকে

আমি কতকগুলো কথা বলে যেতে চাই। এর পর সেই ঘরে উপস্থিত অন্যান্যদের উদ্দেশ্য বলল, "তোমরা এখন যাও।"

সকলে যখন ঘর ছেড়ে চলে গেল তখন হুটট বলল, শোনো সেসার, তুমি এখন একজন চব্বিশ বছরের যুবক। অনেক কিছুই তুমি এখন বুঝতে বা জানতে শিখেছ। এখন থেকে সাত বছর আগে তোমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তখন আমার বয়স ছিল সাঁইত্রিশ। তোমার কি মনে হয় সাঁইত্রিশ বছর [illegible]রও কী বিপত্নীক থাকা উচিত?

সেসার কিছুটা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, না

হুটট ভিতরে ভিতরে এত যন্ত্রণা অনুভব করছিল, সে কথা বলতে পারছিল না। তবু অতি কষ্টে সে আস্তে আস্তে বলল, ওই বয়সে কোনো মানুষের পক্ষে একা একা বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তার মৃত্যুর পর আমি আর কখনও বিয়ে করব না। আমি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আমি আর বিয়ে করিনি। আমার কথাগুলো বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধা হচ্ছে না।

সেসার বলল, না বাবা।

হুটট আবার বলতে শুরু করল, বুয়েন-এর ১৮, রু দ্য লেপারন্যান-এর তিনতলায় যে মেয়েটি বাস করে সে আমার রক্ষিতা। মেয়েটি খুব ভালো আর সে আমাকে প্রকৃতই ভালোবাসে। তার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে বলেই মনে করি। সুতরাং মৃত্যুর আগে সেই কর্তব্য পালন করে যেতে চাই। সে যে সত্যি একজন ভালো মেয়ে একথা তুমি বিশ্বাস করতে পার। তোমার মায়ের কথা ভেবে আর তোমার ভালোমন্দ চিন্তা করে আমি তাকে আমার বাড়িতে এনে তুলতে পারিনি। তাকে বিয়ে করে আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে সুখে সংসার করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। দলিলপত্র মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারগুলো সর্বদা মাথা থেকে সরিয়ে রাখবে। ওই পথ সর্বনাশের পথ। বুঝতে পারলে?

সেসার ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, বাবা।

হুটটের দম ফুরিয়ে আসছিল, তবু সে খুব কষ্ট করে বলতে থাকল, শোনো সেসার, আমি কোনো উইল করিনি বা উইল করার প্রয়োজন মনে করিনি। আমি জানি তোমার মনের মধ্যে কোনো জটিলতা নেই আর তোমার একটা বিশেষ গুণ আছে যে তুমি নির্লোভ। আমি ভেবে রেখেছিলাম মৃত্যুর সময় তোমাকে ওই মেয়েটির কথা বলে যাব। সেই সময় এখন আমার উপস্থিত। তাই বলছি আমার মৃত্যুর পর পারলে তাকে তুমি সাহায্য কোরো। ঠিকানাটা তোমাকে আগেই বলেছি। তার নাম হল ক্যারোলিন দোন্তে। দেখবে সে যেন অভাবে কষ্ট না পায়। তোমার জন্য প্রচুর অর্থ বিত্ত সম্পত্তি রেখে গেলাম। তাকে কিছু দিলে আমার আত্মা শান্তি পাবে। একমাত্র বৃহস্পতিবার সেখানে গেলে তার সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারে। সে কাজ করে খোরাসানিতে। তার ছুটির দিন হল বৃহস্পতিবার। ওই দিনটাতে প্রতি সপ্তাহে একবার করে তার কাছে যেতাম। গত ছ'বছর ধরে আমি তার কাছে যাতায়াত করছি। ওই দিনটা সে আমার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে। আমার মৃত্যুর খবর

পেলে সে খুব দুঃখ পাবে। এ ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে যেন আলোচনা কোরো না। এমনকি ফাদারএর সঙ্গেও না। কারণ এটা এমন কোনো নূতন ঘটনা নয়, এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। কেউ এ নিয়ে অত মাথা ঘামায় না। বুঝলে?

সেসার বিনীত স্বরে বলল, হ্যাঁ, বাবা।

আশা করি, তুমি আমার কথা রাখবে। তার কাছে গিয়ে জানতে চাইবে তার কী প্রয়োজন। যথাসম্ভব তার প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করবে। আমার কথা রাখবে—একথা তোমাকে শপথ করে বলতে হবে।

"হ্যাঁ, বাবা, নিশ্চয়ই।"

এবার আমাকে আলিঙ্গন কর। আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। এবার ওদের ভেতরে ডাকতে পার।

সেসার আজ পর্যন্ত বাবার কথা অমান্য করেনি। এখনও সে তা করল না। বাবাকে আলিঙ্গন করে ঘরের দরজা খুলে সকলকে আসতে বলল।

গির্জার পুরোহিত ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী হুটটের শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। হুটটের কথা বলার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। সে আর কোনো কথা বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তার ছেলে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য ও পুরোহিতের সামনে মাঝরাত্রি নাগাদ তার মৃত্যু হল। এর চার ঘণ্টা আগে থেকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছে সে।

যেদিন হুটট মারা যায় তার এক দিন পরে সকালের দিকে তাকে সমাহিত করা হয়। সেসার তার বাবার কবর দেবার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে এল তখন সে খুব ক্লান্ত। সারারাত সে একটুও ঘুমোতে পারল না। পরের দিন সকালটা অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে কেটে গেল।

সেদিন সন্ধেবেলা সে স্থির করল, বাবার শেষ ইচ্ছা এবং তার নিজের শপথের মর্যাদা দিতে সে যাবে রুয়েনে, যাবে ক্যারলিনের সঙ্গে দেখা করতে। তার ঠিকানাটা বারবার মনে মনে উচ্চারণ করতে করতে সে তার ঠিকানাটা মুখস্থ করে ফেলল।

রুয়েনে পৌঁছে সে প্রথমে তার পরিচিত এক হোটেলে উঠল। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে অনেক চেষ্টা করে বাড়িটা খুঁজে বের করল সেসার। তিনতলায় যে ঘরটায় তার বাবার রক্ষিতা থাকে সেই ঘরে ঢোকার আগে প্রচণ্ড এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল, এক অপরিসীম কুণ্ঠা তাকে এসে আচ্ছন্ন করল। সে ঘরে ঢোকার আগে ভীষণভাবে ইতস্তত করতে লাগল। তাদের মতো ধনী চাষি পরিবারের সন্তানরা যে আদর্শ ও শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠে—তাদের নিশ্চিত ধারণা গড়ে ওঠে যে এই শ্রেণির রক্ষিতারা কখনও ভালো হতে পারে না। তাদের নাম কানে এলেই কেমন যেন এক ঘৃণায় সমস্ত মনটা কুঁকড়ে ওঠে। এছাড়া তার বাবার রক্ষিতা হিসাবে ক্যারোলিন দোনেতের মুখোমুখি হতে সে ভীষণ লজ্জা ও সংকোচের মধ্যে পড়ে গেল।

বেল বাজাতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সেসারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চুপ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল এক সুন্দরী তরুণী। তার নীরব জিজ্ঞাসার উত্তরে সেসার যে কী করবে তা ঠিক করে উঠতে পারল না।

তখন সে-ই জিজ্ঞাসা করল, আপনার কী প্রয়োজন, বলুন।

সেসার বলল, হটট আমার বাবা। তিনি আপনাকে কয়েকটা কথা বলার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

এর পর সেসার তার পিছন পিছন তার ঘরে ঢুকলে ক্যারোলিন তাকে একটা চেয়ার দিল বসার জন্য। সে চুপ করে বসে বসে ঘরের চারদিকটা তাকিয়ে দেখতে লাগল। দেখল দেয়ালে তার বাবার ছবি টাঙানো আছে। ঘরের মাঝখানের টেবিলটা পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে। রান্না চাপানো হয়েছিল স্টোভে। সম্ভবত দোনেত তার বাবার আসার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। বিছানার ওপর বসে চার-পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা খেলা করছিল।

দোনেতই প্রথমে কথা বলল, "হ্যাঁ, মঁসিয়ে সেসার, আপনার যদি কিছু বলার থাকে, আপনি বলতে পারেন।"

সেসার আর তার বাবার মৃত্যুসংবাদটা চেপে রাখার প্রয়োজন বোধ করল না। সে বলল, "গত রবিবার মধ্যরাত্রিতে একটা দুর্ঘটনায় আমার বাবা, হটটের মৃত্যু হয়েছে।"

খবরটা শুনেই ক্যারলের সমস্ত মুখটা ছাই-এর মতো ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তারপর সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "কীভাবে হল, কেমন করে হল?"

তার মাকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে বাচ্চাটা তার খেলা ফেলে ছুটে এল তার মায়ের কাছে আর তার মায়ের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। আমিই তার মায়ের কান্নার কারণ, সেটা বুঝে আমাকে তার ছোটো ছোটো হাত দিয়ে মারতে শুরু করল। ওদের ওইভাবে কাঁদতে দেখে আমারও চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। সেসার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে বাচ্চাটা ক্যারলের সন্তান। সেসার আবার বলল, দুর্ঘটনাটা ঘটেছে রবিবার সকাল আটটায়।

দুর্ঘটনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ খুলে বলল সেসার। এর পর তার বাবার মৃত্যুর সময় কী কী বলে গেছে সে সমস্ত বলতে ভুলল না।

কথাগুলো শুনে দোনেত খুব আনন্দ পেল। বাবার শেষ ইচ্ছার মর্যাদা দিতে তিনি যা যা বলে গেছেন সবকিছুই করতে আমি প্রস্তুত। আপনি যাতে অভাবগ্রস্ত হয়ে কোনোরকম কষ্ট না পান আমি সে ব্যবস্থা করার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

দোনেত বলল, "এখন এসব কথা থাক। অন্য সময়ে এ বিষয়ে কথা বলব। আমার নিজের কিছু প্রয়োজন হবে না। ছেলেটাকে মানুষ করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন হবে সেটুকুই, তার বেশি কিছু নয়।"

সেসার বলল, "এই ছেলেটি কে?"

দোনেত বলল, "এ তাঁরই সন্তান।"

সেসার যাওয়ার জন্য তৈরি হলে দোনেত জোর করল তাকে কিছু খেয়ে যাবার জন্য।

সেসার খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, "আবার কবে আসব?"

দোনেত বলল, "আগামী বৃহস্পতিবার। এখানেই লাঞ্চ করবে।"

এখন সময় কাটানো তার পক্ষে খুব মুশকিল হয়ে উঠেছে। তার বাবা যখন বেঁচে ছিল। তখন বাবার নির্দেশমতো বাবার সঙ্গে কাজ করতে করতে তার সময় যে কোন্‌দিক দিয়ে বেরিয়ে যেত সে বুঝতে পারত না। অভ্যাস অনুযায়ী সেসার প্রতিদিন মাঠে যায়। সে যখন একা থাকত তখন তার মনে হত, টুপি মাথায় দিয়ে বাবা এই বুঝি এসে পড়ল।

দোনেতের কথাও সে ভুলতে পারল না। মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়তে লাগল। তার বাবা দোনেত সম্বন্ধে যা বলেছিল, সত্যিই দোনেত সেই ধরনেরই মেয়ে। সেসার বুঝতে পেরেছে, তার বাবার প্রতি দোনেতের ভালোবাসা ছিল একেবারে অকৃত্রিম। বাবার এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে সে সত্যিই ভীষণ আঘাত পেয়েছে।

দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। বৃহস্পতিবার সকালবেলায় রুয়েনে রওনা দিল সেসার। দোনেতের ঘরে গিয়ে দেখল, খাবার টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দোনেত তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। তার মনে হল এই সপ্তাহের মধ্যে দোনেতের চেহারাটা অনেকটাই ভেঙে গেছে।

সেসার কী করবে না করবে আগেই ভেবে ঠিক করে এসেছে। সে বলল, "আমি প্রতিবছর এমিলের জন্য দুহাজার ফ্রাঁ দেব।"

দোনেত বলল, "দেখুন, এত টাকার দরকার নেই এমিলের জন্য। আমি একটা চাকরি করি। ছেলেটার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু দিলেই চলবে।"

কিন্তু সেসার তার কোনো কথাই শুনতে চাইল না। সে দোনেতকে ওই টাকা দিতে বদ্ধপরিকর, এছাড়াও আরও এক হাজার ফ্রাঁ দিল শোক পালনের জন্য।

দোনেতের সঙ্গে কথা বলে, তার সাহচর্য পেয়ে সেসারের মনটা ভালো হয়ে গিয়েছিল। দুঃখের মাঝেও এক পরম সান্ত্বনা। খাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল, "ধূমপানের অভ্যাস আছে তোমার?"

"হ্যাঁ, কিন্তু পাইপটা আনতে ভুলে গেছি।" দোনেত তখন হটট যে পাইপটায় ধূমপান করত, সেটা এনে দিল।

সেসার এমিলের সঙ্গে খেলা করতে করতে সেই পাইপটায় তামাক ভরে নিয়ে কিছুক্ষণ ধূমপান করল। তারপরে, ইচ্ছা না থাকলেও সেখান থেকে উঠে পড়ল সেসার।

দোনেত জিজ্ঞেস করল, "আবার কবে আসছ?"

"আপনি বললেই আসব।"

"নিশ্চয়ই তুমি আসবে। আগামী বৃহস্পতিবার এসো। আর এখানেই লাঞ্চ করবে।"

সেসার বলল, নিশ্চয়ই আসব, ম্যাদময়জেল, এর পর প্রফুল্ল মন নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল সেসার।

ঘণ্টা
The Bell

ছেলেবেলা থেকে সে দুঃখকষ্টের মধে বড়ো হয়ে উঠেছে। কে যে তার বাবা মা, কোথায় যে তার বাড়ি, সে তার কিছুই জানত না। সে শুনেছে—তার মা তাকে জন্মের পরেই একটা খালের ধারে ফেলে রেখে চলে যায়। গির্জার এক ফাদার তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে সেখান থেকে তুলে এনে মানুষ করেন। সে ফাদারের আশ্রয়ে থেকে তাঁর অনেক কাজ করে দিত। এইভাবে তার বেশ কয়েক বছর কেটে যায়।

কিন্তু সে যখন পনেরো বছরের এক কিশোর তখন তার একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সে যখন এক দিন রাস্তা পার হচ্ছিল, তখন তাকে একটা গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায়। তাতে তার পা-দুটো কাটা পড়ে। ফাদার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তার প্রাণ বাঁচান। কিন্তু তার পা-দুটো চলে যাওয়ার জন্য সে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং জীবিকার্জনের জন্য ভিক্ষা করা ছাড়া তার আর কোনো পথ খোলা রইল না।

মাঝে মাঝে ব্যারনের স্ত্রী দাভেরি তাকে খাবার দিতেন। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তাকে খামারবাড়ির কোনো একটা গরম জায়গায় তার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। সারাদিন ভিক্ষে করেও যেদিন সে কিছু জোটাতে পারত না, ব্যারনের স্ত্রী সেদিন তাকে খাবার দিতেন। কিন্তু সেই মমতাময়ী নারীটি পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে সে প্রতিমুহূর্তে তাঁর অভাব অনুভব করে।

দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হয়। এইভাবে চলতে চলতে তার হাত দুটো বেশি লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে সে ভিক্ষে করে বেড়ায় এইভাবে। কেউ তাকে কোনো দিন এই কারভিল গ্রাম ছেড়ে অন্য কোনো গ্রামে ভিক্ষে করতে যেতে দেখেনি। কারণ পা-দুটো কাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভালো করে কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু কাজ করার ক্ষমতা না থাকলেও, ক্ষিদের আগুনে তার উদরের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি যেন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে। সে আগুন যেন সর্বদা দাউদাউ করে জ্বলে চলেছে। সে আগুন কখনও একমুহূর্তের জন্যও শান্ত হয় না। আর তাকে শান্ত করার জন্য তাকে দুঃসহ অপমান আর কষ্ট সহ্য করেও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়াতে হয়। সে ভিক্ষে করতে করতে মাঝে মাঝে যখন গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে আসে, তখন আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ওদিকে দূরে বহু দূরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে—মাঠের পারে যে গ্রাম আছে, সেখানে চলে যেতে পারলে ভালো হত। কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছা হয় না। কারণ মাঠের ওপারে কোনো গ্রাম আছে কি না সে জানে না।

সুতরাং আবার তাকে গাঁয়ের মধ্যেই ফিরে আসতে হয়। মাঠের পাশ দিয়ে যখন

সে ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে থাকে, তখন চাষিরা তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে বলে, ওই দেখ রে ঘণ্টা আসছে। ও যখন ক্রাচ বগলে ঠকঠক শব্দ করতে করতে চলে যেত, তখন ঘণ্টার মতো শব্দ হত বলে সকলে ঠাট্টা করে তার নাম দিয়েছিল ঘণ্টা। চাষিরা তাকে ডেকে বলে, কী রে ঘণ্টা, একই গ্রামে পড়ে আছিস, রোজ রোজ কি একই বাড়িতে ভিক্ষে পাওয়া যায়? অন্য গাঁয়ে যেতে পারিস না?

কোনো বাড়িতে তাকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে আসতে দেখলেই বাড়ির মেয়েরা বলে ওঠে, "তোকে রোজ রোজ ভিক্ষে দিতে হবে, এমন কোনো দাসখত লিখে দিয়েছি নাকি?"

গ্রামের এত লোকের মধ্যে বাস করেও তার সঙ্গে কারও আন্তরিকতা ছিল না। তার ওপর কারও সহানুভূতি থাকা তো দূরের কথা—মনে হত কেউ যেন তাকে চেনে না, সে যেন তাদের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত জীব।

একবার এমন অবস্থা হল পর পর দুদিন ঘণ্টার কোথাও ভিক্ষে জুটল না। সুতরাং সেই দুদিন সে পুরোপুরি অভুক্ত রইল। ভিক্ষের আশায় কাঁধে ঝুলি নিয়ে সমস্ত গাঁয়ের দরজায় দরজায় সে ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোথাও দু-মুঠো খাবার পেল না সে। দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে, বাড়ির মেয়েপুরুষ তাকে দুকথা শুনিয়ে দেয়, বলে, রোজ রোজ এসে ভিক্ষে চাইলে কি ভিক্ষে পাওয়া যায়? দেখছিস তো আমরা গাঁয়ের মানুষ—রোজগারপাতিও আমাদের কম। তোকে খাওয়াতে গেলে আমাদেরই তো খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

তবু খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একটার পর একটা বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় সামান্য কিছুও যদি পাওয়া যায়—এই আশায়।

নভেম্বর শেষ হয়ে ডিসেম্বর শুরু হয়েছে। কনকনে ঠান্ডায় সব কিছু জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন হাড় হিম করা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যায় তখন মনে হয় করাত কেটে কেটে বসে যাচ্ছে হাড়ের মধ্যে। তা ছাড়া সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। সমস্ত আকাশ ঢেকে গেছে কালো মেঘে। মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মাদাম আভেরি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন ভিক্ষে না পেলেও তিনি তার খাবার ব্যবস্থা করে দিতেন। শোয়ার ব্যবস্থা করতেন খামারবাড়ির কোনো গরম ঘরে। তিনি এখন নেই বলে অনেক রাত্রে লুকিয়ে অপরের খামারবাড়ির আস্তাবলের খড়ের গাদার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে। সে ভাবল শোয়ার ব্যবস্থা না হয় হল, কিন্তু খাবে কী? খিদেতে যে পেটে আগুন জ্বলছে।

বৃষ্টিতে রাস্তায় কাদা জমে যাওয়াতে ক্রাচ দুটো বসে যাচ্ছিল কাদায়। সুতরাং চলতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। খিদের চোটে তার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছিল। গ্রামের সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন গ্রামের শেষ প্রান্তে মঁসিয়ে চিকেতের খামারবাড়ির এক দিকে গিয়ে বসে পড়ল। ক্রাচদুটো কাছেই ফেলে রেখে দিল। ঘণ্টা বুঝতে পারল এখানে বসে থেকে কোনো লাভ হবে না। তবু ও

স্থির করল ও ওখানেই বসে থাকবে, কারণ ওর যাওয়ার আর শক্তি নেই। বাস্তবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যখন মানুষ সমস্ত স্থানে অপমানিত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত ও ব্যর্থ হয়ে অলৌকিক কোনো শক্তির সাহায্যের শূন্য আশায় বুক বেঁধে নিজেকে ভাগ্যের হাতে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে চুপ করে বসে থাকে। যদিও জানে এ মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও ভাবে যদি অপ্রত্যাশিতভাবে অঘটন কিছু ঘটে যায় এবং কোনো মানুষ উপলক্ষ্য হয়ে সেই আশার হাত ধরে তার কাছে এসে উপস্থিত হয়।

ঘণ্টার হঠাৎ নজরে পড়ল অনেকগুলো মুরগির ছানা মাঠের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে। পাশের গোবরের গাদা থেকে গুবরে পোকা খুঁজে খুঁজে বের করে সেগুলোকে খাচ্ছে। তার মনে হল একভাবে সে খিদের জ্বালা মেটাতে পারে। একটা মুরগির ছানাকে মারতে পারলে সেটাকে আগুনে কোনোরকমে ঝলসিয়ে নিতে পারলে তার পেটের খিদের আগুন একটু শান্ত হতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে সঙ্গে সঙ্গে পাশে পড়ে থাকা ইঁটের একটা বড়ো টুকরো তুলে নিয়ে একটা ছানাকে লক্ষ করে জোরে ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে ছানাটা ঘুরে পড়েই মরে গেল। অন্য ছানাগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। ছানাটা কুড়িয়ে আনার জন্য সবে সে উঠে দাঁড়িয়েছে—এমন সময় চিকেত তাকে এসে ধরে ফেলল। সে তাকে ইঁটের টুকরোটা ছুঁড়ে মারতে দেখেছে।

তারপর শুরু হল চোরের মার। শুধু চিকেত নয়, খামারবাড়ির অন্যান্য কাজের লোক এবং গ্রামের আরও অনেকে এসে তাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলল, লাথির পর লাথি, চড়ের পর চড় আর ঘুসির পর ঘুসি পড়তে লাগল তার গালে, বুকে, পিঠে, শরীরের সমস্ত জায়গায়। প্রচণ্ড মারের চোটে ঘণ্টা আর বসে থাকতে পারল না। সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। পর পর দুদিন না খেয়ে এমনিতে তার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না, তার ওপর এইরকম বেধড়ক মার।

এর পরেও চিকেত থেমে থাকেনি। সে থানায় খবর দিল। পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। তার কথা বলার ক্ষমতাই ছিল না বলে পুলিশের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারল না ঘণ্টা। পুলিশ জানতেই পারেনি সে দুদিন সম্পূর্ণ অনাহারে আছে। পুলিশ ভাবল ইচ্ছা করেই সে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না। সুতরাং তারা তাকে বেধড়ক পেটাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাকে হাজতে দেওয়া হল। কিন্তু সেখানেও তাকে অনাহারে কাটাতে হল কারণ তারাও তাকে কিছুই খেতে দিল না।

পরদিন হাজত-ঘরের দরজা খুলে পুলিশ যখন ঘণ্টার খবর নিতে গেল তখন দেখল ঘণ্টা হাজত-ঘরের মেঝেতে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।

সারমেয় সঙ্গী
The Man With The Dogs

বাড়িতে তার সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে তার স্ত্রী বিস্তদ নামে ডাকত। কিন্তু থিয়বেশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যত মানুষ বাস করত, তারা তার নাম দিয়েছিল সারমেয় সঙ্গী। কারণ সর্বদাই তাকে চার-পাঁচটা ভয়ংকর হিংস্র ধরনের কুকুর সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতে দেখা যেত। এলাকার লোকজন তার প্রতি ছিল ভীষণভাবে বিরূপ। সেখানে এমন কোনো লোক ছিল না, যে তাকে ঘৃণা না করত।

অবশ্য বিস্তদকে এমন কুনজরে দেখার পিছনে কারণ ছিল। এই শহরের অধিকাংশ লোক স্মাগলিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। মফস্‌সল শহরে প্রাকৃতিক পরিবেশ সাধারণত যেমন হয়ে থাকে, চারিদিকে গাছপালা, ঝোপঝাড় জঙ্গল, এখানেও সেইরকম প্রচুর ঝোপ, গাছপালা আর জঙ্গল। এখানে এমন কিছু সরু সরু গলি আছে যেগুলো দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। এই সমস্ত গাছপালা, ঝোপ জঙ্গল আর অন্ধকার গলিগুলো দিয়ে চোরাই মাল পাচার হয়। আর এই সমস্ত কাজের প্রধান সহায়ক হল এক ধরনের হিংস্র কুকুর। এ ব্যাপারে কুকুরগুলোকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নেওয়া হত। আর এদের শরীরের সঙ্গে চোরাই মালপত্র বেঁধে দিয়ে এদের বিশেষ বিশেষ জায়গায় চালান করে দেওয়া হত। পুলিশ বা শুল্ক বিভাগের লোকেরা যখন তাদের ধরার চেষ্টা করত তখন তারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলত।

এই সব হিংস্র শিকারি কুকুরদের মোকাবিলা করার জন্য বিস্তদকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শুল্ক অফিস থেকে। সেজন্য বিস্তদকেও অনেকগুলো হিংস্র জাতের শিকারি কুকুর পুষতে হয়েছিল। সেই কুকুরগুলোকে সে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছিল—চোরাই মাল চালানকারী কুকুরগুলোকে দেখতে পেলেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের গলার নলিগুলো কামড়ে ছিঁড়ে ফেলত। এই কাজে বিস্তদ ছিল একমাত্র নির্ভরযোগ্য লোক।

সেই কারণে বিস্তদকে চোরাচালানকারীর দল তাদের শত্রু মনে করত আর সেই জন্য তারা তার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। বিস্তদ কখনও একা একা চলাফেরা করত না। অন্তত তার দুপাশে ভয়ংকর ধরনের দুটো হিংস্র কুকুরকে নিয়ে চলাফেরা করত।

তবে বিস্তদের চেহারাটা ছিল অত্যন্ত কুৎসিত। তার ঝাঁকড়া চুলের গোছা ছিল লাল-হলুদে মেশানো। ভ্রূ দুটো ছিল ঘন লোমে ভরতি। একমুখ দাড়িতে তার মুখের সবটাই প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। চোখ দুটো শয়তানের মতো কেমন যেন কুটিল ছিল। সে তার কুতকুতে চোখ দুটো দিয়ে কারও দিকে তাকালে ভয় আর অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যেত সে। শরীরের গঠন ছিল রোগাটে আর কেমন যেন অস্বাভাবিক

গোছের। কিন্তু তার স্ত্রী ছিল যথেষ্ট সুন্দরী। বিস্তদ তার বাড়ির কাছে একটা দোকান করেছিল। সেই দোকানটা দেখাশোনা করত তার স্ত্রী। দোকানের অধিকাংশ খরিদ্দার ছিল শুল্ক বিভাগের অফিসাররা।

এই এলাকার লোকে মনে করত বিস্তদ শুল্ক বিভাগের অফিসারদের ভোগের জন্য তার বউকে রেখেছে। শুল্ক অফিসাররাও বুঝতে পারত না এমন সুন্দরী একটি মেয়ে কী করে বিস্তদের মতো হতকুচ্ছিত একজন লোককে স্বামী হিসাবে মেনে নিয়েছে। বিস্তদের শরীরের কুকুরে গন্ধ নিয়ে কীভাবে তার বউ তার সঙ্গে সহবাস করে? এই সব ব্যাপারগুলো অফিসারদের বড়ো ধন্দের মধ্যে ফেলে দিত।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। অনেক তত্ত্বতল্লাশের পর তারা যখন রহস্যের কিনারা করতে পারল, তখন তারা বুঝতে পারল—কেন ওই কুৎসিত লোকটার সঙ্গে ওইরকম সুন্দরী একটি মেয়ে স্বামী হিসাবে তার সেবা যত্ন করে চলেছে। ঘটনাটা কয়েক বছর আগের। একবার বিস্তদ আবিষ্কার করল কোনো একটি যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রী অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। এক দিন সে সেই যুবক আর তার স্ত্রীকে অলিঙ্গনরত অবস্থায় গভীর আবেগে চুম্বন করতে দেখে। সে যে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে, সেটা ওদের কাউকে জানতে বা বুঝতে দেয়নি। তারপর তার স্ত্রী যখন বাড়ি ফিরে এল, সে তখন তাকে বলল, তুমি নিশ্চয়ই চাওনা এই কুকুরগুলো তোমার নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে বের করে আনুক। আর তা যদি না চাও, তাহলে আমি যা বলছি, তাই কর, আমার সামনে এক্ষুণি হাঁটু গেড়ে বোসো।

তার স্ত্রী যখন তার নির্দেশমতো হাঁটু মুড়ে বসল, তখন বিস্তদ তাকে চাবুক মারতে লাগল নির্দয়ভাবে। পোশাক ভেদ করে চাবুকের আঘাত গায়ে কেটে কেটে বসে যেতে লাগল। রক্তে ভিজে গেল তার সমস্ত পোশাক। এত আঘাত, এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও বিস্তদের বউ-এর মুখ থেকে টুঁ শব্দটি বেরোল না। বিস্তদ বলল, সাবধান, মুখ থেকে যেন একটাও শব্দ না বেরোয়। মারতে মারতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন সে থামল।

তার স্ত্রী কারও কাছে একথা প্রকাশ করেনি। সেই ঘটনার পর থেকে তার স্ত্রী বিশ্বাসভঙ্গ করার সাহস পায়নি। সে বিস্তদের কাছে তার কুকুরগুলোর মতোই বিশ্বস্ত ছিল। কিন্তু এই নির্মম আঘাত আর চূড়ান্ত অপমান মুখ বুজে সহ্য করলেও সে ভিতরে ভিতরে প্রতিশোধ নেবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং সেজন্য সে সুযোগের অপেক্ষা করছিল।

অনেক দিন অপেক্ষা করার পর—শেষ পর্যন্ত একটা সুযোগ এসে গেল। শুল্ক অফিসে একজন নূতন বিগ্রেডিয়ার এসে কাজে যোগ দিল। সেই ব্রিগেডিয়ারের প্রেমে পড়ে গেল বিস্তদের স্ত্রী। কয়েক দিন আগে এই ব্রিগেডিয়ারের কাছে বিস্তদ তার কুকুরদের থেকে চারটে কুকুর বিক্রি করে দিয়েছিল। এর মধ্যে এক দিন যখন বিস্তদের স্ত্রী তার দোকানে কাজ করছিল, তখন সেখানে কেউ ছিল না। ব্রিগেডিয়ার কী যেন কিনতে এসেছিল সেই দোকানে। বিস্তদের স্ত্রী তাকে বলল, আমাকে যদি সত্যিই

ভালোবাস আর আমাকে যদি পেতে চাও তাহলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার যথারীতি জানতে চাইল, তাকে কী করতে হবে।

বিস্তদের স্ত্রী বলল, আমার স্বামী আমার ওপর ভয়ংকর অত্যাচার করে। আমি তার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। তোমাকে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে হবে।

এর পর সমস্ত ঘটনাটা সে ব্রিগেডিয়ারকে জানায়। তার কথায় রাজি হয়ে অফিসার সেই রাতেই বিস্তদের কাছ থেকে যে চারটে কুকুর কিনেছিল, সেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। বিস্তদের স্ত্রী-ই ব্রিগেডিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

সে বিস্তদকে বলল, "আজেবাজে কুকুর বিক্রি করে তুমি আমাকে ঠকিয়েছ।"

বিস্তদ বলল, "কী বলতে চাইছ অফিসার? তোমার কথার মানেটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না?"

অফিসার বলল, "মানে কিছুই নয়। যে কুকুরগুলো তুমি আমাকে দিয়েছ—ওদের কোনো ক্ষমতাই নেই। তারা চোরাই মাল পাচারকারী কুকুরদের কখনই মোকাবিলা করতে পারবে না। তা ছাড়া তোমার ঘাতক কুকুর 'বুড়ো'-র কাছে এরা দাঁড়াতেই পারবে না।"

এর পর বিস্তদের স্ত্রী চোখের ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে, ব্রিগেডিয়ার তার চারটে কুকুরকে নির্দেশ দিল আর সঙ্গে সঙ্গে চারটে কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিস্তদের দেহরক্ষী ঘাতক কুকুরটার ওপর।

ওই কুকুরটার সঙ্গে ব্রিগেডিয়ারের কুকুরগুলোর ভয়ংকর লড়াই হল। তাতে বিস্তদের কুকুরটা মারা গেল আর অফিসারের কুকুরগুলো ভীষণভাবে আহত হল।

এর পর বিস্তদকে দেখিয়ে দেখিয়ে অফিসার আর বিস্তদের স্ত্রী আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুম্বন করতে লাগল।

তার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় বিস্তদ হতভম্ব হয়ে গেল। এর পর সে বিফল ক্রোধে দিশাহারা হয়ে বলল, "এর শাস্তি তোমাদের পেতে হবে।"

বিস্তদের স্ত্রী অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এভাবে ওর ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। ওদিকের ঘরে যে আরও পাঁচটা ভয়ংকর কুকুর চেনে বাঁধা আছে, সেগুলোকে গুলি করে মারতে হবে। নাহলে ওরাই আমার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে আর বিস্তদ সে কাজটা ওদের দিয়ে বেশ ভালোভাবেই করাবে।"

তার কথামতো অফিসার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘরে গিয়ে চেনে বাঁধা পাঁচটা কুকুরকে গুলি করে মারল। বিস্তদ যে চারটে কুকুরকে ব্রিগেডিয়ারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল তাদের মধ্যে যে দুটো কুকুরের বিশেষ আঘাত লাগেনি—তারা বিস্তদকে চিনতে পারল। তারা এখন নূতন প্রভুর খাদ্যে প্রতিপালিত হলেও বিস্তদ যে তাদের লালনপালন করে বড়ো করে তুলেছে, সে-কথা তাদের মনে পড়ে গেল। তারা বিস্তদের পায়ের কাছে এসে তার পা চাটতে লাগল, মনে হল তারা তাদের কৃত

অপরাধের জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইছে। বিস্তদ বুঝতে পারল এবার ওরা ওদের পুরোনো মনিবকে চিনতে পেরেছে। এর পর বিস্তদ ওদের নির্দেশ দিল তার স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলার নলিটা ছিঁড়ে আনার জন্য।

অফিসার কুকুরগুলোকে মেরে যখন সেই ঘরে ফিরে এল, দেখল তার প্রেমিকার গলাকাটা মৃতদেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে আর মেঝের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। এই দৃশ্যে ব্রিগেডিয়ার ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল, সে অত্যন্ত বিষণ্নভাবে কুকুর দুটোকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরে পুলিশ এসে দুজনকে ধরে নিয়ে গেল। বিস্তদের অপরাধের কার্যকারণ বিচার করে তাকে আদালত বেকসুর খালাস দিল আর অফিসারকে তার অবৈধ প্রেম আর কুকুরগুলোকে হত্যা করার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। এই ঘটনার পর থেকে বিস্তদ কাস্টমস অফিসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে চোরাই মাল পাচারের কুকুরের ব্যবসায় সে নেমে পড়েছে। এই কাজে বিস্তদ খুব নাম করেছে। পুরোনো কথা মনে করে বিস্তদ মাঝে মাঝে রাগে ফুঁসে উঠে বলে, ব্যাভিচারে লিপ্ত নারীদের কীভাবে শিক্ষা দিতে হয়, তা আমার থেকে আর কেউ ভালো জানে না। যেদিন দেখলাম, আমার চোখের সামনে সেই বেশ্যাটার গলার নলিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে কুকুর দুটো তার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো টেনে বের করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল—সেদিন যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম, তা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না।

শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর
The Accent

ভেঙে পড়া পুরোনো ধাঁচে তৈরি বাড়িটাকে দেখলে মনে হয় বিষণ্ণ মনে অনেক ব্যর্থতার স্মৃতি বহন করে দিনাতিপাত করে চলেছে। প্রতিটি ভাঙা ইঁটের খাঁজে খাঁজে যেন লুকিয়ে আছে দৈন্য, অনটন, মৃত্যু আর চরম অবহেলা। বাড়িটার চারিপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পাইন গাছ আর আঙুরলতার ঝোপ। ওইসব গাছের পাতাগুলো যখন হাওয়ার আঘাতে শনশন শব্দ করে, সেই শব্দের মধ্য দিয়ে শোনা যায় তাদের হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস। ওই বাড়ি থেকে সমুদ্র খুব বেশি দূরে নয় বলে ছাদ থেকে সমুদ্রকে দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায় ঢেউয়ের গর্জন।

বাড়ির বাইরের করুণ দৈন্যদশাও যেন জোর করে ঢুকে পড়েছে বাড়ির অন্দর-মহলে। বড়ো বড়ো ঘরগুলোতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ভাঙা টেবিল চেয়ারের পায়া, কাঠ, জরির কাজ করা মখমলের টুকরো। প্রত্যেকটি ঘরের দেয়ালে এখনও পেরেকগুলো পোঁতা আছে। সেগুলোর ওপর মরচে পড়তে ডগাগুলো ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওই সব পেরেকে এক সময় টাঙানো থাকত পূর্বপুরুষদের বড়ো বড়ো তৈলচিত্র। সেই সমস্ত ছবির সবগুলোই এক এক করে বিক্রি হয়ে গেছে পাওনাদারদের দেনা মেটাতে। বৈঠকখানাটার অবস্থা তথৈবচ। সমস্ত ঘরটার মধ্যে জমা হয়ে আছে কয়েক পলেস্তারা ধুলো আর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ভাঙা আসবাবপত্রের টুকরো। ঘরের এক কোণে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটা আধ ভাঙা পিয়ানো।

প্রাসাদের মতো বিরাট এই বাড়িটায় বর্তমানের বাসিন্দা এক সময়ের সেরা সুন্দরী মাদাম দ্য মারিলাক। তাঁকে দেখে মনে হয় একটি পুতুল বহুবার বহুভাবে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহারকারী শেষ পর্যন্ত সেটাকে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। বছরের অধিকাংশ সময়ই তিনি এই ভাঙা বাড়ির অন্দরমহলে বাস করেন। সঙ্গে থাকে তাঁর আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে।

তাঁর স্বামী মঁসিয়ে মারিলাকের জীবদ্দশায় তাঁরা প্যারিসের বাড়িতেই থাকতেন। অতুল বিত্তবৈভব আর বিলাসব্যসনের মধ্যে তাঁরা তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ দিনগুলো উৎসব আর আনন্দ কোলাহলের মধ্যে কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু লাগামছাড়া অপচয়ের কারণে সেই সমস্ত বিত্তবৈভব ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসতে থাকে। একে একে অনেক সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় সমস্ত সঞ্চিত অর্থ। শেষ পর্যন্ত পাওনাদারদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পান।

মঁসিয়ে মারিলাকের মৃত্যুতে সবকিছুই শেষ হয়ে যেত। মাদাম মারিলাককে

কপর্দকশূন্য অবস্থায় ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হত। কিন্তু অনেক চেষ্টায় একজন সহৃদয় উকিল ভদ্রলোককে ধরে গ্রামের বাড়িটা আর এমন কিছু সম্পত্তি রক্ষা করতে সক্ষম হন যার আয়ে তাঁদের সমস্ত বছর কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়।

প্রতিবছর বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি যখন সেজে উঠত ফুলের অলঙ্কারে, গাছে গাছে কুঁড়িগুলো প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করত, মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনিকে সঙ্গী করে বাতাস উপহার দিত গানের ডালি, জানা অজানা ফুলের গন্ধে নবপ্রেমের উন্মেষ ঘটত তরুণ-তরুণীদের জীবনে, তখন মাদাম মারিলাক মেয়েকে নিয়ে চলে যেতেন প্যারিসে। দুর্দিনের জন্য সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু খরচও করতেন। তিনি আশা করতেন কোনো বড়ো ঘরের সন্তান তাঁর মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যাবে। চাই কী তাঁর নিজেরও একটা হিল্লে হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ তাঁর শরীর থেকে এখনও যৌবনের লাবণ্য সম্পূর্ণ ঝরে যায়নি। প্যারিসের মতো শহরে অবিবাহিত কোনো ধনী ব্যক্তি বা মৃতদারকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না।

বসন্তের আর্বিভাবে যখন দিনগুলো রঙিন হয়ে উঠত তখন মাদাম মারিলাক প্যারিসে এসে যথাসাধ্য বিলাসব্যসনের মধ্যে কয়েকটা দিন কাটাবার চেষ্টা করতেন আর তার জন্য সমস্ত বছর ধরে তিল তিল করে রসদ সঞ্চয় করতেন। যাতে তাঁর সুন্দরী কন্যারত্নটির অভিজাত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে অসুবিধা না হয় সেজন্য তিনি তাকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে কোনো চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। একটা ব্যাপারে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর দেশের বাড়িতে যে সমস্ত ঝিচাকর কাজ করত তাদের সঙ্গে কথা বলতে মেয়েকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ওদের সঙ্গে তাঁর মেয়ে যদি কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তাহলে তাদের গেঁয়ো উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে তাঁর মেয়ের উচ্চারণভঙ্গির কোনো প্রভেদ করা যাবে না এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে যে উচ্চারণভঙ্গির প্রয়োজন সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই কারণে মেয়েকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখতেন যাতে সে বাড়ির চাকরবাকর বা বাগানের মালির সঙ্গে কথা বলতে না পারে।

অন্যান্য সময়ের মতো সেবারও বসন্তকালে প্যারিসে এসে প্রথমে অ্যামিউনে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পনেরো দিন এবং সেখান থেকে ক্রভিলের সমুদ্রতীরের এক হোটেলে আরও পনেরোটা দিন কাটিয়ে দিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের মতো পোশাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করে এবং কেতাদুরস্ত ফ্যাশনের মধ্যে ডুবে গিয়ে প্রচুর অর্থের অপচয় করলেন। কিন্তু সবই বৃথা হয়ে গেল। কেউ তাঁর মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয়ে আবির্ভূত হল না।

এর পর গত্যন্তর না দেখে আর হাতের সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেছে দেখে তিনি তাঁর মেয়ে ফেবিয়েনকে নিয়ে ফিরে এলেন। গ্রামের এই বিরাট বাড়িটায় এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। বৈচিত্র্যহীন জীবনের ঘেরাটোপে এইভাবে বাঁধা পড়ে তার সমস্ত শান্তি আর আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। ভাবতে

ভাবতে তার চোখের নীচে কালি পড়ল। এইভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসতে লাগল তার সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত কমনীয় লাবণ্য।

এক দিন রাত্রে ম্যাডাম মারিলাকের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের যে ঘরটায় তাঁর মেয়ে থাকত, সেখানে গিয়ে ফেবিয়েনকে দেখতে পেলেন না। তখন ফেবিয়েনকে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারের মধ্যে বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন।

নিস্তব্ধ রাত্রির বাতাসে ছড়িয়ে প্রস্ফুটিত ফুলের মিষ্টি গন্ধ। বেশি দূর পৌঁছোবার দরকার হল না তাঁর সেই কণ্ঠস্বরের। তিনি তাঁর চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখতে পেলেন, তাতে তাঁর সমস্ত স্নায়ু সাময়িকভাবে জড়ত্ব প্রাপ্ত হল আর তৎক্ষণাৎ তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ম্যাডাম মারিলাক দেখেছিলেন, একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর সুন্দরী কন্যা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বাগানের মালিকে চুম্বন করছে। সে গেঁয়ো একজন মহিলার ভাষায় তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছিল।

কিছুদিন পর থেকে ম্যাডাম মারিলাকের মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেল। আরও দিনকয়েক পরে বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় তাঁকে পাগলাগারদে ভর্তি করে দেওয়া হল।

এখন ফেবিয়েন সেই মালিকে বিয়ে করে সেই বাড়িতেই বাস করছে।

উন্মাদিনী নারী
The Mad Woman

ব্যারন ডি র‍্যাভটের এক পল্লিনিবাসের ধূমপানকক্ষে কয়েকজন বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে মসিয়ে ডি. এন্ডলিন বললেন, 'ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের একটি রোমহর্ষক ঘটনার কথা তোমাদের শোনাব। ফর্বোজ-ডি-কর্মেল-এ আমার যে একটা বাড়ি আছে তোমরা নিশ্চয়ই সেটা জানো। প্রাশিয়ানরা যখন এসেছিল, আমি তখন সেখানেই বাস করছিলাম। আমার পাশের বাড়িতেই এক মহিলা বাস করতেন। পর পর কতকগুলো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তিনি তাঁর স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সাতাশ বছর বয়সে এক মাসের মধ্যে তিনি তাঁর বাবা, স্বামী আর সদ্যজাত শিশুটিকে হারান।

মৃত্যু যদি একবার কোনো বাড়িতে ঢোকে তাহলে সে আবার সেখানেই ফিরে আসবে। কারণ সেখানে ঢোকার রাস্তাটা তার চেনা হয়ে গেছে। ওই যুবতী স্ত্রীলোকটি শোক-দুঃখে জর্জরিত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং একনাগাড়ে ছ'সপ্তাহ বিকারের ঘোরে কাটালেন। ভয়ংকর দুর্দিনগুলো ধীরে ধীরে কেটে গেলে তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হলেন বটে কিন্তু প্রায় জড়ত্বের অবস্থায় এসে পৌঁছোলেন। খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলেন। শুধু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন। যতবারই তাঁকে তুলে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে ততবার তিনি এমন ভীতিবিহ্বল স্বরে আর্তনাদ করে উঠতেন, মনে হত কেউ তাঁকে খুন করতে এসেছে। সেইজন্য সবাই তাঁকে সেইভাবে বিছানায় ফেলে রেখে দিয়েছিল। একমাত্র তাঁকে পরিষ্কার করে দেওয়া আর পোশাক বদলে দেওয়ার সময়টুকু ছাড়া কেউ তাঁর কাছে আসত না।

একজন বৃদ্ধ ভৃত্য সব সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত এবং মাঝে মাঝে সে তাঁকে কয়েকটুকরো ঠান্ডা মাংস বা একটু পানীয় খেতে দিত। তাঁর সেই হতাশাগ্রস্ত মনে কী ধরনের চিন্তা বাসা বেঁধেছিল কেউ তা বুঝতে পারত না। কারণ তিনি কোনো কথাই বলতেন না। তিনি কি তাঁর পরম প্রিয়জনদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতেন? তিনি কি দুঃখের কোনো স্বপ্ন দেখতেন? অথবা স্রোতহীন জলের মতো তাঁর চিন্তাশক্তিতে জড়ত্ব এসে গিয়েছিল?

যা হোক, এইভাবে তিনি পনেরোটা বছর কাটিয়ে দিলেন।

এদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে জার্মানরা কর্মেইল-এ এসে উপস্থিত হল। সেসব কথা আমার এত স্পষ্টভাবে মনে পড়ে মনে হয় সেটা যেন গতকালের ঘটনা—সেবারে এমন ভয়ংকর ঠান্ডা পড়েছিল, মনে হত বড়ো বড়ো পাথরের টুকরোগুলে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। বাতের ব্যথায় আমি এমন কাবু হয়ে পড়েছিলাম যে হাঁটা চলা করতে পারতাম না আর সেজন্য নিজের আরাম কেদারায় চুপচাপ শুয়ে থাকতাম আর জার্মানদের হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের বুটজুতোর শব্দ শুনতাম, জানালা দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

পুতুল খেলার পুতুলের মতো তারা সারাদিন ধরে শুধু হেঁটেই চলত। অফিসারদের আদেশে তাদের অধীনস্থ সৈন্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বইতে হল সমস্ত গৃহকর্তাদের। সতেরেজনের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হল আমাকে। আমার প্রতিবেশিনী সেই উন্মাদিনীর বাড়িতে থাকতে দিতে হল বারোজনকে। তাদের মধ্যে উগ্রস্বভাবের অত্যাচারী একজন অধিনায়ক ছিল।

প্রথম কয়েকটা দিন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। আমাদের পাশের বাড়িতে যে অফিসারটি ছিল তাকে জানানো হল যে ভদ্রমহিলা অসুস্থ, কিন্তু সে ব্যাপারে সে আদৌ কোনো গুরুত্ব দিয়েছে বলে মনে হল না। কিন্তু ভদ্রমহিলা, যাকে তারা কখনোই দেখেনি, তাদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর অসুখ সম্বন্ধে তারা কৌতূহল প্রকাশ করলে তাদের বলা হল ভীষণ শোকের আঘাতে তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। অবশ্যই তারা সে-কথা বিশ্বাস করল না। তারা ভাবল উন্মাদিনী মহিলা নিজের অহংকারে আত্মহারা হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠছেন না পাছে তাঁকে তাদের কাছে আসতে হয় বা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। সেনাধিনায়কটি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার তাগিদ দিতে লাগল। তাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে সে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে বলল, ম্যাডাম, আপনাকে আমি বিছানা থেকে উঠে নীচে নেমে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা সকলে আপনাকে দেখতে চাই। কিন্তু তিনি সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অধিনায়কটি এই দেখে বলল, এই ধরনের অপমান বা অবাধ্যতা আমি কিন্তু সহ্য করব না। আপনি যদি নিজের ইচ্ছাতে না ওঠেন তাহলে বিনা সাহায্যে কীভাবে আপনাকে হাঁটানো যায়—সে উপায় খুঁজে বার করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

কিন্তু তার কথা যে তিনি শুনতে পেয়েছেন তাঁর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি জড়বস্তুর মতো নিজের বিছানাতেই পড়ে রইলেন। ভদ্রমহিলার সেই শান্ত নীরবতাকে সীমাহীন ঘৃণার প্রকাশ মনে করে অধিনায়কটি বলল," আপনি যদি আগামীকাল নীচে না নামেন—" তাঁর কথা অসমাপ্ত রেখেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পর দিন বৃদ্ধ ভৃত্যটি ভীষণ ভয় পেয়ে ভদ্রমহিলাকে পোশাক পরানোর চেষ্টা করল কিন্তু উন্মাদিনী—ভয়ংকরভাবে চিৎকার করতে লাগলেন এবং তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দিতে লাগলেন। অফিসারটি সেই চিৎকাবের শব্দ শুনে দ্রুত ওপরে উঠে এল। বৃদ্ধ ভৃত্যটি অফিসারের পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মুঁসিয়ে উনি নীচে নামবেন না। ওঁকে আপনি ক্ষমা করে দিন—উনি সত্যিই দুঃখিনী। ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সৈনিকটি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। ভদ্রমহিলাকে জোর করে টেনে বের করে আনার জন্য তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিতে যথেষ্ট সাহস পেলেন না। কিন্তু তারপর হঠাৎই অফিসারটি হাসতে শুরু করল, এবং জার্মান ভাষায় তার সৈন্যদের কী সব নির্দেশ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একদল সৈনিককে একটা মাদুর নিয়ে

আসতে দেখা গেল। মনে হল তারা যেন একটা আহত মানুষকে বয়ে নিয়ে আসছে। সেই বিছানাতেই উন্মাদিনী চুপচাপ পড়েছিলেন সম্পূর্ণ একটা জড়বস্তুর মতো, তাঁর পিছনে একজন সৈনিক এক বোঝা মহিলাদের পোশাক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অফিসারটি তাঁর হাত দুটো ধরে বলল " আমরা দেখতে চাই আপনি কারও সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে পোশাক পরতে বা হাঁটতে পারেন কি না।"

এরপর দলটি উন্মাদিনীকে নিয়ে ইমাডিল নামের বনের দিকে রওনা হয়ে গেল। ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে তারা যখন ফিরে এল, তখন সেই মহিলা তাদের সঙ্গে ছিলেন না। উন্মাদিনীর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা গেল না। তাঁকে নিয়ে তারা কী করল বা তারা তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল কেউ তা জানতে পারল না।

সমস্ত দিনরাত ধরে বরফ পড়তে লাগল। বনজঙ্গল, মাঠঘাট, গাছপালা ঢাকা পড়ে গেল বরফের চাদরে। নেকড়ের দল এসে আমাদের চারিদিকে ভয়ংকরভাবে চিৎকার করতে লাগল।

সেই দুভার্গ্যপীড়িতা নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীলোকটির চিন্তা আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করল। ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়ার জন্য প্রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে কতকগুলো দরখাস্ত করলাম আর সে কাজ করতে গিয়ে প্রায় তাদের হাতে গুলিবিদ্ধ হতে চলেছিলাম।

আবার বসন্তকাল এল। সৈন্যবাহিনী অবরোধ তুলে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু আমার প্রতিবেশিনীর দরজা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রইল। বাগানের ঘাসগুলো শুধু ঘন হয়ে বাড়তে লাগল। গত শীতেই বৃদ্ধ ভৃত্যাটি মারা গিয়েছিল। কারও আর ওই ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছা ছিল না। একমাত্র আমিই ব্যাপারটা নিয়ে সর্বদাই চিন্তা করতাম। স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে তারা কী করল? তিনি কি বনের মধ্য দিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছেন? কেউ কি তাঁকে দেখে এবং তাঁর কাছ থেকে কোনো খবর বের করতে না পেরে কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে? আমার সন্দেহ নিরসন করার জন্য কোনো ঘটনাই ঘটল না। কিন্তু একমাত্র সময়ের প্রভাবেই আমি ধীরে ধীরে আশ্বস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম।

ঋতুচক্রের প্রভাবে আবার শরৎকাল এল। চারিদিকে প্রচুর বনমোরগকে দেখা গেল ঘুরে বেড়াতে। বাতের যন্ত্রণা থেকে সাময়িকভাবে তখন আমি খানিকটা রেহাই পেয়েছি।—তবুও আমি বেশ কষ্ট করে বন পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। চার পাঁচটা দীর্ঘচঞ্চু পাখি শিকার করলাম। তার মধ্যে একটা গিয়ে পড়ল ডালপালা ভর্তি একটা গর্তের মধ্যে। সুতরাং সেটাকে নিয়ে আসার জন্য আমি বাধ্য হয়েই গর্তের মধ্যে নেমে গেলাম। সেটাকে তুলতে গিয়ে লক্ষ করলাম সেটা একটা মৃত মানুষের কঙ্কালের কাছেই পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ সেই উন্মাদিনীর স্মৃতি আমার বুকে এসে ভীষণভাবে আঘাত করল। সেই সর্বনাশা সময়ে ওই জঙ্গলেই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কেন জানি না আমার এমন অনুভূতি হল। তবে আমি নিশ্চিত যে সেই উন্মাদিনীর কঙ্কালটাই আমি দেখেছি।

হঠাৎই আমার মনে হল সমস্ত রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সৈন্যরা

সেই নির্জন অরণ্যে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তাঁকে ফেলে রেখে চলে এসেছিল। নিজের ধারণাতে অবিচলিত থাকার কারণে তিনি সেই মোটা অথচ হালকা বরফের নীচে নিজের জীবনকে শেষ করে দিয়েছিলেন। হাত পা নাড়াবার মোটেই কোনো চেষ্টা করেননি।

তারপর নেকড়ের পাল এসে তাঁর শরীরটাকে দিয়ে তাদের খিদে মিটিয়েছে। পাখিরা তাঁর ছেঁড়া বিছানা থেকে পশম বের করে নিয়ে তাদের বাসা তৈরি করেছে। আমি তাঁর কঙ্কালের সৎকারের দায়িত্ব নিলাম। আমার শুধু এইটুকুই প্রার্থনা আমাদের সন্তানদের যেন কখনও যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করতে না হয়।

প্রেত
The Ghost

এক দিন একটি যুবক হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে পুলিশের ডিরেক্টারের কাছে একটা ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করল। তার অভিযোগ, যদিও সে দেশের প্রচলিত আইনের কোনো অমর্যাদা করেনি, তার বাবার প্রতি কোনো অন্যায় করেনি বা কোনোভাবে তাঁকে অসম্মান বা অপমান করেনি তবুও তিনি তাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং সমস্ত সম্পত্তি চার্চের নামে উইল করে দেবেন বলে স্থির করেছেন।

আমার একমাত্র অপরাধ, ক্যাথোলিক চার্চ আর যাজকদের আমি মোটেই পছন্দ করি না।

এই কারণে বাবার কাছে আমি নাস্তিক আখ্যা পেয়েছি আর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জেসুইট ফাদারদের দান করে দিচ্ছেন। আমার ধারণা, চার্চের ফাদাররা এ ব্যাপারে আমার বাবাকে মন্ত্রণা দিচ্ছে। আর তিনি তাদের কুমন্ত্রণায় আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। বছরখানেক আগেও আমার বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল এবং তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কিন্তু যখন থেকে তিনি তাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে শুরু করেছেন তখন থেকেই লক্ষ করছি তিনি আমার প্রতিটি ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছেন।

পুলিশের ডিরেক্টর আমার কথা শুনে বললেন, "কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কী করণীয় থাকতে পারে বলুন। তিনি একজন সুস্থমস্তিষ্কের স্বাভাবিক মানুষ। তাঁর সম্পত্তি তিনি যে কাউকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দান করে দিতে পারেন।"

যুবকটি তখন বলল, "তা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে সাহায্য করতে পারেন। কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছে চার্চের পুরোহিতরা আমার বিরুদ্ধে কোনো একটা ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য আমার সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করার জন্য বাবার সঙ্গে আমার গতকাল বেশ খানিকটা বচসা হয়। বাবা তখন বলেন, আমার মায়ের প্রেত নাকি তাঁর সামনে এসে বলেছেন তিনি যদি আমার নামে তাঁর সম্পত্তি উইল করে দেন তাহলে তাঁর আত্মা কখনই মুক্তি পাবে না। সেইজন্য নাকি আমার বাবা বাধ্য হয়েই এ কাজ করছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ভূতপ্রেতে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই আর কোনো দিনই ছিল না।"

পুলিশের ডিরেক্টর বললেন, "আমারও ও ব্যাপারে কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু সব থেকে বড়ো কথা কী জানেন, সঠিক প্রমাণ ও তথ্য ছাড়া আমরা এ কাজে এগোতে পারি না। চার্চের ক্ষমতা যে কতটা তা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না। আর সেই চার্চের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে আমি যদি সফল না হই অর্থাৎ আমি যদি তাদের

অপরাধ প্রমাণ করতে না পারি তাহলে আমি যে চাকরিটি হারাব, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই এ ব্যাপারে আপনি যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে আমার কাছে আসুন, আমি যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করব।''

বেশ কিছুদিন যুবকটির কোনো খবর নেই। মাসখানেক পরে হঠাৎ এক দিন সে থানায় এসে হাজির। তাকে বেশ অস্থির মনে হল। পুলিশের ডিরেক্টরকে সে বলল, ''আমাদের বাড়িতে একজন পুরোনো চাকর আছে। সে-ই প্রথমে আমাকে গোপনে বাবার উইলের সংবাদ দেয়। পরে জানতে পারি, আমার বাবা মাঝে মাঝে নিশুতি রাতে পুরোহিতের সঙ্গে গ্রামের কবরখানায় আমার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে নাকি তিনি আমার মায়ের প্রেতএর সঙ্গে কথা বলেন। আমার মায়ের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়েছিল। আমাদের গ্রামের বাড়িতেই আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল আর তাঁর মৃত্যুর পর ওই কবরখানায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। খবর পেয়েছি, আমার বাবা চার্চের পুরোহিতদের সঙ্গে আজ রাতে সেই কবরখানায় যাবেন। সুতরাং সমস্ত রহস্যের যবনিকাপাতের আজই উপযুক্ত সময়।''

পুলিশ ভদ্রলোক বললেন, ''হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আজই সমস্ত রহস্যের জট খুলে দিতে হবে। কারণ আপনি যা বললেন তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে ব্যাপারটার মধ্যে মারাত্মক কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র আছে। সুতরাং আজ আর আমার দিক থেকে কোনো বাধা নেই। রাত আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমার এখানে চলে আসবেন আর ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করবেন।''

রাত্রি ঠিক এগারোটার সময় পুলিশের ডিরেক্টর, যুবকটি, একজন পুলিশ সার্জেন্ট আর একজন কনস্টেবল—একটা জিপে করে সেই কবরখানার দিকে রওনা হল।

ওরা যখন সেখানে পৌঁছোল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইছে। দূরে কোথাও যেন শেয়াল ডেকে উঠল। মাঝে মাঝে নিশাচর পাখিরা বিচিত্র শব্দ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। যুবকটি এবার তার মায়ের কবরটা দেখিয়ে দিল। এবার যুবক আর পুলিশ ভদ্রলোকটি কবরখানার প্রার্থনাঘরের একটি কোণে গিয়ে লুকিয়ে রইল আর বাকি পুলিশ কর্মচারী দুজন খালের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে যুবকটির বাবা আর চার্চের ফাদার একটা বাতি হাতে প্রথমে প্রার্থনার ঘরে গিয়ে মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর যুবকটির মায়ের সমাধির কাছে গিয়ে সেটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং ফাদার মন্ত্রপূত পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন সমাধির ওপর। কিছুক্ষণ পরে ফাদার একটু দূরে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে তিনবার কী যেন বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সমাধির ওপর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আর সেই ধোঁয়ার মধ্যে দেখা গেল প্রেতের মতো বীভৎস চেহারার একজন মানুষকে। ফাদার চিৎকার করে তার নাম জানতে চাইলেন।

সেই প্রেতমূর্তি বলল, আমার জীবদ্দশায় লোকে আমাকে অ্যানা মেরিয়া বলে

জানত। ফাদার জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি কি পাপস্থানের আবাস থেকে মুক্তি পেয়েছ?''

প্রেতমূর্তি বলল, ''যতদিন আমার নাস্তিক পুত্রের শাস্তি না হচ্ছে ততদিন সেই নরক থেকে আমার মুক্তি নেই।''

পুরোহিত বললেন, ''কেন, সে তো তার পাপের শাস্তি পেয়েছে। তার ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে তার বাবা তাকে বঞ্চিত করেছে।''

প্রেতমূর্তি তখন বলল, ''তাতেও আমি মুক্তি পাব না। চার্চের নামে যে দানপত্র করেছে আমার স্বামী, সেটাকে আদালতে জমা দিতে হবে আর ছেলেকে বাড়ি থেকে চিরকালের জন্য বিদায় করে দিতে হবে।''

ফাদার বললেন, ''তা বোধহয় সম্ভব হবে না।''

একথার উত্তর আসার আগেই, পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। আর প্রেতমূর্তি তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল। পুলিশের ডিরেক্টর ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। পুলিশ সার্জেন্ট আর কনস্টেবলটি ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল। বিচারাধীন আসামি হিসাবে ফাদারকে গ্রেপ্তার করা হল। সেদিন থেকে যুবকটির বাবা ক্যাথলিক সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে এসে প্রটেস্ট্যান্ট দলে যোগ দেন আর নিজের ছেলের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

ভয়
Fear

ট্রেনটা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। আমার সামনেই বসে আছেন একজন বৃদ্ধ। তিনি ছুটন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ট্রেনের কামরাটা ভরে আছে জীবণুনাশক ওষুধের উৎকট গন্ধে। খুব সম্ভব ট্রেনটা আসছে মার্সাই থেকে।

আকাশে আজ চাঁদ ওঠেনি। বাতাসের গতিও প্রায় স্তব্ধ হয়ে আছে—একটা তারাও চোখে পড়ছে না। অথচ আলোর মিশ্রণে যেন রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আছে। ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে মুখের ওপর। আমরা প্যারিস ছেড়ে এসেছি ঘণ্টা তিনেক আগে, ট্রেন এখন প্রবেশ করছে ফ্রান্সের প্রধান অংশে। কিন্তু আমাদের এই যাত্রাপথে অনেক দ্রষ্টব্যই আমাদের চোখে এড়িয়ে গেছে। হয়তো বা ইচ্ছা করেই আমরা সে সমস্ত কিছু দেখার চেষ্টা করিনি।

হঠাৎ একটা ভয়ের দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখলাম, বনের মধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর সেই অগ্নিকুণ্ডের আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। দেখলাম, যাযাবরদের মতো কম্বল গায়ে দিয়ে তারা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আগুনের আভায় তাদের সমস্ত শরীর লাল। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল থেকে তাদের মুখ বের করে আমাদের দিকে তাকাল। সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হল—তাদের চার পাশ ঘিরে কচি সবুজ গাছপালা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অবশ্য সে সব দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই আগুন নিভে গেল। তার আর কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। আবার সবকিছু সেই আগের মতো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল।

ব্যাপারটা তো ভারী অদ্ভুত, বনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ওরা কী করছিল এই অন্ধকার রাত্রিতে?

আমার সহযাত্রীটি তাঁর ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন মধ্যরাত্রি, আমরা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখলাম।"

তাঁর মতকে আমি সমর্থন করলাম এবং তারপরেই আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। লোক দুটি ওখানে কী করতে পারে, এই নিয়ে আমরা কল্পনায় একটা ছবি তৈরি করে ফেললাম। ওরা কি ওদের কোনো পাপকর্মের একমাত্র সাক্ষীকে হত্যা করছিল? অথবা ওরা কামবর্ধক মাদক কোনো ওষুধ তৈরি করছিল? কেউ নিশ্চয়ই মধ্য রাত্রিতে কোনো কারণ ছাড়াই জঙ্গলে গিয়ে আগুন জ্বালতে যাবে না। ভয়ংকর গ্রীষ্মের এই রাতে কেউ নিশ্চয়ই স্যুপ গরম করতে যাবে না। তাহলে লোক দুটো বনের মধ্যে আগুন জ্বেলেছিল কেন—সেটাই আমাদের সকলের জিজ্ঞাস্য,

কিন্তু আমরা এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পেলাম না।

আমার সহযাত্রী এখন কথা বলছেন। এদিকে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে তিনি যে কোন্ পেশার সঙ্গে যুক্ত সেটা অনুমান করা গেল না। তবে তিনি যে সুশিক্ষিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে সামান্য পাগলাটে ভাব আছে, সেটা আমরা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু কে বুদ্ধিমান কে নির্বোধ, কে সহজ স্বাভাবিক আবার কে বা পাগল—তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সহজ হয় না। বিশেষ করে যৌক্তিকতা যেখানে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ বললেন, দৃশ্যটি আমাকে সত্যিই আনন্দ দিয়েছে কারণ সেটা আমাকে এমন এক অনুভূতির স্পর্শ দিয়েছে যেটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অতীতের পৃথিবী আমাদের বিপুলভাবে বিস্মিত করত। কিন্তু যতই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ততই মানুষ তার কল্পনা করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই রাত বা অন্ধকার খুব সাধারণ নয় তবু এ সবকিছুর মধ্যে এখন আর কোনো রহস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমরা আমাদের অতীন্দ্রিয় কল্পনার জগত থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাদের জীবন থেকে বিস্ময়কর সমস্ত বস্তু হারিয়ে গেছে। সেগুলো এখন আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারি। আমরা যে সমস্ত আধিভৌতিক বস্তুতে বিশ্বাসী ছিলাম, সেগুলো এখন যৌক্তিকতার অন্তরালে মুখ লুকিয়েছে। আজকের যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিস্ময়ের পরিমণ্ডল হয়ে পড়েছে সীমিত।

তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলে চললেন, ''আমি আজও পুরোনো পৃথিবী আঁকড়ে ধরে আছি। আমরা চিরকাল যা বিশ্বাস করে এসেছি তা থেকে এক চুলও সরে আসিনি। বিশ্বাস করার মধ্যে আমরা আনন্দের সন্ধান পাই। আমাদের প্রতারিত করা মোটেই কঠিন নয়। কারণ যৌক্তিকতা থেকে সরে এসে, বিশ্বাসের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থেকে গভীর রহস্যময়তার বাতাবরণে ডুবে থাকতে ভালোবাসি, বিশ্বাস করে আনন্দ পেতে ভালোবাসি, আনন্দের রসদ আহরণ করতে ভালোবাসি। আমরা বাস্তব ও সত্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার এক অপূর্ব অভ্যাস গড়ে তুলেছি।

অদৃশ্য বস্তুগুলোকে যুক্তি ও বুদ্ধির ঘেরাটোপে বেঁধে রেখেছি বলেই কল্পনা আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে সরে গেছে। এই পৃথিবী এখন আমাদের কাছে জড় বস্তুপিণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। এখানে কাব্য বা কবিতার কোনো স্থান নেই।

রাত্রির অন্ধকারে কোনো কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধা মহিলাদের বুকে ক্রুশ আঁকার বিষয়টাকে আমরা এখন আর মেনে নিতে পারি না। নিভৃতে অন্ধকারে একাকী থাকার সময় আমাদের অবচেতন মনটাকে অদ্ভুত ভয়াল কোনো অনুভূতির দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে—যৌক্তিকতার ঘেরাটোপের মধ্যে বসে তাকে আমরা কীভাবে স্বীকৃতি দিতে পারি?

অনুসন্ধান, তর্কবিতর্ক আর যৌক্তিকতার যুগ শুরু হওয়ার আগে, অতীতের দিনগুলোতে রাত্রির অন্ধকারে গা ছমছম করা অনুভূতির মধ্যে আমরা হারিয়ে যেতাম। সত্য ও বাস্তবতার আড়ালে মানুষের অজ্ঞতা যেমন তাদের আচ্ছন্ন করে রাখত তখন

ভয়, বিস্ময়, রহস্য ইত্যাদি বিষয়গুলো সক্রিয় হয়ে উঠে কাল্পনিক রূপ নিত এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তার যখন আবির্ভাব ঘটত মানুষ তাকে মেনে নিতে বাধ্য হত।

মনে করুন, আমরা দুজন যদি ওই জঙ্গলের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম তাহলে অন্যেরা আমাদের দেখে সেই একইরকম ধারণা করত। সেখানে রহস্যের গন্ধ থাকলেও ভয় নামক বস্তুটির কোনো অস্তিত্ব থাকত না। সেই সমস্ত বিষয় বা বস্তু আমাদের ভীত করে তোলে যার সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব থাকে বা পরিষ্কার কোনো ধারণা থাকে না।

আমাদের আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ গত রবিবারের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেদিন গুস্তভ ফ্লেবার্টয়ের বাড়িতে বসে তুর্গেনিভ বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। জানি না সেটি তাঁর কোনো গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কি না।

তিনি এমন দক্ষতার সঙ্গে গল্পটি আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন আমাদের মনে হয়েছিল যেন আমরা সেই অনিশ্চিত, ভয়াল রহস্যময় এক জগতে প্রবেশ করেছি।

তুর্গেনিভের রচনার মধ্যে আমরা সেই সব ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিদের আবিষ্কার করেছিলাম। যে সমস্ত বস্তু আপাত পরিদৃশ্যমান জগৎ থেকে বহুদূরে অবস্থান করে সেই সমস্ত বস্তু সম্পর্কে আমাদের মধ্যে এক গভীর রহস্যময় ভীতি তৈরি হয়। সেই সমস্ত শক্তি দৃশ্যমান পৃথিবীর অন্তরালে থেকে আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে।

তুর্গেনিভ সেদিন আমাদের কাছে যে গল্পটি বলেছিলেন, সেটি হল :

এটা তাঁর তরুণ বয়সের ঘটনা। রাশিয়ার জঙ্গলে তিনি শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সমস্ত দিনটা এ জঙ্গল থেকে ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু কোনো শিকার পেলেন না। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে তিনি একটা নির্জন নদীর তীরে এসে পৌঁছোলেন। নদীর টলটলে ঠান্ডা জলে স্নান করার জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে পোশাক খুলে তিনি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বলিষ্ঠদেহী সাঁতারু স্রোতের টানে নিজের শরীরটাকে ভাসিয়ে দিলেন। জলের তলায় যে সমস্ত ঘাস ও লতাগুল্ম মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাদের স্পর্শ তাঁকে রোমাঞ্চিত করে তুলল।

হঠাৎ একখানা হাত তাঁর কাঁধের ওপর এসে পড়ল। চমকে ফিরে তাকান, দেখেন একটা বীভৎস জীব কুটিল হিংস্র চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারাটা অনেকটা স্ত্রীলোক বা বানরের মতো। কুৎসিত, বিকট কুৎসিত মুখে বিচিত্র হাসি। অজানা জন্তুটা তাঁর মুখের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কখনও ওঁর রোদে পোড়া তামাটে চুলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, কখনও ওঁর পিঠের ওপর উঠে দাঁড়াচ্ছে।

ভয়ংকর ওই জীবটার মুখোমুখি হয়ে তুর্গেনিভ ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেলেন। জীবটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার দিয়ে তীরে ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কোনো কিছু ভাবার অবকাশ পেলেন না। কিন্তু ওই কিম্ভুত জীবটার গতিবেগ যেন আরও বেশি। সে যেন ইচ্ছে করেই ঘাড়ে

হাত রাখছে, কখনও পিঠের ওপর আঙুলের চাপ দিচ্ছে আবার কখনও বা পায়ের নীচে আলতোভাবে আঙুল চালাচ্ছে।

ভয় আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়লেও তিনি এক সময় তীরে এসে উঠলেন। তারপর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলেন বনের দিকে। তিনি তখন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। নদীর তীরে পড়ে থাকা পোশাক ও বন্দুকের কথাটা তিনি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন।

ওই ভয়ংকর জন্তুটাও তাঁর পিছনে তাড়া করে চলেছে—ছুটছে তীব্র গতিতে আর মুখ দিয়ে ক্রমাগত গোঁগোঁ শব্দ করে চলেছে।

তুর্গেনিভ বিস্ময়, ভয় আর উদ্বেগে এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে পাশের মাঠের একটা রাখাল ছেলে বীভৎস জন্তুটাকে দেখতে পেয়ে তার লাঠি হাতে নিয়ে ছুটে আসে। জন্তুটা তাকে দেখতে পেয়ে মেয়ে গরিলার মতো গোঁগোঁ শব্দ করতে করতে বনের মধ্যে পালিয়ে যায়।

জানতে পারলেন, ওই জীবটি কোনো জন্তু বা পশু নয়। ও বিকৃতমস্তিষ্কের একজন স্ত্রীলোক। মেষপালকদের দেওয়া খাবার খেয়ে সে বেঁচে আছে এবং ওই বনে সে বাস করছে প্রায় ত্রিশ বছর। দিনের অধিকাংশ সময় কাটায় সে নদীতে সাঁতার কেটে।

তাঁর গল্পের শেষে রুশ-সাহিত্যিক বললেন, জীবনে আমি কখনও অত ভয় পাইনি। জীবটা যে কী হতে পারে সে সম্বন্ধে আমি বিন্দুবিসর্গ ধারণা করতে পারিনি।

আমি বৃদ্ধ যাত্রীকে গল্পটা বললাম। তিনি বললেন, তবেই দেখুন, আমরা যাকে জানি না বা যে বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তাইই আমাদের মধ্যে ভয় আতঙ্কের জন্ম দেয়। জীবনে এ ধরনের ভয় পাবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। অথচ ঘটনাটা এত সাধারণ যে সে ব্যাপারে ভয় পেয়ে নিজের কাছে অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছিলাম। তাই সেটা আপনার কাছে বলতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।

আমি একবার বিট্রানিতে গিয়ে সেখানে পায়ে হেঁটে সর্বকিছু দেখব বলে ঠিক করলাম। এর পর হাঁটতে হাঁটতে ফিনিস্ত্রির বন্ধুর অঞ্চল পার হয়ে গেলাম। এর আগের দিন সন্ধ্যায় দুই সাগরের সংযোগস্থানে র‍্যাজ নামের যে অঞ্চল আছে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছোলাম। অতি প্রাচীন ভূখণ্ড, ওখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য কিছু প্রবাদ ও কাহিনি আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

রাত্রে পেন মার্চ থেকে পন্ট-লা-অ্যাবি পর্যন্ত অনেকখানি পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিলাম। পেন মার্চে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে কখনও আপনার? ওখানে তীরভূমি এত ঢালু যে মনে হয় সমুদ্রতল থেকেও অনেক নীচু। সমুদ্রের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন বিশাল বিশাল ঢেউ হিংস্র জন্তুর মতো তীরের দিকে ছুটে আসছে। ধূসর রঙএর সেই ঢেউগুলো সাদা রঙএর ফেনা তৈরি করে শিলাস্তরের ওপর প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ে বারবার।

সমুদ্রতীরের এক জেলের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করলাম। তারপর ঘন অন্ধকার রাতে আবার পাড়ি জমালাম অজানা পথের উদ্দেশ্যে।

অতীতে কেল্ট পুরোহিতরা যে বড়ো বড়ো পাথরের খণ্ডকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করত সেগুলোকে এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে খাড়া করে রাখা হয়েছিল অন্ধকারে সেগুলোকে প্রেতমূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। মনে হল ওরা যেন অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে আমার মধ্যে অদ্ভুত একটা ভয়ের অনুভূতি হল, কিন্তু কেন যে ভয় পেলাম সেটা বুঝতে পারলাম না। নৈশ নির্জনতায় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হঠাৎ হাওয়া এসে যখন আমাদের শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যায় তখন অজানা আতঙ্কে আমাদের বুক কেঁপে ওঠে, শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। কিন্তু কেন এমন হয় তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

মনে হল যে পথে পাড়ি দিয়ে চলেছি তা অতি দীর্ঘ। সে পথের মাঝে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম সমুদ্রের অবিরাম গর্জন আর সেটা যেন ভেসে আসছে আমার সামনে পিছনে, ওপরে নীচে সব দিক থেকে। সেই গর্জন মাঝে মাঝে আমার এত কাছে এসে পড়ছে মনে হয়ে ঢেউগুলো আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কোন্ অতলান্ত জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তখনই সেখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো দিশাহারা হয়ে পড়ি।

বাতাসে কাদের যেন শিসের শব্দ শুনতে পাই। সেই শিসের শব্দ যেন আমাকে গ্রাস করতে আসে। খুব দ্রুত পথটুকু অতিক্রম করার চেষ্টা করি কিন্তু এক অজানা ভয় যেন আমার সমস্ত শরীর মনকে হিম, নিস্তেজ আর অবশ করে দিল।

ভয়ে অস্থির হয়ে ভাবতে থাকি কখন যে একজন মানুষকে দেখতে পাব। এদিকে অন্ধকার এত গভীর হয়ে উঠেছে যে পথ চিনতে আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, কোনো বস্তু যেন গড়াতে গড়াতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ভাবলাম এটা বোধহয় কোনো গাড়ির শব্দ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না।

একটু পরেই আবার সেই শব্দ। এবার মনে হল একদম কাছে। শব্দটা যে কীসের তা বুঝতে না পেরে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি। শব্দটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। সেটা কারও পায়ের শব্দ নয় কিন্তু মনে হল একটা চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

শেষ পর্যন্ত শব্দটা একেবারে আমার কাছে চলে এল। আমি ভয় পেয়ে একটা গর্তের মধ্যে লুকোলাম। দেখলাম, একটা একচাকার হাতগাড়ি গড়াতে গড়াতে গর্তটার পাশ দিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, হাতগাড়িই বটে। কিন্তু কেউ সেটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না।

ভয় আর আতঙ্কে আমার বুক এমনভাবে কাঁপতে থাকে মনে হল আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ দেহে আমি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম। শুনতে পেলাম চাকার ঘড়ঘড় শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। উঠে বসার বা দাঁড়াবার ক্ষমতা আমি

হারিয়ে ফেললাম। হাত পা সম্পূর্ণ অসাড়। ভয় হল উঠে দাঁড়ালে সেটা যদি আবার আমাকে তাড়া করে তাহলে নির্ঘাত আমার মৃত্যু হবে।

এইভাবে অনেকটা সময় কেটে গেল। ধীরে ধীরে আমার মধ্যে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এল। কিন্তু বাকি পথটুকু পার হবার সময় আমার ভীষণ ভয় করছিল। কোথাও সামান্য একটু শব্দ শুনলেই চমকে উঠছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আমি যে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাতে হয়তো আমাকে খুব বোকা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলোতে আমি আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। অনেক চিন্তা করে পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। সম্ভবত খালি পায়ে কোনো বাচ্চা ছেলে গাড়িটা ঠেলছিল এবং তখন আমি কোনো বয়স্ক লোককে দেখব বলে আশা করেছিলাম।

ব্যাপারটা বুঝতে নিশ্চয়ই আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আগে থেকেই ভয়টা আমার মনের মধ্যে গেড়ে বসেছিল। আর সেই ভয়েরই প্রভাবে দেখতে পেলাম হাতগাড়িটা নিজে থেকেই চলতে শুরু করেছে।

এই পর্যন্ত বলে তিনি একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, আর একটা ব্যাপার দেখুন—আমরা এখানে বসেই বুঝতে পারছি কলেরা মহামারির রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই গাড়িতে যে কলেরা রোগী আছে তা নিশ্চয়ই আপনি গাড়ির ভিতর ওষুধের গন্ধ থেকে বুঝতে পারছেন। তুঁলাতে গেলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আপনার চোখে পড়বে। তুঁলার রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলে দেখতে পাবেন দলে দলে মানুষ নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে। প্রশ্ন হতে পারে—যেখানে মানুষ চারিদিকে মৃত্যুর করাল ছায়া অনুভব করছে, সেখানে তারা এইভাবে নাচছে কী করে? আগুন জ্বালিয়ে সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে তারা নাচছে গান গাইছে। এই মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ার মধ্যে বাস করে কেন তাদের এমন উন্মাদনা—কারণ, মৃত্যুর দেবতার সেখানে আবির্ভাব ঘটেছে।

তারা সেই মৃত্যুর দেবতাকে খুশি করার জন্য এমন উন্মাদের মতো নেচে চলেছে আর কলেরাই হল তাদের সেই দেবতা।

সেই ভয়ংকর অতীতের শয়তান অদৃশ্য থেকে যত্রতত্র তার করাল হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে বহু মানুষের প্রাণ। মানুষ আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যাচ্ছে। ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন না হয়ে পুরোহিতদের কাছে প্রার্থনা করছে যাতে তাঁরা কলেরার অদৃশ্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন।

একটা সত্যি গল্প
A True Story

হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে দরজার পাল্লা কেঁপে উঠল। শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে যাওয়া বাতাস যেন তার বিলাপ আর হাহাকারের প্রতিধ্বনি। গাছের শেষ শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়ছে আর ঝোড়ো হাওয়া সেগুলোকে মেঘের দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

শিকারিদের ডিনার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফুরফুরে মেজাজে তাদের বেশ চাঙ্গা মনে হচ্ছিল।

ওরা নর্মান জাতির লোক। অর্থ বিত্ত ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে ওরা জমিদার বা জোতদারদের শ্রেণিভুক্ত। গাঁয়ের মোড়ল হিসাবে ওদের বেশ নামডাকও আছে। ওরা চাষবাসও করে। আর্থিক সঙ্গতিও যথেষ্ট। দেহে শক্তিরও কোনো অভাব নেই। প্রতিযোগিতায় নেমে ষাঁড়ের শিং ভাঙতে পারে খুব সহজেই।

গোটা দিনটাই শিকারের জন্য মেয়র, মেঁত্রি ব্লন্দেলের জমিতে ঘুরে তারা গুলি ছুঁড়ে বেড়িয়েছে। এখন মেয়রের অতিথি হয়ে তাঁর বাড়ির খাবার-টেবিলটাকে ঘিরে আসর জমিয়ে তুলেছে।

তারা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল। তাদের হাসির শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে বোধ হয় বন্যজন্তুরা গর্জন করছে। তারা এত বেশি বেশি মদ গিলেছে তাদের পেটগুলো ঢাকের মতো ফুলে উঠেছিল। টেবিলের ওপর কনুইএর ভর দিয়ে তারা বসেছিল। তাদের চোখগুলো আগুনের চুল্লির আলোতে চকচক করছিল। এতক্ষণ তারা কুকুর ও লক্ষ্যভেদ—এই দুই বিষয় নিয়ে গল্পে মশগুল হয়ে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্যান্য অনেকরকমের চিন্তাভাবনায় তারা ভীষণভাবে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যে স্বাস্থ্যবতী যুবতীটি তাদের খাবার পরিবেশন করছিল তারা এখন তাকে দুচোখ দিয়ে গিলছে এবং নানাধরনের কুচিন্তা তাদের মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে।

ভেটেরেনারি ডাক্তার সেঁজুর এক সময় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত বিষয় এখন শিকেয় তুলে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হায় ভগবান, ব্লন্দেল বেশ একখানা খাসা মাল জোগাড় করেছে তো। মনে হয় এখনও পর্যন্ত কোনো মৌমাছি ওর মধু খেতে পারেনি।'

সেঁজুরের মন্তব্য শুনে সকলের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। হঠাৎ সকলের নজর পড়ল একজন বৃদ্ধ মানুষের ওপর। তাঁর পোশাকপরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে তাঁকে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ বলেই মনে হয়। নাম—মঁসিয়ে দ্য ভারনেট। একমাত্র তিনিই মদ্যপান করেননি বলে স্বাভাবিক ছিলেন। তিনি যখন কথা বললেন তখন তাঁর গলার শব্দে অন্যান্য সকলের গলার শব্দ চাপা পড়ে গেল।

তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আমিও এক সময় এই ধরনের একটি যুবতীর সঙ্গে

অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেই কাহিনিটি আজ আমি তোমাদের কাছে বলব। সেই মেয়েটির কথা যখন আমি ভাবি তখন আমার পোষা মাদি কুকুর মির্জার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে যায়। কমোট দ্য হঁসোনেল আমার কুকুরটাকে কিনবে বলে পীড়াপীড়ি করছিল বলে তাকে আমি তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। যখনই মির্জার চেন খুলে দেওয়া হত, সে সেই মুহূর্তে ছুটে আসত আমার কাছে। বুঝতে পারতাম আমাকে ছেড়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত না পেরে হঁসনোলকে বললাম কুকুরটাকে বেঁধে রাখতে। কিন্তু ফল হল অত্যন্ত দুঃখজনক। কুকুরটা আমাকে না দেখতে পেয়ে হঠাৎ এক দিন মারা গেল।

এটা কিন্তু আমার গল্প নয়। যে যুবতীটির কথা বললাম তাকে নিয়েই আমার গল্প।

আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। ভিলিবনে আমাদের যে জমিদারি ছিল সেখানেই আমি অবিবাহিত জীবনযাপন করছিলাম। নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পার যে যুবক অবিবাহিত এবং যে প্রচুর অর্থ বিত্ত সম্পদের মালিক, অবসর সময়গুলো তাকে কীভাবে কাটাতে হয়। নিঃসঙ্গ জীবন আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতাম, তাকিয়ে দেখতাম এখানে-ওখানে।

কিছু দিনের মধ্যে জানতে পারলাম, ক্যানডিলির দেব্যুলতের বাড়িতে একটি অল্পবয়সি ঝি কাজ করে। মেয়েটির নামটা জানতে আমার কোনো অসুবিধা হল না। তার নাম রোজ। এক দিন দেব্যুলতের সঙ্গে দেখা করে তাকে বললাম যে ওই ধরনের একটি কাজের মেয়ের প্রয়োজন। দেব্যুলত আমার ইচ্ছা পূরণ করতে রাজি হল। কিন্তু পরিবর্তে সে একটা শর্ত আরোপ করল। সে তার পরিচারিকাটিকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে কিন্তু আমার যে একটা কালো ঘোটকী আছে সেটাকে তার কাছে বিক্রি করতে হবে, কারণ সে বহুদিন থেকে ও ধরনের একটা ঘোড়ার খোঁজ করছে। তার শর্তে রাজি হয়ে ঘোটকীটিকে আমি তার কাছে তিনশো ক্রাউনে বিক্রি করে দিলাম। সেও রোজকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

প্রথম প্রথম বেশ ভালো লাগত। কেউ কিছু সন্দেহও করত না। কিন্তু আমাকে নিয়ে সে এত বেশি আধিক্যেতা শুরু করল যে আমার ভয় হতে লাগল। মাঝে মাঝে তার সোহাগ দেখানোর রীতি সীমারেখা ছাড়িয়ে যেত। কিন্তু আমি যতদূর জানি ওর শরীরে যে রক্ত বইছে তা খুব নীচু বংশের রক্ত নয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো এক ভদ্র সন্তানের সঙ্গে তার মায়ের অবৈধ সম্পর্কের কারণে তার জন্ম হয়েছিল।

রোজ আমার প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ল। আমার জন্য সে পাগল। আমাকে চোখের আড়াল হতে দেখলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। আমাকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে রাখতে পারলেই যেন সে সব থেকে খুশি। তার ভাব দেখে মনে হত আমাকে ছাড়া বোধহয় সে বাঁচবে না। কিন্তু এসব কিছুর পরিণতি কী হতে পারে অনুমান করে আমি ভয় পেতে শুরু করলাম। ভাবলাম, এইভাবে যদি বেশি দিন চলতে থাকে তাহলে জালের মধ্যে যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাব তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার মতো বান্দা আমি নই। একটু আদর করে বা সোহাগ

দেখিয়ে কিংবা কয়েকটা চুমু খেয়ে যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনব এতটা নির্বোধ আমি নই। সুতরাং যতই সে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতে লাগল, আমি সেইভাবে সজাগ ও সতর্ক হয়ে রইলাম।

সে যখন আমার কাছে আসে তার পায়ের শব্দ পেয়ে আমার মধ্যে অদ্ভুত এক উত্তেজনা হতে থাকে। সে মোটেই দেরি না করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে চুমু খেতে থাকে। সে নারীসুলভ আবেগে খিলখিল করে হাসে, নাচে, গান গায়, আনন্দে তার সুন্দর চুলে ঢাকা মাথাটাকে দোলাতে থাকে অদ্ভুত সুন্দর এক ভঙ্গিমায়।

ওর সঙ্গ আমাকে আনন্দ উত্তেজনায় ভরিয়ে তোলে কিন্তু দুশ্চিন্তা আমাকে ছাড়ে না। নিজের মনকে শক্ত করে ভাবি—চূড়ান্ত কোনো কিছু ঘটার আগেই আমি নিশ্চয়ই ওকে এড়িয়ে যাব।

আমার বাবা মা তখন থাকেন বার্ণেভিলিতে আর আমার বোন তার স্বামীকে নিয়ে রোলিবিতে বাস করছে। অবৈধ নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়ে যাতে তাদের সম্মান বা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য আমি বিশেষভাবে সতর্ক হয়ে রইলাম।

কিন্তু এই তীব্র আকর্ষণ ও মোহ থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। যদি তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিই তাহলে নানান লোকে আমার সম্বন্ধে নানান কথা বলবে। তাদের নিন্দা আর সমালোচনায় কান পাতা দায় হবে। আর সে যদি এখানেই থেকে যায় তাহলে যে-কোনো দিন একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। একজন রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে কতদিন এই আকর্ষণ বা এই প্রলোভন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব। অথচ এভাবেও চলতে দেওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত সমাধানের পথ খুঁজে না পেয়ে আমার কাকা ব্যারণ দ্য ক্রিটুইলের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। কারণ এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর বিস্তর অভিজ্ঞতা। তিনি জীবনে এ ধরনের বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেগুলোর যথাযথ সমাধানও করেছেন।

আমার কথা শুনে তিনি নিরুত্তাপ স্বরে বললেন, "একটা ছেলে দেখে তার সঙ্গে তোমার কাজের মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও।"

তাঁর কথা শুনে এত অবাক হলাম যে আমি চমকে উঠলাম। "বিয়ে দেব! কিন্তু কার সঙ্গে, তেমন পাত্রই বা কোথায়?"

"যার সঙ্গে তোমার ইচ্ছা। আর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার। সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কোনো বুদ্ধি দিতে পারি না। চেষ্টা করে দেখ, বুদ্ধি থাকলে একজনকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে।"

কাকা যে পরামর্শ দিলেন, তা নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে চিন্তা করলাম। তারপর মনে হল কাকা ঠিক কথাই বলেছেন।

সুতরাং তাঁর পরামর্শমতো পাত্রের সন্ধান করতে লাগলাম। স্থানীয় একজন বিচারক পাত্রের সন্ধান দিলেন। পাত্রটি মাদার পাওমেলির সন্তান। ছেলেটি অতি হীন চরিত্রের। টাকার জন্য করতে পারে না এমন কাজ বোধহয় ভূভারতে নেই।

উপযুক্ত ছেলের উপযুক্ত মা। মাদার পাওমেলি বয়সে বৃদ্ধা হলেও যেমন ধূর্ত তেমন লোভী। একটি ক্রাউনের জন্য তার অমূল্য জীবনকেও সে তুচ্ছ মনে করে। এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে বেশ কিছু টাকাপয়সা, সোনাদানা হাতিয়ে নেবার ফন্দি আঁটছে।

আমি তার সঙ্গে দেখা করে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে তাকে সবকিছু জানিয়ে তার ছেলের সঙ্গে ওই মেয়েটির বিয়ের প্রস্তাব দিলাম।

সব শুনে সে বলল, তা তো বুঝলাম, কিন্তু মেয়েটাকে এই বিয়েতে কী কী দেবে?

বুড়ির চালাকি বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আঁচ করতে পেরে আমি তৈরি হয়েই এসেছিলাম।

সেসময় আমি যেখানে বসবাস করতাম, সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমার কুড়ি একরের মতো জমি ছিল—সেটাকে আমি তিনটি ছোটো ছোটো খণ্ডে ভাগ করে রেখেছিলাম। দূরত্বের কারণে চাষিদের কাজের অসুবিধা হত এবং সেজন্য তারা আমার কাছে বহুবার অভিযোগ করেছে। সেখানে একটা খামার তৈরি করব বলে স্থির করেছিলাম। যা হোক ওই খামারটিই রোজকে যৌতুক দেব—এটাই তাকে জানিয়ে দিলাম।

আমার প্রস্তাবে বুড়ি সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হল না। তার কাছে যৌতুকের ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু এর বেশি কিছু দেব না বলেই ঠিক করলাম। যে কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম ফিরে এলাম তা অসমাপ্ত রেখেই।

তার পর দিন খুব ভোরবেলা বুড়ির ছেলে এসে হাজির হল। সেসময় তার মুখ চোখের অবস্থা কেমন ছিল সে কথা এখন আর মনে নেই। তবে ওকে দেখে বুঝলাম, চাষির ঘরেই ওর জন্ম। চেহারাটা চাষির মতো আর স্বভাবে খুব নোংরা। নিজে থেকে যখন এসে হাজির হয়েছে তখন আমার প্রস্তাবে ওরা রাজি হয়েছে বলেই মনে হল।

যে যৌতুকের কথা ওর মাকে বলেছিলাম—সেই যৌতুকের জমি ও দেখতে চাইল। নিয়ে গেলাম জমি দেখাতে। বদমাশটা আমাকে সেখানে পুরো তিনটে ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে জমিটা মাপল ফিতে দিয়ে খুব ভালো করে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আসবাবপত্রও নিশ্চয়ই কিছু দেবেন।"

"মোটেই না", আমার গলায় আপত্তির সুর, "ওই খামারটা যে দিচ্ছি তাই ঢের।"

"ঢের নয়"—তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে সোচ্চার তার কণ্ঠস্বর, "শুধু কি খামারটা দিচ্ছেন, সঙ্গে হয়তো মেয়ের সঙ্গে তার পেটের বাচ্চাটাকেও দিচ্ছেন।"

লজ্জা সংকোচে আমার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তার কথার কোনো উত্তর দিলাম না।

"আপনাকে কী কী দিতে হবে শুনুন, খাটবিছানা, আলমারি, একটা ডিনার টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার, দানসামগ্রী আর বাসনপত্তর।"

যে কথা ও শুনিয়েছে তাতে রাজি না হয়ে পারলাম না।

ফেরার সময় মেয়েটির সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করল না বা কিছু জানতেও চাইল

না। শুধু বলল, আচ্ছা মেয়েটির মৃত্যু হলে ওই সম্পত্তির মালিক কে হবে?

"কেন? তুমি।" আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এতক্ষণ বোধহয় সে এই উত্তরটাই জানতে চাইছিল। আমাকে ওর নিজের মতে আনতে পেরে খুশি হয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। কিন্তু রোজকে ওই বিয়েতে মত করাতে আমার কালঘাম ছুটে যাওয়ার জোগাড় হল। সে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তুমি কী করে এমন কথা বলতে পারলে, শেষ পর্যন্ত তুমি?"

সে এক সপ্তাহ ধরে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলল। এই বিয়েতে সে কিছুতেই রাজি হল না। অনেক করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল কিছুই হল না। তার এক কথা—এ বিয়ে সে করবে না। মেয়েদের মন বোঝা সত্যিই দুঃসাধ্য। তাদের মনের মধ্যে যদি প্রেম নামক বস্তুটি একবার এসে বাসা বাঁধে তাহলে তাকে তাড়ায় কার সাধ্য। পৃথিবীর অন্য সব বিষয় তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। কাণ্ডজ্ঞান বলে আর কিছুই তাদের অবশিষ্ট থাকে না।

আমি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেব বলে ভয় দেখালাম। আমার কথা শুনে বিয়েতে মত দিল কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। সে বলল, সুযোগ মতো সে যেন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে।

আমি এই বিয়ের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। তাকে গির্জায় নিয়ে গেলাম। বিয়ের সমস্ত খরচ আমাকে বহন করতে হল। ভোজের অনুষ্ঠানও নেহাত মন্দ হল না। সবই হল আমার টাকায়। সমস্ত নিয়ম মেনে বিয়ের কাজ শেষ হল।

রোজের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আমি প্রায় মাস দুয়েক ওই বাড়িতে ছিলাম না। আমার ভাইএর সঙ্গে অন্য জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ফিরে এসে জানতে পারলাম রোজ প্রতি রবিবার এ বাড়িতে এসে ব্যাকুল হয়ে আমার খবর জানতে চেয়েছে।

আমার পৌঁছোনোর এক ঘণ্টার মধ্যে রোজ আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। তার কোলে একটি অপুষ্ট শিশু। বাচ্চাটাকে দেখেই আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। অদ্ভুত একটা মমত্ববোধ জেগে উঠল আমার মধ্যে আর সেই মমত্ববোধে শিশুটিকে চুম্বন করলাম।

মাতৃত্বের বোঝা বইতে গিয়ে রোজ নিজেকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে। তার হাড়সর্বস্ব শরীরে আর আগের মতো জৌলুস চোখে পড়ে না। সে এখন আগেকার রোজের ছায়ামাত্র। বিবাহিত জীবন তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তার পক্ষে স্বামী শাশুড়িকে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

"রোজ তুমি কি সুখী হয়েছ?" আমার নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই যেন চমকে উঠলাম। কণ্ঠস্বর ভীষণ যান্ত্রিক মনে হল।

আমার কথা শুনে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি বোধহয় মরে যাব।"

কেঁদেকেটে পরিবেশটাকে জটিল করে তুলল। আমি তাকে শান্ত করার জন্য

নানানভাবে বোঝালাম। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা একটু স্বাভাবিক হতেই তাকে আমি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

জানতে পারলাম তার স্বামী আর শাশুড়ি মিলে তার জীবনটাকে একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তার স্বামী রোজ রাত্রে তাকে ভীষণ মারে। মার খেতে খেতে তার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আর তার শাশুড়ি তার ছেলেকে সে কাজে ইন্ধন দেয় প্রতিনিয়ত।

দিন দুই পরে আবার সে এল। আমাকে জড়িয়ে ধরে তার কি আকুল কান্না। তারপর কাঁদতে কাঁদতে আমার সমস্ত শরীরে চুম্বন করতে লাগল। মাঝে মাঝে বলতে লাগল, আমি ওদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না, তুমি আমাকে শেষ করে দাও। আর তুমি আমাকে ওদের ওখানে ফিরে যেতে বোলো না।

সে যেভাবে করুণস্বরে বিলাপ করছিল তাতে যেন মনে হল আমার আদরের কুকুর করুণস্বরে আর্তনাদ করছে।

পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে উঠল যে আবার মাস দুয়েকের জন্য গা-ঢাকা দিলাম। ফিরে এসে শুনলাম, সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আমার ফিরে আসার সপ্তাহ তিনেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে। আমার চলে যাবার পরে প্রতি রবিবার সে আমার বাড়িতে একবার করে আসত। খুব আশা করত—আমাকে বোধহয় সে সেখানে দেখতে পাবে। আমার কুকুর মির্জাও ঠিক ওইরকমই করত। সে মারা যাবার আট দিন পরে তার বাচ্চাটাও মারা গেল।

আর তার স্বামী, সেই বদমাশ ছোকরা তার সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। সে ওই খামারটাকে কাজে লাগিয়ে নিজের হাল ফিরিয়েছে। এখন তার রমারমা অবস্থা। সে আমার ওই খামারের দৌলতে এখন পৌরসভার একজন সদস্য। ওইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

গল্পের শেষে মেয়র ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, ছোকরার এই সৌভাগ্যের পিছনে আমার অবদান কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না।

ভেটেরেনারির ডাক্তার সেঁজুর ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এই মেয়েটির সম্বন্ধে আপনাদের কী ধারণা হয়েছে বলতে পারি না তবে আমার মনে হয় এই ধরনের স্ত্রীলোক আজকের পৃথিবীতে একেবারেই বেমানান।

এগারো নম্বর ঘর
Room No. 11

আচ্ছা, প্রেসিডেন্ট আমাদঁকে কেন তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল—সেটা কি তুমি জান?

না, আমি সেটা জানি না।

সত্যিকারের কারণটা যে কী সেটা জানা না গেলে সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যে একটা গল্প তৈরি হয়েছে।

তাহলে সে গল্পটাই বল, শুনি।

আচ্ছা, মাদাম আমাদের কথা তো নিশ্চয়ই শুনেছ। পার্থুই লেতে সকলের কাছে যিনি মাদাম মার্গারেট নামে পরিচিত।

হ্যাঁ, তাঁর কথা আমি শুনেছি।

ওই এলাকার মানুষ তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত। তিনি যেমন ছিলেন দয়ালু, তেমনি সামাজিক কর্তব্যপালনে তাঁর গুণের কোনো সীমা ছিল না। দরিদ্র মানুষদের সাহায্যের জন্য তিনি এখানে ওখানে গিয়ে চাঁদা তুলতেন। নিজেও কম অর্থ দান করতেন না। শহরের যুবকদের মন থেকে এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য নানারকম অনুষ্ঠান করে তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করতেন।

আমাদের দেশে যে সমস্ত নামকরা সাহিত্যিক আছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই জন্ম প্যারিসে। তাঁরা নাকি প্যারিস-ললনাদের ভীষণ গুণমুগ্ধ। তাঁরা নাকি তাদের প্রশংসার ভাষা খুঁজে পান না। পঞ্চমুখে যখন তাঁরা তাদের প্রশংসা করেন তখন তাঁরা ভুলে যান যে আধুনিকারা অত্যন্ত অধীরা। তাদের রূপের যথেষ্ট আকর্ষণ থাকলেও সে রূপ বড় উগ্র। সেই রূপের মধ্যে শান্ত সৌম্য ভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু গ্রাম্য সুন্দরীদের সৌন্দর্য সত্যিই অতুলনীয় আর তাদের সৌন্দর্যকে ঘিরে আছে অপরূপ এক স্নিগ্ধ শান্ত মাধুর্য। তারা কৃত্রিম ছলাকলায়ও অতটা দক্ষ নয়।

যদিও মাদাম আমাদঁ ছিলেন গ্রামের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ, তাঁর প্রেম ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তাঁর হাবভাব আচার-আচরণে সর্বদা এমন এক নিষ্পাপ সরলতা প্রকাশ পেত যে তিনি ছিলেন সকলের সন্দেহের উর্ধ্বে।

মাদাম আমাদঁ যখন তাঁর প্রেমিক নির্বাচন করবেন বলে স্থির করতেন, তখন সৈন্যদলের অফিসারদের মধ্যে থেকেই প্রেমিক নির্বাচন করতেন। অবশ্য তাঁর প্রেম তিন বছরের বেশি স্থায়ী হত না। কারণ প্রত্যেক সেনা অফিসারকে তিন বছর পরেই নির্দিষ্ট সেনানিবাস ছেড়ে চলে যেতে হত। এইভাবে তিনি এক একজনকে প্রেমিক হিসাবে নির্বাচন করতেন আর সে বদলি হয়ে গেলেই নূতন কোনো অফিসারের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতেন—আর এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

মাদাম আমাদঁ তাঁর প্রেমিক নির্বাচনের সময় অদ্ভুত ধরনের সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সেনাদলের অফিসারদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি প্রথমে নিশ্চিত হতেন। তারপর অফিসারদের তালিকাগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করতেন। তাকে নিজের বাড়িতে বা নাচের কোনো আসরে নিমন্ত্রণ করে তাকে তাঁর সঙ্গে নাচার জন্য আহ্বান জানাতেন। নাচের সময় মাদাম সেই সেনা অফিসারের শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করে তুলতেন এবং সেই অফিসার ভদ্রলোক তাঁর শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলোর যাতে স্পর্শ পান সেজন্য তিনি নানা ভঙ্গিতে সেগুলোকে প্রকট করে তুলতেন। সেই স্পর্শে উত্তেজিত হয়ে অফিসারটি মাদামের আসঙ্গলিপ্সায় উন্মাদ হয়ে উঠত। কিন্তু মাদাম এত সহজে নিজের শরীরকে তাঁকে ভোগ করতে দিতেন না। তিনি প্রথমে সেই অফিসারের নাড়িনক্ষত্রের খবর নিতেন, দরাজ হাতে পয়সা খরচ করতে তিনি আপত্তি করেন কি না অথবা অন্য কোনো মেয়ের প্রতি তাঁর আসক্তি আছে কি না—এসব সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সবকিছু জেনে নিতেন। এর পর যোগ্যতার বিচারে সে যদি শ্রেষ্ঠ হত তাহলে তাঁকে তিনি তাঁর বাড়িতে এক দিন নিমন্ত্রণ করে তাঁকে গোল্ডেন ইস্ট হোটেলে দেখা করতে বলতেন। বলতেন তিনি ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসের ছদ্ম নামে তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করবেন। তিনি যেন সামরিক পোশাক না পরে সাধারণ পোশাকেই সেখানে যান—একথাও বলে দিতে ভুলতেন না।

মাদাম আমাদঁ প্রায় আট বছর ধরে নীচু শ্রেণির ওই হোটেলটায় একখানা ঘর বুক করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর প্রেমিকদের সঙ্গে সেখানে সহবাসে লিপ্ত হয়ে উভয়ে আনন্দের সাগরে ভেসে যেতেন। মাদাম যে সমস্ত অফিসারকে তাঁর শয্যাসঙ্গী হিসাবে নির্বাচন করতেন তাদের বয়স ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। তাঁর মতে চল্লিশোর্ধ মানুষের একজন নারীকে তৃপ্তি দেওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে না।

মফস্‌সল শহরের অতি সাধারণ ওই হোটেলে যে ঘরটা মাদাম আমাদঁ বুক করে রেখেছিলেন সেই ঘরে আসবাব বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। দুটো চেয়ার, একটা খাট আর দুটো ইজি চেয়ার। দেওয়ালে টাঙানো ছিল তিনজন কর্নেলের ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় তিনখানা বাঁধানো ছবি।

তিনি যথাসময়ে তাঁর নির্বাচিত সঙ্গীকে নিয়ে সেই হোটেলের ঘরে ঢুকতেন। সন্ধে হলেই তিনি স্বামীকে বলে যেতেন তিনি কোনো এক সভায় যোগ দিতে যাচ্ছেন। স্বামী ভদ্রলোক তাঁর কথায় অবিশ্বাস করার কোনো কারণ খুঁজে পেতেন না। তিনি সরল মনে তাঁকে অনুমতি দিতেন কারণ ইতিপূর্বে বহু সভাসমিতিতে তাঁর স্ত্রীরত্নটি যোগ দিয়েছেন।

তিনি যখন সেই হোটেলে যেতেন সাদামাঠা পোশাক পরতেন। বেরোবার আগে মাথায় চাপিয়ে নিতেন কুমারী মেয়েদের টুপি। হোটেলে তাঁকে সবাই ম্যাদময়জেল ক্লারিসে নামে চিনত। এযাবৎ কেউ তাঁর সত্যিকারের পরিচয় জানতে পারেনি। এমনকি হোটেল মালিক ক্রভরের পক্ষেও তাঁর সত্য পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

যাহোক, সেই হোটেলে প্রতিদিন যে তিনি অভিসারে যেতেন এমন নয়, কয়েক দিন পর পর তিনি সেখানে যেতেন। গতবছর গ্রীষ্মকালে যখন প্রেসিডেন্ট মঁসিয়ে আমার্দঁ এক সপ্তাহের জন্য বাইরে যান সেই সময়ে তিনি তাঁর প্রেমিক কর্নেল বারাঙ্গোলের সঙ্গে প্রথম রাতটা কাটাবার পর দ্বিতীয় দিনে একই সময়ে ওই হোটেলে তাঁকে দেখা করতে বলেন। একথাও বলে দেন যে তিনি যদি তাঁর আগে সেখানে পৌঁছে যান, তাহলে তিনি যেন বিছানায় গিয়ে অপেক্ষা করেন।

কিন্তু হোটেল মালিক ক্রভর ভাবতেই পারেননি মাদাম আমার্দঁ পর পর দুদিন অভিসারে আসবেন তাঁর হোটেলে। এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হল কারণ আগে কখনও তিনি পর পর দুদিন তাঁর প্রেমিকদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাঁর হোটেলে আসেননি। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে একজন বোর্ডারকে দুপুরে কয়েক ঘণ্টার জন্য ওই ঘরটা ভাড়া দেন। তখন কলেরা মহামারির আকার নিয়েছে। লোকটা ওই ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে ভেদবমি শুরু হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা যায়। হোটেল মালিক ক্রভর যখন সেই দুর্ঘটনার কথা জানতে পারেন তখন হোটেলের অন্যান্য বোর্ডারদের কাছে সেটা চাপা দেবার জন্য তিনি গোপনে এক ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট জোগাড় করেন এবং পুলিশের সঙ্গে রফা করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুলিশ মধ্যরাতে তাদের কোনো লোককে দিয়ে মৃতদেহটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

এদিকে মাদাম আমার্দঁ, ম্যাদময়জেল ক্লারিসের ছদ্মবেশে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখেন তাঁর বিছানায় একজন অপরিচিত লোক শুয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে হল, কথামতো কর্নেল বারাঙ্গোল বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন অথবা জেগে থেকে ঘুমোবার ভান করছেন। সুতরাং বিবস্ত্রা হতে আর লজ্জা কোথায়! এক এক করে সমস্ত পোশাক খুলে তিনি ঢিলে একটা গাউন পরে লোকটার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু ঠান্ডা মৃতদেহের ছোঁয়া লাগতেই তিনি চমকে উঠে বাতিটা এনে ভালো করে দেখতে থাকেন এবং বুঝতে পারেন সেটা একজনের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নয়। তখন তিনি পাগলের মতো ঘর থেকে ওই পোশাকেই ছুটে বেরিয়ে আসেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন তাঁর ঘরে একজন খুন হয়েছে। তাঁর চিৎকারে হোটেলের অন্যান্য বোর্ডাররাও বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্রভরও সেখানে এসে সমস্ত ব্যাপারটাই সবাইকে বুঝিয়ে বললেন। এর মধ্যে কর্নেল বারাঙ্গোল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মাদাম আমার্দঁ তাঁকে দেখেই যেন তাঁর মনের জোর কিছুটা ফিরে পেলেন এবং তাঁকে জানালেন যে তাঁদের ঘরে একজন খুন হয়েছে।

একজন বোর্ডার বলল, পুলিশ না আসা পর্যন্ত ম্যাদময়জেল ক্ল্যারিসে ও তাঁর প্রেমিককে আটকে রাখা হোক, কারণ মৃতদেহটা ওঁদের ঘরেই পাওয়া গিয়েছে।

হোটেল মালিক ক্রভর তাঁদের হয়ে কথা বললেন, ওঁদের এভাবে আটকে রাখার কোনো দরকার নেই। আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওঁদের ছেড়ে দেবার অনুমতি চাইছি আপনাদের সকলের কাছে।

কিন্তু বোর্ডাররা ক্রুভরের কথা শুনতে চাইল না। পুলিশ না আসা পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতেই হল। সব ঘটনা শোনার পর পুলিশ ওঁদের ছেড়ে দিল কিন্তু সমস্ত গোপন ব্যাপার প্রকাশ হয়ে গেল।

সুতরাং.......

সুতরাং মঁসিয়ে আমার্দকে পরের মাসেই অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হল।

পাগল?
Mad?

আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, না ঈর্ষায় আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল?

আমার যে ঠিক কী হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলতে পারব না তবে ভয়ংকর এক কষ্ট বুকের মধ্যে সর্বদা বয়ে বেড়াচ্ছি। আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। একজন মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের পক্ষে যে অন্যায় বা অপরাধ করা সম্ভব। কিন্তু যে দুঃসহ ঈর্ষার জ্বালা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, যে প্রেমের আবেগে আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম, প্রতারিত হয়ে যেভাবে ভয়ংকর এক যন্ত্রণায় দিবারাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়েছি আর এইসবই আমাকে সে ধরনের অন্যায় অপরাধে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন অপরাধ করা আমার নেশা বা পেশা নয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় সে ধরনের অপরাধের কথা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না।

সত্যি বলতে একটি মেয়ের প্রতি ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, আমি কি মেয়েটিকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম? কিন্তু পরে আমার মনে হয়, না, তার প্রতি আমার ভালোবাসা এত গভীর, এত তীব্র ছিল যে অহরহ তার চিন্তায় আমার মন ব্যাকুল হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে মনে হত আমি বোধহয় তার হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছি। তার গোলাপপাপড়ির মতো কোমল ওষ্ঠে মৃদু হাসির ছোঁয়া, তার চোখের চকিত কটাক্ষ, তার দেহের স্বর্গীয় সুষমা যেন আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল। আমি তার তীব্র আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছি, তার শরীরী আকর্ষণের বস্তুগুলোকে আমি বিভিন্ন ঘৃণ্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে সে বিষয়ে নিজের মনে ঘৃণা উদ্রেকের চেষ্টা করেছি। চেয়েছি তাকে ত্যাগ করে দূরে সরে যেতে। কারণ তার মধ্যে পবিত্রতা বলে কিছুই ছিল না। তার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাও সে হারিয়ে ফেলেছিল, তার স্বভাবটা ছিল মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতো নোংরা, মনটা ছিল ক্লেদপূর্ণ। সে ছিল শরীরসর্বস্ব একজন নারী আর তার নরম, মাংসল আর উষ্ম শরীরটা ছিল সমস্ত অপযশ আর ঘৃণার কারণ।

তার সঙ্গে মিলনের প্রথম কয়েকটা মাস আমার কাছে ছিল পরম তৃপ্তিদায়ক। আমি যেন এক সুগভীর তৃপ্তির আনন্দে তার মধ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতাম। তবুও তার উন্মত্ত অস্থির কামমদির বাহুপীড়নে আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। তার চোখ দুটোর দুর্বার আকর্ষণে আমি হারিয়ে যেতাম, বিস্মৃত হতাম নিজের সমস্ত সত্ত্বা। আমি তার চোখের তারায় তিনরকমের রং প্রত্যক্ষ করেছি এবং তা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হতে দেখেছি। আমি লক্ষ করেছি, সে যখন প্রেম নিবেদন করে তখন তার চোখের তারা হয়ে ওঠে নীলাভ, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে নিশ্বাস বইতে থাকে অতি

দ্রুত। কামের উত্তেজনায় তার ঠোঁট দুটো কেঁপে-কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে তার গোলাপি জিভের অগ্রভাগ আমি দেখতে পাই। তা যেন কামলালসায় লালাসিক্ত হয়ে সাপের জিভের মতো লকলক করে ওঠে। তার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি হয়ে ওঠে কামনামদির। আমি যেন তা দেখে পাগল হয়ে যাই। আমি যখন তাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরি তখন কামনায় আমার সমস্ত শরীর উদ্বেল হয়ে ওঠে, রোমাঞ্চিত হই আমি। সেই মুহূর্তগুলোতে আমার যেন মনে হয় আমি শুধু ওকে লাভ করতে চাই না—কামের উত্তেজনা দুঃসহ হয়ে ওঠায় মনে হয় ওকে আমি খুন করে ফেলি।

সে যখন আমার সামনে হেঁটে বেড়াত, তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার বুকের মধ্যে ঝড় তুলত, তার পায়ের শব্দ যেন আমার বুকে প্রতিধ্বনি তৈরি করত। তারপর সে যখন আমার চোখের সামনে একটা একটা করে তার পোশাকগুলো খুলে ফেলত এবং তার শ্বেতশুভ্র কোমল শরীরের প্রতিটি অংশ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠত তখন আমার সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে যেত। আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যেত, কাঁপতে-কাঁপতে আমি বসে পড়তাম, কীভাবে ওর নরম মাংসল শরীরটা ভোগ করব তা ভেবে দিশাহারা হয়ে পড়তাম।

হঠাৎ এক দিন বুঝতে পারলাম, তার কাছে আমি অসহ্য হয়ে উঠেছি। তার চোখের উদাসীন নিস্পৃহ দৃষ্টি আমাকে সে-কথা বলে দিল। আমি তার কাছে যা প্রত্যাশা করছিলাম, তার বন্য কামনামদির দৃষ্টি। কিন্তু দেখলাম তার নীল চোখের তারা দুটো ভাবলেশহীন, সম্পূর্ণ উদাসীন। তা ছাড়া তার চোখ দুটোতে জড়িয়ে আছে সুগভীর ক্লান্তি ও বিরক্তি। হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে আগুনের জ্বালা অনুভব করি। কামনার আগুনে পুড়তে পুড়তে আমি ভয়ংকরভাবে মরিয়া হয়ে উঠলাম।

নিস্পৃহতা সত্ত্বেও তার শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে হস্ত সঞ্চালন করে আমার কামনামদির ঠোঁটের স্পর্শে তার মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চারের চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার সমস্ত প্রয়াস, আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। সে বিব্রত, বিরক্ত হয়ে আমাকে এড়িয়ে গেল। সে বলে, 'দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও, তোমাদের জন্য আমার একা থাকার স্বাধীনতাটুকুও নেই?' আমার নিজের মধ্যে কুকুরসদৃশ এক ভয়ংকর ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করলাম। আমার মনে হল ওর ভিতরে যখন সেই কামের তাড়না তীব্র হয়ে উঠবে তখন অন্য কেউ ওর ওই সুন্দর নরম শরীরের প্রতিটি অংশকে, তার নারীত্বকে তিল তিল করে ভোগ করবে এবং তার কামের জ্বালাকে শান্ত করবে। আর আমি তখন সম্পূর্ণ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে দূরে সরে থাকব। এই সমস্ত চিন্তা আমাকে ঈর্ষায় উন্মাদ করে তুলল।

বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি উন্মাদ হয়ে যাইনি। কিন্তু আমি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তার প্রতি নজর রাখতে শুরু করলাম। বুঝতে চাইলাম ওর এই নির্বিকার ভাব, ওর এই উদাসীনতা সত্যি না আমার সঙ্গে ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু দেখলাম ওর এই নিস্পৃহতা, ওর এই শীতলতাই সত্যি।

তার এই উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন করলে ও বলেছে, মানুষের কাছে ওনাকি এখন ঘৃণার পাত্রী।

দেখলাম নির্মম সত্যটাই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

তখন তার অস্তিত্বই আমার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। মনে হয় তার এই উদাসীনতা, নির্জন রাত্রিগুলোতে তার একাকীত্বের সুযোগ, তার কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ চিন্তাভাবনা সব যেন তার শয়তানির সহচর। মাঝে মাঝে লক্ষ করতাম, তার কামের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে—চোখ, মুখ, ভাবভঙ্গিতে তারই প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাকে সেই রূপে দেখে আমার সমস্ত শরীর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেত। প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণায় আমি পাগল হয়ে উঠতাম। ইচ্ছে হত ওর বুকের ওপর উঠে বসে ওর টুঁটি টিপে ধরে চিরকালের মতো ওর কামের ক্ষুধা মিটিয়ে দিই। আপনাদের কি মনে হয় আমি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি?

এক দিন রাত্রে হঠাৎ তার মধ্যে খুশির ভাব লক্ষ করলাম। নিশ্চিত হয়ে গেলাম ওর মধ্যে আবার নূতনভাবে সেই কামনার উন্মেষ ঘটেছে। আমার উষ্ণ সান্নিধ্য ও আলিঙ্গন পাবার আকাঙ্ক্ষায় তার সমস্ত শরীর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তার চোখ মুখ হয়ে উঠেছে রক্তাভ, নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অত্যন্ত দ্রুত, কামনার আগুনে শরীর হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত—এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমি এক সময় উন্মাদ, দিশাহারা, ব্যাকুল হয়ে উঠতাম।

আমি কিছুই না জানার, না দেখার ভান করলাম। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে তার ভাবান্তর লক্ষ করতে লাগলাম। কিন্তু বিশেষ কিছু তারতম্য অনুধাবন করতে পারলাম না। এইভাবে দিন, মাস, বছর পার হয়ে গেল। সময় সময় তার মুখের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কামনা-তৃপ্তির আনন্দ। এর কারণ কী হতে পারে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলাম কিন্তু আমি ব্যর্থ হলাম, কিছুই অনুধাবন করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত এর রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

এক দিন রাত্রে প্রথমে ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেদিন রাত্রে ঘোড়ার পিঠে চেপে সে আমার ঘরে এল এবং একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার মুখোমুখি বসল। তার চোখ আর মুখের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল কামনাতৃপ্ত হওয়ার ক্লান্তি, তা আনন্দ উত্তেজনা আর শ্রমে হয়ে উঠেছে রক্তাভ। দ্রুত নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দে তার সুপুষ্ট আর সুডৌল স্তন দুটো ওঠানামা করছে। অদ্ভুত সাফল্যের উত্তেজনায় তার গোটা শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। তার দুচোখ দিয়ে যেন ঝরে পড়ছে অপরিমেয় উল্লাস। ও যে প্রেমে পড়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলোতে তার এ ধরনের শরীরী প্রকাশ আগেও আমি লক্ষ করেছি। ক্রোধে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যেতে লাগল। ওকে দেখে আমার রক্তে আগুন ধরে যাচ্ছিল। পাছে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাই ওর সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালাম এবং দ্রুতপায়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম এ বাড়ির খানসামার মেয়েটো তার বাবার পিছনে পিছনে চলেছে আস্তাবলের দিকে। তারপর সে আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়াকে বার করে নিয়ে ধীরে ধীরে ফটকের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সেও আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। যত সময় না সেই সুন্দর প্রাণীটি খানসামার সঙ্গে ফটকের বাইরে দৃষ্টির আড়ালে চলে না গেল ততক্ষণ সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওই বোবা প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে রইল ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে। তারপর সে গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ভাবতে ভাবতে সমস্ত রাতটা বিনিদ্র কাটিয়ে দিলাম। যে নারী ইন্দ্রিয়সুখের জন্য উন্মাদ হয়ে বিকৃত কামবাসনা পরিতৃপ্তির বিভিন্ন উপায়ের সন্ধান করে চলেছে তার মনের জটিল রহস্যের কিনারা করবে কে?

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেত আর যখন সে ফিরে আসত তার রক্তাভ মুখের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত সেই কামনাতৃপ্তির ক্লান্তি। শেষ পর্যন্ত রহস্যের কিনারা করলাম। কোনো মানুষ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ওই ঘোড়া নামক মনুষ্যেতর প্রাণীটাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যে ওকে পিঠে করে এক শৈল্পিক ছন্দে বয়ে নিয়ে বেড়ায় দূর দূরান্তে, বনে, মাঠে, পাহাড়ের কোলে আবার কখনও বা সমুদ্রের শান্ত বেলাভূমিতে। কখনও কখনও বাতাস হয়ে ওঠে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ সে মাঝে মাঝে তার স্নিগ্ধ পেলব স্পর্শ দিয়ে তার সমস্ত সত্ত্বাকে গভীর তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। সূর্যকিরণে পরিপুষ্ট পত্রগুচ্ছ তার শরীরে প্রেমের সোহাগের পরশ বুলিয়ে দেয় তাতে সে আনন্দে তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতির কাছ থেকে যে আনন্দের স্বাদ সে লাভ করেছে তা আমার কাছ থেকে পাওয়া আনন্দের থেকে অনেক বেশি শ্রেয় তার কাছে। তাই সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এদের ওপর আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে আর তা করতে আমি বদ্ধপরিকর হলাম।

যখন সে উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আমার কাছে আসে তখন আমি তাকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করি কিন্তু ঘোড়াটা আমাকে দেখেই কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আক্রমণের ভঙ্গিতে আমার দিকে ছুটে আসে, ফুলে ওঠে তার কেশর। কিন্তু সে তখন তাকে শাসন না করে তাকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তোলে। তার এলায়িত শরীর দেখলে মনে হয় তার প্রেমিকের ভোগের জন্য তার শরীরকে সম্পূর্ণ শিথিল করে দিয়েছে। তার নিশ্বাসপ্রশ্বাসে ভেসে আসছে তার ঘোড়ার শরীরের বিচিত্র এক ঘ্রাণ।

আমি উপযুক্ত সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দুধারে সারি সারি বার্চ গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে যে পথটি বনভূমির প্রবেশপথের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে—সেই পথ ধরে সে প্রতিদিন ঘোড়ায় চেপে ছুটে যায় অরণ্যের গভীরে। সূর্যোদয়ের আগেই আমি ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। পোশাকের নীচে একটা পিস্তল এবং এক গাছা দড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাকে দেখে যে কেউ বলবে যে আমি ডুয়েল লড়তে যাচ্ছি।

এর পর যে পথ দিয়ে সে প্রতিদিন ঘোড়া ছুটিয়ে যায়—সেই পথ দিয়ে আমি অত্যন্ত সাবধান হয়ে এগোতে শুরু করলাম। যেখানে পাশাপাশি বড়ো বড়ো দুটি গাছ

দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানটা এসে আমার গতি রোধ করলাম। পাশাপাশি দুটি গাছকে ঘিরে জড়িয়ে জড়িয়ে লম্বা দড়িটাকে কষে বেঁধে দিলাম। এর পর আমি ঘনসংবদ্ধ কয়েকটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। ভূপৃষ্ঠের কম্পন জানিয়ে দেয় তার আগমন বার্তা। তেজি ঘোড়াটা তাকে পিঠে করে ছুটে আসছে। দেখলাম, শেষপর্যন্ত দেখতে পেলাম, আনন্দে উত্তেজনায় তার মুখের রং হয়ে উঠেছে রক্তাভ, দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অপরিমেয় তৃপ্তি আর সুখ। আর ওই সুখের উৎস ওই অশ্বের অস্বাভাবিক দ্রুতগতি যে গতিতে সে তাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ঘোড়াটা প্রচণ্ড গতিতে যখন ছুটে আসছিল তখন আচমকা গাছে প্যাঁচানো দড়িতে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল তেজি ঘোড়াটা সামনের পা দুটো মুড়ে। সেই মুহূর্তে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আগের তরুণী প্রেয়সীকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম পরম আন্তরিকতার সঙ্গে। এর পর আমি এগিয়ে যাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু সেটা ছিল আমার ভান। ঘোড়াটা এতক্ষণ আমাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে, ঘোড়াটা কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে আক্রমণোদ্যত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল অত্যন্ত দ্রুত এবং আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করল। এবার আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। পোশাকের ভিতর থেকে পিস্তলটা বের করে তার মাথা লক্ষ করে গুলি করলাম যেমন ডুয়েল লড়াই-এ একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আর-একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ করে গুলি করে।

আমার পূর্বতন প্রেমিকা, রোমান্টিক সঙ্গিনী ক্রোধে, ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার নখ দাঁতে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। এক সময় তার হাতের চাবুক দিয়ে আমার মুখের ওপর প্রচণ্ড জোরে মারতে থাকে। আমার মুখের চামড়া কেটে গিয়ে অজস্রধারে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। আমি তার থেকে খানিকটা পিছিয়ে সরে এলাম। কিন্তু সে আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে আরও নির্মমভাবে আঘাত করার জন্য ছুটে আসতে থাকে, এবার আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল আর সেই মুহূর্তে আমার পিস্তল গর্জে উঠল। পর পর কয়েকবার ট্রিগারটায় চাপ দিয়ে বাকি গুলিগুলো তার শরীরে ভরে দিলাম।

আপনারা এবার বিচার করুন আমি কি পাগল?

নারীর ফাঁদ
Woman's Trap

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আপনাদের যদি শোনার আগ্রহ থাকে তাহলে মন দিয়ে শুনবেন, কান দুটো রীতিমতো খাড়া করে রাখবেন। স্ত্রীজাতি হল এক ধরনের যাদুকরী। তারা আমাদের ওপর ভয়ংকর এক মোহ বা আসক্তির জাল বিস্তার করে আমাদের ফাঁদে ফেলে এবং আমাদের ভুলিয়েভালিয়ে তাদের কাজ হাসিল করে কেটে পড়ে। আমরাও তাদের ফাঁদে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকি। কিন্তু স্ত্রীজাতি অনেক ক্ষেত্রে তাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ আনে পুরুষদের বিরুদ্ধে। সে অভিযোগও হয়তো সত্যি। কিন্তু তাদের প্রতি পুরুষের মোহ বা আসক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তাদের সঙ্গে ছলনা বা প্রতারণা করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি পাওয়া দুষ্কর।

ফরাসি দেশের বিদেশ-দপ্তরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাউন্ট দ্য লিঁয় কথাগুলো বেশ আবেগের স্বরে বললেন।

এতক্ষণ লিঁয়র কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল একজন যুবক।

একটু থেমে লিঁয় আবার সেই প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। তোমাদের কাছে আমি এখন যে ঘটনাটা বলব সেটা একজন সাধারণ স্ত্রীলোকের। সে একজন সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের স্ত্রী। সে ছলনার আশ্রয় নিয়ে যেভাবে আমাকে প্রতারিত করেছিল সেই কাহিনিটি তোমাদের কাছে বলব। মন দিয়ে শুনবে কিন্তু।

সেসময় আমি বিদেশ-দপ্তরের মন্ত্রীর পদে জাঁকিয়ে বসে আছি। প্রতিদিন সকালে শ্যাম এলিমির মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশে বেড়াতে যেতাম এবং সেখানে মুক্ত বায়ু সেবন করতাম। সেখানে প্রতিদিন দেখতাম একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চলাব গতিতে ঔদ্ধত্য আর অহংকার। স্ত্রীলোকটি যখন হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত সে তখন আমাকে কটাক্ষ করত এবং অর্থপূর্ণ হাসি হাসত। এক দিন যখন সে একাকী একটা বেঞ্চের ওপর বসেছিল তখন তার পাশে এসে বসলাম আর তার সঙ্গে যেচে আলাপ করলাম। প্রথম আলাপে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হল। সে তার স্বামীর পরিচয় দিয়ে বলল, তার স্বামী একজন সামান্য কেরানি। আমি যখন আমার পরিচয় দিলাম সে বেশ অবাক হল।

পর দিন সে এল আমার দপ্তরে। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখা করতে লাগলাম। সময় সুযোগ মতো আমরা যৌন সঙ্গম করতাম। প্রতিদিন সকালে আমাদের সাক্ষাতের জায়গা ছিল গাছপালায় ঘেরা নিভৃত একটি কোণ। তখনই আমরা ঠিক করে নিতাম পরে কখন কোথায় আমরা দেখা করব।

মাস দুই পরের কথা। এক দিন সকালে হঠাৎ লক্ষ করলাম তার মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর। মনে হল তার চোখ দুটো ছলছল করছে। আমি একরাশ উদ্‌বেগ নিয়ে

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কী হয়েছে?

সে বলল, আমার গর্ভে সন্তান এসেছে।

আমি বললাম, এতে এত ভয় পাওয়ার কী আছে। তোমার তো বিয়ে হয়েছে আর স্বামী বর্তমান।

সে বলল, হ্যাঁ, আমার স্বামী আছে ঠিকই, কিন্তু মাস ছয়েক হল সে এখান থেকে চলে গেছে। এখন সে ইটালিতে আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেও মনে হয় না।

তার কথা শুনে আমি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়লাম। এই অবৈধ অবাঞ্ছিত সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব আর অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পথের সন্ধান করতে লাগলাম।

এই জটিল সমস্যাটা নিয়ে যখন গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি, তখন মগজে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, তুমি এখনই তোমার স্বামীর কাছে ইটালিতে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। সেখানে হঠাৎ তোমাকে দেখে তোমার স্বামী যখন তোমার সেখানে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করবে, তখন তুমি এমন একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেবে যেটা তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

দেখলাম, আমার যুক্তি সে স্বীকার করে নিয়েছে। তবুও যখন তাকে ইতস্তত করতে দেখলাম তখন মনে হল—তার কিছু টাকার দরকার। তখন তাকে পথখরচ বাবদ কিছু টাকা দিয়ে বললাম, দেরি না করে তাড়াতাড়ি সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

কয়েক দিন পরে সে আমার নামে ডাকে একখানা চিঠি পাঠাল। চিঠি পড়ে জানতে পারলাম, সে সুস্থ আছে তবে তার পেটের আকার ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। তার স্বামী খারাপ কিছু সন্দেহ করেনি। প্রসবের সমস্ত ঝামেলা চুকে গেলে সে একটু সুস্থ হলেই দেশে ফিরে আসবে।

আট মাস পরে আবার তার একটা চিঠি পেলাম। তাতে সে লিখেছে—সে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে।

এর প্রায় এক মাস পরে সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। তখন আমি মন্ত্রীত্ব থেকে অবসর নিয়ে, রু দ্য গ্রেনেলে আমার যে বাড়ি আছে, সেখানে এসে বসবাস করছিলাম। তার সঙ্গে আবার আগের মতো দেখাসাক্ষাৎ হতে লাগল। এক দিন সে অভিযোগ করে বলল, তোমার প্রাণে দয়া মায়া বলে কিছু নেই। তোমার ছেলেকে কি একবারও তোমার দেখার ইচ্ছা হয় না?

আমি বললাম, তাকে দেখেই বা আমি কী করব? তার খাওয়াদাওয়া বা দেখাশোনার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য বরং আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে পারি।

কিন্তু সে আমাকে এমনভাবে ছেলেটাকে দেখার জন্য অনুরোধ করতে লাগল যে আমি একরকম বাধ্য হয়েই তাকে দেখতে যাব বলে কথা দিলাম। সে বলল সে ছেলেকে কোলে করে ওই পার্কেই নিয়ে আসবে।

কিন্তু আমি কথা রাখলাম না। আমি সেখানে না গিয়ে আমার ভাইএর কাছে ওই

স্ত্রীলোকটির ঠিকানা দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বললাম। আমি সেখানে যাইনি, পাছে তার মায়ায় পড়ে গিয়ে বিশ্রী ঘটনাটার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। যা হোক ভাইকে সমস্ত কথা খুলে বলে তাকে স্ত্রীলোকটির ঠিকানায় দেখা করার জন্য অনুরোধ করলাম।

আমার ভাই তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার দেখা হল না। কারণ তখন সে বাড়িতে ছিল না। কিন্তু সেখানকার অন্যান্য লোকেরা জানাল তার আদৌ কোনো সন্তান হয়নি আর সে কখনও ইটালিতেও যায়নি। তার স্বামীরও ইটালি যাওয়ার দরকার হয়নি। সে বেশ ভালো এবং একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

ভাইএর কাছে যখন সমস্ত কিছু জানতে পারলাম তখন আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ভীষণ রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যেতে লাগল। স্ত্রীলোকটি শেষ পর্যন্ত ছলনার আশ্রয় নিয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যাই হোক আমি একটা দিন স্থির করে তাকে আমার বাড়িতে দেখা করতে বললাম। তারপর ভাইকে ডেকে বললাম—আমি সেদিন উপস্থিত থাকব না। তুমি তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে কেন সে আমার সঙ্গে এইভাবে প্রতারণা করল। আমি ভাইএর হাতে দশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে বললাম, তুমি ওই স্ত্রীলোকটিকে এই টাকাটা দিয়ে বলবে সে যেন আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা করার চেষ্টা না করে।

যেদিন সে আমার বাড়িতে এল, আমি যেমন বলে দিয়েছিলাম আমার ভাই সেই কথাগুলোই তাকে বলল। সে প্রত্যুত্তরে জানাল, সে যদি এভাবে ছলনার আশ্রয় না নিত তাহলে কাউন্টের মতো একজন ধনী পদাধিকারী ব্যক্তিকে এভাবে তার শরীরের প্রলোভন দেখিয়ে বশীভূত করতে পারত না। কাউন্ট যদি সেদিন পার্কে আসতেন তাহলে সে তার দিদির ছেলেকে কোলে নিয়ে যেত।

টাকার বান্ডিলটা তুলে নিয়ে সে বলল, এভাবে কাউন্টকে প্রতারিত করার জন্য আমি দুঃখিত। তাঁর সঙ্গে কি আমার আর কোনো দিন দেখা হবে না?

আমার ভাই সেদিন বলেছিল, না, কখনই তোমার সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। তোমাকে সে ভীষণ ঘৃণা করে।

সে-কথা শুনে স্ত্রীলোকটির মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। সে কিছুই শোনেনি এমন একটা ভাব করে টাকাটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তাই বলছি, নারীজাতি থেকে সাবধান, ওদের ফাঁদে পা দিলে তার আর রেহাই নেই।

পরিবর্ত
The Substitute

''ইনিই কি সেই মাদাম বন্দেরয় যাঁর কথা তুমি বলছিলে?''

''হ্যাঁ, ইনিই সেই মাদাম বন্দেরয়।''

''আমি বিশ্বাস করি না।''

''আমি যা বলছি সেটাই সত্যি, ইনিই মাদাম বন্দেরয়।''

''রিবনের তৈরি টুপি পরে যিনি গির্জায় যান সকাল সন্ধ্যায়। যিনি যিশুর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেন, সেই ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধাই কি সেই মাদাম বন্দেরয়?''

''আরে হ্যাঁ বাবা, আমি তাঁর কথাই বলছি।''

''আর এই সাতসকালে কি তুমি গাদাখানেক মদ গিলে এসেছ—না মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।''

''আমার মাথাও খারাপ হয়নি বা নেশাও করিনি। বিশ্বাস কর উনিই সেই মাদাম বন্দেরয়।''

''তাহলে ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল।''

''শোনো তাহলে :''

একজন উকিল হিসাবে ভদ্রমহিলার স্বামী মঁসিয়ে বন্দেরয় খুব নাম করেছিলেন। সন্তানভাগ্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন। মাদাম বন্দেরয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হলেও তাঁর যৌন লালসা ছিল তীব্র। বিকৃতকামে তিনি সব থেকে বেশি তৃপ্তি পেতেন। লোকের ধারণা ছিল তাঁর কামের ক্ষুধা মেটাবার জন্য তিনি অনেক সময় তাঁর স্বামীর কেরানিদের মধ্য থেকে বলিষ্ঠদেহী কাউকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে রাত কাটাতেন। বিভিন্ন ভঙ্গি বা পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি তাঁর সেই যৌন লালসা বা বিকৃতি চরিতার্থ করতেন।

এর পর তাঁর স্বামীর যখন মৃত্যু হল তখন অবাধে তাঁর যৌন কামনা চরিতার্থ করার বিভিন্ন পথ খুলে গেল। স্বামীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি যা পেয়েছিলেন তাতে তাঁর আহারবিহার বা বিলাসব্যসনের কোনো অভাব রইল না। কিন্তু তাঁকে বাইরে থেকে দেখে কেউ ধারণাই করতে পারত না তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন একজন কুৎসিত ও জঘন্য চরিত্রের নারী। কারণ তিনি নিয়মিত গির্জায় গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনো অন্যায় হতে দেখলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন।

তুমি একটা ঘটনার কথা শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে যাবে। মাদাম বন্দেরয়ের জন্য দুজন মিলিটারি- অফিসার ডুয়েল লড়েছিল আর তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা নিজেরাই স্বীকার করেছিল মাদাম বান্দারয়ের জন্য তারা ডুয়েল লড়েছে, অবশ্য তাতে তারা কেউ আহত হয়নি। পরে তাদের মধ্যে আবার বন্ধুত্ব হয়।

"তাই নাকি?"

তাহলে শোনো। অবশ্য ব্যাপারটা আমি শুনেছিলাম আমার সেই মিলিটারি বন্ধুর কাছ থেকে। ঘটনার প্রথম সূত্রপাত বছর দেড়েক আগে। মিলিটারি বন্ধুটি বলল, এক দিন সন্ধেবেলা সে যখন তাদের ব্যারাকের সামনে ঘোরাফেরা করছিল, তখন কোথা থেকে একজন মধ্যবয়সি মহিলা এসে বলল, সে কি সপ্তাহে দশ ফ্রাঙ্ক উপার্জন করতে ইচ্ছুক?

তাতে সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তখন স্ত্রীলোকটি বলল, তাহলে আগামীকাল বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর। বাড়ির ঠিকানাটা নোট করে নাও, ৬, রু দ্য লী ত্রানসী।

পর দিন সঠিক সময়ে বন্ধুটি সামরিক পোশাক পরে মাথায় হেলমেট চাপিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হল। মাদাম বন্দেরয় নিজে দরজা খুলে দিলেন। তারপর ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে। সোফার ওপরে বসতে বলে তাকে বললেন, একথা যদি কাকপক্ষীতেও জানতে পারে তাহলে তোমাকে জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়ব, বলে দিলাম।

আমার বন্ধু তখনও পর্যন্ত জানতে পারেনি তাকে কী কাজ করতে হবে। সে শুধু রোজগারের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তাঁর কথাতে সম্মতি জানাল, বলল, আপনার কাজের কথাটা অবশ্যই গোপন থাকবে আর সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তারপর মাদাম বন্দেরয় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বুঝিয়ে দিলেন তাকে কী করতে হবে। সেও মুহূর্তের মধ্যে নিজের পোশাকটোশাক খুলে ফেলল। এর পর মাদাম এসে তাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলেন। মাদাম বন্দেরয় যুবতী না হলেও তাঁর শরীরের গঠন দেখে কিছু কম লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত না। যাহোক প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে তার কাজ শেষ করে বেরিয়ে এল। ফিরে আসার সময় নিয়ে এল দশ ফ্রাঁর একটি স্বর্ণমুদ্রা। মাদাম বন্দেরয়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমার বন্ধুটি যথাসময়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হত। এভাবে কেটে গেল প্রায় একটা বছর। এক দিন আমার বন্ধু অসুস্থ হওয়ায়, সে তার এক বন্ধুকে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত জানিয়ে, সমস্ত কিছু বুঝিয়ে তাকে মাদাম বন্দেরয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। মাদাম প্রথমে সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকটিকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যান। কিন্তু যুবকটি যখন তাঁকে সবকিছু খুলে বলল তখন তাকে তাঁর নিজের বিশেষ কাজে ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি করলেন না। পরে তিনি দুজনকেই ওই কাজে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সপ্তাহের দুটো দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন দুজনের জন্য। তারা দুজনেই প্রত্যেকে তাদের কাজের জন্য দশ ফ্রাঁ হিসাবে পেতে থাকল। এর পর আমার বন্ধু সেই সামরিক অফিসার অকপটে স্বীকার করল, সে এই কাজ করে প্রতিমাসে সময়মতো তার বাবার কাছে টাকা পাঠাতে পারে। সবটাই পাঠায়, নিজের জন্য একটি কপর্দকও খরচ না করে। তাতে সবদিক রক্ষা পায়।

মাতাল
The Drunkard

উত্তুরে ঝোড়ো হাওয়া ভয়ংকর বেগে বইতে শুরু করেছে। আর সেটা সঙ্গে করে নিয়ে এল ভয়ংকর দৈত্যের মতো বিশালাকারের একখানি ঘন কালো মেঘ। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই মেঘ মারাত্মক বৃষ্টির আকার নিয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

এদিকে সমুদ্রের বুকে বিশাল বিশাল ঢেউ-এর তীব্র গর্জন। সেই শব্দ আর সেই সঙ্গে মাথা সমান উঁচু ঢেউগুলো উপকূলের দিকে ছুটে গিয়ে সেখানে ভেঙে পড়ছে, সেখানকার মাটিকে কাঁপিয়ে দিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে সাদা রঙের ফেনা। যেন ভয়ংকর কোনো পরিশ্রমরত দৈত্যের সমস্ত শরীর বেয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম।

এই ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে ইপোটের ছোটো একটা উপত্যকায়। বিশৃঙ্খল সেই ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে শোনা যায় তীক্ষ্ণ শিসের মতো শোঁশোঁ শব্দ আর ক্রুদ্ধ দানবের গর্জন। অনেক বাড়ির ছাদ থেকে টালিগুলো বহু দূরে উড়ে গিয়ে গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে অথবা মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। জানালার খড়খড়িগুলো বাতাসের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চিমনিগুলো উড়ে গিয়ে পড়ছে মাটিতে। সেই ঝড়ের বেগ এত প্রচণ্ড যে দেয়াল না ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোনো মানুষের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। এই ঝড়ের কবলে পড়লে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা বাড়ির চৌহদ্দি থেকে উড়ে গিয়ে শুকনো দেশলাই বাক্সের মতো দূরের কোনো মাঠের ওপর এসে আছড়ে পড়বে।

ওইরকম ভয়ংকর ঢেউএর আঘাতে যাতে জেলে ডিঙ্গিগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে না যায় সেজন্য সেগুলোকে জল থেকে টেনে এনে রাখা হয়েছে কোনো নিরাপদ জায়গায়। জেলেদের মধ্যে কয়েকজন ডাঙায় তুলে আনা নৌকোর খোলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব আর সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো বড়ো বড়ো ঢেউ অবাক হয়ে লক্ষ করে চলেছে। ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই প্রায় সকলেই ওই ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ি ফিরে আসে।

কিন্তু ওই দুর্যোগে শুধু দুজন রয়ে গেল। তারা পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছে। প্রবল ঝড়ের দাপটে তাদের পিঠগুলো যেন বাঁকা ধনুকের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উলের টুপি দিয়ে তারা ঢেকে ফেলেছে তাদের চোখ আর কান। এই নর্মান জেলে দুজনের চুলের গোছা, দাড়ি আর গোঁফ গলা ও ঘাড় ছাড়িয়ে গিয়ে বুক ও পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্যের তাপে আর সমুদ্রের লবণাক্ত জলে তাদের চামড়া পুড়ে তামার রং ধরেছে। শিকারি পাখির দৃষ্টি নিয়ে তারা আকাশের ভাব লক্ষ করছে।

তাদের মধ্যে একজন আরেকজনকে বলল, "জেরিমি, এসো আমরা কিছুক্ষণ

ডোমিনিজ খেলে সময় কাটাবার চেষ্টা করি। টাকার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না, আমিই টাকা দেব।"

কিন্তু জেরিমির মনে মনে আপত্তি, সে জানে খেলার নেশা যখন জমে উঠবে, তখন তারা গলা পর্যন্ত মদ গিলবে। হই চই হল্লা করবে, জানতেও পারবে না সময় কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল—কিন্তু তার চিন্তা শুধু ঘরে তার বউ একা রয়েছে।

সকলে জানে তুমি প্রত্যেক রাত্রিতে আমাকে পয়সা খরচ করে মদ খাওয়াও। কিন্তু জিজ্ঞেস করি—আমার পিছনে এত পয়সা খরচ করে তোমার কী লাভ?

তার কথা শুনে সে এমন দরাজ গলায় হেসে উঠল যেন তার নেশার পয়সা অন্য লোক জোগান দেয়।

সে এমন তাচ্ছিল্যের স্বরে হেসে উঠল যেন ও জেরেমির নেশার জোগান দেওয়ার জন্য যে পয়সা খরচ করে তা ও রোজ কোনো ফুটপাথের ভিখিরিকে দান করে দেয়। তখনও মাথুরিন জেরিমির হাত ধরে আছে। তার মেজাজ মর্জি যেন আজ খুশিতে ভরপুর।

"এমন ঝড়জলের রাতে পেটে গরম কিছু না ঢুকিয়ে তোমার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হয়? তুমি ভেবো না, তোমার বুড়ি বউ তার শরীরের তাপে নিশ্চয়ই তোমার বিছানাটা গরম করে রাখবে।"

"তুমি নিশ্চয়ই জানো, এক রাতে আমি আমার বাড়ির দরজা খুঁজে পাইনি। একটা নর্দমার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলাম। সকালবেলা লোকজন দেখতে পেয়ে সেখান থেকে আমাকে তুলে আনে।"

ওই দৃশ্যটা যখন মাথুরিন বুড়োর চোখের সামনে ভেসে উঠল, হেসে উঠল হোহো করে—তারপর জেরিমির হাত ধরে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে চলল পারেমিলের কাফের দিকে। জেরিমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পিছন দিকের ঝোড়ো বাতাস আর সামনের দিক থেকে মানুষের টানে সে যেন দুর্বল হয়ে পড়ল: তার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল।

নীচের দিকের ঘরটায় নাবিকরা এক জায়গায় জটলা করছে। তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরটা প্রায় অন্ধকার। তার সঙ্গে তাদের হই হই আর চিৎকার। উলের জ্যাকেট পরা লোকগুলো টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে করে আপন মনে বকে চলেছে। ভরপেট মদ গিলে তারা মাতাল হয়ে চিৎকারের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।

জেরিমি আর বুড়ো মাথুরিন ধোঁয়াভরতি ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা কোণ বেছে নিয়ে খেলা শুরু করে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েক বোতল মদ তারা সাবাড় করে। খেলা যত জমতে থাকে, গ্লাসের পর গ্লাস ভর্তি মদ ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে।

মাথুরিন সেয়ানা, যতটা মদ সে গ্লাসে করে নিচ্ছে, তার অনেকটাই ফেলে দিচ্ছে বাইরে। দোকানের মালিককে চোখ টিপে ইশারা করছে। লোকটা ব্যাপারটা লক্ষ করে মজা পাচ্ছে।

জেরিমি কিন্তু গ্লাসের পর গ্লাস গলার ভিতর দিয়ে চালান করে দিচ্ছে। মাথা দুলিয়ে বিকৃত স্বরে গান গেয়ে চলেছে। কখনও হ্যাহ্যা করে হাসছে। মনে হচ্ছে কোনো বন্যপশু মদের ঠেকে ঢুকে পড়ে ডাকতে শুরু করেছে। কৃতজ্ঞতার চোখে তার সঙ্গীকে বারবার দেখছে সে।

ধীরে ধীরে কাফেটা ফাঁকা হতে লাগল। এক এক করে যে যার বড়ির রাস্তা ধরল। যখনই একজন বাইরে বেরোবার জন্য কাফের দরজাটা খুলছে সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জোলো হাওয়া ভিতরে এসে ঝাপটা মারছে আর তার দাপটে মোমের আলোগুলো নিভে যেতে চাইছে। জমাট বাঁধা পাইপের ধোঁয়া পাতলা হয়ে নাচতে নাচতে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বেশ কিছুটা বেরিয়ে যায়। সেইসঙ্গে শোনা যায় সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে মিশে যাওয়া বাতাসের রিক্ত হাহাকার।

মদের ঘোরে জেরিমি টলছে। ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছে না, পা দুটো বেঁকে যাচ্ছে। হাত দুটোতে কোনো জোর নেই, দুপাশে অবশ হয়ে ঝুলছে। এক হাতে ধরা আছে তাসগুলো আর তা থেকে মাঝে মাঝে দু-একটা এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে।

ঘরে এখন মাথুরিন আর জেরিমি আর দোকানের মালিক। অন্য সবাই ঘর ফাঁকা করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মালিক জিজ্ঞেস করে, "কী জেরিমি, বেশ মজা লাগছে তো! এতক্ষণ ধরে অনেকটাই তো পেটের মধ্যে ঢুকিয়েছ, বেশ চাঙ্গা বোধ করছ তো।"

বিকৃত স্বরে থুতু ছিটিয়ে বলল, "ওতে কিছু হয়নি—এখনও ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।"

"তোমার বন্ধু মাথুরিনের অবস্থাটা এখন কীরকম, তাকেও তো বেশ চাঙ্গা মনে হচ্ছে।"

দুজনে জেরিমিকে নিয়ে রসিকতা করে। এক সময় তাদের খেলা শেষ হয়। তখন মালিক বলল, শোনো, আমি এখন বিছানায় গিয়ে শোব। এখানে বাতিটা রইল আর রেখে যাচ্ছি এক বোতল মদ। মাল খাওয়া শেষ করে, মাথুরিন তুমি রোজকার মতো তালা দিয়ে চাবিটা ভেতরে ফেলে দেবে।

মাথুরিন তার কথায় সম্মতি জানাল। কাফের মালিক শুয়ে পড়ার জন্য অন্য আর একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে।

এর পর আরও কিছুক্ষণ ধরে তারা খেলা করে। মাঝে মাঝে শোনা যায় বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। আবার জেরিমির গ্লাসে বোতল থেকে মদ ঢালে মাথুরিন আর জেরিমি সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা করে দেয় গ্লাস। এদিকে ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার শব্দ হল।

মাথুরিন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলো জেরিমি, অনেক রাত হয়েছে। বেশিক্ষণ আমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না।

জেরিমি অতি কষ্টে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলে ফেলে। মাথুরিন তখন মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এর পর দরজায় তালা দিয়ে, জেরিমির কাছ থেকে বিদায় নেয়। বলে, "শুভরাত্রি বন্ধু,

কাল আবার দেখা হবে।'' কথাগুলো বলেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল মাথুরিন।

জেরিমি তিন পা এগোয়, এক পা পেছোয়-- এইভাবে টলতে টলতে সে এগোতে থাকে। কোনোরকমে টাল সামলায়। এক সময় সে বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছোয়। বাড়ি চিনতে আজ আর তার ভুল হয়নি। এর পর দমাদম দরজার গায়ে ঘুসি মারতে মারতে তার বউএর নাম ধরে ডাকতে থাকে।

এতক্ষণ সে দরজার গায়ে তার সমস্ত শরীরের ভার রেখে দাঁড়িয়েছিল। মাতাল স্বামীর গলার শব্দ পেয়ে বউ মেলিনা এসে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বেসামাল হয়ে উলটে পড়ে ঘরের মধ্যে। তার মাথাটা সশব্দে মেঝেতে ঠুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা ফুলে ওঠে। যন্ত্রণা হতে থাকে সেখানে। মাতাল হলেও সে একেবারে জ্ঞান হারায়নি। হঠাৎ মনে হল, ভারী চেহারার কেউ একজন তার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ভূতপ্রেত অশরীরীতে জেরিমির বিশ্বাস। ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। নেশার ঘোরও খানিকটা কেটে গেল। কে ছুটে গেল তার পাশ দিয়ে এমন দুর্যোগের রাতে, নিশুতি অন্ধকারে! সে শুনেছে এই অন্ধকারে, এই ঝড় জলের রাতে ওইসব অশরীরীরা ঘুরে বেড়ায়। ভয়ে তার হাত-পা নড়তে চায় না। যখন বুঝল তার পাশে আর কেউ নেই, তখন তার আগেকার মাতালের বুদ্ধি ফিরে এল।

ধীরে ধীরে উঠে বসে সে। ভয়ের ভাব কেটে গিয়ে তার মধ্যে একটু একটু করে সাহস ফিরে আসে। জড়ানো গলায় তার বউ এর নাম ধরে ডেকে ওঠে। হঠাৎ তার মাথা গরম হয়ে উঠতে শুরু করে। তার মনে কুৎসিত এক সন্দেহ এসে ভর করে। সে ঘরের মেঝেতে স্থির হয়ে বসে থাকে।

তীক্ষ্ণস্বরে সে চিৎকার করে ওঠে, মেলিনা, যে লোকটা এক্ষুণি আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, সে লোকটা কে, ঠিক করে বল। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমি কিছু বলব না।

সে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে কিন্তু কোনো উত্তর আসে না মেলিনার কাছ থেকে। উত্তর না পেয়ে তার মাথাটা আরও গরম হয়ে ওঠে।

''আমি আর মদ খাব না, কথা দিচ্ছি মদ আমি আর খাব না। ওই বুড়ো মাথুরিন আমাকে জোর করে মদ গিলিয়েছে যাতে আমার বাড়ি ফিরতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়।''

তবুও তার কথার কোনো উত্তর আসে না। এবার জেরিমি নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করতে থাকে, এই মেলিনা, হারামি, এখনও বলছি সত্যি কথা বল, কে ছিল লোকটা? না বললে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

মেলিনার কথা শোনার জন্য সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকে কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে সে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে।

''এখন বুঝতে পারছি, কেন আমাকে কাফেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এত জোরাজুরি। কেন আমাকে পয়সা খরচ করে মদ খাওয়ানো। এইজন্য মদ খাওয়ানোর

অজুহাতে আমার বাড়ি ফেরায় দেরি করিয়ে দেওয়া। কারও সঙ্গে নিশ্চয়ই চুক্তি করে মাথুরিন দিনের পর দিন এটা করে যাচ্ছে, নাহলে বিনা স্বার্থে সে আমাকে মদ খাওয়াতে রোজ এত পয়সা খরচ করে। ওহ্, শালা শুয়ারের বাচ্চা!"

মাতালের রাগ বলে কথা, রাগে সে এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

সে আবার জড়ানো গলায় চিৎকার করে ওঠে, মেলিনা, এখনও লোকটার নাম বল। না বললে, তোর মাথাটা কিন্তু আমি ভেঙে দেব, সাবধান।

মদের তপ্ত প্রভাব তার সমস্ত শিরা উপশিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে একটা বড় কাঠের চেয়ার তুলে নেয় তার দুহাতে আর বিছানার কাছে এগিয়ে এসে, বিছানার ওপর ওই চেয়ারটা দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে বারবার। ও জানে তার বউ এখন গরম শরীর নিয়ে শুয়ে আছে আর একটু আগের ঘটনায় তার সমস্ত শরীর জুড়ে আবেশ। চেয়ারটা দিয়ে পেটাতে পেটাতে সে আবার চিৎকার করে, চেঁচাতে চেঁচাতে আমার গলা ফেটে যাচ্ছে আর ও মাগি এখানে মটকা মেরে পড়ে আছে। আবার সে চেয়ারটা দিয়ে দমাদম পিটতে থাকে। এবার বিছানার দিক থেকে একটা মর্মান্তিক আর্তনাদ ভেসে আসে। মাথায় যেন তার খুন চড়ে যায়। মারতে মারতে চেয়ারের একটা হাতল খুলে আসে। এবার সে সেটা দিয়ে মারতে থাকে। এতক্ষণ সেই আর্তনাদের শব্দ একেবারে থেমে যায়। জেরিমিও এবার চেয়ারের হাতলটাকে এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে আবার চিৎকার করে ওঠে, এবার বল, কে এসেছিল, সত্যি করে বল, না হলে বাঁশপেটা করব।"

তবুও কোনো উত্তর আসে না। শেষ পর্যন্ত নেশার শরীরে অতিরিক্ত উত্তেজনা আর অবসাদ সে সহ্য করতে পারে না। আচ্ছন্ন অবশ হয়ে সে বসে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে আর ঘুমের অন্ধকার গভীরে তলিয়ে যায়।

সকাল হতেই পাশের বাড়ির মাইকেল দরজা খোলা দেখে ভিতরে ঢুকে পড়ে। দেখে, মেঝের ওপর হাঁ করে ঘুমোচ্ছে জেরিমি, তার চারিদিকে মেঝের ওপর ভাঙা চেয়ারের টুকরো ছড়ানো আর বিছানার ওপর বীভৎসভাবে বিকৃত ও থেঁতলে যাওয়া একটা মৃতদেহ—দেখে চেনা যায় না। তার চারিপাশে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে।

লা মরিলনি
La Morrillonne

তাকে সকলে লা মরিলনি নামেই ডাকত। শুধু তার এক গোছা ঘন কালো চুল এবং শরৎকালের পাতার মতো পায়ের রংএর জন্য নয়, তার কালো জামের মতো ঠোঁটের জন্য।

যেহেতু এখানকার সমস্ত লোক ফরসা এবং তাদের চুলগুলো বাদামি রংএর সেইহেতু তারও গায়ের রং ফরসা হওয়ার কথা ছিল, তাই এ অঞ্চলের মানুষ ধারণা করত মরিলনি বংশের কোনো মহিলা পূর্বপুরুষ কোনো নীল মুখের কোনো পর্যটকের প্রেমে পড়ে এবং তার সঙ্গে শারীরিক সংসর্গের ফলে যার জন্ম হয় তারই রক্ত নিশ্চয়ই মরিলনির ধমনীর মধ্যে বয়ে যাবার ফলে তার গায়ের রং হয়ে উঠেছে এমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

কিন্তু সেই পূর্বপুরুষের কাছ থেকে শুধু সে গায়ের রংটাই পায়নি, পেয়েছে কুটিল এবং হিংস্র একটা মন। মাঝে মাঝে তার চোখ দুটোর মধ্যে একরোখা ঘৃণ্য কোনো প্রাণীর হিংস্র চোখের আলো ঝলসে উঠত।

সুন্দরী সে মোটেই নয়। তাকে শুধু কুৎসিত বললে ভুল বলা হবে, সে একেবারে হতকুচ্ছিত। তার থ্যাবড়ানো নাকটা দেখলে মনে হবে কেউ ঘুসি মেরে তার নাকের ওই অবস্থা করেছে। তা ছাড়া তার দুর্গন্ধিযুক্ত মুখ দিয়ে ভয়ংকর লোভে সর্বদা লালা ঝরে চলেছে। তার মাথার চুলগুলো এমন মোটা আর উশকোখশকো এবং অপরিষ্কার যে মনে হয় সেটা নোংরা কোনো পোকামাকড়ের বাসা।

তার রোগাপাতলা চেহারাটা যেন জ্বরে ধুঁকছে, সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—সে বিকটাকারের এক অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত জীব। এ ধরনের কদাকার কুৎসিত চেহারা সত্ত্বেও পাড়ার বহু যুবক তার দেহ ভোগ করতে আপত্তি করেনি।

তার বয়স যখন বারো, গ্রামের প্রায় সকলকে নিয়ে রাত কাটিয়েছে তা ছাড়া তার নিজের বয়সি বহু ছেলেকে গোপন কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে যৌনক্রিয়া করত।

গ্রামের যুবকরা জেলের ভয় না করে তার সঙ্গে মেলামেশা করত। তাদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ, বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা, যেমন খামারমালিক এক্রুসিয়াস, ভূতপূর্ব মেয়র এম মার্টিন এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিক এই নোংরা শরীরের এবং নোংরা চরিত্রের মেয়েটির কামনার আসঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। গাঁয়ের পুলিশ এ ব্যাপারে তাদের ওপর মোটেই রূঢ় হতে পারতেন না, কারণ লোকের ধারণা এ ব্যাপারে তিনি সমান দোষে দোষী।

ফলটা যা দাঁড়াল, তাকে বাধা দেবার কেউ রইল না বলে সে অবাধে চালিয়ে যেতে

লাগল নোংরা কাজকর্ম। মরিলনি হয়ে উঠল গ্রামের প্রায় সকলের কামপীড়ার মহৌষধ। সকলের কাম শান্ত করতেই যেন তার জন্ম হয়েছে। সেদিন গ্রামের স্কুলের মাস্টারমশাই এই কথাই বলছিলেন। যিনি নিজেই তাঁর ইচ্ছা হলেই মরিলনির দেহটাকে ভোগ করার সুযোগ পান। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, এ ব্যাপারে কেউ কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল না। সে এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তরিত হয়ে চলেছিল এবং যেদিন একজন এ ব্যাপারে খুব অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, মরিলনি তার নির্বোধ প্রশ্ন শুনে তাকে বলল, সকলকে কি আমি খুশি করতে পারিনি?

এমন যেখানে অবস্থা সেখানে কেউ কি তার একচেটিয়া অধিকার দাবি করতে পারে, সে ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠলেও?

কেউ তার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারত না নিজের সম্পত্তি মনে করে। সে কিন্তু মোটেই স্বার্থপর ছিল না। টাকা বা যে সমস্ত জিনিস সে উপহার পেত তা নিতেও তার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে কারও কাছে কিছু দাবি করা পছন্দ করত না। কেউ যদি তাকে চুরি করে কোনো জিনিস দিত সে খুব আনন্দ পেত কারণ চুরির জিনিস পাওয়ার মধ্যে সে অদ্ভুত এক আনন্দের শিহরণ অনুভব করত। তাকে সম্পূর্ণভাবে পাবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। সে যত বড় বীর বা মাস্‌ল ম্যান হোক না কেন তাকে বশে আনা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কয়েকজন যে সে ধরনের চেষ্টা করেনি তা নয়, তবে কেউ সফল হতে পারেনি।

কিন্তু এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম ব্রু নামে গ্রামের একজন মেষপালক। সে মাঠের শেষ প্রান্তে অস্থাবর একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করত। ভালোবাসা সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু নোংরা নোংরা ব্যাপারে মাঝে মাঝে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হত। কিন্তু কেউই তার সামনে কিছু বলতে সাহস পেত না। কারণ, প্রথমত, তার শারীরিক শক্তি ছিল অসাধারণ এবং সে তার ভয়ংকর অশুভ দৃষ্টি দিয়ে বাণ মেরে গবাদিপশুদের পঙ্গু করে দিতে এবং তাদের মৃত্যু ঘটাতে বা কারও খেতের ফসল নষ্ট করে দিতে পারত। দ্বিতীয়ত, তার নেকড়ের মতো এমন তিনটি কুকুর ছিল যে তারা তাদের প্রভুর নির্দেশে মানুষকে জীবন্ত ছিঁড়ে ফেলত।

কিন্তু যেহেতু একমাত্র ব্রুর লা মরিলনির জন্য কোনো লালসা বা কামনা ছিল না সেই হেতু স্বভাবতই লা মরিলনি তাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল এবং এক দিন সে সবাইকে জানিয়ে দিল সে ব্রুর চোখের অশুভ দৃষ্টিকে ভয় পায় না, সুতরাং এক দিন সে ব্রুর কুঁড়েতে গিয়ে উপস্থিত হল।

মরিলনিকে দেখে ব্রু জিজ্ঞেস করল, "কীজন্য তুমি এখানে এসেছ? কী চাই তোমার?"

"আমি কী চাই? আমি তোমাকে চাই।" মরিলনির স্পষ্ট জবাব।

"ঠিক আছে," ব্রু তাতে রাজি। সে বলল, "কিন্তু তোমাকে আমি সম্পূর্ণ আমার করে পেতে চাই।"

"আমি তাতে রাজি।" মরিলনি বলল, 'কিন্তু আমাকে তৃপ্তি দিতে পারবে তো?"

সে মৃদু হেসে তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে তার কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে গেল। গোটা একটা সপ্তাহ সে ব্রুর সঙ্গে তার কুঁড়েতে রয়ে গেল। একটিবারের জন্যও সে গাঁয়ের ছায়াও মাড়াল না।

ব্রু আর মরিলনিকে নিয়ে গাঁয়ের লোকদের মধ্যে জোর কানাঘুসো শুরু হয়ে গেল। এতদিন যারা তার প্রতি হিংসার মনোভাব পোষণ করত না, তারা ব্রুকে হিংসা করতে শুরু করল। নিশ্চয়ই ছেলেটির মধ্যে আকর্ষণ করার প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে, নাহলে মরিলনির মতো মেয়েকে বশ করতে পারে? গ্রামের লোকেরা ধীরে ধীরে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল এবং সেই ক্রোধ ধীরে ধীরে সাহসে রূপান্তরিত হল। তারা প্রায়ই গাছের আড়াল থেকে তাদের লক্ষ করত। মরিলনি আগের মতোই প্রাণচঞ্চল। হঠাৎ এক দিন ব্রু অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ল মরিলনির সেবা যত্নের।

বেচারি ব্রুর জন্য গ্রামের মানুষ দয়া এবং সহানুভূতি বোধ করল না। এক দিন তাদের মধ্যে সবথেকে সাহসী একজন লোক বন্দুক হাতে নিয়ে ব্রুর কুঁড়েতে গিয়ে উপস্থিত হল।

"তোমার কুকুরগুলোকে এক্ষুণি বেঁধে ফেল।" সে বেশখানিকটা দূর থেকে চিৎকার করে বলল, "ব্রু, তোমার কুকুরগুলোকে এক্ষুণি আটকাও, নাহলে আমি ওগুলোকে গুলি করে মারব।"

তার চিৎকার শুনে মেরিলনি ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বলল, কুকুরগুলোর জন্য তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। এবার লোকটিকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মরিলনি হাসতে লাগল।

কুড়ের ভিতর থেকে ব্রু চিৎকার করে উঠল, "কী চাই তোমার এখানে?"

"সেটা আমিই বলছি," মরিলনি বলল, "ও আমাকে চায় আর আমি ওর সঙ্গে চলে যাব।"

"তুই একটা অপদার্থ, তুই বেশ্যা।"

মরিলনি যুবকটির হাত ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। তাই দেখে ব্রু তার ভেড়া চরানো লাঠিটা হাতে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বন্দুক উঁচিয়ে তার দিকে নিশানা করল।

"লোকটাকে ধর, শিগগির ধর।" ব্রু তার কুকুরগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল। লোকটা ইতিমধ্যে তার বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল ঠেকিয়েছে। কিন্তু মরিলনি আলতো হাতে বন্দুকের নলটা নীচে নামিয়ে দিয়ে কুকুরগুলোকে আদর করে ডাকতে লাগল।

কুকুরতিনটে তিরবেগে লা মরিলনির দিকে ছুটে গেল এবং তারা তাদের হিংস্রতা ভুলে গিয়ে মরিলনির হাত চাটতে লাগল। তখন মরিলনি দূর থেকে ব্রুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, "ব্রু দেখেছ, ওরা মোটেই হিংসুটে নয়।" এরপর তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল একটা কুৎসিত হাসি। সে লোকটার সঙ্গে চলে যেতে যেতে বলল, "ওরা এখন আমার সম্পত্তি।" কুকুরগুলোও তখন মরিলনির পিছনে পিছনে চলতে শুরু করেছে।

অরণ্যের অভ্যন্তরে
In The Wood

মেয়র সবে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছেন, এমন সময় তাঁকে খবর দেওয়া হল যে গাঁয়ের পুলিশটি দুজন বন্দিকে নিয়ে মেহরিতে অপেক্ষা করছে। ব্রেকফাস্ট খাওয়া মাথায় উঠল। তিনি তখনই মেহরির দিকে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন হোচেদুর নামের পুলিশটি উঠে দাঁড়িয়ে পরিণত বয়সের এক দম্পতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে তাদের সেখানে ধরে নিয়ে এসেছে।

লাল নাকের মোটা লোকটির সব চুল সাদা হয়ে গেছে। মহিলাটি গোলগাল, বেঁটে, সুঠাম স্বাস্থ্যের লাবণ্য তার সারা শরীর জুড়ে, চকচক করছে তার গাল দুটো। সে ওই পুলিশটির দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

মেয়র জিজ্ঞেস করলেন, "হোচেদুর, ঘটনাটা কী?"

গ্রাম্য পুলিশটি তখন সবিস্তারে ঘটনাটা বলতে শুরু করে। প্রতিদিনের মতো সে আজও টহল দিচ্ছিল। শ্যামপিয়ক্স অরণ্য যেখানে আর্জেনটিউলের সীমানায় গিয়ে শেষ হয়েছে, টহল দিতে দিতে সে সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। অস্বাভাবিক কিছু তার নজরে পড়েনি। শুধু দিনটা ছিল চমৎকার, সূর্যকিরণে সমস্ত পরিবেশটা ঝকমক করছিল, বাতাসে ভেসে আসছিল বুনো ফুলের মনমাতানো গন্ধ। হাওয়া দোলা দিয়ে যাচ্ছিল মাঠভরতি পাকা গমের শিষগুলোতে। বৃদ্ধ ব্রাডেলের ছেলে যখন তার আঙুর খেতের দিকে যাচ্ছিল, হোচেদুরকে দেখতে পেয়ে ডাকল, বাবাসাহেব, সাংঘাতিক ব্যাপার, বনের একেবারে ভিতরে গেলে দেখতে পাবে একশো তিরিশ বছরের একজোড়া কপোতকপোতী কাকলি কূজনে সমস্ত বনটাকে ভরিয়ে তুলেছে।

ব্রাডেলের নির্দেশমতো সে গভীর বনের দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল। কাছাকাছি এসে সে ঘনঘন নিশ্বাসের সঙ্গে আবেগ উত্তেজনা মেশানো শব্দ শুনতে পেল আর সেই শব্দ নৈতিকতাচ্যুত কোনো ব্যাপারে তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। যে মুহূর্তে প্রেমিক প্রেমিকাযুগল সহজাত প্রবৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছিল, সেই মুহূর্তে হোচেদুর তাদের ধরে ফেলল।

মেয়র অপরাধীদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। কারণ লোকটির বয়স কম করে ষাট এবং মহিলাটির পঞ্চান্ন। সুতরাং মেয়র সাহেব তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি লোকটিকে দিয়ে শুরু করলেন। সে এত অস্পষ্ট ভীত স্বরে জবাব দিচ্ছিল যে তাঁর পক্ষে তা শুনতে পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তবু তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন।

"তোমার নাম?"

"নিকোলাস ব্যুরেন।"

"পেশা?"

"পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা। প্যারিসের রু দ্য মর্টিয়ার্স-এ দোকান আছে।"

"তুমি জঙ্গালের মধ্যে কী করছিলে?"

পণ্যব্যবসায়ীটি তার মেদস্ফীত পেটের দিকে তাকিয়ে এবং হাত দুটোর ভার উরুর ওপর রেখে কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

মেয়র চেপে ধরলেন, "মিউনিসিপ্যালিটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি যা বলছেন তা তুমি অস্বীকার করতে পার?"

"না, মঁসিয়ে।"

"তাহলে অপরাধ স্বীকার করছ?"

"হ্যাঁ, মঁসিয়ে।"

"তোমার স্বপক্ষে কোনো বক্তব্য আছে?"

"না, মঁসিয়ে।"

"কিন্তু তোমার এই অপকর্মের সঙ্গিনীকে কোথা থেকে জোগাড় করলে?"

"ও আমার স্ত্রী, মঁসিয়ে।"

"তোমার স্ত্রী!"

"হ্যাঁ মঁসিয়ে, ও আমার স্ত্রী।"

"তাহলে তোমরা কি প্যারিসে একসঙ্গে থাকো না?"

"মাপ করবেন, আমরা একসঙ্গেই থাকি।"

"তাহলে তোমাকে তো পাগল ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। নিশ্চয়ই ওই অবস্থায় ধরা পড়ার জন্য জঙ্গালের মধ্যে গিয়ে ওই সমস্ত অপকর্ম করছিলে?

পণ্যব্যবসায়ীটির তখন লজ্জায় কেঁদে ফেলার মতো উপক্রম হল। সে এবার মৃদু অস্পষ্ট স্বরে বলল, "আমার স্ত্রীই আমাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছিল। আমি বললাম, এটা অত্যন্ত বোকার মতো একটা কাজ হবে। কিন্তু হুজুর, আপনি জানেন, একজন স্ত্রীলোকের মাথায় কোনো কিছু একবার ঢুকলে, সেটা তার মাথা থেকে বের করে দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।"

মেয়র স্পষ্ট কথা শুনতে ভালোবাসেন। সুতরাং তিনি একটু হেসে বললেন, "ঠিক বলেছ, তোমার স্ত্রীর মাথায় এমন একটা পরিকল্পনা না এলে তুমি কি আর এই জঙ্গালে এসে ঢুকতে?"

এবার মিঃ ব্যুরেন রেগে গিয়ে তার স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, "এবার বুঝতে পারছ, ব্যাপারটা, তোমার আদিখ্যেতা কী অবস্থায় আমাদের এনে ফেলেছে। ছিছি, কী লজ্জার কথা—এই বুড়ো বয়সে নৈতিকতাভ্রষ্টের অপরাধে আমাদের আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষ পর্যন্ত ব্যাবসাপত্র গুটিয়ে, জিনিসপত্র বিক্রি করে অন্য কোনো শহরে গিয়ে নূতন করে ঘর বাঁধতে হবে।"

তার স্ত্রী উঠে দাঁড়াল, সহ্য করল স্বামীর সমস্ত অপমানজনক অভিযোগ। তার

স্বামীর দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করার সে প্রয়োজন বোধ করল না। সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন স্বরে, অযথা বা অর্থহীন শালীনতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নির্ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় সে বলতে লাগল, "মঁসিয়ে, আমি জানি, আমরা আপনাদের কাছে নিজেদের হাস্যস্পদ করে তুলেছি। আমাদের এই ব্যাপারটাকে গুছিয়ে বলার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমার বিশ্বাস, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াবার লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং আমাদের সসম্মানে বাড়ি ফিরে যেতে অনুমতি দেবেন।

'বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন অল্পবয়সের এক কিশোরী। নিজের গড়া স্বপ্নের জগতে আমি তখন বিচরণ করি। এই অঞ্চলে এক রবিবারে মঁসিয়ে ব্যারেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে তখন এক কাপড়ের দোকানে কাজ করত। আর আমি রেডিমেড একটা পোশাকের দোকানে সেলস গার্ল-এর কাজ করতাম। ঘটনাটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—ওটা যেন গতকালের ঘটনা। আমার এক বান্ধবী রোজ লিভেককে নিয়ে মাঝে মাঝে রবিবারের ছুটির দিনগুলোতে এখানে চলে আসতাম। আমি বুপিগেলিতে রোজকে নিয়ে থাকতাম। রোজের একজন সুদর্শন সুন্দর প্রেমিক ছিল কিন্তু সেরকম কেউ ছিল না আমার। সেও আমাদের সঙ্গে এখানে চলে আসত। এক শনিবার সে হাসতে হাসতে আমাকে বলল, পর দিন অর্থাৎ রবিবার সে তার একজন বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তার উদ্দেশ্য বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। কিন্তু আমি জবাবে বললাম, ব্যাপারটা ঠিক হবে না। কারণ ধর্মসংস্কারের জন্য ও ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। পর দিন রেলস্টেশনে মঁসিয়ে ব্যারেনের সঙ্গে আমার দেখা হল। সেখানেই তার সঙ্গে আমি পরিচিত হলাম। সেসময় তার চেহারা ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। আমি অনেক আগেই স্থির করেছিলাম তার সামনে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব না বা নিজের দুর্বলতা কোনো ক্রমেই প্রকাশ করে ফেলব না এবং সে ব্যাপারে আমি সফলও হয়েছিলাম।

"এর পর আমরা এক দিন বেজন-এ গিয়ে দেখা করলাম। সেদিনটা ছিল এত মনোরম, এত সুন্দর যে একজনের অন্তর আনন্দে খুশিতে মেতে উঠবে। যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজের শান্ত স্নিগ্ধ আলোয় যেন সমস্ত প্রকৃতি ঝলমল করছে। দোয়েল পাখিরা নীল আকাশের গা বেয়ে উড়ে চলেছে দিগন্তের পানে। ঘাসের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে বাতাসে, এখানে-ওখানে ফুটে আছে অসংখ্য ডেইজি ফুল, যেন আলোর মালায় সেজেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির সেই অপূর্ব রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্যাম্পেনের নেশায় যেন আমাকে মাতাল করে তুলল।

"আবহাওয়াও ছিল চমৎকার। রৌদ্রতপ্ত উজ্জ্বল দিন। প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ রূপ চোখের মধ্য দিয়ে আমার শরীরের গভীরে প্রবেশ করে আমার সমস্ত অন্তর, সমস্ত সত্তাকে এক আনন্দ ঘন মধুর রসে প্লাবিত করল। আমি অপূর্ব এক মাধুর্যের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

"দেখলাম, রোজ আর সাইমন মুহূর্তের অবকাশ নিয়ে পরস্পরকে গভীর আবেগে

চুম্বন করছে। এই মধুর পরিবেশে এই মধুরতর দৃশ্য আমাকে আরও অভিভূত করল। আমি আর মঁসিয়ে ব্যারেন বেশি কথাবার্তা না বলে তাদের পিছন দিক দিয়ে হেঁটে চললাম। তাকে একটু সংকুচিত, একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। তার এই বিব্রত অবস্থা আমি বেশ উপভোগ করলাম। অবশেষে আমরা বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। স্নানের পরে যে স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে সমস্ত শরীর ও মন ভরে ওঠে, বনের গভীরে প্রবেশ করে সেই আনন্দ ও শান্তি আমি অনুভব করলাম। আমরা চারজন সেখানে মখমলের মত সবুজ নরম ঘাসের ওপর বসলাম। রোজ আর তার প্রেমিক আমার কঠিন ভাব আর গাম্ভীর্য লক্ষ করে বেশকিছুক্ষণ ধরে হাসাহাসি করল। কিন্তু এছাড়া আমার আর কীই-বা করার ছিল? যে পরিবেশের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছি তার প্রভাবকে কীভাবে অস্বীকার করব। মুহূর্তের মধ্যে কীভাবে ভুলে যাব তার প্রতিফলন। আমাদের উপস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে, সর্বক্ষণ ফিশফিশ করে কথার গুঞ্জন ছড়িয়ে গেল ওরা দুজন। তারপর আমাদের দিকে দৃক্‌পাত না করে সেখান থেকে উঠে গাছের আড়ালে চলে গেল।

"একবার কল্পনা করুন, আমি কী নিদারুণ লজ্জা ও সংকোচের মধ্যে পড়ে কতটা বিব্রত হয়েছিলাম। যে মানুষটার সামনে আমি বসেছিলাম---তাকে জীবনে আমি প্রথম দেখছি। রোজ আর সাইমনকে গাছের আড়ালে চলে যেতে দেখে এবং কল্পনার দৃষ্টিতে তাদের কীর্তিকলাপ অনুভব করে আমি এতটাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে---জোর করে সমস্ত লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে সাহসী হয়ে উঠলাম এবং কথা বলতে শুরু করলাম।

"আমি তার কাছে জানতে চাইলাম---সে কী ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। সে জানাল, একটা কাপড়ের দোকানে সে কাজ করে। আমরা এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। তাতে তার সাহস অনেকটাই বেড়ে গেল। সে আমার সঙ্গে স্বাধীন হয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু আমি তাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে তাকে সংযত হতে বাধ্য করলাম নিজের কাঠিন্য বজায় রেখে। কী ব্যারেন, আমি ঠিক বলছি তো?"

ব্যারেন কোনো উত্তর না দিয়ে বিভ্রান্ত অবস্থায় নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাদাম আবার বলতে শুরু করল, "সেদিনই ব্যারেন বুঝতে পেরেছিল আমার স্বভাবপ্রকৃতি কোন্ ধাতুতে গড়া। এর পর থেকে আমার প্রতি তার ব্যবহার হয়ে উঠল শান্ত, সুন্দর, সংযত। সে আমাকে ভালোবাসা জানাত। কিন্তু তার ভালোবাসার মধ্যে মিশে ছিল শ্রদ্ধা আর সম্মান। প্রত্যেক রবিবার সে আমার কাছে আসত। কারণ আমাকে সে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিল। আমাকে দেখার জন্য, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য সে সমস্ত সপ্তাহ ধরে অধীর ব্যাকুলতায় প্রতীক্ষা করত। তার প্রতিও আমার ভালোবাসা ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল। কী সুন্দর দেখতে ছিল সে সময় তাকে, আচার-ব্যবহারও ছিল কী চমৎকার, কী ভদ্র।

"পরের সেপ্টেম্বরে সে আমাকে বিয়ে করল। বিয়ের পর রু দ্য মটিয়ার্স-এ গিয়ে আমরা ব্যাবসা শুরু করলাম।"

"মেয়র সাহেব, বেশ কয়েকবছর ধরে আমাদের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিন কাটতে লাগল। ব্যাবসায়ে কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। ছুটির দিনগুলোতে গ্রামে গিয়ে যে আনন্দ করব, তেমন সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। ক্রমে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। আপনার নিশ্চয়ই একথা অজানা নয় যে একজন ব্যবসায়ীর কাছে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতার থেকে ক্যাশবাক্সের মূল্য অনেক বেশি। কাজের চাপে বুঝতে পারিনি সময় কোন্ দিক দিয়ে পার হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম না যৌবনের সীমারেখা থেকে বেরিয়ে এসে কবে আমরা বার্ধক্যের দ্বারে এসে উপনীত হয়েছি। ভালোবাসার আবেগ উচ্ছ্বাসের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। যতসময় একজন মানুষ বুঝতে না পারে যে সে কী হারিয়েছে, ততক্ষণ সে সেই হারানোর দুঃখ অনুভব করতে পারে না।

"এর পরে ধীরে ধীরে ব্যবসায়ে উন্নতির মুখ দেখতে শুরু করলাম এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত উদ্‌বেগ আশঙ্কা কেটে গেল। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। তখন আমার নিজের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ করলাম, কিন্তু সেটা যে কী সেটা আমি স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলাম। একজন স্কুল বোর্ডিংএর ছাত্রীর চপলতা আমাকে পেয়ে বসল। ওই বয়সের একজন কিশোরীর মতো আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। রাস্তার ওপর দিয়ে গোলাপভরতি কোনো গাড়ি চলে যেতে দেখলে আমি কেঁদে ফেলতাম। ভায়োলেট ফুলের মিষ্টি গন্ধ আমাকে আরাম কেদারার মধ্যে গভীর আবেশে ডুবিয়ে দিত। এর পরে আমি উঠে দরজার কাছে চলে আসতাম এবং দুই ছাদের মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখিদের ডানা মেলে উড়ে যাওয়া দেখতাম। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে কেউ যদি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে মনে হবে, প্যারিসের ওপর দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে। আর দোয়েল পাখিগুলো যেন মাছের মতো সাঁতার দিয়ে চলেছে আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। আমার বয়সে এ ধরনের ভাবপ্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সারাজীবন ধরে যে মানুষটা সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থেকে নিজের সমস্ত সত্তাকে হারিয়ে ফেলতে বসেছে, ভাবপ্রবণ না হয়ে সে আর কী-বা করতে পারে? জীবনে এমন এক মুহূর্ত আসে যখন মানুষ বুঝতে পারে সে আরও সুন্দর, আরও ভালো কিছু করতে পারত। এই চিন্তাই তাকে গভীর দুঃখে নিমজ্জিত করে। একবার ভেবে দেখুন, আমি কুড়ি বছর ধরে অন্যান্য তরুণীদের মতো বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমার প্রেমিকের চুম্বনের স্বাদ উপভোগ করতে পারতাম। গাছের নীচে শুয়ে থেকে প্রেমিকের আদর, সোহাগ আর চুম্বন উপভোগ করা যে কী গভীর আনন্দের সে-কথা আমি কল্পনা করে আনন্দের স্রোতে ভেসে যেতাম। অহোরাত্র আমি নিজেকে প্রেমিকার আসনে বসিয়ে ওই আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতাম আমার কল্পনায়। আমি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতাম নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর প্রতিফলন, তেমন দৃশ্য কল্পনা করতে করতে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলতাম। আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আমি ভুলে যেতাম।

"প্রথম দিকে মঁসিয়ে ব্যুরেনকে এসব কথা বলার আমার সাহস হয়নি। তাহলে এ

সমস্ত কথা নিয়ে সে আমাকে বিদ্রূপ করত এবং আমাকে নির্ঘাত ছুঁচ আর সুতো বিক্রি করতে পাঠাত। মঁসিয়ে ব্যুরেনের সঙ্গে আমার খুব বেশি কথাবার্তা হত না। কিন্তু আয়নার দিকে তাকিয়ে যখন বুঝতাম আমার যৌবন অস্তমিত হয়েছে, সৌন্দর্য হয়েছে লুপ্ত, যখন বুঝলাম অন্যকে আকর্ষণ করার মতো আমার মধ্যে আর কিছুই নেই, তখন গভীর দুঃখে আমার সমস্ত মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

"যখন দুঃখ যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে উঠল তখন এক দিন মনস্থির করে ফেললাম এবং তার কাছে প্রস্তাব দিলাম গ্রামের দিকে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। যেখানে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেখানে মিলিত হবার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। সে নির্দ্বিধায় আমার প্রস্তাবে রাজি হল এবং আমরা আজ সকাল ন'টা নাগাদ এখানে এসে উপস্থিত হলাম।

"আমি নিজের মধ্যে আবার সেই হারিয়ে যাওয়া যৌবনের উন্মাদনা অনুভব করলাম যখন আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কারণ আমি জানি একজন নারীর হৃদয় কখনও বার্ধক্যের ভারে পীড়িত হয় না। আমি মঁসিয়ে ব্যুরেনের মধ্যে আমার বর্তমান স্বামীকে না দেখে দেখলাম সেদিনের সেই তরুণ সুদর্শন মঁসিয়ে ব্যুরেনকে। মঁসিয়ে, আমি যে সত্যি কথা বলছি, আমার অনুভূতি যে সত্য সেকথা আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি। এখানে আমার উপস্থিতি যেমন সত্যি—তেমন সত্যি যে আমি কামনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। আমি তাকে উন্মাদের মতো চুম্বন করতে লাগলাম, তার সমস্ত শরীর চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। সে এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে মনে হল আমি যেন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি। সে আমাকে বলতে লাগল, আজ সকালে নিশ্চয়ই তোমাকে ভয়ংকর পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। তোমার কী হয়েছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তার কোনো কথায় কর্ণপাত করলাম না, শুনতে পেলাম না তার কোনো কথা, শুধু শুনতে পেলাম আমার হৃদয়ের স্পন্দন। আমি তাকে বনের গভীরে টেনে নিয়ে এলাম।

মঁসিয়ে, লে মেয়ার আমি এতক্ষণ যা বললাম, তার সবটাই সত্যি। এর একবর্ণও মিথ্যে নয়। ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্য।"

মেয়রসাহেব একজন বিচক্ষণ মানুষ। তিনি তাঁর চেয়ার থেকে উঠে মৃদু হেসে বললেন, "ম্যাডাম, নির্বিঘ্নে, মনে আনন্দ নিয়ে ফিরে যাও। বনের মধ্যে, গাছের নীচে এমন গর্হিত কাজ করতে আর কখনও এসো না।"

একটি বিবাহবিচ্ছেদের পরিণাম
The Sequel To A Divorce

বিখ্যাত ব্যারিস্টার ম্যাট্রে গারুলিয়ার অনেক অসম্ভব, অনেক অসাধারণ এবং অনেক জটিল কেস-এর সমাধান করেছেন। কিন্তু ব্যাডমেন্টের কাউন্টপত্নীর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে তাঁর মতো একজন দুঁদে আইনবিদ ভীষণভাবে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাঁর বিস্ময়ের আবেগকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না।

কাউন্টপত্নী দেখতে সত্যিই সুন্দরী। তাঁর সৌন্দর্যের আগুন যে-কোনো মানুষকে পতঙ্গের মতো কাছে টেনে নিতে পারে। সেই আগুনে নিজেদের পুড়িয়ে ফেলতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করবে না। তাঁর একটু সঙ্গ পাওয়ার জন্য, তাঁর প্রেমরাগে রঞ্জিত ঠোঁটের কোণে একটু মিষ্টি হাসি দেখার জন্য তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে এবং দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সরিয়ে দেবার জন্য ছুটে আসবে, অথবা নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না।

কিন্তু গারুলিয়ার এটাও লক্ষ করলেন যে কাউন্টপত্নী এত বেশি আবেগপ্রবণ, এত বেশি দয়ালু এবং এমন কোমলপ্রাণা যে সামান্য একটা পিঁপড়ে মারতেও তাঁর কষ্ট হয়। এহেন মনের একজন নারী তাঁর কাছে এসেছেন তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা রুজু করতে। স্বভাবে চঞ্চল, বাস্তববুদ্ধিহীন এমন একজন স্ত্রীলোক কল্পনার ডানায় ভর করে অতিক্রম করতে চান সমস্ত জটিল সমস্যা ও বাধাবিপত্তির পাহাড়।

দামি পোখরাজ আর হিরের পিন দিয়ে তাঁর পরনের মহামূল্যবান পোশাকটাকে কাঁধের কাছে আটকে রেখেছিলেন। তাঁর সোনালি চুলের গোছা হাওয়ায় উড়তে উড়তে যখন দু-চারটি কপালে এসে পড়ছিল তখন তাঁর মুখের অতুলনীয় সৌন্দর্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলল। গারুলিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

গারুলিয়ার তাঁর কথার মাঝখানে কোনো কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে তাঁর সমস্ত কথা শুনে যেতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে কাউন্টপত্নী উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর নাকের পাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আবেগ আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যেসব কথা বলে গেলেন তার অনেকটাই তাঁর কাছে প্রাঞ্জল হল না। তবে এটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হল না যে কাউন্টপত্নী তাঁর স্বামী ব্যাডমন্টের বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা রুজু করতে এসেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অভিযোগগুলো তাঁর কাছে ব্যক্ত করছেন। যে সময় কাউন্টেস-এর স্বামী তাঁর ক্লাবে ফেন্সিং খেলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, সেসময় কেউ যদি তাঁকে তাঁর স্ত্রীর গারুলিয়ার

কাছে যাওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা রুজু করার খবরটা জানায়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আকাশ থেকে পড়বেন।

গারুলিয়ার কাউন্টেসের সমস্ত কিছু শুনে বললেন, আপনি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন তা বিবাহবিচ্ছেদের মামলার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সমস্ত অভিযোগে আপনার মামলা ধোপে টিকবে না। বিবাহবিচ্ছেদের ফলে এক দম্পতির জীবন যে হতাশা আর অন্ধকারে ভরে যেতে পারে সে-কথা নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। সুতরাং ব্যাপরটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কথাগুলো শুনে তিনি এতটাই হতাশ হলেন এবং তাঁর মুখের মধ্যে এমন এক বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠল, মনে হল একটি শিশুর সব থেকে প্রিয় খেলনাটা ভেঙে গেছে।

গারুলিয়ার তাঁর চিবুকটা তুলে ধরে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, এতটা ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি। আমি ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চয়ই ভাবব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এমন কোনো কালো দাগ আছে যেটাকে আরও খারাপ করে তুলতে অসুবিধা হবে না। আমাকে চিঠি লিখবেন আর দরকারমতো এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

গারুলিয়ারের পরামর্শ ও নির্দেশ পালন করে কয়েক মাস পরে বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় জিতে গেলেন কাউন্টপত্নী।

কাউন্ট ব্যাপারটা জানতে পেরে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ঘটনাটা এইভাবে অন্য দিকে মোড় নেবে তিনি তা ভাবতেই পারেননি। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি বিনা দোষে তাঁর স্ত্রী তাঁকে এইভাবে শাস্তি দেবে। তিনি তো তাঁর স্ত্রীকে সমস্ত অন্তর দিয়ে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। তবে কীভাবে সে তাঁর বিরুদ্ধে এত বড়ো শাস্তির ব্যবস্থা করল। এমন অপ্রত্যাশিত আঘাতে তিনি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন।

প্রথমে ভয়ংকর রাগে তিনি জ্বলে উঠলেন, ছুটে গেলেন উকিলের অফিসে। তাঁর কান কেটে নেবেন বলে শাসালেন। তারপর তাঁর রাগ কিছুটা শান্ত হলে বললেন, ভালোই করেছে, ও নিজে আনন্দ পাওয়ার জন্যই নিশ্চয়ই এ কাজ করেছে।

এর পর তিনি কয়েকজন বন্ধু নিয়ে সমুদ্রপথে পাড়ি দিলেন সিলোন ও ভারতের উদ্দেশ্যে। তাঁর মনে হল এই ভ্রমণের আনন্দ তাঁর দুঃখ যন্ত্রণাকে অনেকটা ভুলিয়ে দেবে। ধীরে ধীরে তাঁর বেদনাহত মনের ক্ষতগুলো শুকিয়ে আসবে।

এর পর মেরি অ্যানি অর্থাৎ কাউন্টপত্নীর মনে হল কৈশোরের সেই বাধাবন্ধনহীন মুক্ত জীবনের আনন্দের মধ্যে তিনি ফিরে এসেছেন। তিনি এখন তাঁর খুশিমতো হাসতে পারেন, গাইতে পারেন, নাচতে পারেন, মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়ে যেতে পারেন। তিনি এখন মুক্ত স্বাধীন অবাধ স্বচ্ছন্দ। কিন্তু সেই বাধাবন্ধনহীন জীবনের আনন্দ, মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা তাঁকে যেন ক্লান্ত করে তুলল। এই বাধাবন্ধনহীন মুক্ত জীবন একজন মানুষের খুব বেশি দিন ভালো লাগে না—তা তাকে বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে। তাই কাউন্টেস সেই বন্ধনের মধ্যে ফিরে

যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি চাইলেন ঘরের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হতে। সুতরাং তিনি আবার বিয়ে করলেন।

এদিকে ভ্রমণের মধ্যে তেমন আনন্দ খুঁজে পেলেন না কাউন্ট। তিনি ভেবেছিলেন দূর বিদেশে এসে সেখানকার পরিবেশের মধ্যে তাঁর মন থেকে ধীরে ধীরে তার স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসবে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে তাঁর কথায়, কাজে, সর্বক্ষেত্রে সে নিজের মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে তাঁর দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলছিল। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রীর একখানা সম্প্রতি তোলা ছবি। সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিভৃতে বসে চোখের জল ফেলতেন। এই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য তিনি সর্বতোভাবে নিজেকেই দায়ী করেছেন। তিনি হয়তো নিজের অজ্ঞাতে এমন কোনো অপরাধ করে ফেলেছেন—যেজন্য সে ভয়ংকরভাবে আঘাত পেয়েছে আর তীব্র ক্ষোভ আর দুঃখ থেকে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি এইভাবে নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন, নিজের মনকে শান্ত করলেন।

এই স্মৃতি আর বিচ্ছেদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আত্মহত্যার মধ্যে শান্তি খোঁজার চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় অনেক প্রাণঘাতী পথ অবলম্বন করেছেন, সম্ভাব্য এমন সমস্ত জায়গায় গেছেন যেখানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী--কিন্তু তাতেও তাঁর মৃত্যু হয়নি।

এর পর বহু দেশ ভ্রমণ করে ফিরে এলেন নিজের দেশে। নিজের দুঃখ যন্ত্রণা, মানসিক পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। বিভিন্নভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন কিন্তু স্মৃতির দুঃসহ বোঝাটাকে নামিয়ে দিতে পারলেন না নিজের মন্ থেকে।

এক দিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেলেন, কিন্তু তার সঙ্গে বাক্যালাপের তাঁর কোনো সুযোগ ছিল না বলেই তাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারলেন না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল—সে সুখী হতে পারেনি, এক সুগভীর বিষণ্ণতা, এক দুঃসহ দুঃখে সে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলেন—দ্বিতীয় বিয়ে তাকে সুখী করতে পারেনি, পারেনি তার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে।

সে-কথা জানতে পেরে তাঁর মনের ভার যেন অনেকটা লাঘব হল। তিনি গভীর আবেগ মিশ্রিত ভাষায় তাঁর পূর্বতন পত্নী মেরি অ্যানিকে একখানা পত্র লিখলেন। জানালেন, তার অদর্শনে, তার বিরহে ভয়ংকর মানসিক পীড়নের মধ্যে তাঁর দিন কাটছে। তাকে ছাড়া তার জীবন নিরর্থক, তিনি বেঁচে থাকার সবরকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত। লিখলেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি ভীষণভাবে অধীর হয়ে আছেন।

চিঠির উত্তর দিতে দেরি করলেন না মেরি অ্যানি। তিনি নির্দিষ্ট একটি দিন স্থির করে জানিয়েছেন যে ওই দিন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

অধীর আগ্রহে মেরির আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন কাউন্ট। প্রতিটি পল, প্রতিটি মুহূর্ত যেন তাঁর কাছে মনে হল এক একটি বছর। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে

মেরি অ্যানি কাউন্টের দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বুকে। অস্থির ব্যাকুলতায় চুম্বন করতে লাগলেন তাঁকে। চোখের জলে ভেসে গিয়ে বারবার তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। দীর্ঘ বিরহের অবসান হল। কাউন্ট ফিরে পেলেন তাঁর পরম আরাধ্য দয়িতাকে। আনন্দ আর হাঁসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পতি-পত্নীর মুখ।

স্বামীর হৃদয় জয় করার জন্য এই কৃত্রিম বিচ্ছেদের এমন পদ্ধতির কথা জানতে পেরে গাবুলিয়ার বললেন, তাঁর এই দীর্ঘ ওকালতির জীবনে এমন একটি ঘটনা দ্বিতীয়টি তিনি ঘটতে দেখেননি।

ঋণ
The Debt

"হে কৃষ্ণবর্ণের সুন্দর মানুষ, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমাকেও দেখতে খুব সুন্দর, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আসতে পার। এই শীতের রাত্রিতে আমার বাড়িতে উষ্ণ আরামের ব্যবস্থা আছে। কারণ আমার ঘরের আগুনের চুল্লিতে আমি আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি।"

কিন্তু কোনো কিছুই পথচারীদের প্রলুব্ধ করতে পারল না। বৃদ্ধ, স্থলদেহী কোনো মানুষ বা সুন্দর কোনো তরুণ—কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে পথচারী নির্বিশেষে সকলকে সুন্দর মানুষ নামে ডাকা সত্ত্বেও কেউ সেই ডাকে সাড়া দিল না। দীর্ঘাঙ্গী ফ্যানি পথচারীদের ওইভাবে আহ্বান করতে করতে এগিয়ে চলল। রাত্রি যত বাড়তে লাগল রাত্রিকালীন পথচারীদের সংখ্যা ততই কমে আসতে লাগল। আরও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত রাস্তাটা শূন্য হয়ে যাবে। দেরিতে ফেরা কোনো মাতালকে যদি তার বাড়িতে না নিয়ে যেতে পারে—তাহলে তাকে সেখানে একাই ফিরে যেতে হবে।

এই দীর্ঘাঙ্গী তরুণী ফ্যানি সত্যিই সুন্দরী। তেইশ বছরের ভরা যৌবনের এই সুন্দরী রমণীটির খরচ চালাতে দৈনিক মাত্র পাঁচ ফ্রাঙ্ক উপার্জনের জন্য এমন নির্জন রাস্তায় খরিদ্দারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া অনেক ভালো কিছু করার ছিল। প্যারিসের এই অসংখ্য প্রতিযোগীদের ভিড়ে শিল্পীদের মতো পরিণত বয়স ছাড়া যশ, সাফল্য বা সৌভাগ্য অর্জন করা অসম্ভব।

যে ফ্যানি নাট্যজগতের সব থেকে ধনী, কুশলী শিল্পী হিসাবে যশোগৌরবে ধন্য হতে পারত, উঠতে পারত খ্যাতি ও সমৃদ্ধির শিখরে, সেই ফ্যানিকে একজন স্বর্গবাসী দেবীর মতো অনুপম সৌন্দর্য ও তেইশ বছরের পূর্ণ যৌবন নিয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় সামান্য পাঁচটি ফ্রাঙ্ক উপার্জনের আশায় এই কনকনে ঠান্ডা রাত্রিতে খদ্দেরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। হায় হতোস্মি!

যা হোক, রাত অনেক হয়েছে, আজ আর কোনো পথচারীর দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে গেছে। কোথাও একজন পথচারীকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ঝড় ওঠার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। সুতরাং তার এখন বাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ফ্যানি হঠাৎ দেখল, রাস্তার মোড়ে ফুটপাথের ওপর বেঁটেখাটো মানুষের আকারের একজন কেউ একটা ওভারকোটে সমস্ত শরীরটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। কোন্ দিকে তাকে যেতে হবে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারছিল না। সেইজন্য দাঁড়িয়ে দ্বিধান্বিতভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিল।

মেয়েটি নিজের মনেই বলল, খুবসম্ভব লোকটার পিঠে কুঁজ আছে। এই ধরনের লোকেরা লম্বা মেয়েমানুষ পছন্দ করে। সে খুব দ্রুত লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে যেতে যেতে সেই কথাগুলো বলতে লাগল, ওগো কৃষ্ণবর্ণের সুন্দর মানুষ, তুমি আমার সঙ্গে এসো। কী ভাগ্য! লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ফ্যানিও সেই কথাগুলো বলতে বলতে তার দিকে এগোতে লাগল। ফ্যানি দেখল, লোকটি মদ্যপ একজন লোকের মতো টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। সে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিল না। তাকে হাঁটতে হচ্ছিল এঁকেবেঁকে। ফ্যানি ভাবল, মাতালরা যদি একবার বসে পড়ে, তাহলে তাদের আর ওঠানো যাবে না। কারণ তারা যেখানেই বসে পড়বে সেইখানেই বসে বসে ঘুমোবে। একমাত্র আশা, টলতে টলতে পড়ে যাবার আগেই যদি তাকে ধরে ফেলা যায়।

ভাগ্যক্রমে সে পড়ে যাবার আগেই ফ্যানি তাকে গিয়ে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তাকে জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে প্রায় ফেলে দিয়েছিল আর কী! কেন এমন হল, সেটা ভেবে ফ্যানি বেশ অবাক হয়ে গেল। ফ্যানি দেখল, লোকটা মাতালও নয়, পিঠে কোনো কুঁজও নেই। লম্বা ওভারকোটে ঢাকা বারো তেরো বছরের একটা বাচ্চা ছেলে। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে ক্ষীণ স্বরে বলল, "মাফ করবেন ম্যাডাম, আমাকে মাফ করবেন। যদি জানতেন আমার কী ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে আর ঠান্ডায় কী কষ্ট হচ্ছে! ঠান্ডায় বোধহয় আমি মরে যাব!"

ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেল ফ্যানি। তারপর বলল, বেচারা!—এই বলে ছেলেটিকে সে আনন্দিত মনে বাড়িতে নিয়ে গেল। তাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে ফ্যানি যান্ত্রিকভাবে বলল, ছোট্ট খোকা, তুমি এভাবে কাঁদছ কেন? তুমি কি ভয় পেয়েছ? দেখবে আমি কত ভালো। আমার বাড়ির আগুনের চুল্লিতে আমি আগুন তৈরি করে রেখেছি। সেখানে গিয়ে তুমি উষ্ণ আরাম উপভোগ করতে পারবে।

কিন্তু ফ্যানির ঘরের আগুন নিভে গেলেও ঘরটা বেশ উত্তপ্ত ছিল। বাড়িতে পৌঁছে বাচ্চা ছেলেটা বলল, ও, এখানে কী আরাম! জানেন ম্যাডাম, আমি ছ'দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় রাত কাটাচ্ছি। সে আবার কাঁদতে কাঁদতে বলল, মাফ করবেন ম্যাডাম, আমি দুদিন ধরে কিছুই খাইনি।

ফ্যানি তার খাবার রাখার আলমারি খুলে কয়েকটা অ্যালবার্ট বিস্কুট, একটু ব্র্যান্ডি আর কিছুটা চিনি জলের সঙ্গে মিশিয়ে শরবত করে তাকে খেতে দিল। তার কাবার্ডে এর বেশি আর কিছু ছিল না। ছেলেটা খিদের জ্বালায় মুহূর্তের মধ্যে সেটুকু নিঃশেষ করে ফেলল। খাওয়া হয়ে গেলে ছেলেটি হাই তুলতে তুলতে তার কাহিনি বলতে শুরু করল।

একমাত্র আত্মীয় আর আপনজন বলতে সে যাঁকে জানত, তিনি ছিলেন তার ঠাকুরদা। তিনি সঁয়সোর একজন পেইন্টার ছিলেন এবং ঘরবাড়ি সাজানোর কাজ করতেন সেখানে। মাসখানেক আগে তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি তাকে বলে যান, শোন, আমি একখানা চিঠি লিখে রেখেছি, আমার ভাই প্যারিসে ব্যবসা করে।

চিঠিখানা নিয়ে তুমি তার সঙ্গে দেখা করবে। সে নিশ্চয় তোমার দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে। যা হোক, যে-কোনোপ্রকারে তুমি প্যারিসে যাবে। আমি জানি তোমার পেইন্টিং-এর হাত খুবই ভালো। তুমি সেখানে গেলে একজন নামি চিত্রকর হয়ে উঠতে পার। আর সে ব্যাপারে তোমার সফল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

তার ঠাকুরদা যখন মারা গেলেন (তিনি একটা হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন), তখন ছেলেটি ঠাকুরদার একটা পুরোনো কোট গায়ে দিয়ে, মাত্র তিরিশ ফ্রাঙ্ক সম্বল করে প্যারিসের পথে পাড়ি দিল। ওইটুকুই তার ঠাকুরদা তার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যখন সে প্যারিসে এসে পৌঁছোল, তখন দেখল, চিঠিতে যে ঠিকানা লেখা আছে সেই ঠিকানায় ওই নামের কেউ থাকে না। তার ঠাকুরদার ভাই মাস ছয়েক আগে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি কোথায় গেছেন—সে কথাও কেউ বলতে পারল না। সুতরাং সে তখন সেখানে মারাত্মক আতান্তরে পড়ে গেল। সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল সেখানে সে। তার প্যারিসে আসার খরচ বাদ দিয়ে তার কাছে যেটুকু সম্বল ছিল—তাই দিয়ে সে কয়েকটা দিন কোনোরকমে চালিয়ে নিল। সেটুকু শেষ হয়ে যাবার পর সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা রুটি কেনার মতো পয়সা তার কাছে ছিল না। খাবার বলতে তার কিছুই জোটেনি। গত দুদিন সে সম্পূর্ণ অনাহারে আছে।

অর্ধেক ঘুমের ঘোরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে আর হাই তুলতে তুলতে সে তার কাহিনি শেষ করল। কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও ফ্যানি তাকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করল না। সে শুধু বলল, "বাকিটা কাল শুনব। এখন বিছানায় গিয়ে একটা লম্বা ঘুম দাও।" শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল। এর পর ফ্যানি তার সমস্ত পোশাক খুলে, বিবস্ত্র হয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল—যাতে তার দেহের উত্তাপে ছেলেটির শরীর উত্তপ্ত থাকে। হঠাৎ ফ্যানির ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। সে কাঁদতে আরম্ভ করল। কিন্তু এই কান্নার কোনো কারণ খুঁজে পেল না।

পর দিন তারা একটা সাধারণ হোটেলে ব্রেকফাস্ট করল এবং দুপুরের খাবার খেল। সেজন্য তাকে কিছু টাকা ধার করতে হয়েছিল। এর পর, অন্ধকার হয়ে এলে সে ছেলেটাকে বলল, আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি তুমি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবে। সে তাড়াতাড়িই ফিরে এল। প্রায় দশটা নাগাদ। তার কাছে ছিল বারোটা ফ্রাঙ্ক, সেটা সে ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, আজ আমার ভাগ্যটা ভালো মনে হচ্ছে আর এটা হয়েছে তোমার জন্য। অস্থির হোয়ো না। তুমি আমার জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো। খিদে পেলে ছানা খেয়ে নিয়ো।

এই বলে ফ্যানি তাকে চুমু খেয়ে সেখান থেকে চলে গেল। যেতে যেতে মাতৃত্বের সুখে তার সমস্ত মনটা কানায় কানায় ভরে উঠল। যা হোক, তাকে নিষিদ্ধ এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দিল।

হোটেল-মালিক বন্ধের সময়ে তাকে হোটেল থেকে বের করে দিল। পর দিন সকালে সেই বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তারা তাকে জানিয়ে দিল,

ফ্যানিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছে।

এর পর থেকে আবার শুরু হল তার ভবঘুরের জীবন।

পনেরো বছর পরে এক দিন সকালে সংবাদপত্রে একটা সংবাদ প্রকাশিত হল। সেই বিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী ফ্যানি ক্লারিয়েট—অভিনয় জগতে এবং ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, যার রূপ এবং শরীরী মোহে অন্ধ হয়ে তিনজন ধনী তনয় আত্মহত্যা করেছিল, যার জন্য বহু মানুষ সর্বনাশের অন্ধকার খাদে হারিয়ে গেছে, যার অসাধারণ অভিনয় দেখার জন্য সমস্ত প্যারিসের মানুষ প্রেক্ষাগৃহের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই ফ্যানিকে উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খবরের কাগজের সংবাদটা পড়ে চিত্রকর ফ্রাঙ্কইস গারল্যান্ড নিজের মনেই বললেন, "না, ফ্যানি কখনও ওইভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে না।" কারণ সে ফ্যানি ছাড়া আর কেউ নয়। ফ্যানি যে তার চরম দুঃসময়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে ক্ষুধার খাদ্য আর আরামদায়ক উত্তাপে তার প্রাণ রক্ষা করেছিল সে-কথা সে কখনও ভুলতে পারেনি। সেদিনের পর থেকে তার চরম বিপদের দিনের বন্ধু ফ্যানির সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্যারিস নামের জায়গাটা ভারী অদ্ভুত। এখানে তাকে মানুষ হতে অনেক চেষ্টা আর পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু সে তাকে শুধু দূর থেকেই দেখেছে, থিয়েটারের স্টেজেই তাকে দেখেছে। কোনো রাজকুমারীর উপযুক্ত গাড়িতে উঠতে দেখেছে স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে। সেসময় সে কীভাবে ফ্যানির সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে দাঁড়াত। সে কি তাকে সেই সময়কার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, যেদিন তার দাম ছিল মাত্র পাঁচ ফ্রাঙ্ক। না, নিশ্চয়ই না, শুধু তার কিছুটা পিছু পিছু গিয়ে, তার শুভ কামনা করে এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে ফিরে এসেছে।

কিন্তু আজ সেদিনের সেই ঋণ পরিশোধ করার সময় এসেছে। আর সেই ঋণ সে পরিশোধ করল। চিত্রকর হিসাবে যদিও তার যথেষ্ট নাম হয়েছে এবং তাতে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলেও সে কিন্তু ধনী নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? সে তার সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়ে সে এক ছবি বিক্রেতার দোকানে কাজ নিল। এর পর সে ফ্যানিকে চমৎকার একটা আশ্রমে পাঠাবার ব্যবস্থা করল যেখানে তার যত্ন বা পরিচর্যার বিন্দুমাত্র অসুবিধা তো হবেই না, বরং সেখানে সে পাবে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের উপকরণ। কিন্তু পক্ষাঘাত কখনও কাউকে ক্ষমা করে না—মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে এর শিকারকে একটু ছেড়ে দেয়, যেমন বিড়াল ইঁদুরকে ছেড়ে দিয়েই আবার ধরে ফেলে। তারপরেই আবার তার শিকারের উপর একেবারে মরণকামড় বসিয়ে দেয়। ফ্যানির রোগের আক্রমণ তখন কিছুটা কম ছিল। এক দিন সকালে চিকিৎসক তাকে বললেন, আপনি রোগিনীকে নিয়ে যেতে চান? ভালো কথা, কিন্তু আবার এঁকে ফিরিয়ে আনবেন। এই যে এঁকে কিছুটা সুস্থ দেখছেন তা সাময়িক এবং

বাহ্যিক। এঁর এই অবস্থা থাকবে, খুব বেশি হলে এক মাস, অবশ্য এঁর যদি কোনো মানসিক উত্তেজনার কারণ না ঘটে।

"যদি সাবধান না হওয়া যায়?" গারল্যান্ড জিজ্ঞেস করল।

ডাক্তার বললেন, "তাহলে, দ্রুত চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে।"

"আপনি সে বিষয়ে কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত?"

"একশো ভাগ নিশ্চিত।"

ফ্রাঙ্কইস গারল্যান্ড উন্মাদ আশ্রম থেকে ফ্যানিকে বার করে নিয়ে গেল। একটা চমৎকার অ্যাপার্টমেন্টে তার থাকার ব্যবস্থা করল আর তার সঙ্গে বাস করার জন্য ছেড়ে দিল আগের অ্যাপার্টমেন্ট। ফ্যানি বৃদ্ধা হয়েছে, মোটাও হয়েছে অনেকটা। চুলগুলোও একেবারে সাদা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে নিজের মনে কী যেন ভেবে চলে। বহুদিন আগে যে বাচ্চা ছেলেটির প্রতি দয়া দেখিয়েছিল, সেই ছেলেটিকে সে চিনতে পারল না। সেও তার পুরোনো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল না। সে শুধু তাকে এইটুকুই মনে করিয়ে দিল, সে একজন ধনী যুবকের সেবা যত্ন ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বাস করছে যে তাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে। কোনো রক্ষিতা এ পর্যন্ত এমন একজন প্রেমিকের সাহচর্য পায়নি। তিন সপ্তাহ পরে আবার ভয়ংকর উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হল সে। আর তাতেই মৃত্যু হল তার। আর ওই তিনটি সপ্তাহ সে তার প্রেমিকের আদর আর ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে ছিল—সেই পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে সে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল।

সেদিন চিত্রকরদের ডিনারপর্ব শেষ হলে ফ্রাঙ্কইস গারল্যান্ডের শেষ আঁকা যে ছবিটি স্যালনের এক্‌জিবিশনে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে—সেই ছবিটি সম্বন্ধে তারা আলোচনা করছিল। তাদের মধ্যে একজন কিন্তু ঘৃণার স্বরে বলল, এই সেই ফ্রাঙ্কইস গারল্যান্ড, যে একজন স্ত্রীলোকের কামনার ক্ষুধা তৃপ্ত করার জন্য তার অবৈধ প্রণয়ী হয়ে বাস করেছিল।

প্রবঞ্চনা
A Ruse

বয়োপ্রবীণ একজন চিকিৎসক তাঁর তরুণী রোগিণীকে নিয়ে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে গল্প করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মেয়েটির কোনো অসুখ হয়নি। সাধারণভাবে সুন্দরী মেয়েরা যে ধরনের স্ত্রীরোগে ভোগে—মেয়েটিও সেই ধরনের রোগের শিকার হয়েছিলেন। এমন কিছুই না, সামান্য স্নায়ুর দুর্বলতা, একটু রক্তাল্পতা বা অবসাদ। প্রেম করে যখন বিয়ে করে দুজন তরুণ তরুণী তখন প্রথম প্রথম তারা এ ধরনের অবসাদ বা ক্লান্তিতে কষ্ট পায়।

কৌচের ওপর আধশোয়া হয়ে ভদ্রমহিলা ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বললেন, যেসব স্ত্রীলোক বিয়ের পরে স্বামীদেরকে ঠকায়, তাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে, তারা যে কী চরিত্রের মানুষ তা আমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে। স্বামীর প্রতি তাদের ভালোবাসা না থাকতে পারে, বিয়ের সময় তারা যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করে, সে সমস্ত পালনে তাদের ইচ্ছার অভাব দেখা দিতে পারে, তাই বলে তারা কীভাবে অন্য পুরুষের কাছে নিজের সমস্ত কিছু বিকিয়ে দেয়। অন্য লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তারা কীভাবে সমাজে ভদ্রতার মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। কীভাবে তারা ভালোবাসার অভিনয় করে বিশ্বাসঘাতক আর কপট মন নিয়ে?

বৃদ্ধ ডাক্তার একটু হেসে বললেন, কোনো নারী যখন সহজ সুন্দর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মন্দ পথ বেছে নেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়—তখন ছোটোখাটো সাংসারিক কলহ বা দ্বন্দ্ব নিয়ে সে আদৌ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে না। আমার ধারণা কোনো নারী যদি বিবাহিত জীবনের হতাশা ও ব্যর্থতার গ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত না হয়, তাহলে তার মধ্যে নিখাদ ভালোবাসা তৈরি হতে পারে না। কিন্তু এই বিবাহিত জীবনটা যে কী সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছেন, বিবাহিত জীবনটা দিনের বেলা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যাপক কলহ আর রাত্রে দুর্গন্ধের একশেষ ছাড়া আর কিছুই না। এ ব্যাপারে ভদ্রলোকের কথাগুলো যে সর্বৈব সত্যি সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে কোনো নারীর মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা জন্মায় না। বিবাহিতা স্ত্রীলোকটিকে যদি একটা বাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সেটাই বোধ করি সঠিক হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী নামক জীবটা সেই বাড়ির রং-পলেস্তারা চটিয়ে না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশেষ বাড়িটি ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে না—অর্থাৎ তার মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা গড়ে ওঠে না।

নারীজাতি চিরকালই ছলনাময়ী। স্বামীকে প্রবঞ্চিত করতে গিয়ে তারা যে ছলাকলা বা নিপুণ অভিনয়ের আশ্রয় নেবে—তাতে অবাক হবারও কিছুই নেই। যে সমস্ত

স্ত্রীলোকদের দেখলে অত্যন্ত সহজ সরল বলে মনে হয়, তারাই পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি কপট এবং শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচারিণী। তারা তাদের ছলাকলার সাহায্যে এমন সমস্ত বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করে, মনে হয়—তারা সত্যি বিরল প্রতিভার অধিকারিণী।

ভদ্রমহিলা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, না ডাক্তার, পুরুষরা কোনো বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়লে সেটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আগে কী করা উচিত সেটা তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। আর ওই সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েরা স্নায়ুর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে পড়ে।

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। ঘটনাটা ঘটে যাবার পরেই পুরুষরা আবার নিজেদের শক্তি ফিরে পায়। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে। আমার এক তরুণী রোগিণীর কাহিনি বলছি, সেটা শুনলেই সবকিছু আপনার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মেয়েটিকে অত্যন্ত সরল সুন্দর পবিত্র বলে মনে হত।

ঘটনার পীঠস্থান একটি দেহাতি শহর। এক দিন রাত্রে আমি আমার ঘরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল শহরে যতগুলো ঘণ্টা আছে সবগুলো একসঙ্গে বাজতে শুরু করেছে। প্রথমে মনে হল, আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু না ওই শব্দে যখন আমার ঘুম ভেঙে গেল তখন বুঝলাম শব্দটা আমার ঘরেরই কলিং বেলের শব্দ। সেটা পরিত্রাহি রবে বেজে চলেছে।

ওই প্রচণ্ড শব্দেও আমার চাকরের ঘুম ভাঙেনি। সুতরাং নিজেকে উঠে খাটের সঙ্গে লাগানো কলিংবেলের সুইচটা বন্ধ করে দিতে হল। এর পর প্রচণ্ড শব্দে কে দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করল। দরজা খুলে দেখলাম, জা কর জাঁ হাতে একটা চিরকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত থেকে চিরকুটটা নিয়ে সেটা পড়লাম। ম্যাডাম লেলিইভার এখনই একবার তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। আমার মনে হল এখন সেখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ব্যাপারটা হয় স্নায়ুর বিকার অথবা হিস্টিরিয়া। নিজের মনে এরকম একটা কিছু ভেবে নিয়ে আমি উত্তর লিখে পাঠালাম, "আমি অসুস্থ, আপনি দয়া করে আমার সহকারী মঁসিয়ে রোনেতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।"

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে আমি আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। আবার কিছুক্ষণ পরেই বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখলাম জাঁ দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাতেই সে বলল, নীচে একজন অপেক্ষা করছেন। তিনি এমনভাবে চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন বোঝাই মুশকিল, তিনি পুরুষ কি মহিলা। কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না, আপনার সঙ্গে দেখা না করে তিনি যাবেন না। বলছেন দুজন মানুষের জীবনমরণ সমস্যা। আপনিই একমাত্র এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

জাঁকে বললাম তাঁকে ওপরে নিয়ে আসতে।

কালো পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে জাঁ-এর সঙ্গে এক ভৌতিক মূর্তি এসে ঢুকল আমার ঘরে। জাঁ তাঁকে পৌঁছে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এর পর সে মুখের কাপড়টা একটু সরাতেই তাকে চিনতে পারলাম। আগন্তুক একজন মহিলা আর তিনি হলেন ওই অঞ্চলের সেরা সুন্দরী মাদাম বার্থা লেলিইভার। বছর তিনেক হল তাঁর বিয়ে হয়েছে। স্বামী ওই শহরের একজন ধনী ব্যবসায়ী।

ভয়ে আতঙ্কে তাঁর মুখের চেহারা হয়ে উঠেছিল ভীষণরকমের বিবর্ণ। থরথর কাঁপছিলেন। দুবার কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেইভাবে কিছুই বলতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে বলে ফেললেন, কিছুক্ষণ আগে তাঁর প্রেমিকের মৃত্যু হয়েছে তাঁর শোয়ার ঘরে। একটু পরেই তাঁর স্বামী ক্লাব থেকে ফিরে আসবেন। আর কিছু বলতে পারলেন না—ভয় উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি পোশাক পরে তৈরি হয়ে তাঁর গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে হঠাৎ তাঁর চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে রুদ্ধ আবেগে কেঁদে ফেললেন—আমার ভিতরে যে কী হচ্ছে তা যদি আপনি বুঝতে পারতেন! মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে যদি আমি মরে যেতে পারতাম! ছটা মাস ধরে কী অসম্ভব রকমের ভালোবেসেছিলাম তাকে।

বাড়িতে আর কে কে আছে?

আমার পরিচারিকা রোজ ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। সে সমস্ত ব্যাপারটা জানে।

গাড়ি থেকে নেমে একটু হেঁটে বাড়ির দরজার কাছে এসে উপস্থিত হলাম। ল্যাচকি দিয়ে দরজা খুলে অতি সন্তর্পণে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে ওপরে উঠে এলাম। একটি মেয়েকে দেখলাম, সে বাতি হাতি নিয়ে সিঁড়ির ওপর চুপচাপ বসে আছে। ওই মেয়েটি নিশ্চয়ই পরিচারিকা রোজ। সম্ভবত ভয়ে মৃতদেহের সামনে থেকে চলে এসেছে।

শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলাম বিছানাটা একেবারে ওলটপালট হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে যেন ওর ওপরে একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। চাদরের একটা প্রান্ত মেঝের ওপর লুটোচ্ছে—একখানা ভিজে তোয়ালে বেসিনের নীচে নেতা হয়ে পড়ে আছে। ওই ভিজে তোয়ালেটা সম্ভবত ম্যাডামের প্রেমিকের কপালে প্রলেপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

মেঝের ওপর মৃতদেহটি চিত হয়ে পড়ে আছে। এবার সেটাকে সবরকমভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম—বুঝলাম ঘণ্টা দু-তিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে। এর পর আমি মহিলাদুজনকে বললাম, "আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন। দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে।"

আমার পাশের মহিলাদুজন জড় পদার্থের মতো বসেছিল। মৃতদেহটিকে বিছানায় শুইয়ে দিতে তারা আমাকে সাহায্য করল। আর একবার তার বুকের ওপর কান রেখে পরীক্ষা করলাম, না মারাই গেছে। আসুন আমাকে সাহায্য করুন—একে পোশাক

পরিয়ে দিতে হবে।

মৃতদেহে পোশাক পরানো যে কী ভয়ংকর কষ্টকর, সে ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন। মৃতদেহে পুতুলের মতো একটা একটা করে পোশাক পরালাম, মোজা, আন্ডারপ্যান্ট, ট্রাউজার, ওয়েস্ট কোট শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে কোট পরানো হল, মহিলাদুজন এ কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করল।

দুরূহ কাজটা শেষ করে পোশাক পরানো মৃত শরীরটার দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। তারপরে বললাম, এবার এর চুল আঁচড়িয়ে দিতে হবে।

চুল আঁচড়ানো শেষ হওয়ার আগেই ম্যাডাম রোজের হাত থেকে চিরুনিটা ছিনিয়ে নিয়ে, পরম মমতার সঙ্গে তাঁর মৃত প্রেমিকের চুল আঁচড়ে দিতে লাগলেন। মনে হল তিনি তাকে আদর করছেন। জীবিত অবস্থায় নিশ্চয়ই তিনি তাকে গভীর ভালোবাসা দিয়ে এইভাবে আদর করতেন।

হঠাৎ চুল আঁচড়ানো বন্ধ করে মৃত প্রেমিকের মাথাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে তার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন। যে মুখ দিয়ে আর কখনও প্রেমের ভাষা বেরোবে না, যে মুখে দেখা যাবে না প্রেমিকের মুখের মিষ্টি হাসি—সেই মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর অস্থির ব্যাকুলতায় তাকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মতো চুমু খেতে লাগলেন। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কান্না জড়ানো স্বরে বললেন, প্রিয়তম, তোমার প্রেমের স্মৃতি আমৃত্যু আমি সযত্নে বহন করে যাব, বিদায় প্রিয়তম, চিরবিদায়।

ঠিক তখনই ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা শব্দ হল। সেই শব্দে আমি কেমন যেন চমকে উঠলাম। এই সময়েই সমস্ত ক্লাবের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাডামকে বললাম, শিগগির চলুন, মৃতদেহটাকে ড্রইংরুমে নিয়ে যেতে হবে।

এর পর আমরা ধরাধরি করে মৃতদেহটিকে ড্রয়িংরুমে এনে একটা সোফার ওপর বসিয়ে দিলাম।

এমন সময় সামনের দরজাটা খোলার শব্দ পেলাম। এক মুহূর্ত পরে শুনতে পেলাম সেটা বন্ধ হয়ে গেল। স্বামী ভদ্রলোকটি বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি যখন সামনের দিকে এসে পড়লেন, তখন বললাম, বন্ধু একবার এদিকে আসুন। এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মঁসিয়ে লেলিইভার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, এসব কী হচ্ছে এখানে।" তাঁর কণ্ঠস্বরে চরম বিস্ময়।

আমি তাঁর সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম, বন্ধু, আমাদের বড়ো বিপদ। আমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে আমরা এখানে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছিলাম। হঠাৎ উনি অসুস্থবোধ করতে থাকেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারান। আমরা দীর্ঘসময় ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ওঁর জ্ঞান ফেরাতে পারিনি। অপরিচিত কাউকে ডাকলে পাছে বেশি হই-চই হয় সেই ভয়ে তেমন কাউকে ডাকার সাহস হয়নি। এঁকে এখন

এর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা খুবই দরকার। এঁকে নীচে নিয়ে যেতে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে বিশেষ বাধিত হব।

মঁসিয়ে যদিও বেশ অবাক হয়েছিলেন, তবু তিনি কিছুই সন্দেহ করেননি। তিনি টুপিটা খুলে রেখে মৃতদেহটিকে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করলেন। আমরা মৃতদেহটিকে চ্যাংদোলা করে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলাম। মাদাম বাতি হাতে আমাদের পিছনে পিছনে এলেন।

এর পর মৃতদেহটিকে গাড়ির মধ্যে তুলে দেওয়া হল। মৃতদেহটিকে আসন থেকে গড়িয়ে পড়তে দেখে আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে ঢুকে দেহটিকে সোজা করে বসিয়ে দিলাম, পাছে কোচম্যানের কোনো সন্দেহ হয় সেজন্য মৃতদেহটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলাম, আরে এত ভয় পাওয়ার কী আছে? তোমার কিছুই হয়নি, ঠিকমতো চিকিৎসা করলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

মঁসিয়ে লেলিইভার উদ্‌বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ভয়ের কোনো কারণ নেই তো?"

"না।" তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম। ম্যাডাম তাঁর বিয়ে করা স্বামীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে যেন অতিথিকে বিদায় জানাচ্ছেন—এমন একটা ভাব নিয়ে গাড়ির ভিতরের দিকে তাকিয়ে রইলেন রীতিমতো একমুখ হাসি নিয়ে। তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম ম্যাডামের প্রেমিকের বাড়ি। বাড়ির লোকজনদের খবরটা জানিয়ে বললাম, "রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।" এই বলে সকলের সাহায্যে মৃতদেহটিকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে তাকে আর একবার পরীক্ষা করার অভিনয় করে বললাম কিছুক্ষণ আগে এঁর মৃত্যু হয়েছে এবং সেই মর্মে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিলাম। সমস্ত কাজ শেষ করে বাড়ি এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। তার আগে পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিক প্রেমিকাদের উদ্দেশ্যে একটি অশ্লীল মন্তব্য করলাম।

ডাক্তার এখানেই তাঁর কাহিনি শেষ করলেন। তারপর ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে এই গল্পটা শোনানোর কারণ কী?"

ডাক্তার মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে বললেন, "ভবিষ্যতে যদি আপনি কখনও এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার হন তাহলে হয়তো সেদিন আপনাকে এইভাবে সাহায্য করতে পারব।"

ঘাতক
The Assasin

তরুণ বয়সের একজন অ্যাডভোকেট এক অপরাধীর পক্ষে কেস লড়ছেন। আর এটা নিয়েই তিনি তাঁর প্রথম মামলা শুরু করেছেন। তিনি উপস্থিত জুরিদের সম্বোধন করে বললেন, যে সমস্ত ঘটনার কারণে এই মামলাটা শুরু হয়েছে—তা হয়তো আপনারা অনেকে জানেন। আমার মক্কেল একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কর্মী হিসাবে তিনি যথেষ্ট একনিষ্ঠ এবং ভীরু ও শান্ত প্রকৃতির একজন মানুষ। হঠাৎ রেগে গিয়ে কেন যে তাঁর মনিবকে খুন করলেন এবং কোন্ মানসিকতা বা মনস্তত্ব সে সময় তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল তা ব্যাখ্যা করা সত্যিই একটা দুরূহ ব্যাপার। তবুও সেটা আপনাদের কাছে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব যদি সে ব্যাপারে আপনাদের সহৃদয় অনুমতি পাই। আমার অনুরোধ, আমার সমস্ত কথা শোনার পর আপনারা সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেবেন।

আমার মক্কেল জাঁ নিকোলা—একজন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারের সন্তান। চরিত্রের দিক থেকে তিনি একজন যথার্থই সরল ও শ্রদ্ধাশীল মানুষ। তিনি যে অপরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার শিক্ষা পেয়েছেন—সেখানেই লুকিয়ে আছে এই অপরাধের উৎস। এ ধরনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে আজকের সমাজের মানুষ প্রকৃতই বঞ্চিত। যদি এই সব মহৎ গুণের অনুসন্ধান করতে হয় তাহলে আপনাদের অবসরপ্রাপ্ত ভদ্র পরিবারের নম্র, বিনয়ী মানুষদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ করে নিতে হবে। তবে এসমস্ত মহৎ উদার মানুষদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আবহমানকাল ধরে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নীতিটি ধর্মপ্রাণ এবং বিজ্ঞ মানুষদের অন্তরে স্বমহিমায় বিরাজ করছে।

অপরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার অক্ষমতা একজন মানুষকে সত্যিকারের একজন মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। এই সমস্ত মানুষ ন্যায় অন্যায়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং সবকিছুই বিশ্বাস করে। আর অবশিষ্ট মানুষরা চোখ কান খোলা রেখে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন। আমরা হলাম প্রথম দলের মানুষ। আমরা অপরের লজ্জা ও কলঙ্কের কাহিনিগুলো কান পেতে শুনি। আমরা অপরের অন্যায় কাজের সমর্থন করি। নারী পুরুষের ভেদাভেদ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করে। সেই বিচারের মাপকাঠিতে আমরা রাজার ছেলে বা বস্তির মাতালের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না। তাদের অন্যায় কাজকে সর্বদা সমর্থন করি, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করি, অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে তাদের বেকসুর খালাস করে দিই। সমাজের সব থেকে উচ্চশ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে সব থেকে নিম্নশ্রেণির মানুষের চূড়ান্ত নৈতিক অবনতি আমাদের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা বুঝতে পারছি, ধীরে ধীরে সবকিছু কী ধরনের অবক্ষয় ও ধ্বংসের গহ্বরে তলিয়ে যেতে বসেছে। অর্থের বিনিময়ে অন্যায়ের দাসত্ব স্বীকার করে নিতে আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না। আমাদের বংশগরিমা আর মর্যাদা স্বর্ণখণ্ডের বিনিময়ে সহজে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। নারীর চুম্বন ও তার শরীরের স্বাদ নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের যথাসর্বস্ব বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত। কোনো শিক্ষা, নীতি, আদর্শ আমাদের আজ সে সমস্ত কাজ করতে বাধা দেয় না। প্রতিটি মানুষকে সন্দেহ করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের সামাজিক পরিকাঠামো ও বাতাবরণের মধ্যে আমার এই মক্কেল একটা বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি শ্রদ্ধা, ভক্তি, মানবিকতা ও উদারতায় এতটা মহৎ, এতটা সমৃদ্ধ যে তা বজায় রাখতে তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এহেন একজন শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিমান মানুষের জীবনের কাহিনি এখন আপনাদের কাছে তুলে ধরব।

ভালো আর মন্দের পার্থক্য নিয়ে যে সমস্ত শিশু শিক্ষিত হয়ে বড়ো হয়ে ওঠে আমার মক্কেলটিও সেই নীতি ও শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভালো ও মন্দের মধ্যে যে সমস্ত তারতম্য বা প্রভেদ থাকে সেগুলো সহজেই তাঁর চোখে ধরা পড়ে যেত। কোন্‌টা সৎ এবং কোন্‌টা অসৎ সেটা তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন।

সেই কারণে ধর্ম আর বিশ্বাসকে আশ্রয় করে তিনি বড়ো হয়ে উঠলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতা তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তাঁর সমস্ত মনটাকে অধিকার করে রইল।

বাইশ বছর বয়সে ওঁর বিয়ে হল আর যার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হল, সেও রুচি, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিকতা ও সরলতায় তাঁরই অনুরূপ। এই ধরনের একজন সরল ও ভক্তিমতী নারীকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন। নিজের মাকে তিনি দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজের স্ত্রীকে শিখিয়েছিলেন মাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে, আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে। বিবাহিত জীবনযাপন করেও মায়ের প্রতি সেই শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। শঠতা, প্রবঞ্চণা বা প্রতারণা নামের শব্দগুলো তাঁর অভিধানে কখনও স্থান পায়নি। দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন উনি। ওঁর চরিত্রে কখনও সামান্যতম কলঙ্কচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি নিজে যেমন কারও সঙ্গে প্রতারণা করেননি, তিনি তেমনি কখনও চাইতেন না, তিনি অন্যের দ্বারা প্রতারিত হন।

বিয়ের কিছু দিন আগে থেকেই তিনি মঁসিয়ে ল্যাঙ্গালের অফিসে ক্যাশিয়ারের চাকরি করছিলেন। এই ল্যাঙ্গালেকেই তিনি সম্প্রতি হত্যা করেছেন।

উপস্থিত জুরি মহোদয়গণ, মঁসিয়ে ল্যাঙ্গালের স্ত্রী, যিনি ছিলেন তাঁর ব্যাবসার অংশীদার, তাঁর নিজের ভাই মঁসিয়ে পাথুঁই, তাঁদের পরিবারের প্রত্যেক সদস্য, ব্যাঙ্কের প্রতিটি উচ্চপদস্থ কর্মচারী—এই মামলায় যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন

তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে আমার মক্কেল তাঁর মালিকের প্রতি যেমন ছিলেন সৎ, বিনয়ী, শ্রদ্ধাশীল তেমনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ কর্মী।

তাঁর এই বিরল ও আদর্শ চরিত্রের জন্য তিনি সকলের সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁকে কিছু সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সমগুণে অলঙ্কৃতা। সেও সকলের সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করেছিল।

ভয়ংকর দুর্ভাগ্যবশত হঠাৎ কদিনের জ্বরে ভুগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল।

কিন্তু তিনি যে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে কতটা দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েছিলেন—তা তাঁকে বাইরে থেকে দেখে বোঝ যেত না। শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেই মৃত্যুকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। একমাত্র তাঁর মুখের সীমাহীন বিবর্ণতা আর শূন্যদৃষ্টি অব্যক্তভাবে প্রকাশ করে দিতে তাঁর অন্তর কী দুঃসহ দুঃখ বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে।

তারপরে যে ঘটনাটি ঘটল, সেটি অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এই মানুষটি দীর্ঘ দশটি বছর বিয়ে করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গ ও সাহচর্যের মধ্যে বাস করে এসেছেন। প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি কাজে স্ত্রীর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অফিস থেকে ফেরার সময় একান্ত আপন একজন নারীর মিষ্টিস্বরে অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। ঘুমোতে যাওয়ার সময় জানাতেন শুভরাত্রি, আর ঘুম থেকে জেগে উঠেই আবার তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন। পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম, অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা—তাঁদের দুঃখ, বিষাদ, বিমর্ষতা আর কাজের একঘেয়েমিকে স্বচ্ছন্দ সহজ করে তুলত। সেইজন্য স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা থাকা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই তিনি কাছের একটা কাফেতে গিয়ে এক বোতল বীয়ার নিয়ে গ্লাসে ঢেলে অল্প অল্প করে খেতেন আর চুরুটের ধোঁয়ায় প্রায় অন্ধকারে বিলিয়ার্ড বলের ছোটাছুটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনাও তাঁর কানে এসে পৌঁছোত। এসব কোনো বিষয়ে তিনি মন দিতে পারতেন না। তাঁর অন্তর সর্বদা একটি নারীর সঙ্গ লাভের কামনায় ব্যাকুল হয়ে থাকত। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে যে তরুণীটি কেনাবেচার কাজ করত—তিনি তার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতেন। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি যেন তার প্রতি মোহাসক্ত হয়ে পড়লেন।

খুব শিগগিরই দুজনের মধ্যে পরিচয় হল আর ধীরে ধীরে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। এর পর থেকে কাউন্টারের কাছাকাছি একটি টেবিল বেছে নিয়ে সেখানে বসতে শুরু করলেন। এই ধরনের একটা অবস্থা তাঁর কাছে বেশ প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠল। মেয়েটিও তাঁকে সাহচর্য বা সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল—অবশ্য সবটাই ছিল ব্যাবসাভিত্তিক। এক এক দিন মেয়েটি তাঁকে গ্লাসে করে মদ খাইয়ে দিত—সেটাও ছিল ব্যাবসার স্বার্থে। ক্রমশ জাঁ নিকোলা মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন, তাকে ভালোবেসে ফেললেন। কারণ সে একটি নারী বই আর কিছু নয়।

ছোটোখাটো চেহারার তরুণীটি কিন্তু মোটেই নির্বোধ ছিল না। সে ভাবতে লাগল এই সরল মানুষটিকে এমন কাজে ব্যবহার করতে হবে যেটা তার কাছে লাভজনক

হয়ে ওঠে। একমাত্র উপায় যেটা ছিল সেটা হল এমন কিছু করতে হবে যাতে জাঁ নিকোলা তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

আর সেটা সুসম্পন্ন করতে তাকে আদৌ কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল না।

আমার শ্রদ্ধেয় জুরিমহোদয়গণ, সেই বিবাহ তার স্বাধীনতাকে মোটেই ব্যাহত করতে পারল না, বরং তা আরও বেশি অবাধ হয়ে উঠল। শুধু তাই নয় তার গতিবিধি এবং আচার-আচরণ লজ্জাজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছোল।

তাঁর স্ত্রীর কলঙ্কজনক কেচ্ছা কেলেংকারী নিয়ে অফিসের সহকর্মীরা তাঁকে বিদ্রুপ করতে শুরু করল। এই হীন জঘন্য আলোচনায় সকলে মেতে উঠল, সকলেই জেনে গেল তার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে।

শেষ পর্যন্ত এই দুশ্চরিত্রা মহিলাটি অফিসের মালিকের ছেলেটিকে তার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করল। বয়স তার উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। তার দেহ ও মনের ওপর ছড়িয়ে দিল নোংরা এবং বিষাক্ত এক প্রভাব। এই কর্মীটিকে মঁসিয়ে ল্যাঙ্গালে এতটাই ভালোবাসতেন ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতেন যে সব জেনে বুঝেও তিনি এতদিন কিছুই বলেননি কিন্তু যেদিন তাঁর ছেলেকে জাঁ নিকোলার স্ত্রীর বাহুবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে চুম্বনরত অবস্থায় দেখতে পেলেন সেদিন তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। ক্রোধে একেবারে পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। তিনি ভীষণ একটা ঘৃণা নিয়ে জাঁ নিকোলাকে ডেকে তাঁর সঙ্গে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে স্থির করলেন আর সেটা করতে গিয়েই তিনি মারাত্মক একটা ভুল করে ফেললেন।

মহামান্য জুরি মহোদয়গণ, এর পরে কীভাবে জাঁ নিকোলার হাতে মিঃ ল্যাঙ্গালে খুন হলেন তা তিনি তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে উল্লেখ করে গেছেন। কী ছিল তাঁর জবানবন্দিতে তা আপনাদের এখন পড়ে শোনাব।

"আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছি, আমার ছেলে গতকাল জাঁ নিকোলার স্ত্রীর ফাঁদে পড়ে তাকে দশ হাজার ফ্রাঁ দিয়েছে। যখনই খবরটা আমার কানে এসে পৌঁছোল তখনই আমি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠলাম। এ ব্যাপারে অবশ্য নিকোলা সম্পূর্ণ আমার সন্দেহের বাইরে ছিল। না জেনে বা নিশ্চিত না হয়ে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

তাকে ডেকে পাঠানোর পর সে যখন আমার সামনে এসে উপস্থিত হল—তখন তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, তাকে চাকরিতে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য সে যেন কিছু মনে না করে।

আমার কথা শুনে তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেই অবস্থাটা সামলিয়ে উঠে সে কারণটা জানতে চাইল বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে।

কিন্তু কারণটা জানাতে আমি অস্বীকার করলাম, যেহেতু সেই ঘটনাটার মধ্যে আমার কিছু ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপার ছিল। এতে সে মনে করল, তার চরিত্র সম্বন্ধে

আমার মন সন্দিহান হয়ে উঠেছে—অথবা সে আমার সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করেছে যা আমার বিরক্তি উৎপাদন করেছে। এই ধরনের একটা চিন্তা তার মুখটাকে বিবর্ণ করে তুলল। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলার জন্য সে আমাকে, প্রথমে কাতরভাবে মিনতি করল। তাতেও কোনো ফল হল না দেখে সে একরকম আদেশের সুরে বলল ব্যাপারটা খুলে বলার জন্য। কারণ তার মনে হয়েছিল, সেটা নিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে আলোচনা করার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

তবুও আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে জঘন্য ভাষায় আমাকে গালিগালাজ করতে লাগল। তাতে আমিও যথারীতি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, মনে হল তার সঙ্গে আমার মারামারি শুরু হয়ে যাবে।

এর পর সে আমাকে এমন একটা অপমানজনক কথা বলল—যা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি তখন গোপন ব্যাপারটা চেপে না রেখে তার মুখের সামনেই বলে ফেললাম।

কথাটা শুনে সে উন্মাদের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে সে আমার টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে তা থেকে বের করে আনল একটা ঘাস কাটার কাঁচি। তারপরে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ছুটে এল আমার দিকে, আমার লম্বা কাঁচিটা আমূল বসিয়ে দিল আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। আমি কোনো যন্ত্রণা অনুভব করার সময় বা সুযোগ পাইনি।''

উপস্থিত জুরি মহোদয়গণ, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আসামির এর বেশি কিছু বলার নেই। সে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকেও প্রথম স্ত্রীর মতো শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত।

এর পর জুরিদের সঙ্গে আলোচনা করে বিচারক আসামিকে বেকসুর মুক্তি দিলেন।

প্রেম
Love
(একজন স্পোর্টসম্যানের জীবনপঞ্জি থেকে তিনটি পৃষ্ঠা)

সংবাদপত্রের সাধারণ সংবাদের মধ্য থেকে প্রেমের একটি কাহিনি পড়লাম। প্রেমিকটি তার প্রেমিকাকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছিল। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, প্রেমিকাকে তার প্রেমিক অসম্ভব ভালোবাসত। ব্যক্তিগতভাবে প্রেমিক বা প্রেমিকা আমার চিন্তার বিষয়বস্তু নয় কিন্তু তাদের প্রেমের কাহিনি আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে সত্যি বলতে বিচলিত বা অবাক করেছে তার থেকে বেশি। এই মর্মান্তিক কাহিনিটি পড়ে, আমার সমস্ত মনটা এক করুণ বিষাদে ভরে উঠেছে আর এই ঘটনাটাই আমাকে আমার তরুণ বয়সের একটা শিকারের কথা মনে করিয়ে দিল।

সহজাত আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি যৌক্তিকতাকে গুরুত্ব দিতাম এবং সুসভ্য মানুষের মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। শিকারে আমার ভীষণ আগ্রহ ছিল। তবুও আহত প্রাণীগুলোর মৃত্যু কাতর আর্তনাদ, তাদের রক্তমাখা পালক এবং আমার হাতের উপরে তাদের গুলিবিদ্ধ শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্ত আমার হৃদয়কে এমন ভয়ংকরভাবে যন্ত্রণা দিত যে মনে হত আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বোধহয় সেই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে।

সে বছর শরতের শেষের দিকে ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। আমার খুড়তুতো ভাই কার্ল ডি র‍্যাভেল আমাকে তার সঙ্গে একটা জলার ধারে পাতিহাঁস শিকার করতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। সকালের দিকেই শিকারে বেরোবার সময় স্থির করা হল।

চল্লিশ বছর বয়সি আমার খুড়তুতো ভাই ছিল ভীষণ আমুদে। তার স্বভাবসিদ্ধ প্রাণচাঞ্চল্যের কাছে হার মানত কৈশোরের প্রাণচাঞ্চল্য। তার মাথার চুলগুলো ছিল লালচে, অসাধারণ বলিষ্ঠ, শরীরে যৌবনের দীপ্তি। মুখে সুন্দর ছাঁদের দাড়ি। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক। রসিকতাকে সে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসত। এক প্রশস্ত উপত্যকার ওপর একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করে সেখানে বাস করছিল সে। উপত্যকার মাঝখানে দিয়ে একটি নদী ছোটো ছোটো ঢেউ তুলে বয়ে চলত। নদীর দুদিকের অর্থাৎ বাম ও ডান দিকের ঢালু জায়গাটা ছিল অরণ্যসমাচ্ছন্ন। সেখানে অনেক বিরল প্রজাতির পাখি দেখতে পাওয়া যেত। সেখানে এসে অনেকে ঈগল পাখি শিকার করত। ফ্রান্সের জনবহুল স্থানে যে সমস্ত পাখিকে দেখা যেত না তারা এই নির্জন অরণ্যের বৃক্ষশাখায় এসে রাত্রির মতো আশ্রয় নিত। উপত্যকার সমতলভূমিতে ছিল বেশ কয়েকটি উন্মুক্ত প্রান্তর। সেগুলোর পাশে যে

কটি পরিখা ছিল তার জল প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে যেত। নদীর মোহনা যেখানে এসে মিশেছে। ঠিক সেখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে একটি বিরাটাকারের সুবিস্তৃত জলা আর সেটা ছিল শিকারের উপযুক্ত জায়গা। আমার খুড়তুতো ভাই ওই জায়গাটার বিশেষ তত্ত্বাবধান করত এবং সেটাকে সে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। সেই জলার নিস্তরঙ্গ জলের মাঝে মাঝে ছিল নলখাগড়ার গাছ। জলের ওপর দিয়ে যখন ছোটো ছোটো ডিঙিগুলো চলে যেত তখন মাছগুলো সব ঝাঁক বেঁধে সেই নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে এসে লুকিয়ে পড়ত জলার পারের বনমুরগিগুলো একবার তাদের দেখে নিয়ে বনভূমির কোন্ গভীরে চকিতে অদৃশ্য হয়ে যেত।

জলের প্রতি আমি বরাবর এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করতাম। সুগভীর রহস্যে ঘেরা তরঙ্গাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিশালতা, এর সীমাহীন ব্যাপ্তি, তরঙ্গায়িত নৃত্যচঞ্চলা সুন্দরী নদীর কোনো এক সুদূর অজ্ঞাতে হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমি দুচোখ ভরে উপভোগ করতাম। জলার মধ্যে অজানা জলচর প্রাণীদের অস্তিত্ব আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতাম। মনে হত এই জলপূর্ণ স্থানটি যেন একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা, সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্বেই যেন নিজেই সম্পূর্ণ। এর নিজের আছে একটি স্বতন্ত্র পৃথিবী, একটি স্বতন্ত্র জীবন, একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এর শান্ত, সুশীতল কোলে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছে স্থায়ী কিছু অধিবাসী। এর ওপর দিয়ে চলে যায় কত মানুষ তাদের জলযান নিয়ে। এর প্রবাহিত তরঙ্গের শব্দ, এর জলকল্লোল, সর্বোপরি এর অপার রহস্য একে যেন স্বতন্ত্র এক স্পর্শে সমৃদ্ধ করেছে। এর নিস্তরঙ্গ শান্ত জলের সঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে শেষরাতের কুয়াশা। নিস্তব্ধ প্রকৃতির মৃদুমন্দ বাতাসে নলখাগড়ার গাছগুলো যখন আন্দোলিত হয় তখন মনে হয় এরা যেন ফিশফিশ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এর অপার্থিব রহস্যে ঘেরা পরিমণ্ডলকে যেন এক স্বপ্নের জগত বলে মনে হয়। বাতাসের স্পর্শে ছলকে ওঠা জলের শব্দ এত মৃদু এত অস্পষ্ট মনে হয় যেন এক অজ্ঞাত ও ভয়ংকর বিপজ্জনক রহস্যে ঘেরা গোপনীয়তা মিশে আছে এর নিস্তরঙ্গ জলের অতলে। মনে হয় কামান বা বজ্রগর্ভ মেঘের গর্জনের থেকে তা আরও বেশি ভয়ংকর। এর জলের ওপর যে কুয়াশার আস্তরণ ভেসে থাকে তার মধ্যে যেন সৃষ্টির আদি রহস্য পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। সূর্যের উত্তাপের নীচে ভিজে মাটির ভয়ংকর আর্দ্রতার মধ্যে কর্দমাক্ত নিস্তরঙ্গ জলের অস্তিত্ব যেন জীবনের প্রথম স্পন্দন সূচিত ও বর্ধিত করে।

রাত্রির জমাটবাঁধা হিমেল অন্ধকারে আমি আমার খুড়তুতো ভাইএর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রকাণ্ড হল ঘরে বসে ডিনার করার সময় লক্ষ্য করলাম, চারিদিকের দেয়ালে, সিলিংএ শিকার করা মৃত কিছু পাখি। সেগুলোকে দেখে মনে হয় যেন তারা জীবন্ত এবং তাদের নখ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে বসে আছে। আমার খুড়তুতো ভাইকে সিলের চামড়ার জ্যাকেট পরে মেরু অঞ্চলের কোনো অদ্ভুত প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের শিকারের কেমন আয়োজন করেছে সমস্ত কিছুই জানাল।

রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ আমাদের বেরোতে হবে যাতে আমরা শিকারের নির্দিষ্ট

স্থানে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছোতে পারি। সেখানে ভাল ভাল বরফ দিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর বানানো হয়েছে যাতে হাড়কাঁপানো, বা করাত দিয়ে মাংস কাটার অনুভূতি তৈরি করা ঠান্ডার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি।

কার্ল ডি র‍্যাভেল, হাত দুটো ঘষতে ঘষতে বলল, 'জীবনে কখনও এমন ঠান্ডা পড়তে দেখিনি। সন্ধে ছটা না বাজতেই তাপমাত্রা –১২° ডিগ্রি তে নেমে যায়।'

ডিনার খাওয়া শেষ হতেই আমি এক মুহূর্ত দেরি না করেই শয্যাশ্রয় করলাম। ঘরের ভিতরে ফায়ার প্লেস-এ যে আগুন জ্বলছিল তার আরামদায়ক উত্তাপে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলাম। তিনটে বাজতেই কার্ল আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিল। সে একটা ভালুকের চামড়ার কোট পরল আর আমি পরলাম একটা ভেড়ার চামড়ার মোটা জ্যাকেট। এরপর আমরা দুজনে দুকাপ গরম কফি খেয়ে দুগ্লাস ব্রান্ডি পান করলাম।

বাইরে বেরোবার প্রথম মুহূর্ত থেকেই যে মারাত্মক ঠান্ডা অনুভব করলাম, সেই কনকনে ঠান্ডা যেন আমার হাড়ের মজ্জাতে পৌঁছে গেল। সেই শীতের রাত্রিতে সমস্ত পৃথিবী যেন জড়, নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। কোথাও যেন প্রাণের সামান্যতম স্পন্দনও নেই। পশু পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা—সমস্ত জীবজগতের যেন মৃত্যু ঘটেছে। পাখিগুলো গাছের ডাল থেকে পড়েই জীবনের স্পন্দন হারিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই কুঁকড়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

স্তিমিত চাঁদ তার উজ্জ্বলতা হারিয়ে এক দিকে ঢলে পড়েছে। আকাশের গায়েই সে যেন তার চৈতন্য হারিয়ে এক জড় ও ক্ষীণ আলোকপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। সে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে ক্ষীণ হতে হতে হতে ডুবে যাওয়ার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। শীতের প্রকোপে জড় আর পঙ্গু অবস্থায় তাকে যেন আকাশের গায়ে জোর করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সে যেন এক শোকাচ্ছন্ন, শবদেহের মতো ঠান্ডা ক্ষীণ বিষণ্ণ আলো বিকিরণ করে চলেছে।

বগলে বন্দুক নিয়ে আর হাত দুটো পকেটে ভরে আমি আর আমার ভাই কার্ল দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে চললাম। আমাদের বুটজুতোগুলোকে উলের কভারে ঢেকে হিমে জমে যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে নিঃশব্দে এগোতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গী কুকুরগুলোর নাক দিয়ে তখন বাষ্প বেরোচ্ছিল।

আমরা অবিলম্বে জলার কিনারে এসে উপস্থিত হলাম এবং মোটেই দেরি না করে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লাম এবং অতি সন্তর্পণে তার ভিতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ঝোপটা যেদিকে বাঁক নিয়েছে—সেখানে পৌঁছে কনকনে ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যে বরফের কুঁড়েঘরটা তৈরি করা হয়েছিল, সেটার কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আর তখনই আমি সেই কুঁড়েঘরটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। পাখিদের ঘুম ভাঙার জন্য আমাদের আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং নিজেকে খানিকটা উত্তপ্ত করার ইচ্ছা নিয়ে গরম কম্বলের নীচে আশ্রয় নিলাম। আমি শুয়ে শুয়ে ক্ষীণ, নিষ্প্রভ চাঁদটার দিকে

তাকিয়ে রইলাম। বরফের দেয়ালের অস্পষ্ট স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে চাঁদটাকে দেখে মনে হল তার যেন চারটে শিং আছে। কিন্তু জমে যাওয়া জলার ঠান্ডা, ঘরের ভিতরের ঠান্ডা আর সমস্ত পরিমণ্ডলের ঠান্ডা আমাকে এমন ভয়ংকরভাবে বিদ্ধ করল যে আমি কাশতে শুরু করলাম।

মনে হল কার্ল যেন একটু বিরক্ত হয়েছে। সে বলল, আমি আজকের দিনটা নষ্ট করতে চাই না আবার তোমার ঠান্ডা লেগে যাক সেটাও চাই না। সুতরাং এখনই আগুন জ্বালানো দরকার। এর পর সে শিকাররক্ষককে কিছু শুকনো নলখাগড়া কেটে আনতে বলল।

সেগুলো এনে ঘরের মাঝখানের মেঝেতে আগুন জ্বালানো হল। ধোঁয়া বেরোবার জন্য ছাদের মাঝখানে একটা গর্ত করে দেওয়া হল। আগুনের উত্তাপে স্ফটিকস্বচ্ছ বরফের দেয়ালগুলো ধীরে ধীরে গলে যেতে শুরু করল। কার্ল আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সে আমাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলে বলল, 'এখানে এসে দেখ, কী অপূর্ব দৃশ্য।' আমি বাইরে এসে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম, আগুনের উত্তাপে শঙ্কুর আকৃতি নিয়ে আমাদের কুঁড়েঘরটা অগ্নিগর্ভ বিরাট হীরকের উজ্জ্বলতা ও ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ এক অদ্ভুত আর্তচিৎকারে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। আমরা যে আগুন জ্বালিয়েছিলাম, সেই আগুনে বনচর পাখিগুলোকে দেখতে পেলাম। প্রত্যূষের সেই হিমেল প্রকৃতিতে পাখিদের ডানা বেয়ে ভেসে আসা করুণ আর্তকান্না পৃথিবীর হতাশ বিষণ্ণ এক আত্মার যেন সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

কার্ল বলল, আগুন নিভিয়ে দাও, সমস্ত প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে পড়েছে উষার স্নিগ্ধ আলো। আকাশের গা বেয়ে তখন একঝাঁক বুনো হাঁস ডানা মেলে দিয়ে উড়ে চলেছে কোনো এক অজানা দিগন্তে।

হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মতো উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হল উষার আকাশটাকে আলোকিত করে। কার্ল তার বন্দুক থেকে গুলি করেছিল। তৎক্ষণাৎ শিক্ষিত কুকুরগুলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে গেল।

তারপরমুহূর্ত থেকে প্রতিটি মিনিটে আমি আর কার্ল বন্দুকে গুলি ভরে তৈরি হয়ে রইলাম। যে মুহূর্তে পাখির ঝাঁক উড়ে যেতে দেখলাম সেই মুহূর্তে আমাদের দুজনের বন্দুক গর্জে উঠল। কুকুর দুটো বারকয়েক হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত বেশ কয়েকটা পাখিকে মুখে করে তুলে নিয়ে এল। তখনও পাখিগুলো করুণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। ইতিমধ্যে সূর্যের উজ্জ্বল আলো সমস্ত প্রকৃতিকে আলোকিত করেছে। মেঘমুক্ত নীল আকাশের নীচে দিনটি তার আনন্দঘন উজ্জ্বলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আমরা ফিরে যাবার কথা চিন্তা করছিলাম। এমন সময় দুটো পাখি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ডানা মেলে দ্রুত উড়ে যাচ্ছিল। আমি বন্দুক তুলে গুলি করলাম। দুটোর মধ্যে একটা পাখি ঠিক আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। এটা ছিল একটা বালিহাঁস। এর পরেই আমার ঠিক মাথার ওপরেই আর একটা পাখির

কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সেই আর্তস্বরে মিশে ছিল কী নিদারুণ, কী মর্মান্তিক শোক দুঃখ যন্ত্রণা—তার সেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করল। সেই পাখিটা তখন আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে উড়তে লাগল আর আমার হাতে ধরা মৃত সঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে হৃদয়বিদারক স্বরে শোক প্রকাশ করতে লাগল।

কার্ল বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বন্দুকের নিশানার মধ্যে না আসা পর্যন্ত পাখিটার সঙ্গীটাকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছিল। সে বলল, তুমি মেয়ে পাখিটাকে গুলি করে মেরেছ, পুরুষ পাখিটা সম্ভবত ওকে ছেড়ে যাবে না।

কার্লের কথাই ঠিক। পুরুষ পাখিটা তার মৃত সঙ্গিনীকে ছেড়ে গেল না। সে একভাবে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে উড়ে উড়ে করুণস্বরে চিৎকার করতে লাগল। ইতিপূর্বে কখনও এমন করুণ আবেদন আমাকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেনি। শুধুমাত্র তার নিষ্ফল শোকপূর্ণ তিরস্কার মহাশূন্যে হারিয়ে যেতে লাগল।

কার্লের যে বন্দুকটা তার গতিবিধি লক্ষ করছিল সেই বন্দুকের ভয়ে সে মাঝে মাঝে তার বন্দুকের নিশানার বাইরে উড়ে যাচ্ছিল। মনে হল সে একাই উড়ে চলে যাবে কিন্তু যেহেতু সে তার মনস্থির করতে পারছিল না—সে তার সঙ্গিনীকে দেখার জন্য বার বার ফিরে আসছিল।

কার্ল বলল, মৃত পাখিটাকে মাটিতে নামিয়ে দাও। তাহলে পুরুষ পাখিটা ধীরে ধীরে বন্দুকের নিশানার মধ্যে চলে আসবে। আর সত্যিই পুরুষ পাখিটা বিপদকে অগ্রাহ্য করে প্রাণীসুলভ প্রেমে মোহিত হয়ে আমাদের কাছাকাছি চলে এল। কার্ল সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল। যে সুতোটায় পাখিটা ঝুলছিল, মনে হল সেই সুতোটা যেন কে কেটে দিল। আমি দেখলাম কালো রংএর কিছু একটা ঝোপের মধ্যে এসে পড়ল আর তৎক্ষণাৎ একটা কুকুর ছুটে গিয়ে ঝোপের মধ্য থেকে গুলিবিদ্ধ মৃত পাখিটাকে মুখে করে আমার কাছে নিয়ে এল। আমি হিমে জমে যাওয়া মৃত পাখি দুটোকে আমার শিকারের ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেললাম আর ওই দিন রাত্রিতেই আমি প্যারিসে ফিরে গেলাম।

একটি নরম্যানডি পরিহাস
A Normandy Joke

শোভাযাত্রাটি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এল। রাস্তার দুপাশ লম্বা লম্বা গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। গাছগুলো চড়াই বেয়ে উতরাই বরাবর খামারবাড়ি পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে। শোভাযাত্রার প্রথমে ছিল নবদম্পতি, তারপরে তার আত্মীয়পরিজন, তাদের পিছনে ছিল নিমন্ত্রিত অতিথিরা এবং সব শেষে ছিল গরিব কিছু প্রতিবেশী। সেই সংকীর্ণ রাস্তার চারিপাশে যে সমস্ত গ্রাম্য ছেলেছোকরারা এখানে ওখানে ঘোরাফেরা করছিল, তারা শোভাযাত্রাটি ভালো করে দেখার জন্য গাছের ওপরে চড়ে বসল।

বরের নাম জাঁপাতু, বয়সে তরুণ ও সুদর্শন। গ্রামের সব থেকে ধনী চাষি। এসব ছাড়াও সে খেলোয়াড় হিসাবেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। এই খেলার প্রতি সে এত বেশি আসক্ত ছিল যে তার জন্য সে কুকুর, মালি এবং বন্দুকের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। কনের নাম ছিল রোজালি রোসেল। তরুণ বয়সের সমস্ত ছেলেরা তার পাণি প্রার্থনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। কারণ তার যেমন ছিল আকর্ষণীয় চেহারা, তেমন ছিল পাত্রপক্ষকে যৌতুক দেবার মতো ক্ষমতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বর হিসাবে পাতুকে মনোনীত করল। কারণ সে পাতুকেই অন্যান্যদের তুলনায় বেশি পছন্দ করেছিল। তার থেকে বড়ো কথা একজন বুদ্ধিমতী নরম্যানডি তরুণীর মতো সে বুঝেছিল অন্যান্য পাণিপ্রার্থীদের তুলনায় তার আর্থিক স্বচ্ছলতা বা সংগতি অনেক বেশি।

যখন তারা খামারবাড়ির সাদা রঙএর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করল তখন চল্লিশবার বন্দুক থেকে ফায়ার করার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু কে বা কারা ফায়ার করল তা কেউ দেখতে বা বুঝতে পারল না। যারা গুলির শব্দ করেছিল তারা খাদের মধ্যে লুকিয়েছিল। সেই শব্দে পুরুষরা খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল। তারা সকলেই বেশ জমকালো পোশাক পরে এসেছিল। পাতু তার স্ত্রীকে সেখানে ফেলে একটা গাছের আড়ালে খামারবাড়ির একটা চাকরকে দেখতে পেয়ে তার কাছে ছুটে গেল। তার হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে সে একবার ফায়ার করল। তারপর সে মাটিতে ঘোড়ার মতো পা ঠুকল। তারপর ফলের ভারে নুয়ে পড়া আপেল গাছটার নীচে গজিয়ে ওঠা লম্বা লম্বা ঘাসের ওপর দিয়ে শোভাযাত্রাটি এগিয়ে চলল। শুয়ে বসে জাবর কাটতে থাকা একপাল বাছুর বড়ো বড়ো চোখ করে তাদের দিকে তাকিয়ে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল এবং তাদের মুখ ঘুরিয়ে শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ভোজ টেবিল থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পুরুষদের মুখের ভাব বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী তাদের মাথায় ছিল লম্বা চকচকে সিল্কের

টুপি। অবশ্য ওই ধরনের টুপি পরার ব্যাপারটা ওরকম একটা বিয়ের আসরে খুব বেমানান মনে হচ্ছিল। অন্যরা সকলে পুরোনো মস্তকাবরণী দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র যারা তারা মাথায় পরেছিল সাধারণ টুপি। সব মহিলাদের গায়ে আলগা করে জড়ানো ছিল শাল আর সেই শালের প্রান্তভাগ তারা তাদের বাহুর নীচে দিয়ে রুচিপূর্ণভাবে ধরে রেখেছিল। গোবরের গাদা থেকে কালো রঙএর মুরগিগুলো ঝলমলে রঙিন শালগুলোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়েছিল। শালের সেই সব বিচিত্র রং দেখে পুকুরধারের হাঁস ও খড়ের চালের পায়রাগুলোও কম অবাক হয়নি। বিরাট খামারবাড়ির সমস্ত খোলা জানালা আর দরজা দিয়ে নানারকম সুখাদ্যের ঘ্রাণ ভেসে আসছিল। সেই সুঘ্রাণে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল চারিপাশের বাতাস। তাতে ভোজনরসিকদের জিবগুলো লালাসিক্ত হয়ে উঠেছিল। অতিথিঅভ্যাগতরা উঠোনে এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরিখার ধার দিয়ে গ্রামের ছেলেছোকরারা এবং উৎসাহী দরিদ্র মানুষেরা সার দিয়ে দাঁড়াল। গুলি ছোঁড়া তখনও বন্ধ হয়নি বরং চতুর্দিক থেকে গুলির শব্দ শোনা যেতে লাগল, চারিদিক ধুলো ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে ভরে উঠল।

বিশাল ডাইনিং হলে ভোজের টেবিল পাতা হয়েছে, সেখানে বসে একসঙ্গে একশোজন অতিথি খেতে বসতে পারে। বেলা দুটোর সময় ভোজনপর্ব শুরু হল। রাত্রি আটটা বেজে গেল তবু খাওয়ার পর্ব তখনও শেষ হয়নি। পুরুষেরা জামার হাতা গুটিয়ে, ওয়েস্টকোটের বোতাম খুলে গোগ্রাসে খাদ্যপানীয় গিলে চলেছে। খাওয়ার পরিশ্রমে তাদের মুখগুলো লাল হয়ে উঠেছে। তাদের দেখলে মনে হবে—কখনই তাদের ভোজনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করা সম্ভব হবে না।

বড়ো বড়ো পরিচ্ছন্ন গ্লাসগুলোতে সোনালি মদের উজ্জ্বলতা অতিথিদের আনন্দ বর্ধন করছে। প্রত্যেকটা ডিশ শেষ করে সোনালি মদে ভরা গ্লাসগুলো মুহূর্তের মধ্যে খালি করে দিচ্ছে অতিথিরা। ফলে উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠছে প্রত্যেকের শিরায় শিরায়। মাথার মধ্যে গজিয়ে উঠতে লাগল নির্বোধের চিন্তাভাবনা।

মাঝে মাঝে এক-একজন অতিথি পিপের মতো ভর্তি পেট নিয়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য কয়েক মুহূর্তের জন্য বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং ফিরে আসছে দ্বিগুণ খিদে আর খাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। তাদের স্ত্রীরা রোদে পোড়া বেগুনে মুখে চুপ করে বসে আছে। তাদের অন্তর্বাসগুলো ফেটে যাওয়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ভীষণ অস্বস্তি বোধ করার কারণে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর বাকি সব মহিলারা তার পিছন পিছন বাইরে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে এসে নূতন করে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠল। বিয়ের রাত্রি বরকনে কীভাবে নিশিযাপন করবে তাই নিয়ে সকলে রসালাপ জুড়ে দিল। তারপর সেগুলোও এক সময় তাদের গুরুত্ব হারাল। গত একশো বছর ধরে বিয়ের অনুষ্ঠানে একই ধরনের স্থূল রসিকতা চলে আসছে। তবুও বিয়ের আসরগুলোতে সেই সমস্ত বস্তাপচা ব্যাপারগুলো নিয়ে জোর আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে এবং তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে

করতে প্রত্যেকের পেটে খিল ধরে যাচ্ছে।

টেবিলের শেষ প্রান্তে প্রতিবেশী চারজন যুবক নবদম্পতিকে নিয়ে কী ধরনের বাস্তব রসিকতা করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করছিল। মনে হল তারা যেন রসিকতার একটা উপযুক্ত বিষয় খুঁজে পেয়েছে। তারপর তারা সেটা নিয়ে ফিশফিশ করে আলোচনা করছিল আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "এই জ্যোৎস্না রাত পশুচোরদের পক্ষে আদর্শ। হ্যাঁ, তুমি কী চাঁদের সুন্দর আলো উপভোগ করবে না?" বর জ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে বলল, "ব্যাটাদের একবার আসতে দাও। তখন দেখব।" কিন্তু অন্য যুবকটি হাসতে হাসতে বলল, "তাদের জন্য আশা করি তুমি তোমার কর্তব্যে অবহেলা করবে না।"

তার কথা শুনে সমস্ত টেবিল জুড়ে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল আর তাদের হাসির শব্দে টেবিলে রাখা মদের গ্লাসগুলো ঝন ঝন করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু জ্যাঁ ভীষণ রেগে রইল। তার বিয়ের রাতের সুযোগ নিয়ে তার এলাকায় এসে পশুচোরেরা তার গোরু ছাগল চুরি করে নিয়ে পালাবে—এটা সে কিছুতেই সহ্য করবে না। তাই সে আবার বলল, "আমি শুধু বলছি ওরা একবার আমার জমির সীমানায় ঢুকে দেখুক।"

অতিথিরা যখন পেটির পর পেটি মদ শেষ করে শুতে গেল তখন নবদম্পতি তাদের নীচের তলার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভীষণ গরমের জন্য তারা জানালাগুলো খুলে, সাটারগুলো বন্ধ করে দিল। ড্রয়ারের ওপরে কনের বাবার দেওয়া উপহার, একটা ছোটো বাতি জ্বলছিল। নবদম্পতির আনন্দের জন্য শয্যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। প্রথমে এই শয্যায় শোয়ার জন্য রুচিশীল সভ্য মানুষের মধ্যে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব, লজ্জা সংকোচ তৈরি হয়—তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা এই নবদম্পতির মধ্যে ছিল না।

নববিবাহিতা তরুণী প্রথমে তার গলা থেকে মালাটি খুলে ফেলল, তারপর খুলল তার পোশাক। সে তখন পেটিকোট পরে তার বুটের ফিতে খুলছে। এদিকে জ্যাঁ তার চুরুটটা শেষ করে চোখের কোণ দিয়ে তাকে লক্ষ করছিল। কিন্তু সে দৃষ্টিতে ছিল হৃদয়াবেগের থেকে অনেক বেশি কামনার তীব্রতা। তারপর কোনো কাজে নিযুক্ত হতে চলেছে এমন একটা ভাব নিয়ে সে তার কোটটা খুলে ফেলল। তরুণী আগেই তার বুটজোড়াটা খুলে ফেলেছিল এবং সেই মুহূর্তে সে তার মোজা খোলায় ব্যস্ত ছিল। এর পর জ্যাঁকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে যুবতীটি তাকে বলল, "পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়, আমি বিছানায় যাচ্ছি।"

মনে হল তার কথা সে মেনে নিতে রাজি হল না। কিন্তু ধূর্ত চোখে সে পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকোল কিন্তু মাথাটাকে বের করে রাখল। যুবতীটি একটু হেসে জ্যাঁ এর চোখ দুটো চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর সমস্ত লজ্জা সংকোচ বিসর্জন দিয়ে কামনার আবেগে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বিছানাটাকে তছনছ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তরুণী বধূ যা বলল, জ্যাঁ তা করল এবং মুহূর্তের মধ্যে সে তার পেটিকোট খুলে ফেলল এবং সেটা তার পায়ের কাছে এসে পড়ল। সেটা তখন একটা বৃত্তের আকার নিয়ে মেঝের ওপর পড়ে রইল। তারপর সে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়

বিছানার ওপর উঠে পড়ল। তার দেহের চাপে খাটের স্প্রিংএ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ হল। জ্যাঁও একটুও দেরি না করে যুবতীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়ে ভীষণ আবেগের সঙ্গে তাকে চুম্বন করতে গেল। আর ঠিক তখনই দূরের রাপিজ এর জঙ্গাল থেকে একটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল।

জ্যাঁ উদ্বিগ্ন মনে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তারপর দুরুদুরু বুকে জানালার কাছে গিয়ে সাটারগুলো খুলে দিল। তখন উঠোনের ওপর দিয়ে শুভ্র জ্যোৎস্নার বন্যা বয়ে চলেছে। তারই মাঝখানে আপেল গাছের বিক্ষিপ্ত ছায়াগুলো বাতাসে কেঁপে উঠছে। মাঠের পাকা ফসলগুলোর ওপর চাঁদের আলো পড়ে সেগুলো সোনার মতো উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতির বুকে। বাতাসের ছোঁয়ায় সেগুলো এক অপরূপ ছন্দে নেচে উঠছে। নৈশপ্রকৃতির বুকে সেই শব্দের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সে যখন একটু ঝুঁকে পড়েছে তখন দুটি নগ্ন হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার স্ত্রী তাকে নিজের কাছে টেনে আনার চেষ্টা করে ফিশফিশ করে বলল, ওসব কথা এখন থাক। ওসবের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই, শুতে এসো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্যাঁ দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার স্ত্রীকে। তাকে তার নিজের কাছে টেনে এনে তার নগ্ন শরীরের উষ্ণতা উপভোগ করল। এর পর সে তার বলিষ্ঠ দুই হাতে তাকে উঁচু করে তাকে কৌচ-এর কাছে নিয়ে গেল। যে মুহূর্তে জ্যাঁ তার স্ত্রীকে কৌচের ওপর শুইয়ে দিচ্ছে, সেই মুহূর্তে আবার সেই বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। এবার সেই শব্দটা যেন খুব কাছেই হল। জ্যাঁ এবার প্রচণ্ড রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল, "হে ভগবান, তুমি কি মনে কর ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেটা আমি তোমার জন্য বাইরে বেরিয়ে দেখব না? একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।"

এই বলে সে তার জুতো পরে দেয়ালে ঝোলানো বন্দুকটা হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে উঠোনের উপর লাফিয়ে পড়ল। তার স্ত্রী তাকে অনেক করে বাধা দিল কিন্তু সে তার কোনো কথাই শুনল না।

তার স্ত্রী তার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করল। এইভাবে সকাল হয়ে গেল কিন্তু জ্যাঁ ফিরে এল না। তার স্বামীকে ফিরে না আসতে দেখে সে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ভয়ংকরভাবে অস্থির হয়ে উঠল। চিৎকার করে বাড়ির সকলের ঘুম ভাঙাল। আর একথা জানাল, জ্যাঁ গতকাল রাতে ভীষণ রাগে উন্মাদ হয়ে পশুচোরদের পিছনে ধাওয়া করেছে। সে-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খামারবাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এমনকি গ্রামের ছেলেছোকরারা জ্যাঁএর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। খামারবাড়ি থেকে দু লিগ দূরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তারা জ্যাঁকে দেখতে পেল। রাগ না মেটাতে পারার দুঃখে আর জ্বালায় সে প্রায় আধমরা। তার বন্দুকটা ভেঙে গেছে। তার পরনের পাতলুনটা ওলটানো। তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনটি মৃত খরগোশ। আর বুকের ওপর ঝুলছে একটা প্ল্যাকার্ড, তাতে লেখা আছে, যে অন্যের পিছু ধাওয়া করে, সে তার নিজের জায়গা হারায়।

পরে যখন সে তার বিয়ের রাত্রির ঘটনাটা বলত, সে এই কথাটা বিশেষভাবে

উল্লেখ করত। ঠাট্টা হিসাবে এটা ভালোই। বদমাশগুলো আমাকে খরগোশ মনে করে একটা ফাঁদ পেতেছিল। শয়তানগুলো একটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমার মাথাটা। আমি যদি কোনো দিন তাদের ধরতে পারি তাহলে তাদের এমন শিক্ষা দেব যে সারাজীবন তারা সে কথা মনে রাখবে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে নরম্যানডির লোকেরা এইভাবে আনন্দ করত।

মোহমুক্তি
The Charm Dispelled

নৌকোটাতে যাত্রীদের ঠাসাঠাসি ভিড়। বাতাস অনুকূল থাকার কারণে হাভারের যাত্রীরা ক্রুভিল যাওয়ার জন্য নৌকোটায় উঠে বসল নিশ্চিন্ত মনে। নৌকাটাতে তিল ধারনেরও জায়গা না থাকার জন্য নৌকো ছেড়ে দেবার সংকেত দিয়ে বাঁশি বাজালেন ক্যাপ্টেন। পারে দাঁড়িয়ে থাকা আত্মীয়পরিজনকে বিদায় জানাবার জন্য তারা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে হাত আর রুমাল নাড়তে লাগল। মনে হল তারা যেন বহু দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

মাসটা তখন জুলাই। সূর্যের আগুন ঝরানো রশ্মি নদীতে পড়ে নদীর জলকে ভীষণ উত্তপ্ত করে তুলেছিল। সেন নদীটাকে বাঁদিকে রেখে নৌকোটা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। নৌকোয় উঠেই আমি যাত্রীদের মধ্যে পরিচিত কোনো মানুষের দেখা পাওয়ার আশায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে তাকালাম, যাকে দেখলাম সে হেনরি সিদোনিক। সেইই আমার নাম ধরে ডাকছিল। তার সঙ্গে প্রায় দশ বছর আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

দীর্ঘদিন অদর্শনের পর তার সঙ্গে দেখা হতেই আমরা পরস্পরের করমর্দন করলাম। তারপর ডেকের ওপর খাঁচাবন্দি ভালুক হয়ে কোনো প্রকারে গা ঘেঁসাঘেসি করে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম। আমাদের নৌকোটায় যাত্রীদের অধিকাংশই ছিল ইংরেজ। তাদের মধ্যে আবার মহিলার সংখ্যা ছিল সবথেকে বেশি। তাদের বিনুনি করা চুলে, মাথার ওপর টুপির বহর। সাদা স্কার্ট আর নীল জুতো আর মোজা পায়ে ইংরেজ তরুণীরা প্রজাপতির মতো ফুরফুর করে ডেকের এদিক থেকে ওদিকে যাতায়াত করছিল। তাদের দেখে মনে হল নৌবিদ্যায় তাদের দক্ষতার কোনো তুলনা নেই। বন্ধু সিদোনিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইংরেজ যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, ফরাসি দেশে এত ইংরেজও ছিল! এরা সব যাচ্ছে কোথায়?

"ওরা যাচ্ছে ক্রুভিল। কিন্তু ওদের প্রতি তোমার বিরক্তির কারণ কী?" আমি উত্তর দিলাম।

সিদোনিক বলল, আমি ওদের সম্বন্ধে খুব ভালো করেই জানি। আমি নিজে একজন ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেছি, সে-কথা হয়তো তুমি জান না।

আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমি ভাবতে পারিনি সে কোনো ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। বললাম, তাহলে তোমার দাম্পত্য জীবনের সমস্যার কথা আমাকে খুলে বল। তোমার ইংরেজ স্ত্রী কি তোমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে? সে কি তোমার সঙ্গে কোনোরকম ছলনা বা প্রতারণা করেছে?

থাকতেন। আর সেই শোকের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করে সেই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা করতেন।

তিনি বললেন, তুমি যদি আমার সামান্য একটা কাজ করে দাও তাহলে আমার খুব উপকার হয়। তুমি আমার পুরোনো বাসায় আমার শোয়ার ঘরে গিয়ে সেখানে ডেস্কের ওপর যে কাগজগুলো পড়ে থাকতে দেখবে, সেগুলো তুমি যদি এনে দাও তাহলে আমার খুব উপকার হয়। কাগজগুলো ভীষণ দরকারি। এ ব্যাপারে গোপনতা বজায় রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি আমার কোনো চাকর বা উকিলকে সেখানে পাঠাইনি। তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমি নিজে কেন সেখানে যাচ্ছি না। তার উত্তরে আমি বলব, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের লোভেও আমি আর সেখানে যাব না। আমি তোমাকে ঘরের চাবি দেব। সেই সঙ্গে মালিকেও একটা চিঠি লিখে দেব। সে তোমাকে ঘরটা খুলে দেবে। আগামীকাল তুমি আমার বাড়িতে এসো, সেখানেই আমরা একসঙ্গে সকালের চা খাব। আর তখনই পরবর্তী কাজগুলো ঠিক করে নেব।

আমি তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব বলে আশ্বাস দিলাম। তাঁর পুরোনো বাসাটা ছিল রাওয়েন থেকে কয়েক মাইল দূরে। বন্ধু বললেন, ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময় লাগবে।

পরের দিন যথাসময়ে তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দুজনে একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট করলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক জমল না। তিনি হ্যাঁ, হুঁ করে আমার কয়েকটি কথার উত্তর দিলেন। অবশ্য তাঁর এই আচরণের জন্য তিনি আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, বললেন, পুরোনো ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি শোকে এত অধীর হয়ে পড়েছেন যে পাছে ওই প্রসঙ্গ এসে পড়ে, সেই ভয়ে তিনি বেশি কথা বলতে সাহস করেননি।

যা হোক আমাকে কী করতে হবে সে সম্বন্ধে সবকিছুই বুঝিয়ে দিলেন। বললেন ডেস্কের ডান দিকে এক প্যাকেট চিঠির নীচে এক বান্ডিল কাগজ আছে। সেগুলো তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, চিঠিগুলো পড়ে দেখতে পার।

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বেলা একটা নাগাদ সেই পুরোনো বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

সেদিনের আবহাওয়াটা ছিল মনোরম। আকাশে হালকা মেঘের আস্তরণ। সেই মেঘে ঢাকা পড়েছে সূর্য। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে। নাইটিংগেল পাখির গান শুনতে শুনতে ঘোড়ায় চড়ে মাঠ বন পেরিয়ে এগোতে লাগলাম। এক সময় বনের মধ্য দিয়ে তাঁর পুরোনো বাসায় এসে পৌঁছোলাম। মালির জন্য যে চিঠিটি দিয়েছিলেন সেটা পকেট থেকে বের করতে গিয়েই যেমন অবাক হলাম তেমন রাগও হল। দেখলাম চিঠির মুখটা গালা দিয়ে আঁটা। ভীষণ বিরক্ত হলাম, একবার মনে হল, দূর ছাই, ফিরে যাই। ঝামেলায় জড়াবার দরকার নেই। কিন্তু আমার কাছে ভাবাবেগের কোনো স্থান নেই। সুতরাং পরমুহূর্তেই মত পরিবর্তন করলাম। মনে হল বন্ধুটি তাঁর

এই মানসিক বিপর্যয়ের কারণে হয়তো অন্যমনস্কভাবে চিঠির মুখটা আটকে দিয়েছেন। আর নেওয়ার সময়ও সেটা আমি খেয়াল করিনি।

বাড়ির সামনে এসে বেশ অবাক হলাম। দেখে মনে হল সেটা একটা পোড়ো বাড়ি। গেটের একটা পাল্লা কোথায় যে উধাও হয়েছে—তা কেউ জানে না। মরচে ধরা আর একটা পাল্লা অতীতের অনেক কিছুর সাক্ষী হয়ে জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার এমনই ভগ্ন দশা সেটা যে এখনও কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে—তা ভেবে অবাক হলাম। ভেতরে ঢোকার রাস্তাটায় লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে একেবারে জঙ্গল তৈরি করে ফেলেছে। রাস্তার দুপাশের ফুলগাছগুলো ঢাকা পড়ে গেছে সেই জঙ্গলে।

জানালাটায় জোরে জোরে শব্দ করতেই পাশের দরজা দিয়ে একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। প্রশ্ন করে তার পরিচয় জেনে নিলাম। তারপর চিঠিটা তার হাতে দিতেই সেটা সে বেশ কয়েকবার পড়ল। তারপর চিঠিটাকে পকেটে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী চাই আপনার?

"তুমি সেটা নিশ্চয়ই জান। চিঠিতে সবকিছু পরিষ্কার করে লেখা আছে। আমি ঘরে ঢুকতে চাই।" আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আপনি ঘরে ঢুকবেন! মানে ওঁদের শোয়ার ঘরে! লোকটির বিস্ময় আর বিভ্রান্তি তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

তখন আর আমার পক্ষে ধৈর্য রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। বিরক্ত হয়ে বললাম, তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছ?

সে আমতা আমতা করতে লাগল, না, তা নয় স্যার, আমার মনিবের স্ত্রী যেদিন মারা যান, সেদিন থেকে আর ওই ঘরের দরজা খোলা হয়নি। আপনি দয়া করে এখানে একটু দাঁড়ান, আমি দেখে আসি।

আমি রেগে গিয়ে তাকে বললাম, দাঁড়াও, চাবি আমার কাছে আর তুমি ঘর খুলতে যাচ্ছ!

তাহলে স্যার, আসুন... এছাড়া সে আর কীই বা বলত।

আমার সঙ্গে আসার তোমার দরকার নেই। তুমি শুধু সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে চলে যাও। আমি নিজেই ঘরটা খুলে নিতে পারব।

কিন্তু স্যার... মানে... ব্যাপারটা...

চুপ, একদম চুপ, বেশি বকবক করলে মজাটা টের পাবে।

এর পর আমি তাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। চার-পাঁচটা ঘর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম এবং নির্দিষ্ট ঘরটা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরের ভিতরটা এত অন্ধকার আমি প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারিনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনো ঘর দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে, বিশেষ করে সেই ঘরে কেউ মারা গেলে, ধোয়ামোছা করে পরিষ্কার করে না রাখলে বা আলো হাওয়া না ঢুকলে ভ্যাপসা একটা পচা দুর্গন্ধ বেরোয়। তেমন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ

বেরোতে লাগল সেই ঘর থেকে। দুর্গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল। ধীরে ধীরে অন্ধকার আমার চোখসওয়া হয়ে গেলে সেই শোয়ার ঘরের সবকিছু দেখতে পেলাম। ঘরের সবকিছু যেখানেসেখানে অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে। বিছানাটার দিকে যখন আমার চোখ পড়ল, দেখলাম তার উপরে শুধু একটা মাদুর পাতা আছে আর আছে একটা বালিশ। মাদুরের ওপর সামান্য গর্ত হয়ে যাওয়া একটা চিহ্ন লক্ষ করলাম। যেন সেখানে কনুইএর চাপ দিয়ে কেউ উপুড় হয়ে শুয়েছিল। এইমাত্র উঠে গেছে। চেয়ারগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

প্রথমে জানালার কাছে গিয়ে পাল্লাগুলো খুলে দিলাম। তাতে ঘরটাতে আলো ছড়িয়ে পড়ল। এর পর চিঠির প্যাকেট আর কাগজের বান্ডিলগুলো নেওয়ার জন্য ডেস্কটার দিকে এগিয়ে গেলাম। বন্ধু যেমন বলেছিল, দেখলাম ডেস্কের ওপরে ডান দিকে কাগজপত্রের স্তূপ ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। তার মধ্যে থেকে বিশেষ জিনিসগুলো বের করে নেওয়ার জন্য যখন কভারের ওপর দিকটা ভালো করে পড়ছি তখন মনে হল আমার পিছনে যেন একটা খসখস শব্দ শুনতে পেলাম। ভাবলাম বাইরের হাওয়ায় কাগজপত্রে এমন শব্দ হচ্ছে। প্রথমে ব্যাপারটাকে তেমন আমল দিইনি। কিন্তু মিনিট দুই পরে একই রকম খসখস শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা এতটা স্পষ্ট যে মনে হল খুব কাছেই শব্দটা হচ্ছে। আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা কনকনে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। ব্যাপারটাতে আমল দেওয়া বোকামি হবে মনে করে একবারও পিছন দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন মনে করলাম না। তখন আমি চিঠির দ্বিতীয় প্যাকেটটা পেয়েছি। এর পরে সবে তৃতীয় প্যাকেটটা নেব বলে হাত দিয়েছি ঠিক সেই মুহূর্তে আমার কাঁধের ওপর এক করুণ বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস এসে পড়ল। তখন প্রায় পাগলের মত আমি অতি ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা লাফ দিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি আত্মরক্ষার তাগিদে যে তরোয়ালটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, সেই। তরোয়ালের হাতলটা শক্ত মুঠিতে ধরে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আমার পক্ষে এটা যদি অনুভব করা সম্ভব না হত যে বিদেহী কোনো প্রেতাত্মা ঠিক আমার পাশে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে আমি কাপুরুষের মতো ভয় আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ওই ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে আসতাম।

দেখলাম একজন সাদা পোশাক পরা স্ত্রীলোক, যে চেয়ারের ওপর আমি এতক্ষণ বসেছিলাম, তার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমার মুখটা হাঁ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। নিজের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। অতি কষ্টে নিজের পতন রোধ করলাম। যে কখনও এভাবে একজন বিদেহী আত্মার মুখোমুখি হয়ে ভয় আতঙ্কে অচৈতন্য হওয়ার অবস্থায় এসে পৌঁছোয়নি তাকে আমার অনুভূতি বা অবস্থার কথাটা কোনোভাবেই বোঝানো যাবে না। এই অবস্থায় একজন মানুষের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। সমস্ত শরীরে জড়ত্ব বাসা বাঁধে—গোটা শরীরটা শিথিল হয়ে যায়, মনে হয় এবার নিশ্চিত মৃত্যু।

ভূতপ্রেতে আমার কোনো দিন বিশ্বাস ছিল না। তবু সেদিন ভূতের ভয় যে কী বস্তু তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটি কনকনে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যেতে লাগল। সেদিন ওই ভয়ংকর অশরীরী ভৌতিক মূর্তি দেখে এত ভয় পেয়েছিলাম যে সে ভয়ের কথা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। শুধুমাত্র অনুভূতিতেই উপলব্ধি করা যায় যে অনুভূতি ব্যাখ্যা করা যায় না।

যা হোক, সে কথা বলল আর সে যদি কথা না বলত তাহলে হয়তো ভয়ে আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যেতাম। সে এমন মিষ্টি সুরে কথা বলল মনে হল বীণার তন্ত্রীতে সুমধুর সুরঝঙ্কার তৈরি হল আর সেই কণ্ঠস্বর অনুরণিত হল আমার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে। কিন্তু আমি যে কী ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম তা আমি প্রকাশ হতে দিইনি। একজন বীর সৈনিকের অহংকারে আমি নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করে রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু সত্যিই আমি সেদিন ভয়ংকর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

মেয়েটির প্রেত অত্যন্ত করুণস্বরে বলল, "স্যার, আমার জন্য আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন।"

উত্তরে কিছু বলব বলে ঠিক করেছিলাম কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না। জিভটা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গলা দিয়ে যে জড়ানো শব্দগুলো বেরিয়ে এসেছিল তা ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও অর্থহীন।

সে বলতে থাকল, 'আমার ভীষণ কষ্ট, ভীষণ যন্ত্রণা। আপনি আমাকে সেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারেন, আমাকে বাঁচাতে পারেন।'

কথা বলতে বলতে সে চেয়ারটার ওপর বসে আমার দিকে কিছুক্ষণ অত্যন্ত করুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি আমার এই উপকারটুকু করবেন?

তখনও আমার জিভের আড়ষ্টভাব কাটেনি। সুতরাং তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলাম না, শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

এর পর প্রেতিনী কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরি একটা চিরুনি আমার সামনে ধরে তার চুল আঁচড়ে দিতে বলল এবং জানাল যে তাতে তার রোগ সেরে যাবে। সে বলল, আপনার কাছে আমার একান্ত মিনতি আপনি আমার জন্য দয়া করে এইটুকু করুন। একবার আমার মাথার দিকে তাকিয়ে চুলগুলোর অবস্থা দেখুন। এই চুলগুলোই আমাকে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলেছে।

তার কালো লম্বা এলো চুলগুলো চেয়ারের পিছন দিকে মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁপা হাতে সেই চুল আঁচড়িয়ে দেবার জন্য যে মুহূর্তে তার চুলে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগল, সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। আমি যেন ভয়ংকর এক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমার আঙুলের ডগায় সেই বিচিত্র অনুভূতি আজও আমাকে ভয়ংকর আতঙ্কে পাগল করে তোলে।

একটা অদ্ভুত সম্মোহনের জালে জড়িয়ে পড়ে আমি তার চুলের জট ছাড়িয়ে চুল

আঁচড়িয়ে দিয়েছিলাম। সে মাথা নীচু করে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। তবুও মনে হল সে যেন বেশ আরাম পাচ্ছে। হঠাৎ সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার হাত থেকে চিরুনিটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে ছুটে চলে গেল। সেই ঘরের দরজাটা যে আধখোলা ছিল সেটা অনেক আগেই আমার নজরে পড়েছিল।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। দুঃস্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে গেলে মানুষ যেমন বিছানার ওপর কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো ভাবলেশহীন চোখে চুপ করে বসে থাকে আমি সেইভাবে বসে রইলাম। যখন আমার চেতনা ফিরে এল আমি জানালার কাছে ছুটে গিয়ে খড়খড়িগুলো জোর করে টেনে খুলে দিলাম। তাতে ঘরটা আলোয় ভরে গেল। যে আধখোলা দরজা দিয়ে প্রেতিনী ভিতরে ঢুকেছিল, আমি সেই দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটু ঠেলে দেখলাম দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক চেষ্টা করেও দরজা খুলতে পারলাম না।

তারপর হঠাৎ ভয়ংকর এক আতঙ্কে উন্মাদের মতো সেখান থেকে পালিয়ে আসার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা চিঠির প্যাকেট ও কাগজের বান্ডিলগুলো নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম, চারটে করে সিঁড়ির ধাপ পার হলাম এক এক লাফে। কীভাবে যে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম সে কথা বলতে পারব না। নীচে নেমে দেখলাম ঘোড়াটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াটার ওপরে লাফিয়ে উঠে তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

যখন আমি আমার বাসায় এসে পৌঁছোলাম তখন আমার সমস্ত শরীর ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়েছে। আমি বিছানায় শুয়ে অনেক সময় ধরে ভাবতে লাগলাম, যাকে আমি নিজের চোখে দেখলাম সে কি কোনো প্রেতের অপচ্ছায়া? স্নায়বিক দুর্বলতার ফলে অনেক সময় অতিলৌকিক বস্তু আমরা দেখি। এ কি আমার মনের ভ্রম না বাস্তব সত্য?

এর পর বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। মনে হল অবাস্তব কোনো অপচ্ছায়া হয়তো আমি দেখে থাকব। এরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার বুকের দিকে লক্ষ পড়ল। চরম বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার সৈন্যের পোশাকে অগুণতি মেয়েদের লম্বা লম্বা চুল জড়িয়ে আছে। গলার কাছের বোতামেও আটকে আছে সেই চুল। কাঁপা হাতে সেগুলোকে একটা একটা করে তুলে বাইরে ফেলে দিলাম।

এর পর আমার খাসবেয়ারাকে ডেকে চিঠির প্যাকেট আর কাগজের বান্ডিলগুলো বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমি এতটা বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। বন্ধুটি প্রাপ্তি স্বীকার করে আমার বেয়ারার হাত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাছে আমার কথা জানতে চেয়েছিলেন। সে বলেছিল প্রচণ্ড রোদ আর গরমে মাথা ধরার ফলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

পরের দিন সকালে তাঁকে সবকিছু খুলে বলার জন্য তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির

হলাম, শুনলাম আগের দিন সন্ধেবেলা তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন তখনও পর্যন্ত ফিরে আসেননি। পরের দিন আবার গেলাম, আর একই কথা শুনলাম। তিনি তখনও ফিরে আসেননি। আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম, শুনলাম তখনও তিনি নিরুদ্দেশ। কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটা জানানো দরকার মনে হল। তার সন্ধান পাওয়ার জন্য একদল লোককে পাঠানো হল। কিন্তু তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কীভাবে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সে বিষয়ে কেউ কোনো তথ্য দিতে পারল না।

বন্ধু যে বাড়িটি ছেড়ে এসেছিলেন আর যেখানে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছিল সেখানে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। সন্দেহজনক কোনো কিছুই নজরে পড়ল না—আর সেখানে কোনো মহিলাকে যে আটকে রাখা হয়েছে এমন কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া গেল না।

অনেক খোঁজখবর করার পর যখন বন্ধুর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না তখন সে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল। পরের ছাপান্নটা বছর তার সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায়নি। আগে যেটুকু জেনেছিলাম, ব্যস, সেইটুকুই—তার বেশি কিছু জানতে পারিনি।

অশরীরী
The Spectre

রু দ্য গ্রেনেল এর পুরোনো বাড়িতে বসে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা মামলায় সম্পত্তি ভাগাভাগির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আলোচনার শেষে ঠিক হল প্রত্যেকে নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনি বলবে।

এর পর বিরাশি বছরের অশীতিপর বৃদ্ধ মার্কুই দে লা টুর স্যামরেল কাঁপাকাঁপা স্বরে যে কাহিনিটা বললেন তা তাঁর নিজের কথাতে বিবৃত করা হল :

যে ঘটনার কথা তোমাদের আমি বলব, সেটি ঘটেছিল ছাপান্ন বছর আগে। তারপর থেকে এমন একটি মাস ছিল না যে মাসে ওই ঘটনাটা সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিনি। সেদিন আমি এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে সেই ভয় আজও আমার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে। সেই ঘটনাটা আমাকে প্রায় দশ মিনিট ধরে বসে বসে দেখতে হয়েছিল। হঠাৎ কোনো গোলমালের শব্দ শুনলে আমি ভয়ে আধমরা হয়ে যাই। রাতের অন্ধকারে যদি অস্পষ্ট কোনো কিছু আমার চোখে পড়ে তাহলে ভয়ংকর আতঙ্কে আমি সেখান থেকে দিশাহারার মতো ছুটে পালাই। যত রাত বাড়তে থাকে ততই ভয় নামক বস্তুটি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

১৮২৭ সালের জুলাই মাস। তখন আমি রাওয়েনের একটা কোম্পানিতে চাকরি করি। এক দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। তাঁকে দেখে আমার খুব চেনা চেনা মনে হল। কিন্তু কবে কোথায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা বা পরিচয় হয়েছিল সে-কথা মনে করতে পারলাম না। তাঁকে দেখে আমি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম আর ভদ্রলোক আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন।

ভদ্রলোক আমার তরুণ বয়সের বন্ধু। এক সময় তাঁর সঙ্গে আমার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অসাক্ষাতে তাঁকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারিনি। মনে হল তিনি পঞ্চাশ-ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ। শীর্ণ শরীরটা কুঁজো হয়ে গেছে। সোজা হয়ে তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা বলতে শুরু করলেন। এক দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়ার জন্য আজ তাঁর এই পরিণতি। তিনি একটি যুবতীর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। তাকে সমস্ত মনঃপ্রাণ উজাড় করে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এক বছর পরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে যুবতীটির মৃত্যু হয়। তারপর তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে তিনি যে বাড়িতে বাস করতেন সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাওয়েনে নিজের বাড়িতে এসে বসবাস করতে শুরু করেন—সম্পূর্ণ একাকী নিঃসঙ্গ। তিনি সেখানে দিবারাত্র শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে

সিদোনিক বলল, না, সেরকম কিছু নয়। তবে তাকে এখন আর আমার ভালো লাগে না। তার কথা শুনলেই ভীষণ বিরক্ত হই।

আমি বললাম, তোমার এ ধরনের বিরক্তির কারণ কী?

সিদোনিক তখন সব খুলে বলতে আরম্ভ করল। সে বলল, তাহলে শোন সব কথা তোমাকে খুলে বলছি। প্রায় ছ'বছর আগে আমি গ্রীষ্মকালটা কাটাবার জন্য এশিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়ে ছিলাম আর জীবনটা এভাবেই কাটিয়ে দেব বলে স্থির করেছিলাম। জীবনে কখনও যে বিয়ে করব, এমন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু এত্রিয়াতের সমুদ্রতীরে এসে আমার সে সংকল্প ব্যর্থ হয়ে গেল। সমুদ্রে স্নানরতা বা স্নান শেষে স্বল্পবসনা সুন্দরী তরুণীদের বেলাভূমিতে শুয়ে থাকতে দেখলে কোনো অবিবাহিত তরুণের পক্ষে নিজেকে স্থির রাখা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। তাতে যদি তার চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে তাহলে বুঝতে হবে হয় সে পাগল না হয় একটি জড়পদার্থ। যতসংখ্যক বয়স্ক মহিলারা প্যারিসের সমুদ্রতীরগুলোতে ভিড় করে, দেখবে ততোধিক সংখ্যায় তরুণী মেয়েরা ভিড় করে এত্রিয়াতের সমুদ্রতীরগুলোতে। এছাড়া যদি কোনো অঁতি স্বল্পবসনা আঠারো বছরের সুন্দরী তরুণীকে উন্মুক্ত বেলাভূমিতে রঙিন একটি প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াতে দেখ অথবা দেখ সে পথের ধারের কোনো ফুল গাছ থেকে ফুল তুলছে অবসরের আনন্দে চঞ্চল হয়ে তাহলে নিজের কৌমার্য রক্ষা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

এর মধ্যে এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়, বাবা মা আর তাঁদের চার ছেলেমেয়ে। দুটি ছেলে বয়সে তরুণ আর দুই মেয়ের মধ্যে একজন তরুণী আর অন্যটি সবে কৈশোর পার করে যৌবনে পদার্পণ করেছে।

ভদ্রলোকের ছোটো মেয়ের রূপে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সমস্ত জীবন ধরে যে স্বপ্ন, আশা বুকের মধ্যে লালন করেছি, তা তার দুই স্বপ্নমদির চোখের তারায় এসে আশ্রয় নিল। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললাম, ভুলে গেলাম আমার প্রতিজ্ঞার কথা।

আমাদের মতো ফরাসি জাতির মধ্যে একটি বিশেষ দোষ খুঁজে পাবে। সেটা কি জান? তারা বিদেশিদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হয়তো মেয়েটি বিদেশিনি বলেই তার প্রতি আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলাম। সে যখন ভাঙা ভাঙা ফরাসি ভাষায় কথা বলত তখন তা আমার মনের মধ্যে এক মধুর গুঞ্জন ধ্বনি সৃষ্টি করত। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় কী জান—এখন তার মুখে সে ধরনের কথা শুনতে মোটেই আমার ভালো লাগে না, বরং আমি ভীষণ বিরক্ত বোধ করি। সে হাজার চেষ্টা করেও আজও শুদ্ধ ও সহজভাবে ফরাসি ভাষায় কথা বলতে পারে না।

তার স্ত্রী এখন কোথায়, সে-কথা আমি জানতে চাইলাম।

সে বলল, সে এখন এত্রিয়াতেই আছে। কিছু দিন একা একা ঘুরে বেড়াব বলে আমি ক্রুভিল যাচ্ছি।

আমাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে নৌকোটা এক সময় ক্রভিলের ঘাটে এসে ভিড়ল। নেমে যাওয়ার আগে সিদোনিক আমায় বলল, যারা বিয়ে করেনি তারা বেশ ভালোই আছে। তুমি ভাবতেই পারবে না যারা বিবাহিত তাদের কাছে স্ত্রীরা সময় সময় কী সাংঘাতিক বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধ জুডাস
Old Judas

সমস্ত শহরের লোকের মধ্যে বিরাট এক আলোড়ন, হইচই শুরু হয়ে গেছে। কতগুলো অশুভ লক্ষণ নাশ করার জন্য বিরাট এক ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়েছে। আর সেখানে তারা দলে দলে যোগ দিতে চলেছে।

চতুর্দিকে রুক্ষ পর্বতমালা, এদিক-ওদিক গজিয়ে ওঠা দুই একটা ওক গাছ ছাড়া কোথাও সবুজের কোনো অস্তিত্ব নেই। বাতাস এসে সেগুলোকে মাঝে মাঝে দুলিয়ে দিয়ে যায়। এর মধ্যে, যে জিনিসটি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হল, পাহাড়ঘেরা ছোট্ট একটা হ্রদ। এর শান্ত কালো জলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য নলখাগড়ার ঝাড়।

এই হ্রদের ধারে একটু নীচের দিকে যে ছোট্ট বাড়িটা দেখা যাবে, সেটাকে মনে হবে, সমস্ত পৃথিবীর সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র কোনো জগৎ যেন গড়ে তুলেছে।

এই বাড়িতে যে বাস করে সে বৃদ্ধ। নাম তার যোশেফ, মাঝি সম্প্রদায়ভুক্ত। তার পেশা হল মাছ ধরা।

সপ্তাহে তিন-চার দিন মাছ ধরে পাশের গ্রামগুলোতে সে ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করে এবং সে যা উপার্জন করে তাতে তার কোনোরকমে চলে যায়।

অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা তৈরি হচ্ছিল এই সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষটাকে দেখতে যাওয়ার জন্য। আমার ইচ্ছা একদিন ফলপ্রসূ হল। সে নিজেই আমাকে এক দিন ডাকল তার মাছ ধরার কাজে সাহায্য করার জন্য। আমি যথাসময়ে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

তার উইধরা নৌকোটায় অসংখ্য ছিদ্র। সেটা অনেক পুরোনো দিনের ঘটনার সাক্ষী। জরাগ্রস্ত শরীরটি গোলাকার। নৌকোটার মতো তার মালিকের চেহারাটাও জীর্ণ, জরাগ্রস্ত। শরীরের মোটা মোটা হাড়গুলো উঁচু হয়ে আছে। গভীর একাগ্রতার সঙ্গে সে দাঁড় টেনে চলেছে। তার এই তন্ময় হয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে তার তালে তালে দাঁড় টানার একান্ত চেষ্টা আর সেটাই আমার মনের গভীরতাকে স্পর্শ করে। বিশাল আকাশের নীচে দিগন্তবিস্তৃত শান্ত নিস্তব্ধ চরাচর—সমস্ত প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে রেখেছে যেন এক সীমাহীন বিষণ্ণতা। এই নির্জন হ্রদের জলের ওপর দিয়ে বাধাহীন গতিতে এগিয়ে যাওয়া জরাগ্রস্ত নৌকো, বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক অশীতিপর বৃদ্ধের দাঁড় বাওয়া—আমার মনটাকে নিয়ে যায় কোন্ এক সুদূর অতীতে। নিজেকে মনে হয় আদিম পৃথিবীর কোনো মানুষ।

বৃদ্ধ যখন জাল টেনে তুলল, তখন দেখলাম নানা ধরনের ছোটোবড়ো মাছে

জালটা ভরে গেছে, আর তা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে রুপোলি আলো। মাছগুলোকে জাল থেকে বের করে সে নৌকোর খোলের মধ্যে পায়ের কাছে রেখে দিল। এর পর আমাদের ডিঙ্গি নৌকোটা এগিয়ে চলল হ্রদের অন্য দিকে। আর সেই দিকের তীরে বহু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি জীর্ণ ধ্বংসস্তূপ। এক ভয়ংকর শূন্যতা ঘিরে রেখেছে সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতরের পরিমণ্ডলকে। শুধুমাত্র দেয়াল ঘেঁসে ঝুলছে একটি বিরাটাকারের লাল রংএর ক্রুশ। অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগে মনে হয় যেন ক্রুশ থেকে ঝরে পড়ছে লাল রং-এর তাজা রক্ত।

ওটা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কী?

বুকে ক্রশ এঁকে বৃদ্ধ জবাব দিল, এই বিশেষ জায়গাটিতে জুডাস শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

উত্তরটা শুনে আমি খুব বেশি অবাক হলাম না। এ ধরনের একটা উত্তর পাব—এমনটাই আমি অনুমান করেছিলাম। তবুও বেশ আগ্রহ নিয়ে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, জুডাস কে?

বৃদ্ধ বলল, "তিনি ছিলেন জাতিতে ইহুদি এবং একজন পর্যটক।"

এর পর আমি জুডাস সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হলে উঠলাম। সেই কাহিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা হয়ে আছে—আর তা ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে আর সে ইতিহাসের কাহিনি বৃদ্ধ যোশেফের সময়কালের। কারণ সে তাঁকে চিনত।

এক সময় ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এক ভিখারিনি বাস করত। অপরের দয়ার দানে তার জীবিকা নির্বাহ হত। কে যে তাকে ওখানে বাস করার অধিকার দিয়েছিল—সে কথা বৃদ্ধাটি স্মরণ করতে পারে না।

এক দিন রাত্রে অদ্ভুত চেহারার এক ভিখারি ওই ভগ্নস্তূপের সামনে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে মনে হল, তার বয়স দুশো বছরেরও বেশি। বয়সের ভারে সে চলচ্ছক্তিহীন। হাঁটতে গেলে টলে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সে সেখান থেকে চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে করে সে ভিখারিনির কাছে ভিক্ষা চাইল।

ভিখারিনি বৃদ্ধকে পিতৃসুলভ সম্মান জানিয়ে বলল, "বাবা, ভিতরে এসে বসুন। এ সমস্ত কিছুতে আমার যেমন অধিকার আপনারও সেই একই অধিকার। এ সমস্ত অপরের দান থেকে পাওয়া।"

বৃদ্ধ কিন্তু সেই মুহূর্তে ভিতরে প্রবেশ না করে ওই ভগ্নস্তূপের সামনে রাখা একখণ্ড পাথরের ওপর বসে। এর পর থেকে ভিখারি, ভিখারিনির সংগৃহীত খাদ্য দুজনে ভাগ করে খায়, বাস করে তারই সঙ্গে ওই ভগ্নস্তূপের ভিতরের একটি ঘরে। বৃদ্ধ তার পর্যটনের অধ্যায় সমাপ্ত করে তার সঙ্গে আমৃত্যু বসবাস করেছিল।

বৃদ্ধ যোশেফ এবার বলল, ওই বৃদ্ধা ভিখারিনি কে জানেন? তিনি যিশুখ্রিস্টের মা মেরি ছাড়া আর কেউ নন, জুডাসকে আহার ও বাসস্থান দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ওই বৃদ্ধের নিজের ভ্রমণের অভ্যাসের জন্য সর্বদা তাঁকে পদচারণা করতে হত। প্রথমে এলাকার মানুষ ব্যাপারটা লক্ষ করেনি, আরও একটা ব্যাপার দেখে তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হল। আগন্তুক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে কেউ কখনও গির্জায় গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতে দেখেনি। সুতরাং তারা যে ইহুদি ধর্মাবলম্বী, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়ে গেল। সকলে তাঁদের দেখে 'যিয়ুস', 'যিয়ুস' বলে চিৎকার করত, সে চিৎকারে শিশুরাও শামিল হত।

সমস্ত দিনে তাঁদের একমাত্র কাজ ছিল দরজায় দরজায় গিয়ে ভিক্ষে চাওয়া। তাঁরা পথচারীদের দেখতে পেলেই ভিক্ষে চাইতেন। কখনও কখনও তাঁদের জনহীন পথ ধরে হেঁটে যেতে দেখা যেত। আবার কখনও দেখা যেত গ্রাম থেকে দূরে কোনো মাঠের মধ্যে। কখনও বা গাছের ছায়ায় বসে ভিক্ষার খাদ্য খাচ্ছেন, কখনও বা সূর্যের খরতাপ মাথায় করে হেঁটে চলেছেন।

এরই মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি, সকলের কাছে জুডাস নামে পরিচিত হয়ে গেলেন।

এক দিন দেখা গেল বৃদ্ধটি তাঁর থলি করে পাঁচটি শূকরছানা নিয়ে এসেছেন। ইনি এগুলো লাভ করেছিলেন একজন খামারমালিকের কাছ থেকে। তিনি নাকি খামারমালিকের রোগ আরোগ্য করেছিলেন। এই শূকরছানাগুলো তারই পুরস্কার।

বৃদ্ধ ভিক্ষা করা বন্ধ করে দিয়ে শূকরছানাগুলোকে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলার জন্য তাদের লালনপালন করতে লাগলেন। বৃদ্ধা ভিখারিনি কিন্তু সারাদিন ধরে ভিক্ষে করে বেড়ান এবং সন্ধ্যায় সেই ধ্বংসস্তূপের ঘরে ফিরে আসেন। এরপর কিছুক্ষণ তাঁরা গল্পগুজব করে ভিক্ষার খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের যে কেউ কখনও গির্জায় যেতে দেখেনি বা তাঁরা যে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকেন না—এ নিয়ে নানা লোক নানা ধরনের মন্তব্য করতে লাগল।

হঠাৎ এক দিন সেই বৃদ্ধা ভিখারিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সামান্য হাওয়ার স্পর্শে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলেন। অবস্থা ক্রমে এমন হয়ে উঠল যে তাঁকে অনেক চেষ্টা করেও সুস্থ করে তোলা গেল না। দু-তিন দিন ধরে এক নাগাড়ে দিনরাত একভাবে তাঁর সেবা করে চললেন ওই বৃদ্ধ।

স্থানীয় গির্জার পুরোহিত শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রীকে ধর্মের বাণী শোনাবার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় ওই বৃদ্ধের চোখ দেখে ভয় পেলেন। তারপর যেভাবে তিনি তাঁকে গালাগালি আর অভিশাপ দিতে লাগলেন, তাতে তিনি সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হলেন তাঁর কাজ অসমাপ্ত রেখে।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা ভিখারিনির মৃত্যু হল।

বৃদ্ধ জুডাস তাঁকে ওই ধ্বংসস্তূপের সামনের একফালি জমিতে সমাধিস্থ করলেন। তাঁদের মতো ভিক্ষুকদের খবর নেবার জন্য বা সমাধি দেওয়ার কাজে সাহায্য করার জন্য একজনও এল না।

এবার তাঁকে একাকী কঠোর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হল। শূকরছানাগুলোর দেখাশোনার কাজে তাঁকে অনেকটাই সময় দিতে হয়, আবার পেটের তাগিদে

ভিক্ষায়ও বেরোতে হয়। কিন্তু পুরোহিতের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করেছিলেন তাতে তাঁর ওপর মানুষের যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। সেজন্য প্রয়োজনীয় ভিক্ষা জোটানোও তাঁর কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।

পবিত্র ইস্টারের সময়ে কয়েকজন ছেলে মেয়ে উৎসবের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হ্রদের এদিকটায় যেখানে বৃদ্ধ জুডাস একাকী বাস করতেন, সেখানে চলে আসে। হঠাৎ তাদের কানে আসে ওই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে বীভৎস এক আর্ত চিৎকার। তারা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই দুটি হৃষ্টপুষ্ট শূকর ভীষণ এক লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল—তা বোঝা গেল না।

তারা ঘরে ঢুকে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পেল। বৃদ্ধ জুডাস তাঁর পালিত শূকরগুলোর দ্বারা নিহত হয়েছেন। তাঁর দেহে মাংসের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। পড়ে আছে কতকগুলো রক্তমাখা হাড় আর ঘরের মেঝেতে বয়ে চলেছে তাজা রক্তের স্রোত।

উপসংহারে মন্তব্য করল বৃদ্ধ যোশেফ, যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল, সেদিন ছিল গুড ফ্রাইডে, সময় বিকেল তিনটে।

"আপনি সময় সম্বন্ধে এমন নিশ্চিত হলেন কী করে"—আমার উৎসুক প্রশ্ন।

সে বলল, "আমি নিজে ঘটনাটা জানি। সুতরাং সন্দেহেরও কোনো কারণ নেই।"

আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। কারণ, এটা এমন একটা ঘটনা যার মধ্যে অলৌকিকত্ব বা অস্বাভাবিকত্ব বলে কিছুই নেই।

আর ওই ক্রুশের লাল রংএর রহস্য সম্বন্ধে মনে মনে কল্পনা করে নিলাম, কেউ নিশ্চয়ই ক্রুশটাতে লাল রং টেনে দিয়েছিল।

দার্শনিক
The Philosopher

ব্লেরত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সে আমার এমন বন্ধু ছিল, এতটাই ঘনিষ্ঠতা ছিল তার সঙ্গে যে জীবনের গোপনতম ঘটনাও তার কাছে ব্যক্ত করতাম। সেও নির্দ্বিধায় আমার কাছে তার সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করে দিত।

ব্লেরত যখন এক দিন হঠাৎ এসে বলল যে তার বিয়ে, তখন আমার মনটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেল। এক গভীর বিষণ্ণতা আমার মনটাকে অধিকার করে রাখল। স্বাভাবিকভাবেই মনে হল, ব্লেরতের বিয়ের পর তার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা আর থাকবে না। কারণ যে ভালোবাসা, মমতা আর সহমর্মিতা শুধুমাত্র আমাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল তা বিভাজিত হয়ে অন্য আর-একজনের জন্য ব্যয় হয়ে যাবে। সুতরাং ঘনিষ্ঠতা যে কমবেই, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম। আমাদের এই গভীর ঘনিষ্ঠতার মাঝখানে এক অনতিক্রম্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে ব্লেরতের পত্নী। তবে যৌক্তিকতার বিচারে স্ত্রীত্বের যা ভূমিকা তার থেকে বন্ধুত্বের ভূমিকা কিছু কম নয়। মানুষের জীবনে এমন এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা স্ত্রীর কাছে গোপন রেখে বন্ধুর কাছে নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করা যায়।

ব্লেরতের বিয়ের সময় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। তবে ব্লেরতের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আমি গির্জা এবং তার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। তার স্ত্রীকে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। সে যে এতটা সুন্দরী হবে, আমি ভাবতেই পারিনি। তার সৌন্দর্য এত শান্ত, এত সুন্দর, তাকে দেখে সত্যিই আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। আমাকে দেখে ব্লেরত আবেগাপ্লুত স্বরে বলল, বন্ধু, সত্যিই আমি যে এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করব ভাবতেই পারিনি। আমি আজ বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে একজন সুখী মানুষ। আমি কল্পনার তুলিতে আমার স্ত্রীর মানসমূর্তি যেমন গড়ে তুলেছিলাম, বাস্তবে তা রূপায়িত হয়েছে। রূপে গুণে তার তুলনা সে নিজেই।

এর পর সে তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সে তার স্ত্রীর সম্বন্ধে আদৌ অত্যুক্তি করেনি। সত্যিই সে অতুলনীয়া, অদ্বিতীয়া। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে আমাকে আপন করে নিল, মনে হল আমি যেন তার কতকালের চেনা, কত না আপন। সে আমাকে বলল, "এই বাড়িটাকে নিজের মনে করে যখন খুশি চলে আসবেন।" তার কথার মধ্যে প্রকৃত আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করলাম।

ব্লেরতের বিয়ের কিছু দিন পরেই আমি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় দেড় বছর ধরে ইংল্যান্ড, সুইডেন, রাশিয়া আর জার্মানি চুটিয়ে ঘুরে বেড়ালাম, তারপরে স্বস্থানে অর্থাৎ প্যারিসে ফিরে এলাম। ব্লেরতের কথা আমার স্মৃতি থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল।

যেদিন প্যারিসে এসে পৌঁছোলাম, তার পর দিনই বুলেভার্ডে ঘুরতে বেরোলাম। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখলাম ব্লেরতকে। আমাকে দেখে সে আমার কাছে এল। কিন্তু এই কি সেই ব্লেরত? এ কি চেহারা হয়েছে ওর! চেনাই যাচ্ছিল না ওকে। এই সময়টার মধ্যে তার চেহারায় যে এতটা পরিবর্তন আসবে, তা কল্পনাই করতে পারিনি।

অবশ্য আমাকে চিনতে তার অসুবিধা হয়নি। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বদেভিল থিয়েটারের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার চেহারা এতটাই রোগা হয়ে গেছে, দেখলে কষ্ট হয়। গায়ের রংও হয়ে গেছে রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। চোখ দুটোও কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম হাঁটতে বা কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কোনো রোগে ভুগছ?

ব্লেরত বলল, ডাক্তার বলেছে আমার রক্তশূন্যতা হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি মনের দিক থেকে সুস্থ আছ তো?

ব্লেরত বলল, না, সে সমস্ত কিছুই ঘটেনি। আমি এমনিতে বেশ সুখেই আছি। তুমি তো জানো আমার স্ত্রী কত ভালো। আমি তাকে যেমন ভালোবাসি সেও আমাকে ততটাই ভালোবাসে। তবুও সব কথা খুলে বলার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম।

ব্লেরত প্রথমে আমতা আমতা করতে লাগল। বারবার প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত আমার চাপে পড়ে সে বলতে বাধ্য হল, আমার এই অবস্থার জন্য সত্যিই কেউ দায়ী নয়। আমার স্ত্রীর প্রতি আমার উন্মত্ত ভালোবাসা আমাকে তিল তিল করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে গেছে।

তার কথাগুলো আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হল। সে তখন বলল, আমার স্ত্রীর প্রতি আমি এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছি যে সেই আসক্তি আমাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমি বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে।

তখনও তার কথাগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হল না। সে বলল, "প্রতিদিন মনে হয় এভাবে বেশিদিন চললে আমি দুরারোগ্য কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হব। সুতরাং নিজের প্রাণ বাঁচাতে হলে সবকিছু ছেড়েছুড়ে এক দিকে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু যখন বাড়িতে ফিরে আসি, দেখি আমার স্ত্রী আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে, যখন সে আমার মুখের দিকে উৎসুক আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে থেকে আমার চুম্বনের প্রতীক্ষা করে, যখন দেখি তার তপ্ত অধর ওষ্ঠ সিক্ত হয়ে উঠেছে কামনার মদির রসে তখন আমি আর নিজেকে সংযত করতে পারি না। তখন আমার মধ্যে কামরিপু প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাকে উন্মাদের মতো চুম্বন করতে করতে তার সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত হই। এইভাবে প্রতিদিন নারী শরীরের আসক্তিতে ডুবে গিয়ে নিজের জীবন থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করলাম। আমি এর চূড়ান্ত পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু নিজেকে কোনো মতেই সংযত করতে পারছিলাম না।

আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, তুমি এমন একজন যুবককে তোমার স্ত্রীর দিকে

এগিয়ে দাও যার প্রতি সে নিশ্চিতভাবে আকৃষ্ট হবে। আর তুমি তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা কর।

কিন্তু আমার এই পরামর্শ বোধহয় তার পছন্দ হল না। সে আমার সামনে থেকে উঠে গেল।

তারপর মাস দুই আর তার কোনো খবর পাইনি। রাস্তায়ঘাটে কোথাও তাকে দেখতেও পাইনি। প্রত্যেকদিন মনে হত শবানুগমনের জন্য যে-কোনো সময়ে আমার কাছে একখানা চিঠি এসে পৌঁছোবে। কিন্তু আমার অনুমান যে ভুল তা এক দিন প্রমাণিত হল। প্রায় ছ মাস পরে সত্যিই এক দিন ব্লেরতের সঙ্গে আমার দেখা হল। দেখে অবাক হলাম। এ যেন অলৌকিক কোনো ব্যাপার। সুন্দর স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে, লাবণ্যপূর্ণ মুখে আনন্দের ছাপ। ঠোঁটের কোণে প্রফুল্ল হাসি। আমি কৌতূহল না চাপতে পেরে এর কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। সে আমার কথার কোনো উত্তর দিল না কিন্তু একরকম জোর করেই আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল ডিনার খাওয়াবে বলে।

তার স্ত্রী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। দেখলাম তার মুখটা এক গভীর তৃপ্তির হাসিতে ভরে আছে।

ব্লেরত বাড়িতে এসেই তার স্ত্রীর কাছে জানতে চাইল লুসিয়ে এসেছে কি না।

তার স্ত্রী 'না' সূচক উত্তর দিল।

তার কিছুক্ষণ পরেই এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক ডিনার টেবিলে এসে যোগ দিলেন। ব্লেরত আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের সৌজন্যমূলক পরিচয় করাল। লক্ষ করলাম, ভদ্রলোক আর ব্লেরতের স্ত্রীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। সে দৃষ্টিতে ছিল গোপন এক ইশারা। কিন্তু তাতে ব্লেরতের কী, সে সেদিকে ফিরেও তাকাল না। তাকে সম্পূর্ণ নির্বিকার মনে হল।

ডিনারের শেষে ব্লেরত তার স্ত্রীকে বলল, আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। এই বন্ধুটির সঙ্গে তো তোমার আগেই পরিচয় হয়েছে। তোমরা তাহলে গল্পটল্প কর।

বাইরে এসেই ব্লেরত আমাকে বলল, ভাবছি আজ সন্ধেটা মদ আর মেয়েছেলে নিয়ে একটু স্ফূর্তি করব। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

"না, না, বিন্দুমাত্র না। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।"

খ্রিস্টানদের উৎসব
Epiphany

ক্যাপ্টেন কাউন্ট দ্য গ্যারেন বললেন, যে সময় প্রাশিয়ানদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছিল—সেই বছরের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারি খ্রিস্টোৎসবে যে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, তার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি এক অশ্বারোহী দলের কোয়ার্টার মাস্টারের পোস্টে চাকরি করি। আগের দিন সন্ধ্যার দিকে শত্রুসৈন্যদের কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ হয়। আমাদের দলের তিনজনকে তারা হত্যা করে। ওই তিনজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল যোশেফ রদেভিন। খুবসম্ভব সে তোমাদের পরিচিত।

সেদিনকার ঘটনার কথা বলছি। আমার এক উর্ধ্বতন অফিসার আমাকে আদেশ দিলেন. সেই রাতের মধ্যেই আমাকে পোর্তেরিণ গাঁ-টাকে শত্রুদের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে আর তারজন্য তিনি আমার সঙ্গে মাত্র দশজন সৈন্য দিলেন। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে এই গাঁ-টাতেই শত্রুপক্ষের সঙ্গে পাঁচবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অফিসারের হুকুম—গাঁ-টা অধিকার করে ওখানেই বাকি রাতটা কাটাতে হবে।

তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভোর চারটে নাগাদ দশজন সৈন্য নিয়ে গাঁ-টার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। তখনও চারিদিকে গভীর অন্ধকার। সেখানে পৌঁছে পীয়ের দ্য মার্কাসকে বললাম, সে যেন প্রথমে গাঁয়ের অবস্থাটা ভালো করে দেখে এসে আমাকে সবকিছু জানায়। গাঁ-টার্য় লোকবসতি এত কম যে সেখানে অনেক খুঁজে সর্বসাকুল্যে গোটা পনেরো বাড়ির সন্ধান পাওয়া যাবে।

তাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার কারণ হল সে অন্যান্য সৈনিকদের তুলনায় যেমন ছিল খেঁকশিয়ালের মতো ধূর্ত তেমনি সাপের মতো ক্রুর ও সতর্ক। বহুদূর থেকে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি সে সহজেই বুঝে নিতে পারত।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফিরে এসে জানাল যে তিন দিন হল প্রাশিয়ান সৈন্যরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। সে আরও জানাল যে গির্জার সিস্টারের সঙ্গে দেখা হতেই সে জানিয়েছে যে সে কয়েকজন আহত সৈনিকের সেবার দায়িত্ব নিয়েছে। এর পর সে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করল।

সে বলল, "ওখানে বাসযোগ্য একটা সুন্দর বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। আর সেখানে গেলে আমরা স্বচ্ছন্দে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারব।"

তালা ভেঙে বাড়ির ভিতর ঢুকতে হল। বাড়িটা সত্যিই সুন্দর। বাড়ির সামনে, ছোট্ট একফালি বাগান। সেখানে বিচিত্র রংএর ফুলের সমারোহ। মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে তাদের মনমাতানো গন্ধ। বাড়ির পিছনে আস্তাবল। সেখানে আমাদের ঘোড়াগুলোকে রেখে দেওয়া হল। আমি জনপাঁচেক সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আর আমাদের খাবার তৈরির কাজে সাহায্য করার জন্য মার্কাসের সঙ্গে রয়ে গেল চারজন সৈনিক।

পাঁচজন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গ্রামের চার দিকটা ভালো করে পাহারা দিতে বলে, আমি ওই বাড়িতেই ফিরে এলাম। দেখলাম, মার্কাস বসার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে বসে আরাম করে চুরুট টেনে চলেছে। আমাকে দেখে বলল, আজকে দুটো মুরগি, তিনটে পায়রা আর একটা হাঁস পেয়েছি। সেগুলোই আজ রান্না হবে। কয়েক বোতল মদও জোগাড় করে ফেলেছি। সেগুলো একটা গুপ্ত কুঠরির মধ্যে লুকোনো ছিল। আজ ৬ জানুয়ারি, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টোৎসব শুরু হয়ে গেছে আর এই উৎসব উদ্যাপন করতে হলে আর তাকে সফল করে তুলতে হলে আমাদের আর একটি উপকরণের প্রয়োজন আর সেটি হল একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক। তুমি যেহেতু দলের প্রধান, তোমাকে ওই বিশেষ দায়িত্বটি নিতে হবে।

আমি বললাম, সে দায়িত্ব নেওয়া বোধহয় আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ এ গ্রামে তেমন কোনো স্ত্রীলোক নেই।

মার্কাস বলল, তুমি এ গ্রামের গির্জায় গিয়ে আব্বেকে এখানে ডিনার করার জন্য নিমন্ত্রণ করে এসো। তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আমাদের চাহিদামতো বিবাহিতা দু-চারজন স্ত্রীলোককে জোগাড় করে দেবে।

এ কাজে আমার যে মোটেই ইচ্ছা নেই সেটা বুঝতে পেরে মার্কাস বলল, দেখ, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আজকের দিনের ঘটনাটা সকলের কাছে গল্প করব। আর এই ঘটনা থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করব সেটা আমার কবিতায় ছন্দ বেঁধে লিখে রাখব।

শেষ পর্যন্ত মার্কাসের অনুরোধ রাখতে আমি গির্জায় যেতে রাজি হলাম। সেখানে গিয়ে ফাদারকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি সব শুনে বললেন, মুশকিলের কথা, এ গাঁয়ে কোনো স্ত্রীলোক নেই। সকলেই গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

আমি তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম—যে-কোনো উপায়ে দু-চারজনকে অন্তত খুঁজে বার করতেই হবে। তিনি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, জীবনের অনেকটা সময় গাঁয়ের এই গির্জায় কাটিয়েছেন। কম মানুষের সঙ্গে ওঁর পরিচয় নেই। নার্সেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। যাজক অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। শেষ পর্যন্ত মুখে সাফল্যের হাসি টেনে বললেন, তুমি যাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিন-চারজন স্ত্রীলোক নিয়ে তোমাদের ওখানে পৌঁছে যাচ্ছি।

আমি বিজয়ীর সম্মান নিয়ে ফিরে এসে মার্কাসকে সব কথা বললাম। মার্কাস উৎসাহের আতিশয্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল।

একসঙ্গে জনাদশেকের বসার মতো করে টেবিলটাকে সাজানো হল। ওদের আসার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই একজন সৈনিক এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। আমরা সকলে দেখলাম, ফাদার আব্বে চারজন স্ত্রীলোক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলাম।

প্রথমে ঘরে এসে ঢুকলেন আব্বে আর তাঁর পিছনে একজন নার্স, সিস্টার অফ মার্সি। সিস্টারের চেহারাটা রোগা আর ফ্যাকাশে। দেখলে বোঝা যায় বেশ বয়স হয়েছে। গায়ের মাংস একটু একটু গুটিয়ে গেছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রথানুযায়ী প্রথম পরিচয়ের রীতি পালন করলেন। এর পর বাকি তিনজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন বার্ধক্যের ভারে প্রায় ন্যুব্জ। চলার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে।

সিস্টার নার্স আমাকে বললেন, আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের উপস্থিতি যে আপনাদের আনন্দবর্ধন করেছে এবং এই উৎসবের দিনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে তার জন্য আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। প্রথমে মাদার পমেলার পরিচয় দিয়ে বললেন, এঁর নাম মাদার পমেলা, বয়স এঁর প্রায় পঁয়ষট্টি। আফ্রিকার এক যুদ্ধে গিয়ে এঁর স্বামী ও একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। এবার দ্বিতীয় বৃদ্ধার পরিচয় দিয়ে বললেন, ইনি হলেন জাঁজিয়ান, এঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ইনি এখন চোখে কিছুই দেখতে পান না। একরকম অন্ধই বলা যায়। আগুনে এঁর মুখ আর ডান পা-টা পুড়ে যায়। আর ইনি হলেন, লা পুঁতয়। এঁর বয়স খুব বেশি নয়, তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ হতে পারে।"—এই বলে নার্স সিস্টার তৃতীয় মহিলার পরিচয় দিলেন।

ডিনারের সময়টা গল্প আড্ডায় জমে উঠল। এক একজন এক একরকমের ঠাট্টা তামাশা করতে লাগল। সকলের কাছে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠল। বৃদ্ধা দুজন ওই হাসিতামাশায় যোগ দিয়ে সকলকে আনন্দ দিলেন। একমাত্র মার্কাসকে এ সমস্ত ব্যাপারে বেশ উদাসীন মনে হল। সে কিন্তু এর মধ্যে একটাও কথা বলেনি। ঘরের আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। তাই মার্কাসকে জানালাগুলো খুলে দিতে বললাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে এতক্ষণ জানালাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছিল কিন্তু ভিতরে অতিরিক্ত গরম বোধ হওয়ার জন্য আমি মার্কাসকে জানালাগুলো খুলে দিতে বলেছিলাম। বেশ খানিকটা ঠান্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে এলে ঘরের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। আমি চিৎকার করে মার্কাসকে আদেশ দিলাম, সে যেন দুজন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ে। কাছাকাছি কোনো শত্রুসৈন্যের অবস্থান সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নিতে বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে মার্কাস দুজন সৈনিককে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল। আমিও জন দুই সৈন্য নিয়ে বাড়ির চারিদিকটা সরেজমিনে দেখতে লাগলাম। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলাম না।

মার্কাস কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বলল, চাষি শ্রেণির একজন লোক সৈনিকদের নিষেধ না শোনায় এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য তারা তাকে গুলি করেছে। এখনই গুলিবিদ্ধ লোকটাকে নিয়ে আসা হচ্ছে।

উৎসবের আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। আহারপর্ব অসমাপ্ত রেখেই আমাদের উঠে পড়তে হল। গুলিবিদ্ধ চাষিটিকে সবাই মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এলে

দেখলাম লোকটার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ফাদার আবেগে বললেন, শেষ পর্যন্ত এই ধরনের একজন নিরীহ নির্দোষ লোককে হত্যা করলে! লোকটা তোমাদের কথার উত্তর দেবে কী, ও তো সম্পূর্ণ বোবা আর কালা। সিস্টার নার্স বললেন, ও তো মারাই গেছে, এখন ওকে নিয়ে আর কী করব।

যা হোক, পরিবেশটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। একটু আগের আনন্দ পরিণত হল দুঃখ আর বিষাদে। বৃদ্ধা দুজনকে দেখে মনে হল তাঁরা বেশ ভয় পেয়েছেন। নার্স সিস্টার তাঁদের সকলকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। সেই দিনটির কথা জীবনে বোধহয় আর কখনও ভুলতে পারব না।

স্ত্রীর স্বীকারোক্তি
Wife's Confession

আমরা যে বাড়িতে বাস করতাম সেটা ছিল প্রায় জনহীন এক গ্রাম্য পরিবেশে। কাছাকাছি লোকবসতি ছিল না বললেই চলে। পুরোনো আমলের বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়িটার চার পাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ততোধিক প্রাচীন শ্যাওলা ধরা বিশাল বিশাল মহিরুহ। বাড়ির সামনের দিকে পার্কের মতো খানিকটা জায়গা। পার্কের পিছন দিকটাতে আছে দুটো বড়ো বড়ো দিঘি। কচুরিপানার দৌলতে জলের চেহারাটা প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। সেই দিঘি দুটোর সংযোগ ঘটিয়েছিল একটা লম্বা টানা খাল। সেই খালের ওপর মাচা করে খড়ের ছাউনি দিয়ে একটা ঘর তৈরি করে নিয়েছিল আমার স্বামী বুনো হাঁস শিকার করার জন্য।

সময়টা ছিল শরৎকাল। এ সময়টা খালে, বিলে প্রচুর বুনো হাঁস, নানাজাতের পাখি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত পাখির সন্ধানে আমরা মাঝে মাঝে পাশের গ্রামগুলোতে চলে যেতাম। আমাদের পরিবার বলতে, আমরা স্বামী স্ত্রী দুজন। আমাদের যে কজন চাকর-চাকরানি ছিল—তাদের মধ্যে বন্য চেহারার কুশ্রী দর্শন একজন দারোয়ান ছিল। সে আমার স্বামীকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত এবং সর্বদা স্বামীর আদেশ পালনে তৎপর হয়ে থাকত। স্পেনদেশের ষোলো বছরের একটি মেয়ে ছিল আমার সর্বসময়ের সঙ্গী। তার বাড়বাড়ন্ত শরীরের জন্য তাকে একজন যুবতী বলে মনে হত। শিকার করতে যাওয়ার সময় আমার ও আমার স্বামীর সঙ্গে যেত দু-চারজন চাকর, আমাদের শিকারের কাজে সাহায্য করার জন্য। আমি নিজে খুব ভালো বন্দুক চালাতে পারতাম। আমাদের বাড়িতে একজন যুবকের যাতায়াত ছিল। আমার স্বামী তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে ছিল একজন ব্যারন। সম্প্রতি সে আমাদের বাড়িতে খুব বেশি যাতায়াত শুরু করেছিল। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল। লক্ষ করলাম, তারপর থেকে আমার প্রতি আমার স্বামীর ব্যবহার বা আচার-আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল।

আমার স্বামী সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। কী সব চিন্তা করত। আগের মতো সে আমাকে আদর করত না বা ভালোবাসত না। যে মানুষ একদণ্ড আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না—সে আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল। সে আলাদা শোয়ার জন্য আমার ঘর থেকে বেশ খানিকটা দূরে অন্য একটা ঘরে নিজের শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিল। গভীর রাতে কারও পায়ের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যেত। মনে হত কে যেন আমার ঘর পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম একটা ছায়ামূর্তি হেঁটে চলে যাচ্ছে আমার

ঘরের সামনে দিয়ে। সে ব্যাপারে আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করতেই সে নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল, বলল, ও কেউ নয়, আমাদের দারোয়ান।

এক দিন সন্ধেবেলা আমার স্বামী আমাকে এসে বলল, "রাতের খাওয়া শেষ করে চলো আমরা শিকার করতে যাব। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আমরা আবার ফিরে আসব।"

তাকে দেখে আর কথার সুর শুনে মনে হল তার খুশির যেন অন্ত নেই।

আমি ওর ভাব দেখে খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমার স্বামী বলল, "তুমি তো জানো, রোজ রাত্রে জঙ্গল থেকে শেয়াল এসে আমাদের মুরগিগুলোকে ধরে নিয়ে যায়। আজ ওকে মারতেই হবে। তুমি ভয় পাবে না তো?"

আমি বললাম, "না, এর আগেও তো আমি অনেক শুয়োর আর নেকড়েকে গুলি করে মেরেছি। সে সময় যখন ভয় পাইনি, তখন আজও ভয় পাব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা রাত প্রায় দশটার সময় শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার স্বামীর মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ লক্ষ করলাম। হঠাৎ তার এ ধরনের পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারলাম না। যা হোক সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। আমরা দুজনে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে জনহীন জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। আমাদের গন্তব্য ছিল দিঘির জলের ওপর তৈরি করা সেই খড়ে ছাওয়া ঘরটা। সাঁকো পার হয়ে আমরা যথাসময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমরা সেখানে অনেকক্ষণ শেয়াল আসার অপেক্ষায় নিঃশব্দে চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু কোথায় শেয়াল, শেয়ালের কোনো চিহ্নও দেখতে পেলাম না। পরিপূর্ণ চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত প্রকৃতির বুকে। কিন্তু সর্বত্র বিরাজ করছে এক সীমাহীন নৈঃশব্দ্য, মনে হচ্ছে মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে সেই বনভূমির প্রতিটি বৃক্ষ প্রতিটি লতাগুল্ম, প্রতিটি পত্রপুষ্পে। বাতাসে যেন মিশে আছে মৃত আত্মাদের মর্মভেদী হাহাকারের শব্দ। ব্যাঙ বা ঝিঁঝি পোকাগুলো যেন সেই নিস্তব্ধ নিথর রাত্রিতে শব্দ করতে ভুলে গেছে। সেই নৈঃশব্দ্যের ভীতি যেন তাদের আচ্ছন্ন করেছে।

আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঠিক জান শেয়ালটা আমাদের চার পাশের জঙ্গলের কোনো একটা জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে?

আমার স্বামী, হার্ভে বলল, হ্যাঁ, আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সে আমার গায়ে হাত দিয়ে ইশারায় একটা গাছের নীচে তাকাতে বলল। আমাদের থেকে গাছটা ছিল বেশ কিছুটা দূরে। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম সেখানে একটা লোক বসে আছে। কিন্তু তাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। হঠাৎ লোকটাকে লক্ষ করে আমার স্বামী গুলি করল। গুলির প্রচণ্ড শব্দ সীমাহীন নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে সমস্ত বনভূমিকে কাঁপিয়ে তুলল। দেখলাম, সেই লোকটি মাথা নীচু করে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বেশি দূর এগোতে না পেরে ঘাসের জঙ্গলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি ভয়ে, আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলাম। হঠাৎ আমার স্বামী আমার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে আমার গলাটা প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরল। তারপর আমার গলা ছেড়ে দিয়ে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে লোকটার মৃত শরীরের ওপর ফেলে দিল। আমি ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে দেখলাম, লোকটা আমাদের বাড়ির, আমার স্বামীর একান্ত বিশ্বস্ত, বশংবদ সেই দারোয়ান।

অপ্রত্যাশিত এরকম ঘটনায় আমি বিস্ময়ের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছোলাম। সমস্ত-রকম চিন্তা করার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এর কার্যকারণ কিছুই খুঁজে পেলাম না, বুঝতেও পারলাম না কিছুই। শুধু এইটুকু বুঝলাম, আমার স্বামী আমাকে খুন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এর মধ্যে হঠাৎ দেখলাম আমার সহচরী কোথা থেকে উন্মাদের মতো ছুটে এসে মৃতদেহটার ওপর লুটিয়ে পড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। আর মাঝে মাঝে তীব্র আবেগে চুম্বন করতে লাগল তার মৃতশরীরে। তা দেখে আমার স্বামী বারবার আমার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। সম্ভবত ব্যাপারটা তখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে চাইতে বলল, আমি মিছিমিছি তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম। দারোয়ানকেও ওই একই কারণে হত্যা করেছি। ওঃ আর একটু হলে কী সাংঘাতিক ঘটনাটাই না ঘটে যেত। এখন বুঝতে পারলাম ওই দারোয়ানের সঙ্গে ওই মেয়েটারই গোপন সম্পর্ক ছিল।

তখন হার্ভে কী বলছে, আমার কানে কিছুই ঢুকছে না। শুধু তীব্র কামের উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ করছিলাম কীভাবে এক নারী তার প্রেমিকের মৃত শরীরটাকে চুম্বন করে চলেছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি ভিতরে ভিতরে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলাম। বারবার মনে হতে লাগল, এইভাবে যদি কারও শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দিয়ে তাকে চুম্বন করতে পারতাম!

প্রকৃত পরিহাস
Practical Joke

আজকের আধুনিক যুগে হাস্যরস পরিবেশনের জন্য যে ধরনের পরিহাস বা রসিকতা করা হয় তা বাস্তবের ছোঁয়ায় কেমন যেন প্রাণহীন, আর তা যে হাস্যরসের জন্ম দেয় তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তা মনে কোনো দাগ রাখতে পারে না। কিন্তু আগেকার দিনে অর্থাৎ আমাদের বাপঠাকুরদার আমলে যে সমস্ত পরিহাস বা রসিকতা করা হত—তা যেমন নির্দোষ, তেমন ছিল স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও নির্মল হাস্যরসে পরিপূর্ণ।

রসিকতার ব্যাপারে আমিও কম যাই না। আবার অন্য অনেকেও আমার সঙ্গে রসিকতা করেছে। কিন্তু আমি একজনের সঙ্গে একবার রসিকতা করেছিলাম এবং আমার সেই রসিকতার মাত্রাটা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যার পরিণাম হয়েছিল ভয়ঙ্কর এবং তাতে তার মৃত্যু হয়েছিল।

ভাবছি আমি সেই গল্পটা এখন আপনাদের কাছে বলব। কিন্তু আমি জানি গল্পটা শুনে আপনারা সকলেই হাসবেন, হাসি চাপতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না।

ঘটনাটা ঘটেছিল প্যারিসের এক মফস্বল শহরে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটার কথা মনে করে এখনও হাসতে থাকবে। কিন্তু এখন থাক, পরে বলব সে ঘটনাটা।

এখন আমি রসিকতা নিয়ে দুটি ঘটনার কথা বলব। একটাতে আমি ছিলাম সেই রসিকতার শিকার আর একটাতে আমি অন্য একজনকে রসিকতার শিকার বানিয়েছিলাম।

কয়েকজন বন্ধু এক দিন আমাকে পিকার্ডিতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করল। আমি সেখানে যেতেই আমার বন্ধুরা বন্দুকের শব্দ করে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু তাদের বাড়াবাড়ি দেখে আমার মনে হল—এরা তো অতিরিক্ত বেশি কিছু করে ফেলছে। ব্যাপারটা ঠিক ভালো মনে হল না।

খাবার টেবিলে বসে আমরা যখন খাওয়াদাওয়া করছিলাম তখন অন্যান্য দিনের মতো আমাদের মধ্যে হাসিঠাট্টা হল না। সকলে মোটামুটি গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হতেই আমি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল ওরা বোধ হয় কোনোভাবে আমাকে ঠকাবার পরিকল্পনা করছে। খাওয়ার পাট চুকে গেলে, বন্ধুরা আমাকে শোয়ার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

আমি ঘরে ঢুকে প্রথমেই সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিলাম। এরপর সমস্ত কিছু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম যাতে কোথাও লুকিয়ে রাখা কোনো জিনিসের মাধ্যমে আমি তাদের ঠাট্টা বা রসিকতার শিকার না হই। মনে হল ঘরের বাইরে ওদের পায়ের শব্দ আর হাসাহাসির শব্দ শুনতে পেলাম। একবার মনে হল খাটের ওপর শুলে খাটটা ভেঙে পড়বে না তো! আমার এমন মনে হওয়ার কারণ

হল ওইসব উপায়ে আমি অন্যদের সঙ্গে রসিকতা করেছিলাম এবং একইভাবে হয়তো আমার সঙ্গে ওরা রসিকতা করতে পারে। ভয়ে সারারাত্রি চুপচাপ জেগে বসে রইলাম দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

হঠাৎ মনে হল খাট ভেঙে পড়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে এইভাবে চুপ করে রাত জাগার কোনো মানে হয় না। সুতরাং খাট থেকে চাদর বালিশ টেনে নিয়ে মেঝেয় বিছানা করে সেখানে শুয়ে পড়লাম। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত জেগে রইলাম তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ তরলজাতীয় গরম কোনো জিনিস আমার মুখের ওপর এবং ভারী কোনো বস্তু আমার শরীরের ওপর পড়লে আমি ঘুমের ঘোরে সেই ভারী বস্তুটার ওপর দমাদম ঘুসি চালাতে লাগলাম।

পরে ঘুম ভাঙলে জানতে পারলাম, পরিচারকটি আমার জন্য সকালের চা নিয়ে ঘরে ঢুকে যখন আমাকে খাটের পরিবর্তে মেঝের ওপর শুয়ে থাকতে দেখল, তখন সে এত অবাক হয়ে এমন চমকে উঠেছিল যে তার হাত থেকে চাএর কাপটা পড়ে গিয়ে সমস্ত চা-টাই আমার মুখের ওপর পড়ে আর সে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে উলটে পড়ে আমার শরীরের ওপর আর আমি সেসময় তাকে অন্য কোনো জিনিস ভেবে দমাদম ঘুসি মারতে থাকি।

নিশ্চয়ই ঘটনাটা শুনে আপনাদের হাসি পাচ্ছে।

আমার ছাত্রাবস্থায় রসিকতার একটা ঘটনা ঘটেছিল। কেমিস্ট্রি আমার সব থেকে ফেবারিট সাবজেক্ট। আর প্রায়ই আমি ক্যালসিয়াম ফসফেট নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসতাম। যারা রসায়নের ছাত্র তারা নিশ্চয়ই জানে—ক্যালসিয়াম ফসফেট জলের সঙ্গে মিশলেই জলে আগুন ধরে যায় আর খুব ধোঁয়া হতে থাকে, একটা বিশ্রী গন্ধও বেরোয়।

ছুটির সময় মাঝে মাঝে দেশের বাড়ি বেড়াতে যেতাম। এক দিন দেখলাম ম্যাডাম দুফোর আমাদের বাড়ি এসেছেন তাঁর অবসর সময়ের কিছুটা কাটাবার জন্য। কিন্তু আমি ছিলাম ওঁর চক্ষুশূল। আমার সবরকম কাজে ভুল ধরা, ত্রুটি খুঁজে বের করা আর সে সমস্ত সকলের কাছে ব্যাখ্যা করে আমাকে ছোটো করা ওঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে সমস্ত নিয়ে তিনি আমাকে বকাবকিও করতেন অনেক সময়।

দিনের পর দিন এভাবে চলতে চলতে আমি ওঁর উপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলাম। রাগও হল যথেষ্ট। ঠিক করলাম ওঁকে বেশ ভালোমতো জব্দ করতে হবে এবং সেই মতো একটা পরিকল্পনা ছকে ফেললাম। আমি লক্ষ করেছিলাম মাদাম দুফোর রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে তাঁর বাঁধানো দাঁত খুলে এক গ্লাস জলের মধ্যে রেখে দেন এবং মাথার উইগটাও খুলে রাখেন। দাঁত এবং পরচুলা খোলা অবস্থায় তাঁকে এত কুশ্রী দেখায় যে সেই চেহারা দেখলে সব থেকে গম্ভীর কোনো লোকের পক্ষেও হাসি চেপে রাখা সম্ভব হবে না। এমনকি হাসতে হাসতে তার পেটে খিল ধরে যাওয়াও অসম্ভব

নয়। এক দিন আমি তাঁকে আমার চালাকির ফাঁদে ফেলে তাঁর প্রার্থনা করার সময় ওই জলের গ্লাসে কিছুটা ক্যালসিয়াম ফসফেট ঢেলে দিলাম।

মুহূর্তের মধ্যে সেখানে ছোটোখাটো একটা বিস্ফোরণ ঘটে জলে আগুন ধরে প্রচুর ধোঁয়া ছড়াতে লাগল। বিদঘুটে একটা দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠল। ম্যাডাম দুফোর এ সমস্ত দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। উনি মনে করলেন—এটা নিশ্চয়ই কোনো শয়তানের কাজ।

আমার কাজ শেষ করে, কিছুই হয়নি এমন ভাব করে নিজের ঘরে চলে এলাম। তারপর ব্যাপারটা সকলের কাছে খুলে বলতেই হাসতে হাসতে সকলের পেটে খিল ধরে যাবার মতো অবস্থা হল। মাদাম দুফোর সম্ভবত কিছুই বুঝতে পারেননি অথবা বুঝতে পারলেও তাঁর মনে সন্দেহ ছিল। এটা যে শয়তানের কাজ—এই বিশ্বাসে তিনি অবিচলিত ছিলেন। তিনি শুধু পর পর কয়েক গ্লাস জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে বললেন, আপনারা জানেন না শয়তানরা মাঝে মাঝে এ ধরনের কাজ করে থাকে।

নামকরণ
Christening

খামারবাড়ির প্রধান দরজার সামনে সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ রবিবারের পোশাক পরে লোকগুলো দাঁড়িয়েছিল। মে মাসের উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত প্রকৃতির বুকে। মঞ্জরিত আপেলগাছগুলো আলোর ঝরণাধারায় স্নাত হয়ে তাদের পাতাগুলোর সাহায্যে যে মিষ্টি স্নিগ্ধ ছায়াপাত করেছিল সমস্ত খামারবাড়িটাতে তা মোহময় এক স্বপ্নলোকের পরিবেশ তৈরি করেছিল। দখিনা হাওয়ায় দীর্ঘ হয়ে বেড়ে ওঠা ঘাসের গালিচার ওপর পাপড়িগুলো নিরন্তর ঝরে পড়ে ঘুলঘুলির রূপ নিয়ে নিজেদের প্রকাশ করার জন্য যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ড্যান্ডিলিয়ন ফুলগুলো আগুনের শিখার রংএ রঞ্জিত হয়ে ফুটে উঠেছিল তাদের মোহময় সৌন্দর্য নিয়ে। আর পাপিসগুলো রক্ত রংএ স্নান করে বাতাসের দোলায় নেচে উঠছিল এক অপরূপ ছন্দে। এমন দৃশ্যে মন হারিয়ে যেতে চায় কোনো এক অজানা দিগন্তে।

খামারবাড়ির একদিকে স্তূপ করা গোবরের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে শূকরী মা। ছোটো ছোটো ছানাপোনাগুলো তাদের মায়ের বিরাট উদরের দুধে ভারী হয়ে যাওয়া স্তন পান করে পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়।

বেশ কিছুটাদূরে যে গির্জাটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ভেসে আসে ঘণ্টার শব্দ। তারই ধাতব শব্দ যেন আর্তকণ্ঠের ধ্বনি—যা বাতাসে ভেসে গিয়ে মিশে যায় স্বর্গলোকের বায়ুস্তরে। সোয়ালো পাখির ঝাঁক সে সময় নীল আকাশের গায়ে ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যায় কোনো এক অজানা দিগন্তে। প্রকৃতির বুক থেকে উঠে আসা বিচিত্র এক গন্ধের সঙ্গে কুঁড়িধরা আপেলগাছের সুগন্ধ মিশে গিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় এক ঝিমধরা আবেশ।

যে লোকগুলো দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে ডাকে, মিলিনা, দেরি কোরো না, এক্ষুণি চলে এসো। ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?

লোকটার বয়স বছর ত্রিশ হতে পারে। শরীরের আকৃতি দীর্ঘ বলিষ্ঠ। মাঠেঘাটে রোদ বৃষ্টিতে সারাবছর ধরে সে অমানুষিক পরিশ্রম করে। তবুও তার দেহের লাবণ্য এতটুকুও মলিন হয়নি। সমস্ত শরীর দিয়ে ঝরে পড়ছে উজ্জ্বল সুষমা। তার বাবা বয়সে বৃদ্ধ হলেও, তার দেহের দিকে তাকালে মনে হয় যেন গাঁটযুক্ত একটা ওক গাছের গুঁড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন চাষাবাদ করতে করতে সমস্ত হাত ভরে উঠেছে ক্ষতচিহ্নে, পা দুটো সামান্য বেঁকে গেছে। সে মন্তব্য করে, মেয়েরা চিরকালই ওইরকম। ওদের সাজতে গুজতে আঠারো মাসে বছর।

অন্য ছেলে দুটো বাপের কথা শুনে তখন হাসছিল। তাদের মধ্যে একজন বড়ো ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে খোঁজ নাও। সম্ভবত দুপুরের

আগে ও বেরোতে পারবে না। সে-ই এতক্ষণ চিৎকার করে মিলিনা, মিলিনা বলে ডাকছিল।

বড়ো ভাই ভিতরে ঢুকে গেল। কয়েকটা পাতিহাঁস ডাকতে ডাকতে খামারের পুকুরের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই সময় বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসে একজন বেশ বলিষ্ঠ শরীরের মহিলা। কোলে তার মাস দুয়েকের একটি শিশু।

এর পর বেরিয়ে এল ওই শিশুটির মা। বয়স খুব বেশি হলে আঠারো উনিশ। শরীরে এক অপূর্ব সুঠাম ছন্দ, ঠোঁটের কোণে উজ্জ্বল হাসি। স্বামীর হাত ধরে সে এগিয়ে আসছিল। তারপর বেরিয়ে এলেন দুই বৃদ্ধা ঠাকুমা, গাছপাকা আপেলের মতো তাঁদের গায়ের রং। সম্প্রতি একজনের পতিবিয়োগ হয়েছে। আর একজন তার বৃদ্ধ স্বামীর হাত ধরে এগিয়ে যেতে থাকে সকলের আগে আগে। তাদের পিছনে অন্য সবাই। ছোটোরা মিষ্টির বাক্স হাতে নিয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করতে করতে এগিয়ে চলে।

গির্জার ঘণ্টাটার থামার কোনো লক্ষণ নেই। সেটা শুরু থেকে একইভাবে বেজে চলেছে। শিশুরা এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি হয়ে কাঠবিড়ালির পায়ে তরতর করে উঠে পড়ছে টিলাটার ওপর। গির্জার ভিতরে ঢুকে পড়ছে অনেকেই। গয়লানিরা দুধ বিলি করে গির্জার সামনে এসে দুধের পাত্রগুলো নামিয়ে নামকরণের এই পবিত্র অনুষ্ঠানটা দেখছে।

এদিকে বলিষ্ঠ শরীরের নার্স শিশুটিকে কোলে নিয়ে বালি ও কাঁকর বিছানো পথ ধরে এগিয়ে চলে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা চলেছে ওই একই উদ্দেশ্যে নামকরণের ওই পবিত্র অনুষ্ঠান দেখার জন্য। তারা অশক্ত পায়ে হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। যুবকরাও যাচ্ছে সেখানে দর্শক হয়ে ওই অনুষ্ঠানে শামিল হতে। রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীদের দেখে তাদের চলার গতিতে যেন নাচের ছন্দ জাগে।

শিশুটির বাবা মা আত্মবিশ্বাসে অটল, তারই প্রতিচ্ছবি তাদের মুখের ওপর, তাদের সমস্ত শরীরে, তাদের চলার ছন্দে। তারা নিশ্চিত—এই শিশু দেঁন্তু বংশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

আজই তার সূচনা হবে শুভ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

দ্রুত গির্জায় পৌঁছোবার তাগিদে তারা মূল রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে। ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে গির্জার বাড়িটা। চূড়াগুলোও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কানে ভেসে আসছে ঘণ্টার শব্দ। ক্রমশ সেটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। একইভাবে বেজে চলে সেটা। সেই ঘণ্টাধ্বনি যেন শিশুটির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের প্রথম শুভ মুহূর্তটিকে পরম শ্রদ্ধায়, একান্ত আন্তরিকতায় অভ্যর্থনা জানায়।

একটি কুকুর ওদের সেই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে। সে তাদের অনুসরণ করছে। বাচ্চাগুলো তাদের সঙ্গে খেলাচ্ছলে মিষ্টি ছুঁড়ে দেয় তাদের দিকে। ওদের চোখে-মুখে আনন্দের বান বয়ে যায় মিষ্টির সুঘ্রাণে। তাদের পায়ের কাছে এসে তারা লেজ নেড়ে

সেই ভাষাহীন আনন্দ প্রকাশ করে।

অনুষ্ঠানের জন্য গির্জার দরজা খুলে রাখা হয়েছে। প্রধান পুরোহিত যিনি তিনি বেদির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘাকারের চেহারাটি অত্যন্ত শীর্ণ কিন্তু গঠন মজবুত। সমস্ত মাথাটা ভরে আছে গোছা গোছা লাল চুলে। তাঁরও জন্ম এই দেঁন্তু বংশে। অনুষ্ঠানের প্রধান নায়ক ওই শিশুটির পিতৃব্য। তিনি রীতিসিদ্ধ পবিত্র লবণের খণ্ডটি শিশুটির মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি কেঁদে উঠল।

অনুষ্ঠানশেষে পরিবারের সকলে গিয়ে দাঁড়ায় গির্জার সিঁড়ির ওপর। পুরোহিতও অনুষ্ঠানের পোশাক ছেড়ে যোগ দিলেন সকলের সঙ্গে সাধারণ পোশাকে। এর পর সকলে শোভাযাত্রা করে ফিরে চলল নিজের নিজের বাড়ির দিকে। সকলে জানে বিরাট ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং তাদের চলার গতি দ্রুত। চ্যাংড়া ধরনের একদল ছেলে সেই দলের মধ্যে ভিড়ে গেছে। মাঝে মাঝে যখন ওদের দিকে মিষ্টির বাক্স ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল তখনই তাদের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি শুরু হয়ে যাচ্ছিল। সেই সব কুকুরগুলোও—যারা রাস্তার ধারে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খাবারের সন্ধানে তারাও ছুটে এসে সেই যুদ্ধে যোগ দিল। খাবার নিয়ে কুকুর মানুষে লড়াই—এ এক নূতন বস্তু। কুকুরগুলো লড়াইএর প্রতিযোগিতায় জিতে গিয়ে মিষ্টির প্যাকেট মুখে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত নার্স রেগে গিয়ে বলল, সেই সকাল থেকে আমার ভাইপোকে কোলে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি। দুপুর গড়িয়ে যেতে চলল—এক মুহূর্ত তাকে কোল থেকে নামাবার সুযোগ পাইনি। হাত-পা সব অসাড় হয়ে আসছে।

পুরোহিত তার কথায় নিজের কোলে তুলে নেন শিশুটিকে। কিন্তু শিশু কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে তিনি যে মোটেই অভ্যস্ত নন এটা তাঁর চলাফেরার ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁর করুণ অবস্থা দেখে সকলে হেসে ওঠে। বৃদ্ধা ঠাকুমাদের মধ্যে একজন বলে ওঠেন, তোমার নিজের সন্তান থাকলে আর সেই সন্তানকে কোলে নিয়ে বেড়াবার অভ্যাস থাকলে তোমার এমন দুর্ভোগ সহ্য করতে হত না।

পুরোহিত তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মাঝে মাঝে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তার নীল চোখ দুটো। আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটো দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শিশুটিকে চুম্বন করার তীব্র ইচ্ছায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। এর পর ব্যাকুল স্নেহে চুম্বন করতে লাগলেন শিশুটির সমস্ত শরীরে।

পুরোহিতের ভাবভঙ্গি দেখে শিশুটির বাবা কৌতুকের স্বরে বলে উঠল, একটা সন্তানের জন্য যখন এতই ইচ্ছা তখন তো আমাকে একবার বলতে পারতে। উপায়টা বাতলে দিতে আমার খুব বেশি সময় লাগত না।

এ ধরনের রসিকতায় সকলের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়।

খাবার টেবিলে হাসির ফোয়ারা ছুটতে থাকে। পরিবারের প্রবীণতম মানুষটিও আজ স্ফূর্তিতে ডগমগ। তার ছেলেরা ও ছেলের বউরাও হাসিঠাট্টা হইহুল্লোড়ে গোটা

পরিবেশটাকে মাতিয়ে তুলেছে। যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাঁরা ওই বংশ ও শিশুটির সার্বিক মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করলেন। পুরোহিত নিজেকে এই চটুল আনন্দের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নার্সের পিছনে একটি আসনে বসে ভাইপোকে আদর করছেন, তাকে নানান খেলায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। শিশুটি মাঝে মাঝে যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছিল তখন তাঁর সমস্ত অন্তর এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে উঠছিল। কিন্তু এক ধরনের বিষণ্ণতা তাঁকে যেন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

পুরোহিত এক দৃষ্টিতে শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হল তাঁর কানে কারও কথা পৌঁছোচ্ছে না। নার্স যখন তাঁর কোল থেকে শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নেয় তখন তিনি নিজের মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। শিশুটিকে নিজের কোলে ফিরিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে উঠল। বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে খাবার টেবিলে বসে খাবার খেতে নার্সের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল। সেটা তিনি লক্ষ করে বাচ্চাটিকে আবার নিজের কোলে তুলে নেবার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, আমার এখন খাবার ইচ্ছা নেই। কারণ খিদে পায়নি। বাচ্চাটাকে আমার কোলে দাও। শিশুটিকে আবার নিজের কোলে তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পরিবেশটা তাঁর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি হাসিঠাট্টা, হইহুল্লোড়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, শুধুমাত্র গভীর একাগ্রতার সঙ্গে তিনি শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওই শরীরটার স্নিগ্ধ মধুর উষ্ণতা, ওই কচি কচি নরম তুলতুলে শরীরটার স্পর্শ তাঁর সমস্ত শরীরে সঞ্চার করল ব্যাকুল মাধুর্যের আবেশ। নীরব ভাষায় উচ্চারিত হয়—কী সুন্দর, কী পবিত্র, কী অপূর্ব! জলে ভিজে ওঠে তাঁর চোখ দুটো। আহারপর্ব সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আকণ্ঠ পানভোজনে সকলেই তৃপ্ত। সেই তৃপ্তির প্রকাশ ঘটছে হাসিঠাট্টা আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে আর সেটা এখন সীমার গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। সেই চিৎকার আর হট্টগোলে শিশুটি ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করে বলে ওঠে, "আপনার বাচ্চা দুধ খাবার জন্য কাঁদছে, ওকে দুধ দিন।"

তার কথায় সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। শিশুটির মা তাকে কাঁদতে দেখে তাকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানোর জন্য দ্রুত পাশের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে জানায়, ওকে স্তন পান করাতেই ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভোজ-অনুষ্ঠান তখনও শেষ হয়নি। অতি ভোজনে ক্লান্ত হয়ে মেয়েপুরুষ মাঝে মাঝে টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ বাগানে পায়চারি করে আবার ফিরে এসে টেবিলে বসছে—অসমাপ্ত খাবারগুলো শেষ করার জন্য। ভোজ্য বস্তু আর পানীয়ে পেট ফুলে হয়ে উঠেছে জয়ঢাক। স্নায়ুতন্ত্রী ক্রমশ অবসন্ন হয়ে আসছে, স্তিমিত হয়ে আসছে চিন্তাশক্তি।

একটু রাতের দিকে অতিথিদের কফি পরিবেশন করা হল। বেশ কিছুক্ষণ আগে পুরোহিত এই ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। পুরোহিতের অনুপস্থিতি নিয়ে কেউ কোনো

প্রশ্ন করল না। প্রশ্ন করা তো দূরের কথা, ওই প্রসঙ্গে কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করল না।

শেষ পর্যন্ত শিশুটির আঠারো বছরের মা, যে ঘরে শিশুটি ঘুমিয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে যায় নিঃশব্দে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পাছে কোনো শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়, সেইভাবে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে।

সে যেন শুনতে পায় ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কে যেন ফিশফিশ করে কথা বলছে। ভীষণ আতঙ্ক তাকে যেন চেপে ধরে। সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সকলকে জানায় সে কথা। ক্রুদ্ধস্বরে মাতালগুলো গর্জন করে ওঠে। তারা সেই অদেখা জীবটিকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। শিশুর বাবা বাতি হাতে দ্রুত ছুটে যায় ঘরের দিকে। তার পিছনে অন্য সবাই। তারা দেখে এক বিচিত্র দৃশ্য।

শিশুটির দোলনার পাশে নতজানু হয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছেন সেই পুরোহিত। শিশুটির গায়ে হাত রেখে তিনি অঝোরে কাঁদছেন। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তাঁর সমস্ত শরীর, ভিজে উঠেছে তাঁর দেহের পোশাক।

চৌম্বক শক্তি
Magnetism

সেদিন এক দ্বিপ্রাহরিক ভোজের অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রের আকর্ষণ শক্তি এবং তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে দোনাতোর দক্ষতা ও চরকোতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় যাবৎ ভোজটেবিলের ওপর দিয়ে যেন তর্কবিতর্কের ঝড় বয়ে গেল।

ওই ভোজ অনুষ্ঠানে যারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল তারা সকলে প্রচুর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের মধ্যে বসবাস করে। সুতরাং ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তবুও তারা এমন এমন ঘটনার বর্ণনা দিল যেগুলোকে অলৌকিক বা অতিলৌকিক বললেও ভুল হবে না। কিন্তু ঘটনাগুলি সত্যি।

তাদের মধ্যে একজন যুবকের এ সমস্ত ব্যাপারে তিলমাত্র বিশ্বাস তো ছিলই না বরং সে এ সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বের ঘোর বিরোধী ছিল। ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তার কোনো আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল না। তখনও পর্যন্ত সে বিয়ে করেনি কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় তার জুড়ি ছিল না। সে শিকার করতে ভালোবাসত এবং সুযোগ পেলেই শিকারে বেরিয়ে পড়ত।

প্রত্যেকে যখন অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল তখন যুবকটি ঠোঁটের কোণে অবিশ্বাসের হাসি টেনে বলল, ও সমস্ত স্রেফ গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবে ও সমস্ত ঘটনা কখনও ঘটে না। ওগুলো এডগার অ্যালান পোর মনগড়া গল্পের মতোই অবাস্তব। অনেক সময় মানুষ স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং তার কার্যকারণ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে গির্জার পুরোহিতদের স্মরণাপন্ন হয় এবং তারা সে সমস্ত ঘটনার যেমন ব্যাখ্যা করে—তারা সেগুলোই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

তাদের মধ্যে একজন বলল, শুনেছি আমাদের বাপঠাকুরদার আমলে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটত। যুবকটি বলল, তাহলে এখন সেগুলো ঘটে না কেন?

তখন নাস্তিক যুবকের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য সকলে অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, কে বলেছে আধুনিক যুগে অলৌকিক কোনো ঘটনা ঘটে না! আজও মহাশূন্যে পরলোকগত আত্মাদের মধ্যে কথা হয়। অলৌকিক শক্তির বলে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের ওপর অতি সহজে প্রভাব বিস্তার করে, তার মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ইচ্ছেমতো তাকে দিয়ে যে-কোনো কাজ করিয়ে নেয়।

যুবকটি তখন বলল, অলৌকিক বলতে বাস্তবে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। ও সমস্ত স্রেফ মনগড়া কাহিনি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সিগারেট খেতে খেতে এ সমস্ত কথা বলছিল। শেষ পর্যন্ত সিগারেটটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল,

আমি এখন আপনাদের এমন দুটি ঘটনার কথা বলব, যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বলে মনে হলেও সেগুলোর মধ্যে অলৌকিকত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই—বরং ঘটনাগুলো অতি সাধারণ বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঘটনা দুটো বললে সবকিছু আপনাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এত্রিয়াতের গ্রামাঞ্চলে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বসবাস করে। প্রতিবছর তারা কড মাছ ধরতে যায় নিউফাউন্ডল্যান্ডের সমুদ্রাঞ্চলে। এক দিন গভীর রাত্রে এক জেলের ছোটো ছেলেটি ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠল, মা, মা বাবা সমুদ্রের জলে ডুবে যাচ্ছে। এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হল ঠিক এক মাস পরে। সেখান থেকে একজন এসে খবর দিল, সেই জেলেটি, অর্থাৎ ওই ছেলেটির বাবা সত্যি জলে ডুবে মারা গেছে। এই ঘটনার কথা গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি দেরি হল না। তখন তারা ঘটনাটিকে অলৌকিক বলে ধরে নিল।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলল, ঘটনাটা যে অলৌকিক নয়, সেটা তুমি কীভাবে প্রমাণ করবে?

যুবকটি তখন বলল, আমি এর কারণ খুঁজে পেয়েছি। আমি ওই এলাকায় গিয়ে জেলে পরিবারে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, যখন পরিবারের কর্তারা মাছ ধরতে চলে যায় তারপর থেকে পরিবারের প্রায় সকলেই তাদের সম্বন্ধে ভালো বা খারাপ স্বপ্ন দেখে। তার মধ্যে কিছু স্বপ্ন সত্যি হয় আর বাকিগুলো স্বপ্নই রয়ে যায়। সেগুলোকে সত্যি হতে দেখা যায় না। যে স্বপ্নগুলো বাস্তবে ঘটে না সেগুলোর কথা তারা খুব শিগগির ভুলে যায় আর যদি কখনও স্বপ্নগুলো কাকতালীয়ভাবে বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সঙ্গে মিলে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না—সেগুলোকে তারা অলৌকিক বা অতিলৌকিক ভেবে নেয় আর তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত থাকে না।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলল, বুঝলাম, এবার দ্বিতীয় ঘটনাটা বল।

যুবকটি তখন বলতে শুরু করল, আমাদের একই সম্প্রদায়ের বা শ্রেণির মেয়েদের মধ্যে আমি যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি বা যাদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে তাদের মধ্যে একজনের প্রতি আমি ভীষণভাবে বিরূপ হয়ে উঠেছিলাম। তাকে কুশ্রী দেখতে না হলেও এবং চলনসই গোছের রূপ থাকলেও তার মধ্যে এমন কিছু জিনিসের অভাব ছিল—যার জন্য তাকে দেখলে আমার মধ্যে কোনো কামনার অনুভূতি জাগত না। এক দিন রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে আমি ফায়ার প্লেসের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কতকগুলো চিঠি লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সেই নির্জন পরিবেশে, সেই আগুনের আলোয় অলস মুহূর্তগুলোতে কয়েকটি চিন্তা ছবি হয়ে আমার মনের পর্দায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। আমার হাতের কলম হাতেই রয়ে গেল স্থির হয়ে। এক অজানা উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে লাফাতে শুরু করল—সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। হঠাৎ মনে হল—যে মেয়েটির সান্নিধ্য বা সংস্পর্শ আমার কাছ অসহ্য হয়ে ওঠে, সে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। চোখে তার কামনার আমন্ত্রণ। ধীরে ধীরে সে তার শরীর থেকে একটি একটি করে

পোশাক খুলে ফেলে আমার সামনে তার নগ্ন শরীরটা নিয়ে দাঁড়াল। যেন তার উলঙ্গ শরীরের প্রতিটি স্থানে আমি আমার হাত দিয়ে অনুভব করছি।

যার কথা ভাবলে একদিন ঘৃণায় আমার সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে উঠত, যার মধ্যে অবাঞ্ছিত ও মন্দ বই সুন্দর বা ভালো কোনো বস্তুর সন্ধান পাইনি—সে যেন আজ স্বর্গের দেবীর অতুলনীয় সৌন্দর্য ও সীমাহীন গুণে সমৃদ্ধ হয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

এর পর আমি নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং তার কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখলাম, তা আমার কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হল। দেখলাম সে আমার সামনে তার নগ্ন শরীরের মহার্ঘ সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তার সেই সমস্ত মূল্যবান সম্পদ দুচোখ দিয়ে উপভোগ করতে করতে আমি উত্তেজিত হয়ে তার নিবিড় সান্নিধ্যে এসে 'উপস্থিত হয়েছি। তারপর আদরে সোহাগে আলিঙ্গানে চুম্বনে তার সম্পদ শোভিত সেই শরীর নিষ্পেষিত করে চলেছি সীমাহীন আবেগে। এর পর তার শরীরের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণখনির গহ্বরে আমার শরীরের রক্তবর্ণের যষ্ঠিটিকে প্রবেশ করিয়ে মহাবেগে মন্থন করে চলেছি এক দোলায় মান ছন্দে ও নিবিড় এক উষ্ণতায়। এইভাবে স্বপ্নে দেখা আমাদের মহামিলনের মুহূর্তগুলো যেমন আনন্দ পুলকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল তেমনি হল দীর্ঘস্থায়ী।

ঘুম ভাঙার পর থেকে শুধু তার কথাই ভাবতে লাগলাম। এমন অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে আমি এক মুহূর্তও দেরি না করে সোজা তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার ঘুম ভেঙে গেলেও সে তখনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে হয়তো বা আমার কথাই ভেবে চলেছিল। আমাকে দেখে অপ্রত্যাশিত আনন্দে দিশাহারা হয়ে সে বিছানার ওপর উঠে বসল। তার চোখ দুটো থেকে ঝরে পড়তে লাগল গভীর বিস্ময়। আমি তাকে সব কিছু খুলে বললাম। আমি কেবলই অনুভব করতে লাগলাম ঘুমের মধ্যে আমি যেটা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটা স্বপ্ন নয়, আমি যেন সত্যই তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। মনে হল তার অধর রসে সিক্ত হয়ে উঠেছে আমার পিপাসার্ত অধর। তার শরীরের উষ্ণ পেলব স্পর্শ আমার শরীরকে যেভাবে রোমাঞ্চিত করেছিল—সেই শিহরণ আমি যেন অনুভব করছিলাম। তার শরীরের সঙ্গে শরীর মিশে এক হয়ে গিয়ে আমার মধ্যে যে তৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছিল—সেই পুলকের শিহরণ আমি যেন আমার সর্বাঙ্গে অনুভব করলাম।

সেও যেন আমার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। তার পরের ঘটনা আগেই আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছি।

এর পর প্রায় দু'বছর মেয়েটির সঙ্গে বসবাস করলাম।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলল, এই ব্যাপারটাকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে মানুষ সচেতন মনে যাকে

সব থেকে বেশি অগ্রাহ্য বা অবহেলা করে, তার মনের অবচেতন স্তরে তার প্রতি এক সুপ্ত আকর্ষণ থেকেই যায়। সেই আকর্ষণ প্রতিরূপ হয়ে অবচেতন মনের স্তর পার হয়ে চেতন মনের দরজায় এসে আঘাত করে কোনো এক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে।

গল্পের শেষে শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলল, এই ঘটনার পরে তুমি নিশ্চয়ই অলৌকিক তত্ত্বে বিশ্বাস করবে, আর যদি না কর তাহলে বুঝব তুমি একটি নির্বোধ।

দুই তরুণ সৈনিক
Two Young Soldiers

ওরা প্রত্যেক রবিবারে এখানে এসে উপস্থিত হত। ব্যারাক থেকে বেরিয়ে, শহরের শেষ প্রান্তে যে সেন নামের একটা নদী ছিল, সেই নদীর সেতু পেরিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে এসে জঙ্গলের ধারে এই জায়গাটায় ওরা বসত। এর পর ওরা যে সমস্ত খাবারদাবার সঙ্গে করে নিয়ে আসত, সেগুলো খেত নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে।

এই সৈনিক দুজনের বাড়ি ছিল ব্রেঁতোতে। ওরা যখন মাঠ পার হয়ে নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেত, তখন ওদের নিজেদের গ্রাম, নিজেদের বাড়ি এবং আত্মীয়পরিজনের কথা মনে পড়ে যেত।

সেন নদীর অন্য পারে যে দোকানটা ছিল, সেখান থেকে ওরা রুটি আর মদ কিনে নিত। এর পর আবার তারা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। সবুজ ফসলে ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে পায়ে চলার যে সরু পথটা বেরিয়ে গেছে—সেই পথ দিয়ে চলতে চলতে ওরা সবুজের সমৃদ্ধি দুচোখ ভরে উপভোগ করত, তাতে তাদের মন আনন্দ ভরে উঠত, হারিয়ে যেত সেই সব ছেলেবেলার দিনগুলোতে।

এর পর মাঠ পার হয়ে তারা জঙ্গলের ধারে ওই গাছের নীচে এসে বসত।

সে সময় গাঁয়ের এক চাষির তরুণী মেয়েটি গরু চরাতে আসত সেই মাঠের ধারে। কালোকোলো স্বাস্থ্যবতী চাষি মেয়েটির সরল সুন্দর চালচলন আর ভাবভঙ্গি দেখে ওদের গাঁয়ের চাষিদের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে যেত। তারা ওই মেয়েটিকে দেখত দুচোখ ভরে। তাতে তাদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে যেত আর পুরোনো দিনের স্মৃতির আনন্দে তাদের বুক ভরে উঠত।

মেয়েটি একটা টিনের পাত্র হাতে করে নিয়ে আসত। সে গোরু দুইয়ে সেই পাত্রটা ভরে ওদের কাছে নিয়ে আসত এবং সেই দুধ খাওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করত। সেই অনুরোধে মিশে থাকত সরল আন্তরিকতা। সেই পাত্র থেকে এক বন্ধু অর্ধেক খেয়ে বাকিটা অন্য বন্ধুর হাতে তুলে দিত।

কোনো কোনো দিন ওদের সঙ্গের খাবার খাওয়া শেষ হলে চাষির মেয়েটি এসে হাজির হত। আবার যেদিন মেয়েটি ওদের খাওয়ার আগে আসত, সেদিন ওদের নিজেদের খাবার থেকে খানিকটা মেয়েটিকে দিয়ে সেটা খাওয়ার জন্য মেয়েটিকে বলত।

মেয়েটি এসে গাছের তলায় সরল ভঙ্গিতে ওদের সামনে বসে সহজভাবে খোলা মনে কত না গল্প করত। দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্না, সুখদুঃখের কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সে কথা বলত।

প্রত্যেক রবিবার ওরা নিয়ম করে সেখানে যেত। আর এটাকে তারা অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিল। সরল গ্রাম্য চাষি মেয়েটির মুখের পবিত্র সুন্দর হাসি দেখার জন্য ওরা তার জন্য কিছু জিনিস কেনার কথা ভাবল। তাই এক রবিবার যাওয়ার সময় তারা তার জন্য কিছু লজেন্স কিনে নিয়ে গেল।

ওরা সেই গাছের ছায়ায় বসে যথাসময়ে বুটি আর মদ খেল আর নিজেদের ভাগ থেকে মেয়েটির জন্য কিছু রেখে দিল। মেয়েটি তখনও পর্যন্ত সেখানে এসে পৌঁছোয়নি। এক বন্ধু খানিকটা দূর থেকে তাকে আসতে দেখে বলল, ওই দেখ, মেয়েটি আসছে। মেয়েটি রোজ একটি গোরু নিয়েই চরাতে আসত।

তাদের সামনে এসে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, তোমরা ভালো আছ তো?

ওরা বলল, আমরা ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

সে সরল সুন্দর হেসে উত্তর দিল, আমিও ভালো আছি।

এক বন্ধু বলল, এই দেখো তোমার জন্য কী এনেছি। মেয়েটির হাতে লজেন্সগুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কী আনন্দ। সে তখনই একটা লজেন্স মুখে পুরে দিয়ে গালের এপাশ-ওপাশ করে চুষতে লাগল। খুশি, আনন্দ তার দুচোখ দিয়ে যেন উপচে পড়তে লাগল।

অন্যান্য কাজের দিনে ওরা যেটুকু অবসর পেত ব্যারাকের মধ্যে বসেই ওরা দুজনে গল্পগুজব করত। কখনও ওরা একজন অপরজনকে ছেড়ে থাকত না, কিন্তু কোনো এক বুধবার এক বন্ধু ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বাইরে যাবার জন্য অন্য বন্ধুটির কাছে সম্মতি চাইল। পরের সপ্তাহে ঠিক সেই একই দিনে সে তার বন্ধুর সম্মতি নিয়ে বাইরে বেরোল। বন্ধু যে একা একা কোথায় যায় কী করে, তার কিছুই জানতে পারল না অন্য বন্ধুটি। সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সে দ্বিধা বোধ করত। কারণ তার মনে হল, বন্ধু যখন তার কাছ থেকে ব্যাপারটাকে আড়াল করতে চাইছে তখন সেটা জানার জন্য তাকে জোর না করাই ভালো।

অন্যান্য রবিবারের মতো পরের রবিবারও তারা যথারীতি সেই গাছের নীচে গিয়ে বসল। কিন্তু এক বন্ধু সেদিন একটা ব্যাপার দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। সে দেখল মেয়েটি সোজা এগিয়ে এসে কোনো দিকে না তাকিয়ে অন্য বন্ধুটিকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো তার ঠোঁটে গালে চুমু খেয়ে চলেছে। এই বন্ধুটিই বৃহস্পতিবার ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ব্যারাকের বাইরে একা একা বেরিয়ে আসত।

বন্ধুটি অবাক হয়ে তাদের কীর্তিকলাপ দেখছিল। ওরা পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল পাগলের মতো। তারপর বন্ধুর দিকে দৃক্‌পাত না করেই অন্য বন্ধুটি চাষি মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেল। বন্ধুটি কিছু দূর পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করল। তারপর দেখল তারা গাছপালা ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে গেল। বন্ধুটি তাদের আর অনুসরণ না করে ফিরে এসে তার নিজের জায়গায় বসল। বেশ কিছুক্ষণ পরে অন্য বন্ধুটি চাষি মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। এরপর মেয়েটি সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে

রহস্যময় একটু হাসি হেসে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। মেয়েটি চলে যাবার পর দুই বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। বন্ধুটির কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। অন্য বন্ধুটির মুখের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল, একটু আগে মেয়েটিকে নিয়ে সে যা করেছে এবং তার ফলে তার মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার স্পষ্ট ছাপ।

শেষ পর্যন্ত তারা সেখা থেকে উঠে তাদের ব্যারাকের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তখন তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন অপরিচিত দুজন মানুষ। কেউ কাউকে চেনে না। সেন নদীর সেতুর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল এক বন্ধু যার নাম জাঁ। জাঁ নদীর জলের দিকে তাকিয়ে এক মনে কী যেন ভেবে চলেছিল। কিন্তু যে বন্ধুটি চাষি মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলের আড়ালে চলে গিয়েছিল এবং তার শরীরটাকে যথেচ্ছভাবে ভোগ করেছিল, তার নাম লুক। সেই মুহূর্তে, জাঁ অন্যমনস্ক হয়ে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে এত কী দেখছে বা ভাবছে— তা জিজ্ঞেস করার বা জানার সাহস হল না লুকের। হঠাৎ লুক লক্ষ করল জাঁ-এর মাথাটা রেলিং ওপরে অনেকটা নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। একদৃষ্টিতে একইভাবে সে জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ জাঁ রেলিংএর ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ল নদীর জলে এবং মুহূর্তের মধ্যে তার দেহটা তলিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তার দেহটা স্রোতের টানে হাবুডুবু খেতে খেতে একবার যেন ভেসে উঠে আবার তলিয়ে গেল।

জলে ভেজা চোখ দুটো নিয়ে কান্নাজড়ানো করুণস্বরে ব্যারাকের সহকর্মীদের কাছে ঘটনাটা বলল লুক।

সংশয়াত্মক সুখ
Doubtful Happiness

যে স্থান এবং মানুষটাকে নিয়ে আমার এই গল্প, তাদের নাম আমি জানি না। সুতরাং তা উল্লেখ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে জায়গাটা ছিল এখান থেকে বহুদূর সমুদ্রের তীরবর্তী একটি অঞ্চলে। সেদিন সকাল হতেই আমি সূর্যের তাপে গরম হয়ে ওঠা সমুদ্রের ডান দিকের তীর ধরে সোনালি গমের খেতের মধ্য দিয়ে যে পায়ে চলা সরু পথটা চলে গেছে, সেই পথ দিয়ে আমি একবারের জন্যও না থেমে বেশ জোর পায়ে হেঁটে চলেছিলাম।

ওই এলাকার একজন লোক আমায় বলেছিল, এই গমের খেত যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে কমলালেবুর বাগানের মধ্যে একটা ছোটো সুন্দর বাড়িতে এক ফরাসি ভদ্রলোক বাস করেন। আপনার সেখানে পৌঁছোতে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়, তাহলে আপনি সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে রাত্রিতে থেকে যেতে পারেন।

লোকটার কথায় দ্বিমত না করে আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভদ্রলোকের পরিচয় আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। তবে এটুকু জানতে পেরেছিলাম যে ভদ্রলোক বছর দশেক হল এখানে এসেছেন। এখানে আসার পরেই সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত জমি চাষের কাজের জন্য কিনে নেন। আর এই সমস্ত জমির উর্বরতা বাড়াতে আর তাতে ফসল ফলানোর জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে থাকেন। তিনি সমস্ত দিন ধরে চাষের কাজ দেখাশোনা করেন আর এই চাষের কাজেই তাঁর প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। অর্থোপার্জনের নেশায় তিনি মেতে ওঠেন এবং এই চাষের আয়েই একজন ধনী ব্যক্তি হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত হন।

সেদিনের কথা আমার এখনও মনে আছে। আমি যখন ওই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাড়িতে কে আছেন, বলে ডাকতেই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারার এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। রাতের মতো আশ্রয় চাইতেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। তারপর চাকরদের কী যেন নির্দেশ দিলেন।

খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতে আমরা গল্প করতে লাগলাম। তিনি বললেন, জায়গাটা বেশ ভালোই, তবে আত্মীয়পরিজন ছেড়ে এরকম একটা জায়গায় একা একা পড়ে থাকতে কারও ভালো লাগে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্বদেশ ফরাসি থেকে চলে এসে কি আপনার খুবই কষ্ট হয়?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্যারিস ছেড়ে আসার পর থেকে আমার আনন্দ শান্তি সব যেন হারিয়ে গেছে।

আমি বললাম, আপনি তো মাঝে মাঝে প্যারিসে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে পারেন।

তিনি বললেন, মাঝে মাঝে নয়, আবার সেখানে ফিরে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। তিনি প্যারিসের অনেক খবর নিলেন। কয়েকজন পুরুষ ও নারীর নাম উল্লেখ করে তাদের কথা জানতে চাইলেন।

আমি বললাম, আপনি যেসব পুরুষদের কথা জানতে চাইছেন আমি তাদের চিনি না। তবে মেয়েদের মধ্যে সুজান বার্নার আর অ্যাস্তিয়ের সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাচ্ছে আর সোফি মারা গেছে।

এর পর তিনি আমাকে ভিতরের একটা বড়ো ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই সামনের দেয়ালে দুটো বন্দুক টাঙানো আছে দেখতে পেলাম। ঘরের বাঁ দিকের একটা কোণে চায়ের কিছু যন্ত্রপাতি জড়ো করে রাখা রয়েছে। এর পর তিনি আমাকে অন্য আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম সমস্ত ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর আঁকা অনেকগুলো বাঁধাই করা বেশ বড়ো আকারের সুন্দর সুন্দর ছবি। সেগুলোর শৈল্পিক ব্যঞ্জনা অসাধারণ। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় প্রতিকৃতিগুলো একেবারে জীবন্ত। ওই ঘরে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম। ঘরের মাঝখানে একটি সোনার বাক্স, ঢাকনা খোলা অবস্থাতে রাখা আছে। দেখলাম তার মধ্যে এক গাছা লম্বা চুল একটুকরো রেশমি কাপড়ের সঙ্গে একটা পিন দিয়ে আটকানো। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, এই পিনটির সঙ্গে আমার জীবনের আনন্দ বিষাদে ভরা এমন এক স্মৃতি জড়িয়ে আছে—যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার জীবনের সমস্ত অস্তিত্বই আমি ওই পিনটির মধ্যে খুঁজে পাই। গত দশ বছর ধরে প্রতিদিন আমি ওই পিনটিকে একবার করে দেখি। ওটা না দেখতে পেলে মনে হয় আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমি বললাম, মনে হয় কোনো নারীর দ্বারা আপনি এত বেশি প্রভাবিত হয়েছেন যা আপনার জীবনকে দুঃখ যন্ত্রণায় একেবারে জর্জরিত করে তুলেছে।

কথা বলতে বলতে আমরা ঘরের সামনের টানা বারান্দাটায় এসে দাঁড়ালাম। দোতলার সেই বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম বাড়ি থেকে সামান্য কিছু দূরে দুই উপসাগরের মাঝখানে একটা খাড়াই পাহাড় তার সমস্ত ঐতিহ্যের গৌরব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের শেষ অস্তরাগ তখন সমস্ত প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে আবিরের রং। বাড়ির চারিদিক ঘিরে যে কমলালেবুর গাছগুলো ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে, তাতে কুঁড়ি ধরেছে। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে আসছিল লেবুফুলের সুগন্ধ। মন উদাস করা সেই গন্ধে নিজের সমস্ত সত্ত্বা যেন কোনো এক অজানা লোকে হারিয়ে যেতে চায়।

ভদ্রলোক এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, "জিয়োন দ্য লিমোসের কোনো খবর জানেন? তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? আপনি তাঁকে চেনেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, ভালো করেই চিনি। প্যারিসের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। মানুষ তার অতুলনীয় সৌন্দর্যের মোহে মুগ্ধ। রাজমহিষীদের মতো বিত্তবৈভব ও বিলাসের মধ্যে

জীবন অতিবাহিত করেন।''

ভদ্রলোক বললেন, ''ওকে আমি সমস্ত জীবন দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। তার প্রতি আমার সেই ভালোবাসা আজও অম্লান হয়ে আছে। আমি তিন বছর ওর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটিয়েছিলাম। এই তিন বছরের মধ্যে ওকে আমি বেশ কয়েকবার হত্যা করার চেষ্টা করি আর তার প্রতিশোধ নিতে সে ওই পিনটা চোখে বিঁধিয়ে দিয়ে আমাকে অন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে। আমার চোখ দুটো তার ওই পিনের আক্রমণে অন্ধ না হয়ে গেলেও তার সাক্ষ্য রেখে গেছে আমার চোখের পাতার ওপর। এটাকে আমার ভালোবাসার ক্ষতচিহ্ন বলতে পারেন। সাধারণত আমরা দু'ধরনের প্রেমের কথা বলি। এক ধরনের প্রেম হল সহজ, সরল সাদামাঠা। এই প্রেমে মনের দিক থেকে প্রেমিক প্রেমিকার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য ধরনের প্রেম হল ভয়ংকর এবং এতে প্রেমিক প্রেমিকার মানসিক স্তরে কোনো সাযুজ্য, সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ থাকে না এবং তারা ভালোবাসার আবেগে ক্ষতবিক্ষত বা দগ্ধ হয় না। বিরহের যন্ত্রণায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। তবুও একজন অন্যজনকে ছেড়ে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারে না। এই তিন বছরের মধ্যে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস ব্যাসন আর আনন্দের জন্য আমার চল্লিশ লক্ষ ফ্রাঁ খরচ হয়ে গেছে। সে যে কী এক অসাধারণ চুম্বক আকর্ষণে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, কী এক নিদারুণ মোহে আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তা ব্যক্ত বা বর্ণনা করা আমার সাধ্যের বাইরে। ওকে যতই দেখতাম, ততই ওকে দেখার ইচ্ছা আমার তীব্রতর হয়ে উঠত। তবে ওর ওই উষ্ণ পেলব শরীর ভোগ করে আমার দেহমন সমস্ত সত্ত্বা এক অসাধারণ তৃপ্তিতে ভরে উঠত। যত ওকে ভোগ করতাম, ভোগের স্পৃহা ততই বেড়ে যেত। প্রথম দিকে আমার ধারণা ছিল, সমস্ত নারী-অন্তরকে বুঝি ঠিকভাবে বোঝা বা জানা যায়, তাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারলে বুঝি তাদের মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ওর সঙ্গে মিশে আমি বুঝতে পারলাম নারীর মন কতটা দুর্জ্ঞেয়, কতটা রহস্যময় হতে পারে। অনেক চেষ্টা করেও ওই নারীর মনের অতল রহস্যের সন্ধান আমি কোনো দিনই পাইনি।

ওর মতো নারীর সংস্পর্শে আমি জীবনে কখনও আসিনি। ওকে সঙ্গে নিয়ে যখন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম তখন আমি যে একটা মানুষ তার পাশে পাশে হাঁটছি—তা যেন পথচারীরা ভুলেই যেত। গভীর আকাঙ্ক্ষা আর উদগ্র কামনা নিয়ে পুরুষরা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। কেবলই আমার মনে হত শুধু আমাকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য, আমাকে আনন্দ দেবার জন্য ওর বেঁচে থাকা নয়, ও সকলের মনোহারিণী হয়ে সকলের আনন্দের সকলের কামনার রসদ জোগায়। আমার কেবলই মনে হত, ওকে আমি পরিপূর্ণরূপে লাভ করতে পারিনি, কোথাও যেন অনেকটাই ব্যবধান রয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত ভয়, একটা অদ্ভুত শঙ্কা যেন দিবারাত্র আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

তখন সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে সমস্ত প্রকৃতির বুকে। শান্ত বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল লেবুফুলের সুগন্ধে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবার তার সঙ্গে মিলিত হতে চান?

ভদ্রলোক বললেন, কে বলে চাই না? আজও সে আমার প্রিয়তম, অন্তরের গভীর ভালোবাসা তাকে ঘিরে আজও প্রতীক্ষায় দিন গোণে। আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে তার জন্য এই নির্জনে এসে বসবাস করছি এবং এই দশ বছর অসম্ভব পরিশ্রম করে সঞ্চয় করেছি মাত্র আট লক্ষ ফ্রাঁ। এটাই যথেষ্ট নয়—আরও দুলক্ষ সঞ্চয় করতে পারলে দশ লক্ষ ফ্রাঁ নিয়ে আমি আবার তার কাছে ফিরে যাব। অন্তত একটা বছর তার সাহচর্যে, তার সান্নিধ্যে তার উষ্ম শরীরের স্পর্শে থেকে অপার আনন্দ তৃপ্তিতে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে পারব।

তারপরে তিনি কী করবেন—এই জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, তারপর?

ভদ্রলোক বললেন, তারপর! বলব, তোমার ভৃত্য হয়ে তোমার সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য কোরো।

আদালত কক্ষে
In The Court Room

জর্জভিলের আদালত-ঘরটা চাষি সম্প্রদায়ের লোকেদের ভিড়ে উপচে পড়েছে। তারা সেশন শুরু হবার অপেক্ষায় আদালত-ঘরের দেয়াল ঘেঁসে সারি দিয়ে বসে আছে।

শেষ পর্যন্ত জজসাহেব এসে আদালত ঘরে প্রবেশ করলেন। আদালতে জজিয়াতি করলেও তিনি একজন পণ্ডিত এবং উদার মনের মানুষ। যাঁরা হোরেস অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি ভলটেয়ারের লেখা ছোটো ছোটো কবিতাগুলোও পড়েছেন।

তিনি তাঁর আসনে বসার কিছুক্ষণের মধ্যে কোর্টের কেরানি বাদি ও বিবাদী পক্ষের লোকদের নাম ধরে ডাকল।

"ম্যাডাম ভিক্টোরি বাসকিউল বনাম ইসিডোরপাতুরোঁ।" ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল চেহারার একজন মহিলা এগিয়ে এল। মফস্‌সল শহর ক্যান্টনে তার নিবাস। মাথায় ছিল চ্যাটালো একটা টুপি, বুকে ঝোলানো ছিল চেনে বাঁধা একটা ঘড়ি। আঙটি পরতে কোনো আঙুল বাদ দেয়নি। তার কানের মুক্তার দুল দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল।

জজসাহেব পরিচিতির দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রসিকতার সুরে বললেন, ম্যাডাম বাসকিউল, আপনার কি অভিযোগ সেটা বলুন।

বিবাদী পক্ষের লোকেরা অন্য একদিকে দাঁড়িয়েছিল, তারা ছিল তিনজন। তাদের মধ্যে বছরপঁচিশের একজন যুবক চাষি, তার ডান দিকে দাঁড়িয়েছিল তার বউ। তার গোল গোল চোখ দুটোতে ছিল ক্রোধ আর বিস্ময়। সে ত্যরচা চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। যুবক চাষিটির বাঁ দিকে বসেছিল তার ন্যুব্জ দেহের বৃদ্ধ পিতা। বৃদ্ধের শরীরটা বয়সের ভারে বেঁকে গিয়েছিল।

ম্যাডাম বাসকিউল জজকে বলতে লাগল, হুজুর, আমি পনেরো বছর ধরে এই যুবকটিকে আদরযত্নে লালনপালন করেছি। আমি তাকে দিয়েছি মায়ের স্নেহ আর ভালোবাসা, আমি তার জন্য সব কিছুই করেছি। আমি তাকে মানুষ করে তুলেছি। সে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, শপথ করে বলেছিল, সে আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না এবং সেই মর্মে সে আইনসম্মত শপথ নিয়েছিল। তার জন্য আমি তাকে ছ'হাজার ফ্রাঁ মূল্যের সামান্য কিছু সম্পত্তি দান করেছি। বেক-দ্য-মরটিন-এ আমার যে একটুকরো জমি আছে—সেটাই ওকে দান করেছিলাম। কিন্তু হুজুর, এই বদমাশ ছোকরা তার কথা রাখেনি।

তখন জজসাহেব বললেন, "আপনার ভাষাকে সংযত করুন, ম্যাডাম বাসকিউল।"

ম্যাডাম বাসকিউল তখন বললেন, হুজুর সে তার প্রতিজ্ঞা ভেঙে এই মেয়েটিকে বিয়ে করল। এই নির্বোধ পশুটা তার স্ত্রীকে আমার দেওয়া সম্পত্তি দান করে দিল।

আমার শর্তে রাজি হয়ে যে চুক্তিপত্রে ও সই করেছিল—সেটা আমার কাছে আছে। এই দেখুন হুজুর। এই বলে সে স্ট্যাম্প লাগানো একখানি কাগজ জজের হাতে দিল।

ইসিডোর পাতুরোঁ তখন বলল, মিথ্যে কথা হুজুর।

জজসাহেব বললেন, তুমি চুপ কর। তোমার সময় এলে তুমি বলবে। এর পর জজসাহেব সেই চুক্তিপত্রখানা পড়তে লাগলেন, "আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী, ইসিদোর পাতুরোঁ, এই মর্মে আমার হিতকারিণী ম্যাডাম বাসকিউলের নিকট প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইতেছি যে আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তাঁকে ত্যাগ করিয়া যাইব না এবং আজীবন তাঁকে যথাবিহিত ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে আন্তরিকভাবে তাঁর সেবা করিয়া যাইব।

জর্জ ভিল, আগস্ট ৫, ১৮৮৩।"

কাগজটা পড়ে জজসাহেব বললেন, কাগজের নীচে স্বাক্ষরের জায়গায় একটা ক্রুশচিহ্ন দেওয়া রয়েছে। তিনি এবার ইসিডোরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি কি সই করতে জানো না?

ইসিডোর বলল, "না, হুজুর।"

জজ বললেন, "তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ক্রুশ চিহ্নটা এঁকেছো।"

ইসিডোর বলল, "না, হুজুর ওটা আমার আঁকা নয়।"

জজ বললেন, "তাহলে কে করেছে ওটা?"

ইসিডোর : ওই মহিলা নিজেই ওই ক্রুশ চিহ্নটা এঁকেছে।

জজ তখন বললেন, "তুমি শপথ করে বলতে পারবে, ওটা তোমার আঁকা নয়?"

ইসিডোর তখন একান্ত আন্তরিকভাবে বলল, "আমি আমার বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা এবং যিনি আমার সমস্ত কথা শুনতে পাচ্ছেন, সেই ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ওই ক্রুশ চিহ্নটা আমার আঁকা নয়।"

জজসাহেব অল্প হেসে বললেন, "তোমার সঙ্গে ম্যাডাম বাসকিউলের কী ধরনের সম্পর্ক ছিল?"

ইসিডোর বলল, "আমি আমার সাহচর্যে ওকে আনন্দ দিতাম।"

জজ বললেন, "তুমি যেভাবে কথা বলছ, তাতে অন্যরকম মানে দাঁড়ায়। তোমার সঙ্গে ম্যাডাম বাসকিউলের মা ছেলের সম্পর্ক আছে বলে তিনি যে ভাব দেখাচ্ছেন তা যে সত্যি নয়, সেই কথাই কি তুমি বলতে চাইছ?"

ইসিডোরের বৃদ্ধ পিতা তখন বলল, "হুজুর, আমার ছেলের বয়স এখনও পনেরো বছর হয়নি আর ওই বয়স হওয়ার আগেই ওই মহিলা আমার ছেলেটাকে খারাপ করে।

জজ বললেন, 'খারাপ করে',—মানে কী বলতে চাইছ?

বৃদ্ধ পাতুরোঁ তখন বলল, হুজুর, আমি যা বলেছি, তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনাকে বলেছি, ওর তখন পনেরো বছর পূর্ণ হয়নি। তার বছর চারেক আগে থেকেই ওকে আদরযত্নে লালনপালন করে। তারপর যথাসময়ে ওর শরীরে যখন যৌবন আসে তখন ওই মহিলা ওকে নরকের পথে টেনে নিয়ে যায়।

বিচারক : নরকের পথে নিয়ে গেল আর তুমি সেটা মেনে নিলে?

পাতুরোঁ : তখন অতটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

বিচারক : তাহলে তোমার অভিযোগ করারই বা কী আছে?

পাতুরোঁ : না, আমি কোনো কিছুই অভিযোগ করছি না। আমার ছেলেকে ওই মহিলার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি।

ম্যাডাম বাসকিউল : ওই লোকগুলো আপনাকে মিথ্যে কথা বলে আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি সত্যিই ওকে একজন মানুষের মতো মানুষ করে তুলেছি।

জজ : বুঝেছি!

ম্যাডাম বাসকিউল : হুজুর, সমস্ত কথা ওই ছেলেটা এখন অস্বীকার করছে। আমাকে তো ও ত্যাগ করেইছে, আমার সম্পত্তিটাও জোর করে দখল করেছে।

ইসিডোর : হুজুর, ওর কোনো কথাই সত্যি নয়। আমি ওকে পাঁচ বছর আগেই ছেড়ে চলে আসতে চেয়েছিলাম। দিনকে দিন ও এত মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখে আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগল, কেন তা বলতে পারব না। আমি যখন তাকে বললাম, আমি ওকে ছেড়ে বরাবরের মতো চলে যাচ্ছি, তখন ও কাঁদতে লাগল এবং বেক-দ্য-মরটিন-এ ওর যে সম্পত্তিটুকু আছে সেটা আমাকে দান করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। ও তার জন্য একটা শর্ত দিল যে আমাকে ওর সঙ্গে আরও কয়েক বছর কাটাতে হবে। আমি ওর কথায় রাজি হয়ে গেলাম। এর পর, আমি দীর্ঘ পাঁচ-পাঁচটা বছরের প্রতিটি অনু, পল, মুহূর্ত তার সঙ্গে কাটিয়েছি এবং তার দেখাশোনা বা সেবা যত্ন করেছি। তারপর আমি ওকে ছেড়ে চলে আসি। আমি মনে করি, আমি ওর জন্য যা করেছি, যথেষ্টই করেছি। আমি আজ মুক্ত—আমার ওপর ওর আজ আর কোনো দাবি নেই।

বৃদ্ধ পাতুরোঁ মাথা উঁচু করে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের স্বরে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ইসিডোর তার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়েছে। তাই আজ সে স্বাধীন, মুক্ত। ওর উপর ওই মহিলার সমস্ত অধিকার শেষ হয়ে গেছে।

ওদের কথা শুনে ম্যাডাম বাসকিউল তার আসনে বসে কাঁদতে লাগল।

জজসাহেব তখন পিতৃসুলভ স্বরে বললেন, ম্যাডাম বাসকিউল, আপনি কী আশা করেন? আমার কিছু করার নেই। আপনি আইনসঙ্গতভাবে আপনার সম্পত্তি দান করে দিয়েছেন। এখন ওই সম্পত্তির মালিক ইসিডোর। ওই সম্পত্তিতে ওর পূর্ণ অধিকার আছে এবং সে সম্পত্তি সে তার নিজের ইচ্ছামতো উপহার হিসাবে তার স্ত্রীকে দান করতে পারে। আমি কোনো সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমি ব্যাপারটার আইনগত বিষয়গুলো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি—এই পর্যন্ত, তা ছাড়া আমার অন্য কিছু করার নেই।

বৃদ্ধ পাতুরোঁ রূঢ়স্বরে বলল, তাহলে আমি এখন বাড়ি ফিরে যেতে পারি?

জজ বললেন, নিশ্চয়ই।

তখনও ম্যাডাম বাসকিউল কেঁদে চলেছিল।

জজ তখন বললেন, ডিয়ার ম্যাডাম, এখন বাড়ি ফিরে যাও। যদি আমার পরামর্শ শোনো, তাহলে বলব তুমি অন্য আর একজনকে খুঁজে নাও।

ম্যাডাম বাসকিউল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি আর কাউকে পাচ্ছি না।

জজ বললেন, এমন কারও কথা যে তোমাকে বলে দেব, তেমন একজন লোকের কথাও আমার মনে পড়ছে না।

ম্যাডাম বাসকিউল তখন আর একটিও কথা না বলে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটার দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে আদালত থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল।

জজ বললেন, ইউলিসিস চলে গেলে ক্যালিপসোকে সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ ছিল না, তারপর কেরানির দিকে ফিরে বললেন, এর পর কার মামলা আছে?

কেরানি হাঁক পাড়ল, সেলেস্টিন পোলাইট লেকাশোর বনাম প্রস্পার ম্যাগলোরি ডেলাফেট—।

পরিত্রাণ
The Saved

জানালা দিয়ে ছুটে আসা একটা বলের মতো ছুটে এল মার্কুইসপত্নী। সে হাসছিল এবং হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। সে ব্যারনপত্নীর ঘরে ঢুকে অতি কষ্টে হাসি চেপে বলল, সে তার স্বামী মার্কুইসের সঙ্গে বেইমানি করেছে এবং তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

গ্রাঞ্জেরির ব্যারনপত্নী একটা বই পড়ছিল। সে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অ্যানেট-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার তুমি এত হাসছ কেন? নিশ্চয় কিছু করেছ?"

"হ্যাঁ, বেশ একটা মজার কাজ করেছি। আর তার জন্য আমি পুরোপুরি রেহাই পেয়ে গেছি।"

"তুমি রেহাই পেয়ে গেছ—মানে কী বলতে চাইছ?"

"হ্যাঁ, একেবারে রেহাই পেয়ে গেছি, আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন।"

"কীসের থেকে মুক্ত?"

"হে বন্ধু, আমার স্বামীর হাত থেকে।"

"কীভাবে মুক্ত হয়েছ, কীভাবে রেহাই পেয়েছ?"

"কীভাবে রেহাই পেয়েছি? আমি স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছি।"

"ডিভোর্সের আইনগত কাজকর্ম কি সম্পূর্ণ হয়েছে?"

"না, এখনও হয়নি। তুমি আচ্ছা বোকা তো! তিন ঘণ্টার মধ্যে কারও কি ডিভোর্স হয়? কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে যে সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং ওই কাজ করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে।"

"সে তোমাকে কীভাবে ঠকিয়েছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমায় খুলে বল।"

"সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে আর সেটাই আসল।"

"তুমি কীভাবে ম্যানেজ করলে?"

"আমি কীভাবে ম্যানেজ করলাম! শোনো তাহলে, গত তিন মাস ধরে সে আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল, সে আমার সঙ্গে বর্বরের মতো ব্যবহার করতে শুরু করল। সুতরাং আমি নিজেকে বললাম, এমনভাবে কিছুতেই চলতে পারে না, সুতরাং তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি তাকে ডিভোর্স দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু কীভাবে? কারণ ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না। সে যাতে আমাকে মারধোর করে সেজন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সে আমাকে আঘাত করল না। সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সবসময় আমায় বিরক্ত করত। আমার কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা না হলে সে আমাকে সেখানে যেতে বাধ্য করত। এছাড়াও আমার যখন খিদে পেত, তখন ডিনার করতে বাইরে বেরোতে চাইলে সে আমাকে

ঘরে থাকতে বাধ্য করত। অবস্থা অত্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠল। এর পর আমি খোঁজ নিতে লাগলাম ওর কোনো রক্ষিতা আছে কি না। অনেক খোঁজ করে জানলাম হ্যাঁ ওর একজন রক্ষিতা আছে। কিন্তু সে যখন তার কাছে যেত তখন হাজাররকমের সাবধানতা অবলম্বন করত। এর ফলে তাদের কখনও একসঙ্গে ধরা যেত না। তখন আমি কী করলাম জানো? আমি আমার ভাইকে দিয়ে পনেরো লুই খরচ করে সেই রক্ষিতার একখানি ছবি জোগাড় করলাম।

"রক্ষিতা মেয়েটাকে দেখতে দারুণ। আমি আমার ভাইএর কাছ থেকে মেয়েটির গায়ের রং, তার শরীরের গঠন, তার স্তন—ইত্যাদি অনেক খবর জানতে চাইলাম। আমার ভাই জ্যাকস আমাকে সবকিছু জানালে, আমি ক্লারিসের ছবিখানা নিয়ে এক মেয়েছেলের দালালের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তাকে ছবিখানা দেখিয়ে বললাম, এই ছবির মেয়েটির মতো দেখতে একটি ঝি দরকার, তাকে অবশ্যই সুন্দরী, মার্জিত, ভদ্র এবং বিনয়ী হতে হবে। এরজন্য সে যে টাকা চায় আমি দেব, প্রয়োজন হলে আমি তার জন্য দশ হাজার ফ্রাঁ খরচ করতে রাজি, তবে মাস তিনেকের বেশি তাকে প্রয়োজন হবে না।

"লোকটি আমাকে বলল, এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আপনার সুন্দরী ঝিকে পেয়ে যাবেন। কাজটা করে না দেওয়া পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে একটি পয়সাও চাইব না। আপনার স্বামীর রক্ষিতা?

"হ্যাঁ, মঁসিয়ে।"

"তিন দিন পরে একটি দীর্ঘকায়া সুন্দরী মেয়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। তাকে দেখতে সত্যি ভীষণ সুন্দর। আচার-আচরণ ভদ্র এবং মার্জিত। মেয়েটি আমার সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করল এবং যেহেতু তার নামটা জেনে নেওয়া হয়নি সেজন্য তাকে আমি ম্যাদময়জেল বলে ডাকতে শুরু করলাম। তখন সে বলল, "ম্যাডাম, আপনি আমাকে রোজ নামেই ডাকবেন।"

"এর পরে তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হল।

"রোজ, তুমি কীজন্য এখানে এসেছ, তা কি তুমি জান?"

"আমি অনুমান করতে পারি ম্যাডাম।"

"এবং এই কাজের জন্য নিশ্চয়ই তুমি মোটেই বিরক্ত হবে না!"

"মোটেই না ম্যাডাম, আমি ইতিমধ্যে গোটা আষ্টেক ডিভোর্স ঘটিয়েছি। এটা আমার পেশা।"

"এই কাজটা করতে তোমার কতদিন সময় লাগবে বলে মনে হয়?"

"সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার স্বামীর মেজাজ মর্জির ওপর। আমি তাঁকে মিনিট পাঁচেক দেখলেই বলে দিতে পারব।"

"তুমি তাকে শিগগিরই দেখতে পাবে। সে কিন্তু সুন্দর বা সুদর্শন নয়।"

"আমার কাছে ওটা কোনো ব্যাপার নয়। আমি বহু কুৎসিত পুরুষের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। কিন্তু ম্যাডাম, আপনি কি বলতে পারেন, আপনার স্বামীর সবথেকে প্রিয় পারফিউম কী?"

"হ্যাঁ, রোজ ভারবেনা।"

"ভালোই হল, ওই পারফিউমটা আমারও খুব ফেভারিট। আর একটা ব্যাপার আমাকে বলুন, আপনার স্বামীর রক্ষিতা যে অন্তর্বাস আর নাইটড্রেস ব্যবহার করে তা কি সিল্কের?"

"না, কেমব্রিক আর লেসের।"

"ঘণ্টাখানেক পরে আমার স্বামী বাড়ি ফিরে এসে রোজকে দেখতে পেল। রোজ কিন্তু তখনও তার চোখের দিকে তাকায়নি। সে মাথা নীচু করে বসেছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রোজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ওই মেয়েটি কে?"

"কেন? আমার নূতন ঝি!"

"তুমি ওকে কোত্থেকে পেলে?"

"ব্যারনেস ডি গ্রাঞ্জেরি আমার জন্য জোগাড় করে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"তোমার কাজের মেয়েটিকে বেশ সুন্দর দেখতে তো?"

"তোমার কি সেরকম মনে হচ্ছে?"

"একজন কাজের মেয়েকে যে এত সুন্দর দেখতে হতে পারে, সেটা ভাবাই যায় না।"

"ওর কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হল। সেদিন সন্ধেবেলায় রোজ আমাকে বলল, আমি হলফ করে বলতে পারি, পনেরো দিনের বেশি সময় নেব না। ইতিমধ্যেই ও আমার ফাঁদে পড়ে গেছে।"

"আহ্, তুমি একটু আধটু চেষ্টা করে দেখেছ নাকি?"

"না, ম্যাডাম, সে শুধু আমার নামটাই জিজ্ঞেস করেছে, যাতে সে আমার গলার স্বর কেমন, সেটা বুঝতে পারে।"

"সপ্তাহের শেষের দিকটাতে আমার স্বামী একেবারেই বাইরে বেরোত না বললেই চলে। দেখতাম সমস্ত বিকেলবেলাটা সে বাড়ির চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যেটা লক্ষ করলাম, সেটা হল, সে আমাকে বেরোনোর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিল। রোজকে নিয়ে যাতে সে সম্পূর্ণ মেতে থাকতে পারে সেই সুযোগ দিতে আমি প্রায় সমস্ত দিন বাড়ির বাইরে কাটিয়ে দিলাম।

"ন'দিনের দিন, রোজ যখন আমাকে বিবস্ত্র করছিল, তখন সামান্য ভীত স্বরে সে বলল, "ম্যাডাম, আজ সকালে একটা কাণ্ড ঘটেছে।"

"আমি রোজের কথা শুনে খুব অবাক হলাম। সে কথাগুলো যেভাবে বলল তাতে আমি তোতলাতে শুরু করলাম।

রোজ বলল, গত তিন দিন ধরে চুম্বন আলিঙ্গন করার জন্য আমাকে ভীষণ চাপ দিচ্ছে কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি শুরু হোক ম্যাডাম, আপনি আমাকে বলুন কখন আপনি আমাদের চুম্বন বা আলিঙ্গনরত অবস্থায় ধরতে চান।

"শেষ পর্যন্ত ওই ব্যাপারের জন্য বৃহস্পতিবারের দিনটা স্থির করা হল। ওই দিন ঠিক বেলা পাঁচটার সময় আমাদের শোয়ার ঘরের বিছানায় ওরা অশালীন কাজে যখন ব্যস্ত থাকবে তখন আমি হঠাৎ সেখানে ঢুকে ওদের হাতেনাতে ধরে ফেলব। আমি

সেসময়টা বাইরে থাকব এবং কয়েকজন সাক্ষী সঙ্গে করে নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ব।

"এই কথাটা বলার জন্য আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন, আমাদের ডাইভোর্সের জয় হোক।"

এই বলে মার্কুইস-পত্নী ব্যারনেসের ড্রইংরুমের মধ্যে আনন্দে নাচতে লাগল।

ব্যারনেস একটু চিন্তান্বিত স্বরে বলল, "আমাকে সেসময় যদি ডাকতে, তাহলে নিজের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পেতাম।"

অভিশপ্ত রুটি
The Accursed Bread

বৃদ্ধ তেইলি পুত্রভাগ্য থেকে বঞ্চিত। কিন্তু কন্যাভাগ্য থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেননি। তাঁর তিনটি মেয়ে। বড়ো মেয়ে অ্যানা, মেজো মেয়ে রোজ আর ছোটো মেয়ে ক্ল্যারা। বড়ো মেয়ে অ্যানার কথা নিয়ে সংসারে কোনো আলোচনা হয় না বললেই চলে। মেজো মেয়ে রোজ সতেরো পার করে আঠারোয় পড়েছে আর ছোটোমেয়ে পনেরো বছরের এক কিশোরী। তার সমস্ত শরীর জুড়ে ছড়িয়ে আছে রসের ভাণ্ডার। ওই বয়সের মেয়েদের সাধারণত যেমন চেহারা আর শরীর স্বাস্থ্য হয় তার থেকে অনেক বেশি সুপুষ্ট আর সুঠাম তার শরীরের আকার ও গঠন। তেইলির স্ত্রী বহুকাল আগে গত হয়েছে। সে এখন লেব্রুমতের বোতাম কারখানায় একজন ফোরম্যান।

এর মধ্যে এক দিন তেইলির বড়ো মেয়ে অ্যানা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে এক যুবককে বিয়ে করে। ব্যাপারটা যখন সে জানতে পারে তখন সে রাগে দিশাহারা হয়ে পড়ে। সেদিন থেকে সে মনে মনে অ্যানাকে ত্যাজ্য করেছিল। তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে তার ঘৃণা হত। কিন্তু লোকের মুখে মুখে যখন ছড়িয়ে পড়ল যে অ্যানা মঁসিয়ে দুঁবয়কে বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করছে এবং মঁসিয়ে দুঁবয় সরকারের বাণিজ্যবিষয়ক মামলার একজন খ্যাতনামা বিচারপতি, তখন সে-কথা জানতে পেরে তেইলির ক্রোধ তো প্রশমিত হলই, উপরন্তু সে মনে মনে বেশ খুশি হল।

তেইলির একটাই আক্ষেপ, সে তিরিশ বছর ধরে কাজ করে আসছে তবুও বছরে সে মাত্র পাঁচ ছ' হাজার ফ্রাঁর বেশি উপার্জন করতে পারেনি। ওই সামান্য উপার্জনে তার সংসারে শুধু খাওয়া-পরাটাই চলেছে এতদিন। এছাড়া ভালো কোনো আসবাবপত্র কিনে মনের মতো করে ঘর সাজাতে পারেনি, ভালো জামাকাপড় পরতে পারেনি, ভালোমন্দ খেতে পারেনি। সমস্ত জীবন ধরে মনের মধ্যে এই ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে বুড়ো তেইলি আজও বেঁচে আছে।

কিন্তু অ্যানার সংসারে কত উন্নতি, কত ভোগবিলাসের উপকরণ, কত ঐশ্বর্য, কত সমৃদ্ধি।

এইসব ভাবতে ভাবতে বুড়ো তেইলির দিন কাটে। এর মধ্যে এক দিন সকালে বিত্তশালী চাষি তুলার্ডের ছেলে এসে তেইলির মেজো মেয়ে রোজকে বিয়ে করার জন্য তাকে প্রস্তাব দিল। তেইলি তার প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হল। সে ভেবে দেখল তার মেয়ে ওই পরিবারে গিয়ে সুখে থাকবে। তার মতো দরিদ্র পিতার সংসারে থেকে মেয়েটাকে আর দুঃখ যন্ত্রণার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে না। সুতরাং তুলার্ডের ছেলের প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে সে এক মুহূর্ত দেরি করল না।

পাকা কথাবার্তার পর বিয়ের দিন স্থির করা হল। ঠিক হল বিয়ের ভোজ দেওয়া

হবে ম্যাডাম লুসার রেস্তোরায়।

এর মধ্যে এক দিন সকালে অ্যানা তার বাবার কাছে এসে উপস্থিত হল। সে তার বুড়ো বাবা তেইলির পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। রোজ ও ক্ল্যারাকেও জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তারাও তাদের দিদিকে কাঁদতে দেখে কাঁদতে লাগল। এক সময় কান্নার পর্ব শেষ হলে, তার বাবা তাকে কাছে ডেকে নিয়ে স্নেহের চুম্বন এঁকে দিল তার কপালে। বহুদিন পরে সে তার মেয়েকে ক্ষমা করল, ভুলে গেল সমস্ত পুরোনো কথা। এইভাবে সকলের আনন্দাশ্রুর মধ্য দিয়ে তারা আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল।

অ্যানা প্রস্তাব দিল, বিয়ের ভোজের অনুষ্ঠান হবে তাদের বাড়িতে। সে ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব তার, টাকাপয়সাও সে খরচ করবে। নিজের বোনের বিয়ে বলে কথা!

প্রথম দিকে তেইলি মৃদু আপত্তি করেছিল, কিন্তু অ্যানার জেদাজেদিতে তার আপত্তি ভেসে গেল।

তেইলি আর তার মেয়েরা খুব খুশি। কিন্তু ভাবনা শুরু হল তুলার্ড পরিবারকে নিয়ে। যদি তারা এই প্রস্তাবে রাজি না হয়।

রোজ বলল, তুলার্ডদের রাজি করানোর দায়িত্ব তার।

তুলার্ডরা যখন জানতে পারল মঁসিয়ে দুঁবয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠান করা হবে, তখন তারা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

বিয়ের কাজকর্ম মিটে গেলে, অ্যানা নবদম্পতি এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা অতি সামান্য। বর ও কনেপক্ষ মিলিয়ে মোট বারোজন। টেবিল চেয়ার পেতে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে বসার ঘরে। অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ঘরটাকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এবং বিভিন্ন পদের, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যবস্তুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাতাসে ছড়িয়ে থাকা মনোলোভা খাবারের গন্ধে খাদ্যরসিক অতিথিদের জিভগুলো লালাসিক্ত হয়ে উঠছিল। খেতে বসে সেই সমস্ত খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে অতিথিরা এক অসাধারণ তৃপ্তিমিশ্রিত অস্বস্তি অনুভব করল। কারণ জীবনে এই প্রথম তাদের এমন অপূর্ব খাদ্যবস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে।

গোটা বাড়ির পরিবেশটা এক অদ্ভুত থমথমে বাতাবরণে আচ্ছন্ন ছিল। ঘরে ঘরে মহামূল্যবান সমস্ত আসবাবপত্র। সুদৃশ্য খাবার টেবিলে মহার্ঘ সমস্ত খাদ্যবস্তুর আয়োজন দেখে তারা অবাক হয়ে গেল।

ফিলিপ নামের একটি যুবক তার মায়ের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। ওই এলাকার সকলে ফিলিপের কণ্ঠস্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ফিলিপের মা ফিলিপকে একটা গান গাইতে বলল।

ফিলিপ 'অভিশপ্ত রুটি' নামের গানটি গাইল। গানটিতে তিনটি স্তবক। ফিলিপ যখন প্রথম দুটি স্তবক গেয়ে শোনাল, তখন কেউ চোখের জল রোধ করতে পারল না। গানটিতে বলা হয়েছে, আহারের সংস্থান করে বেঁচে থাকতে গেলে সকলকে সৎ বা অসৎ যে-কোনো উপায় অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু ফিলিপ যখন তৃতীয় স্তবকটি

গাইল তখন অ্যানা আর সহ্য করতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গানটিতে বলা হয়েছে, ধার্মিক ব্যক্তিরা যেন অপমানের রুটি গলাধঃকরণ না করে। যে সমস্ত স্ত্রীলোক তাদের নৈতিকতা ও ধর্ম বিসর্জন দিয়ে, ভোগবিলাসের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে—তাদের ঘৃণ্য নারী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

গানটি অ্যানাকে সব থেকে বেশি দুঃখ দিল। অশ্রু বিসর্জন করতে করতে সে তার ভৃত্যদের মদ পরিবেশন করতে বলল অতিথিদের। তখনও অতিথিরা ফিলিপের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়ে চলেছিল। অপমানের রুটি গ্রহণ করার জন্য যেন তোমাদের ইচ্ছা না হয়।

সিঁধেল চোর
The Burglar

বারবি জোনে একটা হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে আমরা কথা বলছিলাম। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ আর্টিস্ট, আমার বন্ধুস্থানীয়।

চুরির প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। ওই প্রসঙ্গের জের টেনে সে আমাকে বলল, যে ঘটনার কথা তোমাকে আমি বলব, সেটা কি তুমি বিশ্বাস করবে?

"বিশ্বাস করি আর না করি, ঘটনাটা তো বল।"

"কিন্তু ব্যাপারটা তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে নাও হতে পারে কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। একমাত্র শিল্পীরা এ ধরনের কাহিনি শুনে অবাক হবে না। কাহিনিটা শুরু করার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার, হ্যাঁ, শিল্পীদের কথাই বলছিলাম, কারও সঙ্গে একবার রসিকতা শুরু করলে, চরম দুর্বিপাকের মধ্যেও সেই রসিকতা করার নেশাকে সংযত করা কঠিন হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে আর এ ব্যাপারটা শিল্পীদের অজানা নয়।"

"সেরিউল ছিল আমার বন্ধু। তবে তার আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। এক দিন আমরা সেরিউলের আমন্ত্রণ পেয়ে তার বাড়িতে ডিনার করতে গেলাম।

"আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার আর এক বন্ধু পঁয়তেভি। যাদের কথা বলছি তারা আজ আর কেউ বেঁচে নেই। তারা অর্থাৎ সেরিউল আর পঁয়তেভি।

"ডিনারের পরে আমরা সেদিন তিন বন্ধু মিলে আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিলাম। আমরা মাতাল হয়ে গেলেও, পঁয়তেভি মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। যখনকার ঘটনা ওটা তখন আমরা বয়সে তরুণ। যে ঘরটা স্টুডিয়োর জন্য ব্যবহার করা হত, তার পাশে একটা ফাঁকা ঘর ছিল। আমরা মেঝেতে শুয়ে নেশার ঘোরে আবোল-তাবোল বকে চলেছিলাম। চেয়ারের ওপর দুটো পা তুলে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে দু'একটা ঘটনা বলছিল। হঠাৎ তার কী মনে পড়ে যেতে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একটা ড্রয়ার খুলে ফেলল। বের করে আনল তার পোশাক আর কয়েকটা যন্ত্রপাতি। নিজের পরিধানের পোশাক খুলে সে সেই পোশাক পরল। তারপর ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের একজন সৈনিকের একপ্রস্ত পোশাক বার করে পঁয়তেভিকে পরতে দিল। কিন্তু সেই পোশাক পরতে সে রাজি হল না। তখন আমরা দুজনে তাকে চেপে ধরে জোর করে সেই পোশাক পরিয়ে দিলাম। আমিও পরে নিলাম অশ্বারোহী একজন সৈনিকের পোশাক। পোশাক পরার কাজ শেষ হলে সেরিউল আমাদের মিলিটারিদের মতো কিছুক্ষণ প্যারেড করতে বলল, তারপর সে চিৎকার করে বলল, সামরিক পোশাকে আমরা এখানে সত্যিকারের সৈনিক, সুতরাং এসো আমরা সৈনিকদের অনুকরণে মদ্যপান করি এবং নিজেদের আমরা সৈনিক বলে ভাবতে থাকি।

"এর পর সেরিউলের নির্দেশ মেনে আমরা প্রচুর মদ গিললাম। তারপর মাতাল সৈনিকদের মতো জড়ানো গলায় গান গাইতে শুরু করলাম সমবেত কণ্ঠে। অতটা মদ খেয়েও কিন্তু পঁয়তেভি তার স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি। সে হঠাৎ একটা হাত তুলে ফিশফিশ করে বলল, তোমরা সবাই চুপ করো। মনে হচ্ছে কেউ যেন স্টুডিয়োর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পায়ের শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোমরা শুনতে পাচ্ছ না?

"সেরিউল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বন্ধুগণ, তোমরা নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে তৈরি হও।" সে তখন নেশার ঘোরে অল্প অল্প টলছিল।

"সেরিউলের নির্দেশ মেনে, দেয়ালের গায়ে যেসব অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল তার মধ্য থেকে সামরিক পোশাকের মর্যাদা অনুযায়ী যে যার মতো অস্ত্র নামিয়ে নিল।

আমি নিলাম একটা ম্যাসকট আর একখানা তরোয়াল। পঁয়তেভি নিল বেয়নেটযুক্ত একটা বন্দুক আর নিজের জন্য কোন্‌টা উপযুক্ত হবে সেটা ঠিক করতে না পেরে সেরিউল একটা পিস্তল নামিয়ে নিয়ে বেল্টের মধ্যে গুঁজে রাখল। এর পর একটা কুড়ুল হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেল স্টুডিওর দরজাটার দিকে। তারপর এক ঝটকায় দরজাটা খুলে স্টুডিয়োর মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। আমরাও তার পিছন পিছন গিয়ে ঘরে ঢুকলাম। মিনিট কুড়ি ধরে আমরা স্টুডিয়ো ঘরটি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম। কিন্তু কোথাও কিছু নজরে পড়ল না। এর পর পঁয়তেভি দরজার পাশে যে কুলুঙ্গি মতো একটা জায়গা ছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু কুলুঙ্গিটার কাছটা ভীষণ অন্ধকার। আমি সেই হেতু একটা মোমবাতি ধরিয়ে সেরিউলকে অনুসরণ করলাম। কুলুঙ্গির ভিতরটা উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েই আমি চমকে উঠে বেশ খানিকটা পিছিয়ে এলাম। দেখলাম, একটা লোক তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। এর পর তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এলাম বন্ধুদের কাছে এবং তাদের কাছে সবকিছু খুলে বললাম।

"চোরটাকে নিয়ে কী করা হবে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে জোর আলোচনা শুরু হল। সেরিউল বলল, "ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া করে দাও, তাহলে চোরটা ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে।" অন্য কোনোভাবে তাকে শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না সে। পঁয়তেভির মত হল, না খেতে দিয়ে চোরটাকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া আর আমি লোকটার গায়ে মাইন বেঁধে দিয়ে উড়িয়ে দেবার প্রস্তাব দিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা পঁয়তেভির মতটাকে উপযুক্ত বিবেচনা করে সেটাকে স্বীকার করে নিলাম। ওব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পর আমরা আবার মদ খাওয়ার আয়োজন করলাম। পঁয়তেভি একজন দেশপ্রেমিকের কায়দায় বন্দুক কাঁধে নিয়ে পাহারা দিতে লাগল। আমরা চোরের স্বাস্থ্য কামনা করে জালাভরতি মদ নিঃশেষ করতে লাগলাম। এর পর স্থির করা হল চোরটাকে কুলুঙ্গি থেকে বের করে এনে পরিষ্কার আলোয় ভালো করে একবার দেখে নিতে হবে।

"সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে ধরে সকলে একসঙ্গে কুলুঙ্গির

দিকে ছুটে গেলাম। এর পর তিনজনে মিলে চোরটাকে আমরা অন্ধকার কুলুঙ্গির মধ্য থেকে বার করে নিয়ে এলাম। দেখলাম, চোর একজন বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলো সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। চেহারার মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট; অনাহারে ভুগতে ভুগতে পাঁজরের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে, মুখের মধ্যে সীমাহীন ক্লান্তি, গায়ে শতছিন্ন নোংরা পোশাক। বুড়ো চোরটার হাত-পা বেঁধে চেয়ারের ওপর বসিয়ে রাখলাম। তার মধ্যে কোনো ভাবন্তর লক্ষ করা গেল না। সে নির্বিকারভাবে চেয়ারের ওপর চুপ করে বসে রইল।

"সেরিউলের প্রস্তাবে বৃদ্ধ চোরের বিচার শুরু হল। বিচারের পর সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করা হল যে চোরের উপযুক্ত শাস্তি হল মৃত্যু, সুতরাং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

"সেরিউল বলল, ফাঁসির দড়ি গলায় পরে ওকে মরতে হবে। তবে মৃত্যুর আগে প্রভু যিশুর কাছে ও সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নেবে। সেজন্য একজন গির্জার পুরোহিতের প্রয়োজন এবং তাঁকে এক্ষুণি ডেকে পাঠাতে হবে।

"রাত্রি গভীর হওয়ার কারণে আমি সেটা করতে নিষেধ করলাম। এর পর আমার ওপর পাদরির কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল। এর পর চোরকে তার অপরাধ স্বীকার করতে বলা হল। এতক্ষণ ধরে সে গোল গোল চোখ করে আমাদের গতিবিধি কাজকর্ম লক্ষ করছিল এবং ভাবছিল এ কেমন হতচ্ছাড়াদের পাল্লায় এসে পড়লাম। এবার সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, আমার মনে হয়, তোমরা সত্যিই আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চাও না। ঠিক কি না?

"সেরিউল তাকে নীলডাউনের মতো জোর করে বসিয়ে দিয়ে ধমকে উঠে বলল, চোপ্, একটাও কথা নয়। জেনে রেখো, তোমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে, এক্ষুণি তোমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নাও। খ্রিস্টধর্মে তাকে দীক্ষিত করা হয়নি মনে করে সে তার মাথায় ঢেলে দিল এক জগ লাল মদ।

"ভীষণ ভয় পেয়ে বুড়োটা পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল। পাছে সেই চিৎকারে মাঝরাতে আশপাশের লোকের ঘুম ভেঙে যায় আর তারা সেখানে নাটক দেখতে ছুটে আসে, এই ভয়ে তার মুখটা দুহাত দিয়ে জোর করে চেপে ধরলাম।

"এর পরে সে আমার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য জোর ধস্তাধস্তি করতে লাগল। তারপর মেঝেতে শুয়ে পড়ে প্রচণ্ড জোরে হাত-পা ছুঁড়ে টেবিল চেয়ারগুলো সব উলটে দিল। তার হাত-পায়ের বিক্ষেপে ক্যানভাসের ওপর আঁকা ছবিগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল! অবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠায় সেরিউল বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "এটাকে এবার শেষ করে দেওয়া যাক।" এই বলে সে তার পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিল। একটা তীক্ষ্ণ ক্লিক শব্দের সঙ্গে পিস্তলের চাবিটা মাটিতে গিয়ে ছিটকে পড়ল। আমিও বন্দুকটা বুড়োর দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিলাম, তাতে শুধু একটা খটাস করে শব্দ হল। মদের নেশায় আমরা কেউই বুঝতে পারিনি বন্দুক বা পিস্তলে কার্তুজ বা বুলেটের কোনো চিহ্নই নেই। পরে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। পঁয়তেভি আমাদের

উদ্দেশ্যে জড়ানো গলায় বলল, "কোন্ অধিকারে আমরা বুড়ো চোরটাকে গুলি করে হত্যা করলাম।"

"নেশায় তার মগজে ঢোকেনি যে বন্দুক বা পিস্তলে কোনো গুলি ছিল না।

"সেরিউল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন? আমরাই তো ওকে শাস্তি হিসাবে দিয়েছি মৃত্যুদণ্ড।

"তা ঠিক, তবে সাধারণ মানুষদের এভাবে আমরা গুলি করে হত্যা করতে পারি না। যা হোক দেখো আমাদের গুলিতে ওর মৃত্যু হয়েছে কি না। যদি তা না হয়ে থাকে চলো ওকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসি। তারাই ওর শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

"এর পর লোকটাকে আমরা ভালো করে দেখলাম এবং দেখলাম সে বেঁচে আছে। বুড়োটার হাঁটাচলার ক্ষমতা ছিল না বলে তাকে একটা তক্তার সঙ্গে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চললাম আমি আর পঁয়তেভি। সেরিউল চলল আমাদের পিছনে। কাঁধে তার বন্দুক। থানার কাছাকাছি আসতেই পুলিশের লোকেরা আমাদের বাধা দিল। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি আমাদের বেশ ভালোই চিনতেন এবং জানতেন যে সর্বদা আমরা কী ধরনের রঙ্গরসিকতা ও কৌতুকে অভ্যস্ত। সুতরাং তিনি আমাদের কেস নিতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু সেরিউল ছাড়বার পাত্র নয়। সে কেসটা নেওয়ার জন্য জেদ করতে লাগল। তখন পুলিশ অফিসারটি বেশ কড়া সুরেই বললেন, বেশি ঝামেলা করার চেষ্টা কোরো না, লক্ষ্মী ছেলের মতো যে-যার ঘরে ফিরে যাও। তখন আমরা একরকম বাধ্য হয়েই মার্চ করতে করতে স্টুডিওর ঘরে ফিরে এলাম।

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এবার বুড়োটাকে নিয়ে আমরা কী করব?

"পঁয়তেভি বলল, "আপদটা নিশ্চয়ই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।" তার স্বরে সহানুভূতি ঝরে পড়ল।

"বুড়োর ওপর আমার যেন কেমন মায়া হল, মদের ঘোরে কি না তা ঠিক বলতে পারব না। আমি তার বাঁধনটা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওহে বৃদ্ধ চোর, তোমার এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

"বুড়ো যেন ককিয়ে উঠল, বলল, তোমাদের কাছে যে শিক্ষা পেলাম, তা জীবনে ভুলব না।

"বৃদ্ধের জন্য সেরিউলের মনে সন্তানভাব জেগে উঠল। সে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে একটা আরাম কেদারায় শুইয়ে দিল। বৃদ্ধের প্রতি তার আচরণ হয়ে উঠল অনেক দিনের পুরোনো বন্ধুর মতো। আমরা আবার মদ খেতে শুরু করলাম। বুড়োটা আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে আমাদের ব্যাপারস্যাপার লক্ষ্য করতে লাগল। আমরা তার দিকে এক পাত্র মদ এগিয়ে দিলাম, সে সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটা খালি করে দিল। এর পরে তাকে আর এক গ্লাস মদ দিলাম, সেটাও সে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ করে দিল। এইভাবে গ্লাসের পর গ্লাস মদ উড়িয়ে দিল সে। অবাক হয়ে

দেখলাম, আমরা তিনজনে মিলে যতটা মদ খেয়েছি, তার থেকে অনেক বেশি মদ সে একাই খেয়ে শেষ করল।

"রাত শেষ হয়ে প্রথম সূর্যের স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে পড়ল প্রকৃতির বুকে। বুড়োটা এবার আরাম কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমি কি এবার যেতে পারি?

"আমরা তাকে আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য অনেক অনুরোধ করলাম। কিন্তু সে তার অনিচ্ছা প্রকাশ করল। আমরা তার সঙ্গে করমর্দন করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। দরজার চৌকাঠে যেন হোঁচট খেয়ে পোড়ো না, একটু দেখে যেয়ো।"

তার গল্প বলার ভঙ্গিতে সকলের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। সে এবার পাইপটা ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—"সব থেকে মজার ব্যাপার কী জান, ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্যি।"

কাঠের জুতো
The Wooden Shoes

গ্রামের একমাত্র চার্চের বৃদ্ধ পুরোহিত যখন তাঁর ধর্মোপদেশের শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করছিলেন তখন তাঁর মুখ থেকে থুতু ছিটকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল চাষি স্ত্রীলোকদের মাথার টুপিগুলো। আর পুরুষগুলোর তেল চকচকে মাথাগুলোতে সেই থুতু ছিটকে এসে পড়ছিল। চাষি স্ত্রীলোকগুলো তাদের ঝুড়িগুলো পাশে নামিয়ে রেখে —জুলাই-এর প্রচণ্ড দাবদাহে গোরু বা ভেড়ার পালের মতো ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল, পশ্চিম দিকের খোলা দরজার ভিতর থেকে। দূরের কোনো মাঠে হাম্বা স্বরে গোরুগুলো ডেকে উঠছিল।

পুরোহিত বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। তিনি এই প্যারিসে বাস করছেন দীর্ঘ চল্লিশ বছর। তিনি লা পমেল ডিজাইর ভ্যালেনের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করলেন।

অন্যদের কথা তাঁর মনেই ছিল না। সুতরাং প্রার্থনাপুস্তকের মধ্যে রাখা স্লিপগুলো তিনি খুঁজে দেখতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দুখানা খুঁজে পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "আমি এখন থেকে কোনো ছেলে বা মেয়েকে সন্ধের পর এই গির্জায় ঢোকার অনুমতি দেব না। আর তারা যদি আমার নিষেধ অমান্য করে তাহলে স্থানীয় পুলিশকে ব্যাপারটা জানাতে বাধ্য হব। যা হোক মঁসিয়ে সিসেয়ার ওমতের বাড়ির কাজকর্মের জন্য একজন সভ্য ভদ্র পরিচারিকার দরকার।"

লা সেবরিয়ের গ্রামের শেষ প্রান্তে ফুরভিল যাওয়ার রাস্তার এক পাশে যে কুঁড়েঘরটা আছে—সেখানে ধর্মের বাণী শুনে ফিরে গেল এক চাষি পরিবার। বাড়ির রোগা চেহারার বৃদ্ধ কর্তা, টেবিলে গিয়ে বসলেন। তার স্ত্রী উনুন থেকে সসপ্যানটা নামিয়ে নিল আর তার মেয়ে অ্যাদিলেদ তাদের খাবার ঘরের আলমারি থেকে প্লেট আর গ্লাসগুলো বের করে আনল। অ্যাদিলেদের বুড়ো বাবা সেই চাষিটি বলল, "আমার মনে হয় মঁসিয়ে ওমত খুব ভালো লোক। ভদ্রলোক বিপত্নীক এবং যতদূর জানি তাঁর পুত্রবধূ তাঁকে পছন্দ করে না। সেইজন্য ঠিকভাবে তাঁর সেবা যত্ন হয় না। সেইকারণে তাঁর একজন সেবা যত্নের লোকের দরকার। তাঁর পয়সাকড়ি আছে যথেষ্ট। সুতরাং আমার মনে হয় অ্যাদিলেদকে সেখানে পাঠালে ভালোই হয়।"

তার স্ত্রী বলল, "আমি নিজে সেখানে যাব এবং তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।" তারপর তার মেয়ে অ্যাদিলেদের দিকে ফিরে বলল, "এই বোকা মেয়ে, তোকে মঁসিয়ে ওমতের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিচারিকার কাজ করতে হবে। তিনি তোকে যা করতে বলবেন, তোকে সেসব করতে হবে।"

অ্যাদিলেদের লম্বা চওড়া চেহারাটা যেন স্বাস্থ্যে ফেটে পড়ছে। মাথায় এক গোছা

সোনালি চুল এবং গাল দুটো আপেলের মতো লাল।

মেয়েটি তার মায়ের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বোকার মতো শুধু খিলখিল করে হাসতে লাগল। এর পর তারা ডিনারে বসল। খেতে খেতে তার বাবা বলল, "শোনো মেয়ে, আমি যেসব কথাগুলো তোমাকে বলে দেব, সেগুলো তুমি যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করবে।" এর পর সে কীভাবে তার সেবা যত্নে তুষ্ট করে বিপত্নীক মালিকের মন জয় করবে, সে বিষয়ে সমস্ত কিছু তাকে বুঝিয়ে দিল। তার স্ত্রী খাওয়া বন্ধ করে তার স্বামীর কথাগুলো যেন গিলতে লাগল আর তার মেয়ে অ্যাদিলেদ তার কথাগুলো অবাক হয়ে শুনতে লাগল নিষ্পলক চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে। খাওয়াদাওয়ার পর্ব চুকে গেলে তার স্ত্রী তার মেয়ের মাথায় একটা টুপি চাপিয়ে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ওমতের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল।

মঁসিয়ে ওমতের বয়স পঞ্চান্ন। কিন্তু তাঁর দৃঢ়, ঋজু আর বলিষ্ঠ চেহারা দেখলে মনে হবে না তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে পৌঁছেছেন। এক ধরনের প্রফুল্ল ভাব সর্বদা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। অন্যান্য ধনীদের মতো তাঁর আচার-আচরণ বা ব্যবহার খানিকটা রুক্ষ। তিনি এত জোরে হাসেন আর চিৎকার করেন যে মনে হয় দেয়ালগুলো সব ধ্বসে পড়বে। গ্লাসের পর গ্লাস ব্র্যানডি আর সিডার উড়িয়ে দেন। কাঠের জুতো পরে মাঠের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাকা ফসলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, তাদের ঘ্রাণ নেন প্রাণভরে।

তিনি কফি খেতে খেতে স্ত্রীলোক দুজনকে অভ্যর্থনা জানালেন। জানতে চাইলেন কী প্রয়োজনে তারা তাঁর কাছে এসেছে।

মেয়েটির মা-ই কথা বলল, "এই আমাদের মেয়ে অ্যাদিলেদ। মঁসিয়ে লে ক্যুরে বলেছিলেন আপনার একজন কাজের মেয়ের দরকার। একে আপনার কাজের মেয়ে হিসাবে রেখে দিতে পারেন।"

মঁসিয়ে ওমত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, হোঁতকা মার্কা এই ছাগলীটার বয়স কত?

"সবে কুড়িতে পড়েছে।"

অ্যাদিলেদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওমত বললেন, ঠিক আছে। খাওয়া ছাড়া মাসে ও পনেরো ফ্রাঁ করে পাবে। ও তাহলে আগামীকাল সকাল থেকে কাজে লেগে পড়ুক। সকালের স্যুপটা ও-ই তৈরি করবে।

পরের দিন থেকে অ্যাদিলেদ কাজ শুরু করে দিল। সে মুখ বুজে তার কাজগুলো করে যেতে লাগল যেমন সে বাড়িতে এতদিন করে এসেছে। বেলা ন'টা নাগাদ যখন সে রান্নাঘরের মেঝেটা পরিষ্কার করছিল, তখন মঁসিয়ে ওমত তাকে ডেকে বললেন, শোনো মেয়ে, তুমি আমার পরিচারিকা ছাড়া আর কিছু নও। এখন থেকে তোমার আর আমার জুতো আলাদা করে রাখবে। দুজোড়া জুতো যেন এক জায়গায় না থাকে।

"ঠিক আছে, স্যার।"

"তোমার জুতো থাকবে রান্নাঘরে, আর আমার জুতো থাকবে খাবার ঘরে। এটা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে স্যার।"

"বেশ, এখন তুমি তোমার কাজ কর।"

ডিনার খাবার সময় হলে ওমত টেবিলে গিয়ে খেতে বসে অ্যাদিলেদকে চিৎকার করে ডাকলেন। সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে রান্নাঘর থেকে পাড়ি কি মরি করে ছুটে এল।

ওমত জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার খাবার কোথায়?"

"কিন্তু স্যার..."

সে একইভাবে চিৎকার করে বলল, "আমি একা একা খেতে পারি না। টেবিলে তোমার খাবার নিয়ে এসো। তুমি যদি আমার কথা না শোনো, তবে জাহান্নামে যাও। যাও এক্ষুণি তোমার প্লেট আর গ্লাস নিয়ে এসো।"

এর পর অ্যাদিলেদ মালিকের আদেশ পালন করতে বাধ্য হল। সে ওমতের উলটো দিকের চেয়ারে বসে মাথা নীচু করে খেতে লাগল। ডিনারের শেষে অ্যাদিলেদ তার মালিকের জন্য কফি নিয়ে এলে, ওমত তার জন্যও কফি নিয়ে আসতে বলল। কফি খাওয়ার অভ্যাস না থাকলেও এবং সেটা তার ভালো না লাগলেও মালিকের হুকুমে সে কফি খেতে বাধ্য হল।

ওমত নিজে ব্র্যানডি খাওয়ার সময়ও অ্যাদিলেদকে ব্র্যানডি না খাইয়ে ছাড়ল না। এর পর রাত্রে খাওয়ার সময়ও তার মালিকের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে হল। রাত্রের খাওয়ার পাট চুকে গেলে অ্যাদিলেদকে ওমতের সঙ্গে ডোমিনোজ খেলতে হল। তারপর ওমত তাকে শুতে পাঠিয়ে বলল, সে একটু পরেই দোতলায় উঠে আসব। এবার অ্যাদিলেদ ছাদের চিলেকোঠায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর প্রার্থনার কাজ শেষ করে তার পোশাক খুলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওমতের ক্রুদ্ধ চিৎকারে অ্যাদিলেদ লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল।

"অ্যাদিলেদ!"

অ্যাদিলেদ ঘর থেকে উত্তর দিল, "আমি এখানে স্যার।"

"তুমি কোথায়?"

"আমি শুয়ে পড়েছি।"

"ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি নীচে নেমে এসো। আমি একা একা ঘুমোতে পারি না। আর তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে এই মুহূর্তে তুমি বিদেয় হতে পার।"

"আমি এক্ষুনি আসছি স্যার।" সে তখন কাঠের জুতো পরে তার মালিকের হেঁটে বেড়ানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। সে যখন সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে, তখন ওমত তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তার শোবার ঘরের দিকে। অ্যাদিলেদ ঘরে ঢোকার আগে তার হালকা কাঠের জুতোজোড়াটা তার মালিকের জুতোর পাশে রেখে

দিয়ে ওমতের সঙ্গে তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মাস ছয়েক পরে এক রবিবারে অ্যাদিলেদ তার বাবা মা-র সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে তার বাবা বলল, "তুমি কী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ?"

বাবার কথা শুনে সে বজ্রাহতের মতো বসে পড়ল। তারপর নিজের কোমরের দিকে তাকিয়ে বলল, "না, সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।"

এর পর সে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক করে বল, তোমার মালিকের জুতোর সঙ্গে তোমার হালকা কাঠের জুতোজোড়া মিশিয়ে দাওনি?"

"হ্যাঁ, প্রথম রাত্রিতে আমি সেটা করেছিলাম, তারপর থেকে প্রতি রাত্রে।"

"বোকা মেয়ে কোথাকার, এর পরেও তুমি বলছ তুমি অন্তঃসত্ত্বা হওনি?"

তার বাবার কথা শুনে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর তোতলাতে তোতলাতে বলল, আমি তা কী করে জানব? আমার কি সেটা জানার কথা ছিল? বৃদ্ধ চাষি তার মেয়ের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মেয়ের কথা শুনে সে যে বেশ খুশি হয়েছে, তাকে দেখে সেটা বোঝা গেল। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী জানতে না?" এর পর জলভরা সরল দুটো চোখ মেলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কী করে জানব, কীভাবে বাচ্চা তৈরি হয়?" যখন অ্যাদিলেদের মা ফিরে এল, তখন তার স্বামী তাকে বলল, অ্যাদিলেদ গর্ভবতী হয়েছে।

কিন্তু তার মা ভীষণ খেপে গিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে তাকে গালাগালি করতে লাগল। দুশ্চরিত্রা, বেশ্যা—ইত্যাদি বলতেও ছাড়ল না। তার স্বামী তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করল। তারপর টুপিটা হাতে নিয়ে সে যখন ওমতের সঙ্গে ওই ব্যাপারে কথা বলার জন্য বেরোচ্ছে, তখন সে বলল, "আমি ওকে যতটা বোকা মনে করেছিলাম, তার থেকে ও অনেক বেশি বোকা—এতদিন ধরে ওমতের সঙ্গে রাত কাটিয়ে ও যা যা করেছে তার ফল যে কী হতে পারে, সেটাও ও জানে না। বোকার হদ্দ আর কাকে বলে!"

যা হোক, পরের রবিবার যাজক এসে ওমত আর অ্যাদিলেদের বিয়ের কথা ঘোষণা করলেন এবং এর পর তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

লিলি লালা
Lili Lala

লুই দ্য অ্যারানডেল স্বপ্নালু চোখে স্মৃতির অতল থেকে কী যেন আহরণ করার চেষ্টা করে বললেন, যখন আমি তাকে প্রথম দেখলাম তখন মনে হল স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া কোনো গায়কের গাওয়া একটি মন্থর অথচ সুখশ্রাব্য মিষ্টি গান শুনলাম। সেই গানের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছিল একটি সুকেশা রমণীর কাহিনি। তার রেশমকোমল কেশগুচ্ছ সোনালি রংএর ছটায় এত বেশি উজ্জ্বল ছিল, বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে তা এমন এক অপূর্ব নৃত্যের ছন্দে উড়তে উড়তে তার মুখমণ্ডলের চারিপাশে এমন শোভা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ত, যা দেখে তার প্রেমিক তার মৃত্যুর পর সেই চুলগুলো কেটে নিয়ে সেই চুল দিয়ে তার বেহালার ছড় তৈরি করল। সেই বেহালা মধুর সুরঝংকারে এমন এক স্বর্গীয় প্রেমের মূর্ছনা সৃষ্টি করত যা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে সেই বেহালার দিকে।

তার চোখে আমি ভেসে থাকতে দেখেছি অতল জলের রহস্য। সেই অতলের কোনো তল খুঁজে না পেয়ে তারা ডুবে যেত সেই রহস্যের গভীরে। তার ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত এমন এক নির্দয় নিষ্ঠুর হাসি যা দেখে মনে হত কেউ তাকে জয় করতে পারবে না। যারা নিষ্ঠুর সম্রাজ্ঞীর মতো পুরুষদের ওপর প্রভুত্ব করে তারা। নিজের মনকে শত ব্যভিচারের মধ্যে সতীত্বের দৃঢ়তায় পুণ্যবতী নারীদের মতো পবিত্র রাখার ছলনা করে।

আমি দেখলাম স্বর্গীয় নারীদের মতো তার মাথার সুন্দর গঠনশৈলী, দেখলাম তার সোনালি রং-এর সুন্দর চুলগুচ্ছ, তার সুদীর্ঘ রমণীয় শরীর, তার শিশুর মতো নরম আঙুল। সে যখন বাবলাগাছের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে যেত তখন তাকে বড় একাকী নিঃসঙ্গ মনে হত। মনে হত এই জীবনের ভার বহনে সে ব্যর্থ। সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত এই ভেবে যে সে মানুষের অদম্য অপ্রতিহত বাসনাকে সংযত করতে পারছে না। তাকে দেখে কারও মনে হত না যে সে জীবনের অবাধ স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। সাহসিকতার মাপকাঠিতে সে অদ্ভুত সেই লিলি লালা নামটাতে পরিচিত হয়েছে—কেউ যদি একবার তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায় তাহলে সে তার শেষ কপর্দকটি তার পায়ে বিলিয়ে না দিয়ে ফিরে আসতে পারবে না।

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও তার কণ্ঠস্বরটি ছিল একটি স্কুল পড়ুয়া কিশোরীর মতো সুরেলা। সেই কণ্ঠস্বরে খুঁজে পাওয়া যেত না কোনো অপরাধের ছায়া। মনে হত সে স্কিপিং করে এবং বাচ্চাদের মতো স্বল্পবাসে সে অভ্যস্ত। তার হাসিতে ছড়িয়ে পড়ত ঝরণাধারার এমন এক মিষ্টি সুরঝংকার, মনে হত কোথাও যেন বেজে উঠছে বিয়ের ঘণ্টা। মাঝে মাঝে তার সামনে আমি এমনভাবে নতজানু হয়ে বসতাম মনে হত এক সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে আমি নতজানু হয়ে বসেছি।

এক দিন সন্ধেবেলা যখন আমরা বিয়ারিজ সমুদ্রতট ধরে হেঁটে চলেছিলাম তখন আকাশটা হয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড উত্তাপে ধূসর, বিবর্ণ। সমুদ্রটাকে দেখে মনে হচ্ছিল কালো কালি গুলে দেওয়া হয়েছে তার জলে। ভয়ংকর বিশাল বিশাল কালো ঢেউগুলো ফসফরাস ছড়িয়ে দিয়ে আছড়ে পড়ছিল বেলাভূমিতে। লিলি কিন্তু এসব কিছু লক্ষ করছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে তার বুটের গোড়ালি দিয়ে বালুবেলার ওপর ছোটো ছোটো গর্ত খুঁড়ে চলেছিল। হঠাৎ সে তার অনেক গোপন কথার একটা প্রকাশ করে দিল। নারীজাতি সময় সময় এভাবে নিজেদের গোপন কাহিনিকে ব্যক্ত করে এবং তারপরেই তারা অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে।

"হে আমার প্রিয় বন্ধু, কোনো সিদ্ধপুরুষের তালিকাভুক্ত হওয়ার বা কোনো 'গসপেল' বা 'গোল্ডেন লিজেন্ড'-এর চরিত্রে সমৃদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার জীবনটা শুধুমাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের অনুকরণ। যতদূর মনে পড়ে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একটি শিশুসন্তান লাভ করে পিতামাতা ও আত্মীয়পরিজন যে মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসায় ঘিরে রাখে এবং যেভাবে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তোলে—সে স্নেহ ভালোবাসা আর অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের আনুকূল্য লাভ করে আমি একেবারে যথেচ্ছ-চারিণী হয়ে উঠলাম।

"সে সব চুম্বনগুলো এত মিষ্টি ছিল, এমন শিহরণ জাগাত আমার সমস্ত শরীরে—মনে হয় এখনও সেই চুম্বনের স্পর্শে সিক্ত আর উষ্ণ হয়ে আছে আমার ঠোঁট দুটো।

আমার স্মৃতিতে আজও ভেসে ওঠে সেই অস্পষ্ট প্রকৃতির মাঝে শ্রেণিবদ্ধ গাছগুলো—যেগুলো আমাকে ভীত আতঙ্কিত করে তুলত। মনে পড়ে সেইসব পুকুরগুলোর কথা—যেখানে হাঁসেরা দল বেঁধে সাঁতার কেটে বেড়াত আর মাঝে মাঝে ডেকে উঠত কোয়াক কোয়াক শব্দে। শুধুমাত্র নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন মনে পড়ে যায় আমার শিশু বয়সে একজন স্ত্রীলোক আমাকে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলত এবং আমার সঙ্গে অন্যদের তুলনায় মিষ্টিস্বরে কথা বলত। কিন্তু তারপরে কী হল?

আমাদের বাড়ির কোনো চাকর আমাকে চুরি করে ভ্রাম্যমাণ কোনো সার্কাস কোম্পানির মালিকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল কি না সে কথা আমি বলতে পারব না, কোনো দিন হয়তো জানতেও পারব না। কিন্তু পরিষ্কার মনে পড়ে, আমার সম্পূর্ণ ছোটোবেলাটা ওই সার্কাসের চৌহদ্দির মধ্যে কেটে গিয়েছিল। ওই সার্কাস কোম্পানি মেলা থেকে মেলায়, গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াত। মালগাড়ি বোঝাই মালপত্র নিয়ে, জীবজন্তুদের মিছিলের সঙ্গে মাইকে খুব জোরে জোরে গান বাজাতে বাজাতে সার্কাসের দলটা ঘুরে বেড়াত।

আমি তখন একটা অসহায় পিঁপড়ের মতো ছোটো ছিলাম। ওরা আমাকে অনেক কঠিন কঠিন খেলা শেখাল। ওরা আমাকে টানটান করে বাঁধা শক্ত দড়ির ওপর দিয়ে এবং আলগা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে শেখাল। ওদের হাতে যখনতখন আমাকে মার খেতে হত। একটুকরো মাংসের পরিবর্তে আমাকে শুকনো রুটি চিবোতে হত। খিদের

জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাই-ই খেতাম বাধ্য হয়ে। মনে হত আমার দাঁতগুলো বোধহয় এবার ভেঙে যাবে। এক দিনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। এক বাটি স্যুপ চুরি করে ভ্যানের নীচে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সার্কাস কোম্পানির একজন ক্লাউন তার তিনটি শিক্ষিত কুকুরের জন্য সেটা তৈরি করেছিল।

সেখানে ছিল না আমার কোনো বন্ধু বা আত্মীয়পরিজন। আমাকে সেখানে সব থেকে নোংরা কাজগুলো করতে হত, আস্তাবলের ঘোড়াদের মলমূত্র পরিষ্কার করতে হত, তাদের গা ধুয়ে দিতে হত, তাদের দেখাশোনার কাজে আমাকে সবরকমভাবে সাহায্য করতে হত। আমার সমস্ত শরীরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে, টাট্টু এঁকে দিত। সার্কাস কোম্পানির সমস্ত লোকদের মধ্যে যে আমাকে সব থেকে বেশি মারত, যে আমাকে সব থেকে বেশি যন্ত্রণা দিত সে ছিল একাধারে ম্যানেজার ও মালিক। সে আমাকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়ে মনে হয় বেশ আনন্দ পেত। লোকটা ছিল বয়সে প্রায় বৃদ্ধ, নৃশংস, নিষ্ঠুর, বর্বর। তাকে সকলে প্লেগের মতো ভয় করত। লোকটা ছিল ভয়ংকর রকমের কৃপণ—সব সময় টাকাপয়সার হিসাব করত এবং কর্মচারীদের মাইনে কেটে নিত।

লোকটার নাম ছিল রাফা। এরকম নৃশংস অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমার জায়গায় অন্য কোনো শিশু হলে সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করে তার সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়োত। কিন্তু আমি দিনের পর দিন রাফার ওই অত্যাচার সহ্য করে বড়ো হয়ে উঠতে লাগলাম। যতই আমি বড়ো হয়ে উঠতে লাগলাম—ততই স্বাস্থ্য সৌন্দর্যে আমার সমস্ত শরীরটা ভরে উঠল। আমি পনেরো বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহকর্মীরা আমাকে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করল, দর্শকরা সার্কাসের মাঠে আমাকে লক্ষ করে ফুলের তোড়া ছুঁড়ে দিতে লাগল। আমি যখন জাঙিয়া পরে খেলা দেখাবার জন্য দড়ির উপর দিয়ে হাঁটতাম—তখন সকলে আমার নগ্ন উরুযুগলের দিকে, পীনোদ্ধত বুকের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।

সার্কাসের কর্মচারীদের কেউই আমার সঙ্গে আর আগের মতো ব্যবহার করত না। তারা আমার সঙ্গে অন্য সুরে কথা বলতে শুরু করল। আমার পোশাক পরিবর্তনের সময় আমার ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়ত। মনে হল রাফা জিনেস্টোস-এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে যখন আমার কাছাকাছি আসত তখন তার বুকটা এক অব্যক্ত উত্তেজনায় কাঁপতে থাকত। সে যখন নোংরা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে আসত তখন আমার গাল দুটো লাল হয়ে উঠত, ঘেমে উঠত আমার কপাল। ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠত। যে আমাকে পদে পদে আঘাত করেছে, যে আমাকে পীড়ন করেছে, যে আমাকে ভীষণভাবে নির্যাতন দিয়েছে, সব থেকে বেশিরকম জর্জরিত করেছে অসম্ভব অত্যাচার করে, তার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

নারীজাতির সহজাত যে সমস্ত চাতুরি, ছলাকলা, মিথ্যাভাষণ, সব থেকে দৃঢ়চেতা ও কঠোর মনের অবিশ্বাসী মানুষকে পোষা জন্তুর মতো তাদের পায়ের কাছে টেনে আনতে পারে—সেই সমস্ত মারাত্মক অস্ত্রগুলোকে আমার মালিকের উদ্দেশ্যে ব্যবহার

করতে লাগলাম।

সেই কামুক ছাগলটা কিন্তু আমাকে ভালোবাসত। সত্যিকারের ভালোবাসত। যে মেয়েদের কখনও কৌচের নরম গদি, নিজের শরীরের তৃপ্তির যন্ত্র বা রাতের শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারত না, আমি তার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করতাম এবং তাকে দিয়ে আমার যা খুশি করিয়ে নিতাম।

মালিকের থেকে অনেক বেশি ম্যানেজারি করতে শুরু করলাম আমি নিজে। হতভাগা পাষণ্ডটা ব্যর্থ আশায় নিজেকে ক্ষয় করে ফেলতে লাগল। আমার আঙুলএর একটা ডগা পর্যন্ত সে ছোঁয়ার সুযোগ পায়নি। সে শুধু আমার জুতো, আঁটসাট পোশাক ও আমার পরচুলাকে ভালোবাসা জানিয়ে, আদর করে খুশি থাকত। তার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সামান্যতম চেষ্টাকে আমার কঠিন আচরণে শাসন করতাম। লোকটা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল, দিন দিন শীর্ণ হতে লাগল এবং বোকার মতো ব্যবহার করতে শুরু করল। যখন সে তার জলভরা চোখে আমাকে মিনতি করল এবং আমাকে স্ত্রীর সম্মান দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করল, তখন আমি হোহো করে হেসে উঠলাম। সে কীভাবে আমাকে গালাগালি দিয়েছে, কীভাবে আমাকে প্রহার করেছে—কীভাবে আমাকে নির্যাতন করেছে, জর্জরিত করেছে সীমাহীন অত্যাচারের, সে সমস্ত কথা তাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতাম। সে এভাবে আমার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে অতিরিক্ত মদ্যপান করে টেবিলের নীচে গড়িয়ে পড়ে যেত এবং এইভাবে সে দুঃখ আর কামনা ভোলার চেষ্টা করত।

সে আমাকে দামি দামি গয়না দিয়ে মুড়ে দিল এবং তার স্ত্রী হওয়ার জন্য আমাকে সমস্তরকমভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করল। আমার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। এক দিন সন্ধেবেলা তার গালে একটা আদরের টোকা দিয়ে অতি সহজে তার সমস্ত সম্পত্তি, তার সার্কাসের মালিকানা সমস্ত কিছু আমার নামে উইল করিয়ে নিলাম।

সময়টা ছিল শীতের মাঝামাঝি। মস্কোর কাছে তাঁবু ফেলা হয়েছে। অবিরাম তুষারপাত হয়ে চলেছিল।খেলা শেষ হওয়ার পর বিরাট একটা পাত্রে রাফার জন্য খাবার এল। এর পর আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দুজনে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করলাম। আমি রাফার সঙ্গে সুন্দর প্রীতিপূর্ণ আচরণ করতে লাগলাম, বারবার তার মদের গ্লাস ভরতি করে দিতে লাগলাম। এক সময় উঠে এসে তার কোলের ওপর বসে তাকে চুমু খেলাম। তার সমস্ত ভালোবাসার আবেগ আর মদের ধোঁয়া তার মাথায় চড়ে বসে তাকে এত বেশি নেশাগ্রস্ত করে তুলল যে সে যেন বজ্রাঘাতে চেয়ার থেকে নীচে পড়ে গেল। তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল, মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরোল না।

দলের অন্যান্যরা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। সমস্ত ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, অবিরাম শুধু বরফ পড়ে চলেছে। আমি পেট্রোলিয়ামের বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। এর পর দরজাটা খুলে মাতাল

লোকটার পা ধরে টানতে টানতে তাকে বাইরে নিয়ে এসে বরফের মধ্যে ফেলে রাখলাম।

পর দিন সকালে রাফার কুঁকড়ে যাওয়া শক্ত দেহটাকে তুলে আনা হল। সকলে তার অতিমাত্রায় মদ খাওয়ার অভ্যাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল বলে কেউ সে ব্যাপারে তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করল না বা তার মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করল না। এইভাবে আমি তার ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং বছরে পনেরো হাজার ফ্রাঁ উপার্জনের সুযোগ পেলাম। সুতরাং সৎ হয়েই বা কী লাভ আর গসপেলের নীতি মেনে শত্রুকে ক্ষমা করেই বা কী লাভ?

কাহিনির শেষে লুই দ্য অ্যারানডেল বললেন, আমার মনে হয় জীবনে আমি এত কথা একসঙ্গে কখনও বলিনি। চলুন ক্যাসিনোতে গিয়ে এবার দু-চার পেগ মদ খাওয়া যাক।

মার্টিনের মেয়ে
Martin's Girl

এক দিন রবিবারে গির্জার প্রার্থনা শেষে তার বাড়ি যাওয়ার পথে যে একটা সরু রাস্তা পড়ে—সেই পথ দিয়েই সে বাড়ি ফিরছিল। মার্টিনের মেয়েটিও প্রার্থনা শেষ করে সেই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিল। মেয়েটির পাশে পাশে হাঁটছিলেন বাড়ির মালিক। তাঁর চলার ভঙ্গিতে ফুটে উঠছিল ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার। কারণ তিনি যে প্রচুর বিত্তবৈভবের মালিক সেটা তিনি তাঁর হাঁটাচলার ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চাইছিলেন। চাষবাস করেই তিনি এমন ধন-সম্পদের মালিক হয়েছেন। ঢিলে পোশাকগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি পরেছেন ধূসর রংএর সুন্দর একটা জ্যাকেট, মাথায় চাপিয়েছেন সুন্দর একটা টুপি। মেয়েটি তার স্তনদুটিকে বক্ষবন্ধনী দিয়ে বেশ শক্ত করে এঁটে বেঁধেছে। হাত দুটোকে দুপাশে দোলাতে দোলাতে সে হেঁটে চলেছে। তার চলার ছন্দে নেচে উঠছে তার গুরু নিতম্ব। তার মাথার টুপিতে গোঁজা রয়েছে নানা বর্ণের ফুটো। তার নরম ঘাড়টা চুলে ঢাকা পড়েনি। তার মাথার ছোটো ছোটো চুলগুলো সূর্যের আলো পড়ে চকমক করছে। বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে সেগুলো মুখের চার পাশে উড়ছে।

মেয়েটির নিতম্ব দুটি আকর্ষণ করার মতো। সেদিকে তাকিয়ে রইল বেনয়েস্ট। মেয়েটির মুখের দিকে সেভাবে তাকিয়ে দেখার কোনো দিন তার ইচ্ছা হয়নি। তবুও সাধারণভাবে দু-একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে। সেই হিসাবে মেয়েটির মুখটি তার চেনা।

হঠাৎ সে মনে মনে বলে উঠল, মার্টিনের মেয়েটিকে তো বেশ সুন্দর দেখতে! মেয়েটির প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। মেয়েটির পিছন দিকটা দেখতে দেখতে সে হাঁটতে লাগল, মেয়েটির মুখের দিকে তাকাবার কোনো দরকার আছে বলে তার মনে হচ্ছিল না। সে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তার পিছন দিকের শরীরের অংশটাকে মাঝে মাঝেই সে মেয়েটির সুন্দর দেহসৌষ্ঠবের কথা ভেবে মনে মনে তারিফ করতে লাগল।

মার্টিনের খামারবাড়িতে ঢোকার জন্য মেয়েটি ডান দিকে বাঁক নিল। এই ফার্মের মালিক হলেন তার বাবা জাঁ মার্টিন। হঠাৎ মেয়েটি পিছন ফিরে তাকিয়ে বেনয়েস্টকে দেখতে পেল। সে ওদিকেই এগিয়ে আসছিল। কাছাকাছি হতেই মেয়েটি ও বেনয়েস্ট পরস্পরের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করল। এর পর বেনয়েস্ট নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে দেখতে পেল খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়া আছে মুরগির স্যুপ। সে তার মায়ের উলটোদিকের চেয়ারটা টেনে নিয়ে খেতে বসল। পরিচারিকাটি সে সময় আপেলের তৈরি মদ আনতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্যুপের প্লেট থেকে দু-এক চামচ খেয়ে প্লেটটা সে সরিয়ে দিল। বোঝা গেল তার খাওয়ার রুচি নেই। মা জিজ্ঞেস করলেন, কিছুই খেলে না, তোমার কি শরীর খারাপ?

"না, পেটটা মনে হচ্ছে ভরতি হয়ে আছে, খিদেও নেই তেমন।"

এদের পাশে বসে আরও যে দুজন খাচ্ছিল, সে দেখল তারা বেশ পরিতোষের সঙ্গে খেয়ে চলেছে। তারা খাওয়াতে এত ব্যস্ত যে কোনো দিকে মুখ তুলে তাকাবার ফুরসত পাচ্ছে না। বেনয়েস্ট মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো রুটি মুখে দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে চিবিয়ে চলেছিল। সে শুধু ভাবছিল মেয়েটির কথা। মেয়েটা যে এত সুন্দর, এত আকর্ষণীয়—একথা তার আগে কখনও মনে হয়নি। এমনভাবে মেয়েটি তাকে চিন্তাক্লিষ্ট করে তোলেনি। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তার খাওয়ার ইচ্ছাটাই নষ্ট হয়ে গেল।

"বেনয়েস্ট, স্টু রান্নাটা এত ভালো হয়েছে, যে ওটা খেলেই তোমার খাওয়ার রুচি ফিরে আসবে এবং আরও বেশি করে খেতে চাইবে।"

মায়ের অনুরোধ সে স্টুর পাত্র থেকে এক চামচ মুখে দিয়েই বাঁ হাত দিয়ে পাশে সরিয়ে রাখল। রান্নাটা অসাধারণ হলেও তার কাছে সেটা যেন বিস্বাদ মনে হল।

নামমাত্র খেয়ে সে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর বেরিয়ে পড়ল মাঠের দিকে। মাঠে যারা তখন কাজ করছিল—তাদের সে ছুটি দিয়ে দিল, বিকেলটুকুর জন্য তাদের কাজগুলো সে দেখাশুনা করবে—সে-কথা সে ওদের জানিয়ে দিল।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। সপ্তাহে একটি দিন সবাই কাজকর্মের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ছুটির আনন্দ উপভোগ করে, শুয়ে বসে আলস্যবিলাসে দিনটা কাটিয়ে দেয়। মাঠে সেদিন কোনো লোকজন ছিল না। গোরুগুলো পেট ভরে খেয়ে রোদে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছিল। ওদের মধ্যেও যেন ছুটির মেজাজ এসে গিয়েছে। পড়ন্ত বেলায় তারা গোয়ালে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাম্বা হাম্বা করে ডাকাডাকি শুরু করেছে। শরতের বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে ভায়োলেট ফুলের মিষ্টি গন্ধ। বিকেল থেকে বেশ ঠান্ডা বোধ হচ্ছে, মনে হয় রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা পড়বে। কোলের ওপর টুপিটা নিয়ে বাঁধের ধারে বসেছিল বেনয়েস্ট। মনে হল গরম মাথাটাকে ঠান্ডা করার জন্য সে টুপিটা খুলে ফেলেছে। এতক্ষণ ধরে সে একমনে মেয়েটির কথাই ভাবছিল। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, দারুণ খাসা মেয়েটা।

সর্বদাই সে মেয়েটার কথা ভাবতে লাগল। খাওয়া, শোওয়া, ঘুমোনো—কোনো সময়েই সে মেয়েটার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। সর্বক্ষণ তার চিন্তায় বেনয়েস্ট আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

বেনয়েস্ট যে মেয়েটির চিন্তায় খুব বেশি কাতর হয়ে পড়েছিল বা অস্থির হয়ে উঠেছিল এমন নয়। তবে এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল অথচ সেটা যে কী সে নিজেই বুঝে উঠতে পারছিল না। অনুভূতির রূপটা কেমন সেটা ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয় ঘরের মধ্যে যখন একটা নীল মাছি

ঢুকে পড়ে আর বেরোবার পথ না পেয়ে ভোঁভোঁ শব্দ করতে করতে সমস্ত ঘরে ঘুরে বেড়ায়—তখন সেই একটানা বিরক্তিকর শব্দ শুনতে পায় সেই ঘরে অবস্থানকারী লোকটি। হঠাৎ যখন মাছিটা তার ভোঁভোঁ শব্দ থামায় তখন লোকটির মনে ওই শব্দ সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই থাকে না। আবার যখন মাছিটা একইরকম শব্দে লোকটিকে বিরক্ত করতে থাকে—সে শুধু উড়ন্ত মাছিটাকে দেখতে থাকে হতাশ হয়ে। কিছুই তার করার থাকে না। তাকে না পারে ধরতে, না পারে মারতে, তার পিছনে তাড়া করে বেড়ানোও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিছুক্ষণ তার শব্দ বন্ধ করে আবার নূতন উদ্যমে শুরু করে। ওই মেয়েটির চিন্তা আটকে পড়া মাছিটার মতো বেনয়েস্টকে বিরক্ত করতে লাগল।

মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে তাকে দেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে সে মার্টিনের খামারবাড়ির কাছে এসে চারিদিকে তাকাতে লাগল মেয়েটিকে একবার দেখতে পাওয়ার আশায়। কিছুক্ষণ পরেই সে মেয়েটিকে দেখতে পেল। সে তখন আপেল গাছের ডালে বাঁধা একটা দড়িতে কাচা জামাকাপড় মেলে দিচ্ছিল।

সেদিনটা বেশ গরম পড়েছিল বলে মেয়েটি সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে এসেছিল। সে যখন ক্লিপ দিয়ে জামাকাপড়গুলো আটকিয়ে দিচ্ছিল—তখন দেহের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে এতক্ষণ একটা ঝোপের আড়ালে বসে মেয়েটির সবকিছু লক্ষ করছিল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। তারপরেও বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে বসে মেয়েটির কথা ভাবতে লাগল। এর পরে সে নিজের ঘরে চলে এল। মেয়েটির চিন্তায় তার পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল। খাওয়াদাওয়ায় তার মোটেই রুচি ছিল না। ঘুমোতেও পারছিল না। ঘুমের মধ্যে বারবার জেগে উঠতে লাগল। ছটফট করতে লাগল বিছানায় শুয়ে শুয়ে। রবিবার দিন গির্জায় গিয়ে সব সময় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকত। মেয়েটি তার অবস্থা লক্ষ করে শুধুই হাসত।

এক দিন বিকেলে রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ সে মেয়েটিকে দেখতে পেল। তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। সমস্ত দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে উঠে মেয়েটিকে বলল, "দেখ, এইভাবে আর বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।"

মেয়েটি বলল, "কেন সম্ভব হচ্ছে না?"

তার মনে হল মেয়েটি যেন তাকে বিদ্রূপ করছে।

সে বলল, "দিবারাত্র তোমার চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। তোমার জন্য আমার খাওয়া ঘুম সব বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত রাত্রি বিছানায় শুয়ে ছটফট করি। কিছুতেই তোমার কথা ভুলতে পারছি না।"

দুহাত কোমরে রেখে মেয়েটি বলল, "তার জন্য আমি নিশ্চয়ই দায়ী নই। আমি কি আপনাকে খাওয়া ঘুম বন্ধ করতে বলেছি, না আমার চিন্তায় অস্থির হতে বলে দিয়েছি আপনাকে?"

"তা বলনি, তবে তোমার জন্য যে আমার পাগলের মতো অবস্থা হয়েছে, সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না?"

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, "তাহলে আপনার এই অসুখ সারবে কী করে, সেটা আমায় দয়া করে বলবেন?"

সে মেয়েটির দিক থেকে অন্যরকম উত্তর আশা করছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে তার কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনে সে অত্যন্ত হতাশ হল। তার হাত-পা যেন কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। মেয়েটি তার ভাবভঙ্গি দেখে খিলখিল করে হাসতে হাসতে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

এর পরদিন থেকে তাদের সঙ্গে দেখা হতে লাগল কখনও ঝোপের ধারে, কখনও অন্ধকার মাঠের মধ্যে। মেয়েটির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাওয়ার জন্য বেনয়েস্ট ব্যাকুল হয়ে উঠল। এক এক সময় তার মনে হত তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে দমবন্ধ করে মেরে ফেলে। কিন্তু মেয়েটিকে একান্তভাবে নিজের করে পাওয়ার মতো সুযোগ তার হল না। এই না পাওয়ার ব্যর্থতা তার মধ্যে গুমরে গুমরে মরত। তাদের দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারটা নিয়ে লোকে নানান কথা বলতে শুরু করল, গুজব ছড়িয়ে পড়ল, তাদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে।

এর মধ্যে এক দিন সে মেয়েটির কাছে জানতে চেয়েছিল, সে তাকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না। মেয়েটি তাতে সম্মতি জানিয়েছিল। নিজেদের পরিবারের লোকদের জানানোর কাজটাই শুধু বাকি ছিল, আর সেই সুযোগের জন্য তারা অপেক্ষা করছিল।

প্রতিদিন যে সময়টাতে তাদের সঙ্গে দেখা হত—এক দিন সেই সময়ে মেয়েটি আর এল না। বেনয়েস্ট তার জন্য অপেক্ষা করে করে ফিরে গেল। মেয়েটি যে আসবে না, আগের দিনও সে-কথা তাকে জানায়নি। তার দেখা পাওয়ার জন্য খামারবাড়ির চারিপাশে ঘুরে বেড়াল, সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় লক্ষ রাখল, কিন্তু কোথাও সে তাকে দেখতে পেল না। গির্জার প্রার্থনাসভায়ও তার দেখা পেল না। এক রবিবার উপাসনা শেষে পাদরি ঘোষণা করলেন, ভিক্টর অ্যালিয়েড মার্টিনের সঙ্গে জোসেফাইন ইসিডোর ভালির বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত-পা সমস্ত অবশ হয়ে এল, কান দুটো ঝাঁঝাঁ করে উঠল, তার কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, মনে হল রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে তার সমস্ত শিরা উপশিরায়। তার দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

একটা মাস ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়ে দিল। আবার কাজকর্মে মন দিল। তবুও চিন্তার হাত থেকে সে অব্যাহতি পেল না। মেয়েটির চিন্তা তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। মেয়েটিকে ভুলে থাকার জন্য সে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল। তার বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরল।

মেয়েটির সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে সে ওই গ্রামের একজন চাষি। যথেষ্ট অর্থ বিত্ত সম্পদের মালিক সে। সে ছিল বেনয়েস্টএর ছেলেবেলার বন্ধু। এখন তার সঙ্গে আর বেনয়েস্টএর বাক্যালাপ নেই। বন্ধুত্বের সম্পর্ক একেবারেই নেই বললেই চলে।

এক দিন সে শুনতে পেল, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। তাতে সে দুঃখে ভেঙে না পড়ে বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভাবল এটাই সব থেকে ভালো হয়েছে। এখন সে মুক্ত স্বাধীন। বোধহয় মনে প্রাণে এরকম কিছু কামনা করছিল।

এর পর বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। সে মাঝে মাঝে দেখতে পেত, পেটের মধ্যে একটা বোঝা নিয়ে মেয়েটি গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। যদি তার সঙ্গে কখনও মেয়েটির মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত—তাহলে মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করত। বেনয়েস্টও তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য ঘুরে গিয়ে অন্য পথ ধরত।

সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে বেনয়েস্ট সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। শুধু রয়ে গেল একটা স্মৃতি। সেই স্মৃতির প্রভাব এখন অনেকটাই ক্ষীণ সেটা আর তাকে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করে না। এর মধ্যে এক দিন নিছক কৌতূহলবশত মেয়েটির বাড়ির পাশের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। অনেক দূর থেকে মেয়েটির বাড়ির ছাদের দিকে তার নজর পড়ল। তার অতীতের প্রেমিকা এখন অন্য আর একজন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে বাস করে। দেখতে পেল বাড়ির আপেলগাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। বাতাসে ভেসে আসছে আপেল ফুলের মিষ্টি গন্ধ। গোবরের স্তূপ থেকে মোরগগুলো ডেকে উঠছে। কেউ এখন বাড়িতে নেই। সকলেই বসন্তের ফসল কেটে ঘরে তুলবে বলে মাঠে বেরিয়ে গেছে। একটা কুকুর ঘরের সামনে থাবার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেনয়েস্ট একটা খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কান্নার একটা প্রচণ্ড আবেগ তার ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। হঠাৎ সে ঘরের মধ্যে থেকে নারীকণ্ঠের একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেল। বাঁচাও, বাঁচাও বলে কে যেন ঘরের ভিতরে চিৎকার করে কাঁদছে। সে খুঁটিটাকে শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে বুঝতে না পেরে সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। আবার ঘরের ভিতর থেকে ভেসে এল সেই করুণ আর্তনাদ। সে আর সহ্য করতে পারল না, দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে সে ভিতরে এসে ঢুকল, দেখল মেয়েটি মেঝের ওপর চিত হয়ে শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে, যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে। প্রসব যন্ত্রণায় সে এমনভাবে আর্তনাদ করছে।

কয়েক মুহূর্ত বেনয়েস্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের দিশাহারা অবস্থা তার মুখটাকে বিবর্ণ রক্তহীন ফ্যাকাশে করে তুলেছে। সে কাঁপতে-কাঁপতে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে বলল, "এই তো আমি, কোনো ভয় নেই।"

মেয়েটি কোনোপ্রকারে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বেনয়েস্ট, তুমি এসেছ, আমায় বাঁচাও, আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে যেয়ো না।"

সেই মুহূর্তে তার কী করা উচিত তা ভেবে ঠিক করতে না পেরে মেয়েটির মুখের দিকে বোবার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটি। যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠতে লাগল।

এবার বেনয়েস্ট মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য, তার যন্ত্রণা উপশমের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। দুহাত দিয়ে তাকে মেঝে থেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। মেয়েটি সমানে চিৎকার করে চলেছিল। সে এক এক করে তার সমস্ত পোশাক টেনে খুলে দিল। যাতে গলা থেকে চিৎকার না বেরোয় সেজন্য মেয়েটি হাত মুঠো করে কামড়ে ধরে রইল। গোরু, ঘোড়া, ছাগল প্রসব করানোর অভ্যস্ত হাত দুটো দিয়ে সে মেয়েটিকে প্রসব করানোর জন্য একই পদ্ধতি ব্যবহার করল। একটু চেষ্টা করতেই একটি হৃষ্টপুষ্ট শিশু সে তার দুহাত দিয়ে বের করে আনল। এর পর শিশুটির উপযুক্ত ব্যবস্থা করে মেয়েটির কাছে ফিরে এল। মেয়েটিকে পরিষ্কার করে, বিছানার চাদর বদলে তাকে তার ওপর শুইয়ে দিল।

মেয়েটি বলল, "সত্যিই বেনয়েস্ট, তুমি মানুষ না দেবতা, তোমার মধ্যে এত দয়া!"

মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

বেনয়েস্ট তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রেম নামক বস্তুটি তার মন থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে সমস্ত ভালোবাসা। কীভাবে যে এটা সম্ভব হল। সে নিজেই সেটা বুঝতে পারল না। গত একটি ঘণ্টার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করল—তাতে তার মন থেকে সমস্ত ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সম্পূর্ণ একটি দশকও যদি তার সঙ্গে তার দেখা না হত—তবুও বোধহয় সেটা এত বেশি কার্যকরী হয়ে উঠতে পারত না। ক্লান্ত ক্ষীণ স্বরে মেয়েটি জানতে চাইল, ছেলে না মেয়ে।

"মেয়ে। ভারী সুন্দর হয়েছে।" বেনয়েস্ট বলল।

মেয়েটি অনুরোধ করল, "আমার কাছে একবার দাও না!"

বেনয়েস্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে তার মায়ের কাছে দেবার আগেই ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ইসিডোর ভালি।

প্রথমে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। তারপর সবকিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

বেনয়েস্টও খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করে বলল, "আমি তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তোমার স্ত্রীর আর্তনাদ শুনে ভিতরে এসে ঢুকলাম। তারপর দরকারি সমস্ত কিছু করে ফেলেছি। এই দেখো ভালি, এটা তোমার বাচ্চা, বাচ্চাটাকে একবার দেখো।"

ভালি তখন কাঁদছে। সুখে আনন্দে আবেগে তার চোখ দুটো দিয়ে জল ঝরে পড়ছে অঝোরে। নীচু হয়ে সে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকে তার মুখে। এর পর বাচ্চাটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটা হাত বেনয়েস্টের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আবেগাপ্লুত স্বরে বলল, "তোমার সেই আগের বন্ধুত্ব ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে ক্ষমা করতে পার না বন্ধু!"

বেনয়েস্টও মহা আবেগে কেঁদে ফেলে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

বহু ভূমিকায়
In Various Roles

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যাদের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে সে একজন নারী যে ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত পুলিশ মহলে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তার নাম ওয়ান্দা ভন শেবার্ত। মাত্র ষোলো বছর বয়সে একজন অফিসারের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে।

কিন্তু বছর দুই স্বামীর সাহচর্য পাওয়ার পর হঠাৎ ওয়ান্দার স্বামীর মারা যায়। বিলাসব্যসনে আর আমোদ-আহ্লাদে মেতে থাকতে সে ভালোবাসত সর্বদা। আমোদ-প্রমোদ ছাড়া এক মুহূর্ত সে থাকতে পারত না বা অন্য কিছু ভাবতেও পারত না। ওয়ান্দার আর একটা বিশেষ দোষ ছিল। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে সে যেন হাঁপিয়ে উঠত।

তার স্বামীর মৃত্যুর পর দু-চারদিন যেতে না যেতেই ওয়ান্দা আর একজনের প্রেমে পড়ল। আবার সে যথারীতি আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে মত্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ এক দিন শোনা গেল, ওয়ান্দা তার নূতন প্রেমিককে নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। অনেক খোঁজখবর করে জানা গেল তারা ইতালিতে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের সম্পর্ক খুব বেশি দিন টেকেনি। তার প্রেমিক ইতালির একটা শহরে তাকে ফেলে রেখে হঠাৎ এক দিন পালিয়ে যায়।

ওয়ান্দার কাছে তখন যথেষ্ট টাকাপয়সা না থাকার জন্য সে বিপদে পড়ে যায়। যেটুকু ছিল তা দিয়ে তার কিছু দিন চলল। পয়সাকড়ি যখন সব শেষ হয়ে গেল—তখন আহার বাসস্থানের সংস্থান করা তার পক্ষে ভীষণ কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু এমন বিপদে সে বুদ্ধি বা ধৈর্য হারাল না। এবার নূতন কোনো প্রেমিকের সন্ধান না করে সে পুলিশ বাহিনীতে একটা কাজ জোগাড় করে নেয়। পুলিশের গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগের কাজ। কিছু দিনের মধ্যে সে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পুলিশের উচ্চতর বিভাগে নিজেকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ওয়ান্দা তার সৌন্দর্যের মোহে অতি অল্পসময়ের মধ্যে কঠোর মনের মানুষকেও বশীভূত করতে পারত। শুধু তাই নয়, সে ইংরেজি, জার্মানি, পোল, ফরাসি, ইতালি ও রুশ দেশের ভাষায় অনায়াস স্বচ্ছন্দে কথা বলতে ও লিখতে পারত। আর একটা বিশেষ গুণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে। যে-কোনো অবস্থা, যে-কোনো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সে কোনো অসুবিধা বোধ করত না। এছাড়া, প্রয়োজন অনুযায়ী বাসস্থান পরিবর্তন করতে তার এক মুহূর্তও দেরি হত না।

একবার জেনেভার লেকের পার্শ্ববর্তী ভিভে নামক এক শহরে বাস করার সময় এক হোটেলে জন এস জোভেদো নামে ব্রাজিলবাসী একজন তরুণের সঙ্গে তার

পরিচয় হয়। যুবকটিকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মনে হল এত সুন্দর একজন মানুষকে দেখার সৌভাগ্য তার আগে কখনও হয়নি। দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ শরীর, ঘন কোঁকড়ানো সোনালি চুলে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য, টানাটানা দুচোখে সুদূরপ্রসারী গভীর দৃষ্টি, পাকা আপেলের মতো গায়ের রং। তার অতুলনীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে বলিষ্ঠতা মিশে গিয়ে এমন অপরূপ মাধুর্য ও কমনীয়তা দান করেছে—যা খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুস্কর। ওয়ান্দা যুবকটির আকর্ষণে নিজেকে হারিয়ে ফেলল, নিঃশেষে বিলিয়ে দিল তার পায়ে।

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ওয়ান্দার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল। সে কীভাবে অর্থ উপার্জন করে সেটা সে বুঝতে পারল না। তার কেমন যেন ধারণা হল জেভেদো সম্পূর্ণ বেকার, কর্মহীন একজন যুবক। সে যখন পর পর দুবার তার কাছে টাকা ধার করল, তখন সেই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল।

তারপর হঠাৎ এক দিন আগের প্রেমিকটির মতো জোভেদো তাকে ফেলে রেখে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ধনী মহিলাকে নিয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তা কেউ জানতে পারল না।

একটি বছর সে নিঃসঙ্গ কাটিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ এক দিন লুক্কাতে গিয়ে দেখতে পায়, জোভেদো একজন ইংরেজ মহিলার হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওয়ান্দার তার প্রেমিককে চিনতে ভুল করল না। কিন্তু জোভেদো চিনেও না চেনার ভান করল। কয়েক দিন পরে স্থানীয় লোকজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল—জোভেদো সেখানে অন্য পরিচয়ে বাস করে। লুক্কার লোকেরা তাকে রোমানেসকো নামে জানে।

ওয়ান্দা একবার কয়েক দিনের জন্য হেগলোল্যান্ড নামে একটা দ্বীপে যাবে বলে স্থির করে। সেখানে দুই-একদিন কাটাবার পর সে একটা হোটেলে যায় ডিনার করতে। সেখানে সে জোভেদোকে দেখতে পায়। সে একজন রুশ মহিলার সঙ্গে পান ভোজনে ব্যস্ত ছিল। মাঝে মাঝে তারা গল্প করতে করতে দুজনে হাসাহাসি করছিল। ওয়ান্দা তাদের টেবিলে গিয়ে জোভেদোর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু সে তাকে না চেনার ভান করে বলল, "আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি হয়তো নিজের পরিচিত কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন। আপনি আমাকে আপনার কোনো পরিচিত লোক ভেবে বসে আছেন কিন্তু আমি সে লোক নই। আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।"

ওয়ান্দা বলল, "আপনি জোভেদো নন?"

"না, আমার নাম কাউন্ট দেনোবিস্কি। আমি থাকি যানকিমিয়াতে।"

ওয়ান্দা সবকিছুই বুঝতে পারল, তবুও বলল, "তাই হবে বোধহয়।"

প্রায় এক বছর বাদে জোভেদোরের সঙ্গে ওয়ান্দার আবার দেখা হল ভিয়েনার বেভেন শহরে। সেখানে সে অ্যানাস্তামিও মরোকরদাতোস নাম নিয়ে গ্রিসের একজন রাজকুমার হিসাবে পরিচয় দিয়ে বাস করছে, তার চুলগুলো আগের মতোই কালো

আছে। তবে ইদানিং সুন্দর ছাঁদের দাড়ি রেখেছে নিজের মুখে।

জোভেদো কিন্তু ওয়ান্দাকে দেখে এবার আর নিজের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করল না।

ওয়ান্দা মজা করে বলল, "এবার কি কোনো নিগ্রো রাজা সাজার ইচ্ছা আছে?"

ওয়ান্দাকে অনুরোধ করে বলে সে যেন তার আসল পরিচয় প্রকাশ করে না দেয়।

জোভেদো সেসময় অস্ট্রিয়ার এক কাউন্টকন্যার সঙ্গে প্রেমের খেলায় মেতে উঠেছিল। মেয়েটির সঙ্গে জোভেদোর পরিচয় হওয়ার আগে সে একজন স্থানীয় অফিসারের প্রেমে পড়েছিল কিন্তু জোভেদোকে দেখার পর তার পরিচয় পেয়ে সেই অফিসারকে ছেড়ে সে জোভেদোর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যায়।

কোনো এক পরিস্থিতিতে ওয়ান্দার সঙ্গে সেই অফিসারের আলাপ হয় এবং ওয়ান্দা তাকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। এদিকে কাউন্টকন্যাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের মধ্যে ডুয়েল লড়ার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা আর ততদূরে এগোয়নি। সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়তেই প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ জোভেদোকে গ্রেপ্তার করে আর কাউন্টকন্যা আবার তার পূর্বের প্রেমিকের কাছে নিজের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং প্রেমিক তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে গ্রহণ করে।

তামাকের দোকান
The Tobacco Shop

অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম, বারভিলারের যাদুঘরটা দেখতে যাব। এক দিন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। বারভিলারে চলে গেলাম যাদুঘর দেখতে। সবকিছু দেখার পর যাদুঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এর পর হাতে যথেষ্ট সময় ছিল বলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম হালকা মেজাজে। তখন বিকেল চারটে, সাড়ে চারটে হবে।

কী করে সময় কাটাব বুঝতে পারছিলাম না। ঘুরতে ঘুরতে ধূমপানের নেশাটা বেশ চাগিয়ে উঠল। সেজন্য একটা দোকানের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম। রাস্তার ওপারে কোণের দিকে গাছের নীচে একটা সিগারেট চুরুটের দোকান দেখতে পেলাম। এক বাক্স সিগার কেনার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম দোকানি একজন স্ত্রীলোক। চুরুটের কয়েকটা বাক্স সে আমাকে দেখাল। কিন্তু একটা ব্র্যান্ডও পছন্দ হল না।

স্ত্রীলোকটির বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হতে পারে। শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালোই। মুখের আকার গোল, মাথার চুলগুলো কালো। মহিলাটিকে দেখে মনে হল, তাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি কিন্তু কোথায় দেখেছি তা ঠিক মনে করতে পারলাম না। আবার ভালো করে মুখের দিকে তাকালাম। আবার মনে করার চেষ্টা করলাম এবং যথারীতি আবার মুখের দিকে তাকালাম। ব্যাপারটা শিষ্টতা বা শালীনতার সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে মনে করে স্ত্রীলোকটিকে বললাম, মাফ করবেন ম্যাডাম, এভাবে আপনার মুখের দিকে বারবার তাকাবার জন্য আপনার হয়তো অন্য কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু আপনাকে আগে যে কোথায় দেখেছি সেটা ঠিক মনে করতে পারছি না বলে বারবার আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা মনে করার চেষ্টা করছি। সেজন্য দয়া করে আপনি কিছু মনে করবেন না।

সে বলল, আমারও যেন আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, তুমি কি সেই যাকে হঠাৎ দেখেছিলাম।

কাছাকাছি কেউ আছে কি না, সেটা বোঝার জন্য চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, তুমি জর্জ না!

আমি বললাম, তোমার ধারণা ঠিক, আমিই জর্জ।

চুপ চুপ, খুব সাবধানে কথা বল, কেউ যেন শুনতে না পায়।

আমি তাকে ঠিকই চিনেছি। সেই রোগা চেহারার মেয়েটি এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে। তাকে একজন বেশ গিন্নিবান্নির মতো মনে হচ্ছে। সেসময় আমাদের জীবনযাত্রা ছিল অন্যরকম। আমরা একটা গ্রামের নদীর জলে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে তার ওপর বাস করতাম বেদেদের মতো এবং সেই জীবনে আমার রীতিমতো অভ্যস্ত

হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের দলটা ছিল বারো-তেরোজনের। এদের মধ্যে কয়েকজনকে বাজার-হাট করার জন্য বাইরে বেরোতে হত, কাজ মিটে গেলে তারা আবার ফিরে আসত আর বাকিরা নৌকো থেকে নামত না বললেই চলে। এর মধ্যে কোথা থেকে একটা মেয়ে এসে আমাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বলে যে তার থাকবার মতো নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। তাকে আশ্রয় দিতে আমাদের কোনো আপত্তি হল না। দুই-একজন একটু আপত্তি করেছিল কিন্তু তাদের আপত্তি ধোপে টিকল না। সুতরাং সে আমাদের সঙ্গে রয়ে গেল।

আমি জানতে চাইলাম, সে কেমন আছে। সে সবল, আগের থেকে একটু ভালো।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি সরাসরি সেই গ্রাম থেকে আসছ?

সে বলল, না, আমি আসছি প্যারিস থেকে।

আমি জানতাম না সে কোথায় থাকত এবং কীভাবে তার চলত। তাই জিজ্ঞেস করলাম, প্যারিসে কী করতে, কীভাবে তোমার দিন চলছিল, কোথায় বা বাস করতে সেখানে?

সে বলল, আমি ম্যাডাম ব্যাভেলের দোকানে অন্য পাঁচ-ছয়জন মেয়ের সঙ্গে কাজ করতাম। থাকতাম তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ম্যাডামের ব্যাবসা সেসময় মন্দা চলছিল, রোজগারপাতি ছিল না বললেই চলে। ম্যাডাম ব্যাভেল এক দিন বললেন, তোমরা যদি তোমাদের রোজগার বাড়াতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। ম্যাডামের আসল নাম ছিল ইর্মা। প্রথমে তাঁর কথা বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, ব্যাপারটা জলের মতো সোজা। আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, তখন তোমরা পাঁচজন ভালো পোশাক পরে, সাজগোজ করে এক একটা ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে। দেখবে, পুরুষদের কেউ না কেউ, তোমাদের দেখে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে আসবে, তখন তাকে বেশ করে জড়িয়ে ধরে থাকবে। তারপরে তার কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে বলবে, তোমরা তাঁকে চিনতে ভুল করেছ। ভেবেছিলে তিনি তোমাদের চেনাজানা পরিচিত কেউ হবেন। তিনি যেন কিছু মনে না করেন। তখন কিন্তু সেই লোকটি তোমাদের নরম শরীরের স্বাদ পেয়ে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তখন তোমাদের আসঙ্গলিপ্সায় তোমাদের তিনি ছাড়তে চাইবেন না। তখন তোমরা তাঁকে কোনো হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। এর পর লোকটির সঙ্গে হোটেলে গিয়ে রাতের খাবার খাবে এবং বেশকিছু টাকাপয়সা আদায় করে ফিরে আসবে।

ইর্মা ছিলেন আমাদের থেকে অনেক বেশি সুন্দরী। তাঁর সৌন্দর্যের মোহে মন্ত্রীসভার এক সদস্য নাকি তাঁর প্রেমে মজেছিলেন। তাঁর হাবভাবে মনে হত রাজরাজড়াদের ঘরণী হবার জন্য তিনি জন্মেছেন। ইর্মাকে নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম।

এক দিন ইর্মা যখন বাইরে বেরিয়ে গেলেন, আমরা রীতিমতো সাজগোজ করে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় একজন লোক

আমাকে দেখেই গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল আর আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরলাম বেশ জোর করে। পরে আমার নিজের ভুলের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে কাঁদতে লাগলাম। তখন সে ভয়ংকর অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে শান্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। নানাভাবে আমাকে বোঝাতে লাগল। তখন আমি কান্না বন্ধ করলাম। এর পরে সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমার ঠোঁটে গালে চুমু খেতে লাগল। তারপর আমি একবার বলতেই সে আমাকে নিয়ে এল একটা হোটেলে।

কিন্তু এধরনের প্রেমের অভিনয় করতে করতে আমি ক্রমশ নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। এরকম জঘন্য একটা জীবন আমার কাছে ভীষণ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মনে প্রাণে চাইছিলাম—এথেকে মুক্তি পেতে।

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এই দোকানটা করার মতো পয়সা পেলে কোথা থেকে।

সে বলল, প্যারিসে যে বাড়িটায় আমি বাস করতাম, তার সামনে একটা ঘরে একজন কলেজের ছাত্র পড়াশোনা করত। আমাকে দেখে সে যথারীতি আমার প্রতি আকৃষ্ট হল। এক দিন সে আমাকে তার ঘরে যেতে বলল, আমি এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ঘরে যেতেই দেখি সে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার শরীরের বিশেষ অঙ্গটি কঠিন হয়ে তীরের মতো এক সরলরেখায় অবস্থান করছে। আমি তাই দেখে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আমার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলে তাকে চোখের ইশারা করলাম। মুহূর্তের মধ্যে সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘণ্টাখানেক পরে দুজনে যখন আমরা শান্ত হলাম—তখন সে আমাকে বেশকিছু টাকা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তার সঙ্গে আমার যৌনসংসর্গের ফলে আমাদের এক পুত্রসন্তান জন্মাল। তার নাম রাখা হল রোজার। তাকে লালনপালন করার জন্য সে মাসে মাসে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পরের দিকে সে সরকারের উঁচু পদে কাজ পেয়ে এই দোকানটা কিনে দেয় এবং সমস্ত মালপত্র দিয়ে সাজিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

এর পর সে তার ছেলে রোজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তার মধ্যে লম্বা চেহারার ভদ্র একজন যুবককে খুঁজে পেলাম। জানতে পারলাম, মেয়রের অফিসে সে এখন কেরানির কাজ করে, আর এখন থেকে তৈরি হচ্ছে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য।

আমি আর বেশি কিছু না বলে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য শান্তি কামনা করে হোটেলে ফিরে এলাম।

এক দিনের গ্রাম পর্যটন
A Country Excursion

ম্যাডাম দুফোরের জন্মদিনে প্যারিসের গ্রাম্য পরিবেশে কোনো রেস্টুরেন্টে ওরা লাঞ্চ করবে বলে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আসছে। মঁসিয়ে দুফোর একটা গোরুর গাড়ি জোগাড় করে নিজেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চললেন। ম্যাডাম দুফোর সুন্দর পোশাক পরে স্বামীর পাশে বসেছিলেন।

তাঁর ছত্রিশ বছরের শরীরটা পূর্ণ প্রস্ফুটিত যৌবনের অহংকারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের একমাত্র মেয়ে ম্যাদময়জেল দুফোর একজন হলদে চুলওয়ালা যুবককে পাশে নিয়ে বসেছিল। বুড়ি ঠাকুরমাও তাদের সঙ্গে এসেছিলেন।

নিউইলি নদীর ব্রিজের ওপরে যখন গাড়িটা এসে পৌঁছোল তখন মঁসিয়ে দুফোর বললেন, আমরা শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে এসে পড়লাম।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন ম্যাডাম দুফোর। তাঁদের গাড়িটা যখন কারবিভয়ের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল—দুপাশের পথের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। স্যানয়িস পাহাড়ের কোলে রাজকীয় মর্যাদায় দাঁড়িয়ে আছে আরজেন্টিউল গির্জা। সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে গ্রাম আর গ্রামের পিছন দিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে সবুজ বনানী।

সকালের সূর্যের শান্ত স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে তাঁদের মুখের ওপর। রাস্তার এক দিকে দেখতে পাওয়া গেল একটা পরিত্যক্ত গ্রাম। গ্রামের সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় সেখানে সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা যেন ঘিরে রেখেছে গোটা গ্রামটাকে। সম্ভবত কোনো এক সময়ে কোনো মহামারীর প্রকোপে এই গ্রামের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঙাচোরা কতগুলো বাড়ির কঙ্কাল। সে সমস্ত বাড়ি এখন শূন্য। ছোটো ছোটো অনেকগুলো কুঁড়েঘর সেগুলো অসম্পূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোথাও বন্ধ্যা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে কারখানার চিমনি।

শেষ পর্যন্ত, দ্বিতীয়বার তাঁদের সেন নদীর সেতু পার হতে হল। সেতুর ওপর দিয়ে যখন গাড়িটা এগিয়ে চলেছিল তখন তাঁদের মন আনন্দে ভরে উঠল। নদীর বুকে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছিল তার স্বচ্ছ জলধারা। নিশ্বাসের সঙ্গে মুক্ত বাতাস টেনে নিতেই তাঁদের সমস্ত মন শরীর প্রফুল সতেজ হয়ে উঠল। এখানে চিমনির কালো ধোঁয়ায় দূষিত হয়ে ওঠেনি—স্বচ্ছ বাতাস।

পথের ধারেই একটা রেস্টুরেন্ট পাওয়া গেল। সাইনবোর্ডের ওপর রেস্টুরেন্টের নামের সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, স্টু, ফ্রায়েড ফিশ, বড়ো বড়ো খোলামেলা ঘর, ছায়াচ্ছন্ন পথ আর সুন্দর সুন্দর দোলনা।

মঁসিয়ে দুফোর তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা তোমার পছন্দ? কী ঠিক করলে, এখানেই থাকবে তো?

জায়গাটা সকলের পছন্দ হলে গাড়িটাকে এনে দাঁড় করানো হল রেস্টুরেন্টের উঠোনে। উঠোনের দুপাশে বিরাট বিরাট মহিরুহ স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিল। পিছন দিকের অংশটা যা নদী থেকে একটা খালের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য দিকে তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে।

হোটেলের পরিচারিকা তাঁদের কাছে এগিয়ে এল তাঁরা কী খাবেন জানার জন্য। ম্যাডাম দুফোর লাঞ্চের অর্ডার দিলেন, মাছ ভাজা, স্যালাড, খরগোশের স্টু আর ডেসার্ট (এক ধরণের মদ)। বললেন, এখানে এই নরম ঘাসের ওপর বসেই আমরা লাঞ্চ করব। একটু দূরে একটা গাছের নীচে বসে দুজন যুবক খাওয়াদাওয়া করছিল। ওঁরা যখন সেদিকটায় এগিয়ে গেলেন তখন তারা সসম্ভ্রমে সেখান থেকে উঠে ঘাসের ওপর গিয়ে বসল। কারণ সকলের বসার জন্য যথেষ্ট চেয়ার সেখানে ছিল না।

উঠোনের এক দিকে একটা দোলনা ছিল। ম্যাডাম দুফোর সেটাতে বসে তাঁর স্বামীকে ডেকে বারবার অনুরোধ করে বলতে লাগলেন, সিপরিয়ান, দোলনাটা একবার দুলিয়ে দাও। তাঁর অনুরোধে স্বামী সিপরিয়ান জামার আস্তিন গুটিয়ে অনেক মেহনত করে শেষ পর্যন্ত দোলনাটাকে গতিযুক্ত করে তুললেন। এইভাবে কিছুক্ষণ দোল খাওয়ার পর পরিচারিকাটি খাবার নিয়ে এলে—তাঁরা সকলে খেতে বসলেন। একটু দূরেই যুবক দুটি ঘাসের ওপর বসে খাওয়াদাওয়া করছিল। যুবক দুটির পরিধানে ছিল টাইট জিনসএর প্যান্ট, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। ফলে তাদের পেশিবহুল বলিষ্ঠ হাতগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এত সুন্দরভাবে সুগঠিত হয়ে উঠেছিল যা একমাত্র নিয়মিত ব্যায়ামচর্চার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। সৌষ্ঠবসমৃদ্ধ তাদের ওই বলিষ্ঠ শরীরের দিকে তাকাতে গিয়ে কেমন যেন লজ্জা পাচ্ছিল ম্যাদময়জেল দুফোর। কিন্তু ম্যাডাম দুফোর আড়চোখে বারবার তাদের অনাবৃত পেশিবহুল হাতগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং পা-দুটো গুটিয়ে উবু হয়ে বসে এমনভাবে শরীরটাকে ঘোরাতে লাগলেন—মনে হল তাঁর শরীরের কোথাও পিঁপড়ে ঢুকেছে। যুবক দুটির অতিরিক্ত বিনয় ও ভদ্রতা কিন্তু মঁসিয়ে দুফোরকে খুশি করতে পারল না। তাদের ব্যাপারে তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

ম্যাডাম দুফোর নিজেই আলাপ করলেন দুই যুবকের সঙ্গে। তিনি বললেন, আজকের আবহাওয়াটা খুব চমৎকার, তাই না?

"হ্যাঁ, ম্যাডাম, সত্যিই আজকের আবহাওয়াটা ভারী সুন্দর। আপনারা কি প্রায়ই এদিকটাতে বেড়াতে আসেন?"

"হ্যাঁ, খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে বছরে দু-একবার আসতে হয়। আর মঁসিয়ে আপনি?"

"আমি প্রতিদিনই এখানে আসি আর এখানেই রাত কাটাই।"

"বাঃ, ভারী সুন্দর তো!"

"নিশ্চয় ম্যাডাম।" এর পর তাদের মধ্যে একজন এই স্নিগ্ধ শান্ত ও স্বচ্ছ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের এমন একটা পরিচ্ছন্ন নিখুঁত চিত্র মাড়ামের সামনে তুলে ধরল, তা শুনতে শুনতে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যে। তাঁরা সারাদিন চার দেয়ালে আঁটা একটা ছোট্ট দোকান ঘরের মধ্যে আবন্ধ থেকে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, তরঙ্গায়িত নদী, গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের শনশন শব্দ, পাখির মিষ্টি গান, জানা অজানা ফুলের সুগন্ধ—প্রকৃতির এই সমস্ত দানের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হন তাঁরা। দোকান ছেড়ে ইচ্ছামতো বেরিয়ে আসতে পারেন না। সারাবছরে দু-একবার মাত্র একটা দিনের জন্য মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেন।

মেয়েটি তাদের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল।

মঁসিয়ে দুফোর এই প্রথম কথা বললেন, সত্যিই এই জীবন অত্যন্ত আনন্দ ও শান্তির। ম্যাডাম দুফোর জিজ্ঞেস করলেন, আর একটু খরগোশের স্টু নেবে?

"না, ধন্যবাদ।" সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু দিয়ে, ম্যাডাম দুফোর যুবক দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "পাতলা পাতলা গেঞ্জি পরে আছ তোমরা, তোমাদের কি ঠান্ডা লাগে না?"

তারা তাঁর কথা শুনে হেসে উঠল, তারা অসম্ভব কষ্ট সহ্য করতে পারে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে কনকনে ঠান্ডা জলে স্নান করতে পারে, কুয়াশাচ্ছন্ন ঘন-অন্ধকার রাত্রিতে তারা স্বচ্ছন্দে দাঁড় বাইতে পারে—এরপর বুকে চাপড় মেরে বোঝাতে চাইল তাদের বুকের পাটা কতখানি কঠিন তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে তাঁরা তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মঁসিয়ে দুফোর বললেন, "তোমাদের দেখলে বেশ শক্তিশালী বলে মনে হয়।" এদিকে ম্যাদময়জেল দুফোর এর প্রেমিক হলুদ চুলওয়ালা যুবকটি মদ খেয়ে খকখক করে কাশছিল।

ইতিমধ্যে রোদের তাপ প্রচণ্ডরকম বেড়ে উঠেছে, প্রবহমান নদীর জল দেখে মনে হচ্ছিল আগুনের স্রোত বয়ে চলেছে। সকলেই যথেষ্ট মদ খেয়েছে, ফলে নেশার ঘোর এসে গিয়েছিল সকলের মধ্যে।

এর পরে কফি দিয়ে গেল হোটেলের পরিচারিকাটি। যুবক দুটি এর মধ্যে মহিলা দুজনকে হেসে জিজ্ঞেস করল, আমরা নৌকো নিয়ে বেরোচ্ছি, আপনারা কি খানিকক্ষণ নৌকোয় করে ঘুরে আসতে চান?

মঁসিয়ে দুফোরকে তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর কথা কিছুই বুঝতে না পেরে মাতালের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এবং একটু পরেই নেশার ঘোরে তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল। তাঁর পাশেই হলদে চুলওয়ালা যুবকটি বসে বসে ঘুমোচ্ছিল।

ম্যাডাম দুফোর যখন এক যুবকের নৌকোয় উঠে বসলেন তখন সে তাঁকে নদীর অপর পারে ছোট্ট জঙ্গলটা দেখতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। দেখতে দেখতে ম্যাডাম দুফোরকে নিয়ে যুবকটি তিরবেগে বেরিয়ে গেল। কিন্তু হেনরিয়েত্তি যে

নৌকোটায় ছিল, তার চালক সেই যুবকটি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল তার নৌকাটানার গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়ল। তার ভয়ংকর আবেগ তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে তুলল। হেনরিয়েত্তি এই জলের মধ্যে ভেসে বেড়ানোর আনন্দকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করছিল। অন্য কোনো কিছু ভাবতে তার মোটেই ভালো লাগছিল না। আনন্দ উপভোগের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার মনটাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, তার রক্ত ফুটছিল টগবগ করে।

তাদের নীরবতা তাদের আবেগকে অনেকটাই বাড়িয়ে তুলল। অনেক চেষ্টা করে সে মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করল।

"হেনরিয়েত্তি।"

"আমি হেনরি।"

অন্য নৌকোটা ম্যাডাম দুফোরকে নিয়ে অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। সম্ভবত তারা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

"আমাদের সঙ্গে বনের মধ্যে দেখা হবে। ম্যাডাম দুফোর-এর পিপাসা পেয়েছে। তাঁকে নিয়ে এখন আমি রবিনসনের বাড়িতে যাচ্ছি।" এই বলে সে দ্রুত দাঁড় টেনে চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্য নৌকোর যুবকটি হেনরিয়েত্তিকে বলল, শুনতে পাচ্ছেন কী মিষ্টি সুরে একটা নাইটিঙ্গেল পাখি ডাকছে। আগে কখনও সে নাইটিঙ্গেল পাখির ডাক শোনেনি, ওই মিষ্টি সুর তার মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল অদ্ভুত একটা রোমান্টিক অনুভূতি। এরপর সে নাইটিঙ্গেল পাখির ডাক শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

"তাহলে চলুন, আমরা নিঃশব্দে বনের মধ্যে কোথাও গিয়ে বসি। সেখানে স্পষ্ট করে নাইটিঙ্গেল-এর ডাক শুনতে পাব।"

এরপরে নৌকো থেকে নেমে হেনরিয়েত্তি হেনরির হাত ধরে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এর পর তারা গুঁড়ি মেরে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গেল। তাদের মাথার ওপরে একটা গাছের ডালে সেই নাইটিংগে পাখিটা গান গেয়ে চলেছিল মিষ্টি সুরে। তারাও একটা কথা না বলে চুপ করে বসে রইল পাছে পাখিটা ভয় পেয়ে উড়ে পালায়। তারা ঘন হয়ে পরস্পরের পাশে বসে রইল। ধীরে ধীরে হেনরি মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে মৃদু চাপ দিতে লাগল, হেনরিয়েত্তি কিছু বলল না। কিন্তু যখন সে তাকে জড়িয়ে ধরল তখন হেনরিয়েত্তি স্বাভাবিক প্রবণতায় তার হাতটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

হেনরিয়েত্তি আনন্দের আবেগে শুনে চলেছিল পাখির গান। তার মনটা এক অদ্ভুত আবেগে মথিত হতে লাগল, এক অপূর্ব কোমল আবেশে তার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। তার স্নায়ু এত শিথিল হয়ে পড়ল যে সে কাঁদতে শুরু করল। কান্নার কারণটা সে নিজেই বুঝতে পারল না।

ম্যাডাম দুফোর নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও বসে আছেন, কারণ মাঝে মাঝে তাঁর টুকরো হাসির শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল।

মেয়েটি তখনও কেঁদে চলেছিল ব্যাকুল আবেগে। হেনরি তার কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা রেখে চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ সে হেনরিয়েত্তিকে চুম্বন করল। কিন্তু এতে হেনরিয়েত্তি খুব বেশ অবাক হল। এবার রেগে গিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে উঠে পড়ল। তারা দুজনে এক অদ্ভুত লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গেল। কেউ কারও দিকে তখন মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। তারা কেউ কাউকে স্পর্শ না করে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল নৌকোটার দিকে। তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে যেন ঘৃণা ও শত্রুতার একটা অনতিক্রম্য দূরত্ব। মাঝে মাঝে হেনরিয়েত্তি মা, মা বলে চিৎকার করে ডেকে উঠছিল।

এর মধ্যে ম্যাডাম দুফোর জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গীর গললগ্ন হয়ে। যুবকটির মুখে তখন হাসির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে।

ওঁরা দুজনে এবার যাঁর যাঁর নৌকোয় উঠে বসলেন। প্রথমে ফিরে এল হেনরি— হেনরিয়েত্তি ও সে পাশাপাশি বসে থাকলেও কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। হেনরিয়েত্তির পিছনে পিছনে এলেন ম্যাডাম দুফোর। মঁসিয়ে দুফোর অধীর হয়ে তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ার আগে হলদে চুলওয়ালা যুবকটি কিছু খেয়ে নিচ্ছিল।

যুবক দুজন সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। পরস্পরের দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলের মধ্যে সকলে বিদায় নিল।

দুমাস পরে এক দিন যখন হেনরি রু ডেস মারটিয়ারস এর পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, সে একটা দরজায় নেমপ্লেটে 'দুফোর আইরনমংগার' নামটা দেখতে পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দেখল, ম্যাডাম দুফোর কাউন্টারে বসে আছেন। তারা উভয়ে উভয়কে খুব সহজেই চিনতে পারল। সম্ভাষণ বিনিময়ের পর, হেনরি সকলের খবর নিল, বিশেষভাবে জানতে চাইল হেনরিয়েত্তির কথা।

ম্যাডাম দুফোর বললেন যে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

"কার সঙ্গে বিয়ে হল ম্যাডাম?"

"যে যুবকটি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল, তার সঙ্গে। ও এখন আমাদের ব্যাবসার একজন অংশীদার।"

"হ্যাঁ, তার কথা আমার খুব মনে আছে।"

হেনরি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন ম্যাডাম দুফোর তাকে ডেকে লজ্জাজড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বন্ধুটি কেমন আছে?"

"সে খুব ভালো আছে।" এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

দরকারি বাড়ি
A Useful House

রোঁয়ামত যখন বন্ধুদের কাছে গল্পটা বলবে বলে ঠিক করল—তখন সেটা মনে করে নিজেই এমনভাবে হাসতে লাগল, তার ভারী শরীরটা হাসির দমকে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

রোঁয়ামত বলল, "আজ আমি তোমাদের এমন একটা ঘটনা বলব, যা শুনে তোমরা বেশ মজা পাবে। ঘটনাটা হল একজন কীভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে, তার বন্ধুর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে পাওনাদারদের যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।"

রোঁয়ামতের এক বন্ধু বলল, "আজেবাজে না বকে আসল ঘটনাটা বল।"

রোঁয়ামত বলল, "শোনো তাহলে, এই কাহিনির প্রধান নায়ক হল বর্দেলেভ। সে ছিল ভীষণ গরিব, একেবারে নিজস্ব কপর্দকশূন্য বললে চলে। এহেন বর্দেলেভ তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই প্রকাশ করবে বলে স্থির করেছিল। বইয়ের ভূমিকাটা লিখে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন বদেভিলের একজন নামকরা লেখক।

এদিকে কুলেনাত নামে যে একজন যুবক ছিল, সে ছিল বিরাট ধনী। তার ধনৈশ্বর্য, অর্থবিত্তের পরিমাণ এত বেশি ছিল সে নিজেই তার হিসাব জানত না। এহেন কুলেনাতের সঙ্গে বর্দেলেভের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। এক সময় হয়তো বর্দেলেভের ধনৈশ্বর্যের অভাব ছিল না, কিন্তু এখন সবকিছু তার দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে। সে এখন কপর্দকশূন্য, নিজস্ব। কিন্তু কুলেনাতের সম্পত্তি থেকে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ কম করে বারো লক্ষ ফ্রাঁ। তা ছাড়া সামরিক বিভাগে কনট্রাক্টরি করে কুলেনাতের উপার্জন হয় প্রচুর।

কুলেনাত ছিল যেমন অসম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির, বর্দেলেভের চরিত্র ছিল তার বিপরীত। রঙ্গরসিকতা, হাসিঠাট্টায় তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। সে ইহুল্লো, আনন্দ, উচ্ছলতায় সে গোটা পরিবেশটাকে মাতিয়ে রাখে। সে যতক্ষণ কুলেনাতের সঙ্গে থাকত, ততক্ষণ কুলেনাত সমস্ত গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে নিজেই হইহুল্লোড় রঙ্গরসিকতায় তার শামিল হত। সেজন্য কুলেনাত মনে মনে তার বন্ধুর প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞ ছিল এবং তাকে বিশেষ পছন্দ করত। সমস্ত কাজে কুলেনাত বর্দেলেভের মতামত নিত। কোন্ মেয়েকে সে মেলামেশার জন্য বেছে নেবে, কার সঙ্গ তার পক্ষে উপযুক্ত হবে—সে সমস্ত কিছু ঠিক করে দিত বর্দেলেভ। এমনই অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল বর্দেলেভের সঙ্গে কুলেনাতের।

হঠাৎ এক দিন প্যারিসের এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে কুলেনাতের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তরুণীর নাম সুজেত্তেমার্লি। সে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে এল। বর্দেলেভের পরামর্শমতো কুলেনাত একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। নিরিবিলি ছিমছাম বাড়িটা দেখে তার খুব পছন্দ হল। বাড়িতে ঢোকার রাস্তাটাতে বিছানো আছে

লাল কাঁকর, রাস্তার দুপাশে রংবেরং-এর ফুলগাছের সমারোহ। পিছনের দিকে একটুখানি ঝোপ, মাঝে মাঝে দু-একটা পাইন গাছ। পাতার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে নাইটিংগেল পাখির গান। নবদম্পতির রোমান্সের পক্ষে সব থেকে উপযুক্ত ও যোগ্য একটা পরিবেশ।

যে বাড়িটা কুলেনাত ভাড়া নিয়েছিল, সেটা ছিল একটা দোতলা বাড়ি আর দোতলায় থাকত কুলেনাত তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে আর একতলায় থাকত বর্দেলেভ সম্পূর্ণ একা।

বর্দেলেভ একবার তার নীচের ঘরে একটা ভোজসভার আয়োজন করল। সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এল কুলেনাত এবং তার স্ত্রী ছাড়াও আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। ডিনারপর্ব শেষ হয়ে গেলে সকলে মদ্যপান করতে করতে নিজের স্ত্রী বা প্রেমিকাদের কোলে বসিয়ে তাদের শরীরের তৃপ্তি মেটাতে লাগল। সেই সময় বর্দেলেভ একা একা একটা জায়গায় বসে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করে চলেছিল। ঠিক সেই সময় একজন চাকর এসে বর্দেলেভকে বলল, বসার ঘরে একজন ভদ্রলোক আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ দরকার আছে।

বর্দেলেভ তার কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল, বলল, এখন আমি ব্যস্ত আছি—এখন তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।

চাকরটা বলল, উনি বলেছেন, আপনি যদি তার সঙ্গে দেখা না করেন, তাহলে তিনি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবেন।

কীজন্য ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, সে-কথা বুঝতে বর্দেলেভের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। বর্দেলেভ বসার ঘরে গিয়ে দেখল, একজন ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে একটা কাগজ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন তো, এই চুক্তিপত্রে আপনার স্বাক্ষর আছে কি না? এই স্বাক্ষর নিশ্চয়ই আপনি করেছেন।"

বর্দেলেভ বলল, "হ্যাঁ, এ সই আমার।"

ভদ্রলোক বললেন, "নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও আপনি ঋণের টাকা পরিশোধ করেননি। এই মুহূর্তে যদি আপনার ঋণের সমস্ত টাকা আমাকে না দেন তাহলে এই বাড়িতে যে সমস্ত আসবাবপত্র আছে আমি সব সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আদালত থেকে দুজন লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, তারা বাইরে অপেক্ষা করছে।

প্রকৃতপক্ষে বাড়িটা ছিল বর্দেলেভের। সে তার বন্ধু কুলেনাতকে ভাড়া দিয়েছিল। অন্য কোনো উপায় না দেখে সে কুলেনাতকে সবকথা জানায়। কুলেনাত যখন দেখল যে, সমস্ত সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র, সুন্দর সুন্দর মূল্যবান সমস্ত অয়েল পেন্টিং এবং অন্যান্য দামি দামি জিনিসপত্র তার স্ত্রী এবং বন্ধুবান্ধবের সামনে থেকে ঋণের দায়ে আদালতের লোকগুলো এক এক করে বের করে নিয়ে যাবে, তখন সেই লজ্জা ঢাকার জন্য সে বাধ্য হয়ে সমস্ত ঋণের টাকা মিটিয়ে দিল।

বার্দেলেভ নিজের বাড়িটাই বুদ্ধি করে তার বন্ধুকে ভাড়া দিয়েছিল এবং এইভাবেই সে যাত্রায় পাওনাদারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

রজারের পদ্ধতি
Rozer's Method

রজার ছিল আমার বন্ধু। এক দিন তার সঙ্গে আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একজন কাগজের হকার পাশ দিয়ে চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে, শাশুড়িদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার নূতন উপায় আবিষ্কার হয়েছে—এক কপি কিনে পড়ে দেখুন।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তাকে বললাম, একটা কথা মনে পড়ে গেল, আচ্ছা তোমার স্ত্রী প্রায়শ বলেন, "রজারের পদ্ধতি" "রজারের পদ্ধতি"—আচ্ছা ব্যাপারটা কী আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো। তোমার স্ত্রী এমন লজ্জা মাখানো ব্রীড়ার ভঙ্গি তে কথাগুলো উচ্চারণ করেন মনে হয় ব্যাপারটার মধ্যে প্রেমজনিত কোনো রহস্যময় গোপন ব্যাপার লুকিয়ে আছে। একমাত্র তুমিই জান সেই রহস্য সমাধানের সূত্র। যখনই কেউ প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—তখনই তোমার স্ত্রী তোমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে বলেন, তুমি কেন তোমার পদ্ধতির কথাটা ওদের বলে দিচ্ছ না? সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যখনই তোমার স্ত্রী ওই পদ্ধতির কথাটা বলেন তখনই তুমি লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু কর, ব্যাপারটা কী?

রজার বলল, অবশ্যই এর পিছনে একটা কারণ আছে। অবশ্য আমার স্ত্রী যদি আসল ব্যাপারটা জানত তাহলে সে আর ওধরনের কথা উচ্চারণ করত না। তোমাকে ঘটনাটা বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সাবধান, কেউ যেন সেটা জানতে না পারে, কথাটা যতদূর সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করবে।

আমার সঙ্গে যে একজন বিধবার প্রেম ছিল, একথা নিশ্চয়ই তুমি জানতে। আর তাকেই যে আমি বিয়ে করেছি—একথাটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। আমার স্ত্রীর একটা বাজে অভ্যাস আছ, সে সব সময় বেশি কথা বলা পছন্দ করে। বিয়ের আগে থেকেই আমরা কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে গল্পসল্প করতাম আর আমাদের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা হত সেগুলো ছিল বেশ রসাত্মক। বিধবা মহিলারা সেই সব কথা বলতে বেশি ভালোবাসে। অসভ্য বা অশ্লীল কথাবার্তায় কারও যেহেতু ক্ষতির কারণ হয় না, সেহেতু সে সব সময় ওই সব কথা বলত বেশ সাহসের সঙ্গে। আর সেই সব কথা শুনে আমি যথারীতি লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম। বিয়ের আগে ওই সমস্ত অশ্লীল বিষয়ের অবতারণা করে এমন সব প্রশ্নে আমাকে এমনভাবে অস্থির করে তুলত যার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, তার ওই অশ্লীল কথাবার্তা ও বাচালতার আকর্ষণে আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। যদি প্রশ্ন কর আমি তাকে ভালোবাসি কি না, তাহলে বলব, তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তাকে আমি ভালোবাসি আর আমার স্ত্রী সে ব্যাপারটা বেশ ভালো করেই জানে।

স্থির করলাম, বিয়ে হবে সাদামাঠা ভাবে। হইচই বা আনন্দ হবে না। শুধু যারা সাক্ষী দেবে তারাই আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবে। তারপর আমরা কিছুক্ষণের জন্য প্রমোদ বিহারে বেরিয়ে পড়ব। রাত্রিতে বাড়ি ফিরে আমরা ডিনার করব। সাক্ষীরা সেইমতো তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়ার কাজ শেষ করে যে যার মতো বিদায় নিলেন। গেটের মুখে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, কোচম্যানকে নির্দেশ দিলাম, ব্যয় দ্য বোলেন-এ আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। জুন মাসের তখন শেষের দিক। নানা বর্ণের, নানা গন্ধের ফুলের শোভায় সেজেছে প্রকৃতি।

দুজনে গাড়ির মধ্যে যখন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে বসলাম, সে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল, তারপর বলল, মশাই, এবার বুঝব তুমি কেমন বীর, এবার তোমার যোগ্যতার প্রমাণ দাও, দেখি তুমি এ ব্যাপারে কতটা দক্ষ।

এই আহ্বান আমাকে কেমন যেন বিবশ বিভ্রান্ত করে ফেলল। আমি একটু দ্বিধার সঙ্গে তার হাতে চুমু খেলাম। তারপর একটু সাহস পেয়ে তার ঘাড়ের পিছনে বারদুই চুমু খেলাম। কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ির মধ্যে বসে এই সমস্ত ব্যাপারে বীরত্ব দেখাবার সাহস যেন আমার হারিয়ে গেল। রাস্তায় লোকজন দেখে আমার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। আর আমার ওই অবস্থা দেখে সে আমাকে ঠাট্টা করে খেপাতে লাগল। এর পর যা হবার তা হল... বেশ কিছুক্ষণ ধরে। সব শেষ করে আমি যেন কেমন নেতিয়ে পড়লাম। প্রকাশ্য রাজপথে, রাস্তার এত লোকজনের মাঝখানে ওই সব কীর্তি... আমার কথাগুলো বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধা হচ্ছে না।

আমার এই বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে সে বেশ মজা পাচ্ছিল মনে হল। এর মধ্যে দু-একবার সে রসিকতা করে বলেছে—তুমি হিজড়ে না তো, আমার এখন ভয় হচ্ছে—কোনো হিজড়েকে বিয়ে করলাম কি না। তোমার জন্য আমি নিজেই নিজের কাছে খুব লজ্জায় পড়ে যাচ্ছি।

নিজেকে আমি বেশ ভালো করেই চিনতাম—কেউ যদি আমাকে একটু ভয় দেখাত তাহলে আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়তাম, সমস্ত কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতাম।

যখন আমার সঙ্গে সে ডিনারের টেবিলে এসে বসল—তখন তাকে দেখে বেশ খুশি হয়ে উঠলাম। মনে মনে বেশ গর্ববোধ করলাম, আমায় বেশ সুন্দর দেখতে তো! একই গ্লাস থেকে আমরা মদ খেলাম, একই প্লেট থেকে আমরা খাবার তুলে খেলাম। একটা বিস্কুটের দুপ্রান্ত আমরা দুজনে কামড়ে ধরে খেলাম, একই কাঁটায় খাবার তুলে পরস্পরকে খাইয়ে দিলাম।

এইভাবে দুজনে খাবার টেবিলে বসে মজা করলাম, হাসাহাসি করলাম।

সে একটু শ্যাম্পেন খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। র‍্যাক থেকে শ্যাম্পেনের বোতলটা নামিয়ে নিয়ে ছিপিটায় নিয়মমতো বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিলাম, তাতে ছিপিটা ছিটকে বেরিয়ে যাবার কথা ছিল—কিন্তু ছিপিটার তেমনভাবে লাফিয়ে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তা দেখে গ্যাব্রিয়েল হেসে উঠে বলল, লক্ষণটা খুব শুভ বলে মনে হচ্ছে না।

অনেকরকম ভাবে ছিপিটা খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে খোলা গেল না। বেশি টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে ছিপিটাই গেল ভেঙে। ছিপি খোলার যন্ত্রটা নিয়ে অনেক মেহনত করলাম কিন্তু ছিপি নাছোড়। শেষপর্যন্ত ভাঙা টুকরোগুলো ভিতরে ঢুকে যেতে চাকরটাকে ডাকতে বাধ্য হলাম। আমার অবস্থা দেখে আমার বউ তো হেসে কুটিকুটি হতে লাগল, বলল, মনে হয় তোমার ওপর নির্ভর করতে আমার খুব অসুবিধা হবে না।

দেখলাম, সে অল্প অল্প টলছে। লক্ষ করলাম কফির পেয়ালাটা যখন নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে তখন সে বেশ টলছে। বিছানায় নিয়ে যাওয়ার সময়, যেমন অবিবাহিতা তরুণী মেয়েদের কখনও গায়ে হাত বোলাতে হয়, কখনও টানাটানি করতে হয়— সেসব করার প্রয়োজন হয় না বিধবা মেয়েদের ক্ষেত্রে। গ্যাব্রিয়েল সহজ স্বাভাবিকভাবে শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। যেতে যেতে বলল, সিগারেট খাওয়ার জন্য মিনিট পনেরোর মতো স্বাধীন।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই যে মুহূর্তে গ্যাব্রিয়েলের দিকে আমার নজর পড়ল—আমি যেন কেমন দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমার সমস্ত মনের জোর হারিয়ে গেল। স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, আমি যেন কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। তবুও দুরুদুরু বুকে আমি বিছানার ওপর উঠে এলাম। সে একটা কথাও বলল না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসতে লাগল। ঠিক বুঝতে পারলাম না, সেই হাসির মধ্যে বিদ্রুপ মিশে আছে কি না। আমার সমস্ত শরীর যেন কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল, আমি যেন এক অদ্ভুত ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগলাম। আমার অসহায় অবস্থা দেখে সে বেশ মজা পাচ্ছে মনে হল। তারপর একসময় ঠাট্টা করে বলল, তুমি কি শিশুকাল থেকে এইরকম প্রাণবন্ত?

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, বলতে বাধ্য হলাম, চুপ কর তো, একেবারে অসহ্য!

তবু সে হাসতে শুরু করল, হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগল বিছানার ওপর। অনেক বললেও সে হাসি থামাল না।

সত্যি বলতে নিজের কাছে আমি নিজেই ছোটো হয়ে গিয়েছিলাম, আমার নিজের সম্মান বাঁচাতে আমি সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলাম।

মাঝে মাঝে যখন হাসির দমক একটু কমে আসছিল—সেই অবসরে সে বলল, এসো, কাছে এসো, ভয়ের কী আছে, সাহস করে এগিয়ে এসো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এর পর তার হাসির মাত্রাটা এত বেড়ে গেল, মনে হল বেশ জোরে জোরে সে কাঁদছে।

শেষপর্যন্ত আমি এতটাই বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম—যে আমি ভীষণ রেগে উঠলাম। মনে হল ওর নাকে একটা ঘুসি মেরে ওর নাকটা ভেঙে দিই অথবা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

এর পর বিছানা থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে, বাইরে বেরোনোর জন্য পোশাক পরতে লাগলাম—ওর দিকে তাকালামও না বা একটা কথাও বললাম না।

হঠাৎ সে হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। আমার রাগ হয়েছে বুঝতে পেরে বলল, 'কী হয়েছে, কোথায় যাচ্ছ?'

তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আমি রেগেমেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলাম কী করে ওর ওপর প্রতিশোধ নেব? শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, অনেকটা সময় বাইরে কাটিয়ে তবে ঘরে ফিরব। এক ধরনের পাগলামি যেন আমায় পেয়ে বসল। ভাবলাম একজন মেয়েমানুষ জোগাড় করে নিলে কেমন হয়—তাহলে বেশ দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হবে। কলাকৌশলগুলো বেশ শিখে নিতে পারব আর তার ওপর বেশ একটা প্রতিশোধ নেওয়া হবে। মনে হল আমার স্ত্রী যদি কখনও আমাকে ঠকায় তাহলে আগে থেকে সেই কাজটা করে ফেললে দোষটা কোথায়?

মন থেকে সমস্ত বিবেক বিবেচনা আর দ্বিধা দ্বন্দ্বকে বিসর্জন দিয়ে আমার জানাচেনা একটি মেয়ের কাছে ছুটে গেলাম।

সাঁতার কাটার অভ্যাসটা এখনও চলনসই আছে কি না সেটা পরীক্ষা করার জন্য একজন মানুষ যেমন পুকুর বা নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমিও তেমনি আমার পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

জলে নেমে বুঝতে পারলাম—আমি ভালোই সাঁতার কাটতে পারি, দক্ষ কোনো সাঁতারুও বোধহয় সাঁতারের প্রতিযোগিতায় আমার কাছে হেরে যাবে। প্রাণভরে সাঁতার কেটে দারুণ আনন্দ পেলাম। সারারাত ধরে আনন্দ করলাম। একটা অপূর্ব আবেশে মনটা আমার ভরে উঠল। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার মানসিক উদ্‌বেগ অনেকটাই প্রশমিত হয়ে এসেছে, অনুভব করছি আমার শবীরে শক্তির জোয়ার। প্রয়োজন হলে এখনও সেই শক্তির খেলা দেখাতে মোটেই পিছপা হব না।

বাড়িতে ঢুকেই, শোয়ার ঘরের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললাম। দেখলাম, গ্যাব্রিয়েল শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। সে আমাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল, তারপর জিজ্ঞেস করল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তো তোমার জন্যে ভেবেই মরছিলাম।

তার কথার কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজনবোধ করলাম না। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বিছানায় উঠে এলাম। বীরত্ব দেখাবার সুযোগ ছাড়তে আমি মোটেই রাজি নই।

সে আমার পৌরুষ অনুভব করে ভীষণ অবাক হল। আমার অকল্পনীয় শক্তির পিছনে যে কোনো গোপন রহস্য আছে—সে বিষয়ে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এই ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় দশ বছর আগে। অবশ্য এখন আর আমার পক্ষে সেই ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয় কোনোমতেই। তবে তোমার কোনো বন্ধু যদি বিয়ের রাতে এই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয় তাহলে এই উপায়ের কথাটা তাকে জানালে সে নিশ্চয়ই স্ত্রীর কাছে বীরের মর্যাদা লাভ করবে।

উইল
Will

রেনে দ্য ব্যুরনেভাল নামের সেই দীর্ঘাকৃতির যুবকটির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সঙ্গী হিসাবে সে সত্যিই সুন্দর। মানুষের প্রতি সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের মন্দ চরিত্র সম্বন্ধে সে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠত। সে প্রায়ই বলত—মানুষের মধ্য থেকে সমস্ত সৎগুণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে সমস্ত মানুষকে আমরা ভালো বলে জানি—তাদের মধ্যে সত্যিকারের ভালো গুণের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদেরকে একমাত্র শুয়োরের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের সেই ভালো গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সে তার অন্য দুভাইকে এড়িয়ে চলত। তাদের জন্মের মধ্যে কিছু গোলমাল ছিল। তাদের পদবি ছিল কুরসিলস আর এই পদবি থেকেই বোঝা যেতে তারা একই পিতার সন্তান ছিল না। তাদের পরিবারে যে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছিল—সেটা আমি প্রায়ই শুনতে পেতাম কিন্তু ঘটনাটা যে কী সেটা আমি কখনও জানতে পারিনি।

যুবকটিকে আমি বেশ পছন্দ করতাম—সেও আমার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করত। সেজন্য আমাদের মধ্যে একটা প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল খুব স্বাভাবিকভাবেই। একদিন সন্ধেবেলা যখন আমরা একটা হোটেলে বসে খাওয়াদাওয়া করছিলাম—তখন আমি নিছক কৌতূহলবশতই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তোমার মায়ের কোন্ পক্ষের সন্তান?

প্রশ্নটা শুনে সে যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। মনে হল একটু লজ্জা পেয়েছে। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইল। স্পষ্ট বোঝা গেল আমার প্রশ্নটা তাকে বেশ বিব্রত করে তুলেছে। এর পর সে বলল, আমার জীবনের কিছু অদ্ভুত ঘটনার কথা তোমাকে বলব—আশাকরি তুমি তাতে বিরক্ত বোধ করবে না। আমি জানি আপনার মধ্যে যে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আছে, তার সাহায্যে কোন্টা ন্যায় আর কোন্টা অন্যায় সেটা সঠিকভাবে বুঝতে আপনার অসুবিধা হয় না। সেইজন্য আমার বিশ্বাস, আমি যে সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করব, সে সমস্ত শোনার পরেও আমাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আদৌ ক্ষুণ্ণ করবে না। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা যদি ঘটেও তাহলে তাতে উভয়ের কারও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

"আমার মা, যাঁর নাম ছিল ম্যাডাম দ্য কুরসিলস, দুর্ভাগ্যের অভিশাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বভাবচরিত্রে, মানসিকতায় যেমন ছিলেন দুর্বল তেমন ছিলেন ভীরু প্রকৃতির। অর্থের লোভে পড়ে একজন তাঁকে বিয়ে করে। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় সংবেদনশীল এবং স্নেহপ্রবণ। অপরের ভালোর জন্য তিনি নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। যে অসভ্য হীন চরিত্র, লম্পট লোকটির সঙ্গে

তাঁর বিয়ে হয়েছিল, সেই লোক চিরকাল আমার মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এসেছেন। বিয়ের কিছু দিন পর থেকে তিনি বাড়ির কাজের মহিলাটির সঙ্গে রাত কাটাতে শুরু করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর অধীনস্থ লোকদের মেয়ে ও স্ত্রীদের নিয়ে যথেচ্ছভাবে তাদের শরীর ভোগ করতেন। এর পরেও তার ঔরসে আমার মায়ের গর্ভে দুটি সন্তানের জন্ম হয়। আমি হলাম আমার মায়ের তৃতীয় সন্তান। মা তাঁর স্বামীর এই সমস্ত জঘন্য অন্যায় কাজের কোনো প্রতিবাদ করেননি। ঘরের অসংখ্য জিনিসপত্রের মধ্যে যেমন নেংটি ইঁদুরগুলো লুকিয়ে থাকে, তেমনি আমার মাও গোলমাল ঝামেলার সংসার থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন ভীরু নেংটি ইঁদুরের মতো। একরাশ আতঙ্ক আর ভয় নিয়ে তিনি বেঁচেছিলেন। সত্যিকারের সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন সেইরকম সুন্দরী—কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ করতে করতে ভয় উৎপীড়ন আর আশঙ্কায় তাঁর মুখের রঙ বিবর্ণ-ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল।

মঁসিয়ে দ্য কুরসিলস-এর বন্ধুদের মধ্যে অনেকে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। তাঁদের একজন হলেন মঁসিয়ে দ্য ব্যরেনেভাল। তিনি সামরিক বিভাগে অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ করতেন এবং তিনি ছিলেন সেই বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ এক্স-অফিসার। বহুকাল আগেই তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছে। তাঁকে সকলে ভয় পেত কিন্তু তাঁর মনটা ছিল খুব নরম। পরের দুঃখকষ্টে তিনি খুব কাতর হয়ে পড়তেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি ভয়ংকর কঠোর হতে পারতেন এবং মাঝে মাঝে এমনসব অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করে বসতেন যা কার্যকরী না করা পর্যন্ত তিনি কিছুতেই শান্ত হতেন না। তাঁর পদবিই আমার পদবি। ভদ্রলোক দীর্ঘকায়, সামান্য রোগাটে গড়ন, কিন্তু গোঁফজোড়াটা সত্যি দেখার মতো। আমার চেহারাটা হয়েছে অনেকটা তাঁরই মতো।

তিনি অনেক পড়াশুনো করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা ছিল অন্যান্য মানুষের থেকে পৃথক। মহামনীষী রুশোর অনেক গ্রন্থ তিনি পড়েছেন এবং তাঁর যে সমস্ত গ্রন্থগুলি অন্ধ কুসংস্কার, মূল্যহীন রীতিনীতি, ত্রুটিযুক্ত আইনকানুন, কৃত্রিম নীতিবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন—সেই সব গ্রন্থের আদর্শের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহার ও কর্মপদ্ধতিতে তার প্রকাশ ঘটত।

খুবসম্ভব আমার মা ও তিনি পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রেমবিনিময় চলত এত নিভৃতে, এত সংগোপনে যে অন্য কারও চোখে সেটা ধরা পড়ত না। ভাগ্যপীড়িতা, দুখিনি নারীর কাছে তাঁর জীবনের বোঝা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল বলেই তিনি তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। আমার ধারণা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে ভদ্রলোকের চিন্তাধারার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারে তাঁর যে স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার আছে—এ বিষয়ে তিনি নিজের মধ্যে দৃঢ় মত গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি

দুর্বল মানসিকতার মানুষ ছিলেন বলেই সম্ভবত তিনি সকলের কাছে তাঁর প্রেমের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন।

বাবা যেমন তাঁর ওপর অত্যাচার করতেন, আমার অন্য দুটো ভাই-এর নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমার মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিবারে তাঁকে অপাঙ্ক্তেয় মনে করে তাঁর সঙ্গে তারা ঝিচাকরের মতো ব্যবহার করত। আমিই একমাত্র তাঁকে ভালোবাসতাম আর তিনিও আমার মধ্যে ভালোবাসার আশ্রয় পেয়ে আমাকে তাঁর মাতৃস্নেহে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

আমার যখন বয়স মাত্র আঠারো, তখন আমার মায়ের মৃত্যু হয়। পরের ঘটনাগুলো যাতে আপনার বুঝতে অসুবিধা না হয়—সেজন্য এখানে কতকগুলো ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার।

বাবার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য একজন ট্রাস্টি নিযুক্ত করা হয়েছিল। বাবা মায়ের যৌথ সম্পত্তি থেকে তিনি মায়ের সম্পত্তি আলাদা করে দিয়েছিলেন। মা তাঁর নিজের অধিকারের বলে তাঁর নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন।

আমি জানতে পেরেছিলাম—মা যে উইলটা করেছিলেন সেটা আছে আমাদের উকিলের কাছে। সেই উইলটি তিনি পড়ে শোনাবেন বলে এক দিন তিনি সকলকে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। ঘটনাটা এখনও এত স্পষ্টভাবে আমার মনে আছে, মনে হচ্ছিল ঘটনাটা গতকালের। ঘটনাটা এমন একটা পরিবেশের মধ্যে ঘটেছিল—সেটা শুধু আকর্ষণীয় ছিল না, ছিল দারুণভাবে নাটকীয়। নাটক না বলে সেটাকে প্রহসন বললে কথাটা সঠিক হিসাবে বিবেচিত হবে।

সেই লালমুখো লোকটি যিনি নিজেকে আমার বাবা বলে পরিচয় দিতেন তাঁকে দেখলে একজন কসাই ছাড়া অন্য কিছু মনে হত না। তিনি উইলটা শুনবেন বলে চোখ মুখে ক্রোধ আর উত্তেজনা ছড়িয়ে চেয়ারের ওপর বসে ছিলেন। তাঁর পাশের চেয়ার দুটো অধিকার করে রেখেছিল বিশাল চেহারার তাঁর যোগ্য দুই পুত্র। তারাও তাদের আসনে চুপ করে বসে ছিল। মঁসিয়ে দ্য ব্যুরনেভালকেও সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার পিছনে। তাঁকে একটু নার্ভাস মনে হচ্ছিল। অবশ্য ভাবী ঘটনাটা কী হতে পারে সেটা অনুমান করেই তিনি বেশ ভালোমতো তৈরি হয়ে এসেছিলেন। লাল মোমে আঁটা খামটা খোলার আগে দরজায় দুটো তালা দিয়ে আটকে দিলেন উকিল ভদ্রলোক। সকলের সামনে খামটি ছিঁড়ে উইলটি বার করে নিয়ে এলেন তিনি। এবার তিনি উইলটি পড়তে শুরু করলেন।

"আমি লিয়োপলড-যোশেফ দ্য কুরসিলস-এর আইনসঙ্গত স্ত্রী, অ্যানি ক্যাথারিন দ্য ক্রয়লু, এই মর্মে যে বিবৃতি দিতেছি তাতে আমি সুস্থ ও সবল দেহ ও মনে স্বাক্ষর করিতেছি।

যে কাজ আমি করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার জন্য আমি প্রথমে ঈশ্বর ও আমার একমাত্র ভালোবাসার আশ্রয়, একমাত্র স্নেহের পুত্র রেনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একমাত্র আশা আমার পুত্র আমার প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারবে। সারাজীবন ধরে যে দুর্বিষহ যন্ত্রণার বোঝা আমি বয়ে বেড়িয়েছি তা ব্যাখ্যা করার মতো আমার শক্তি নেই। অর্থবিত্তের প্রলোভনে পড়ে যিনি আমার নামমাত্র স্বামী, তিনি আমাকে বিয়ে করেছিলেন। এর পরে আমি আমার স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছি। প্রতারিত হয়েছি চূড়ান্তভাবে। তবুও তাঁকে আমি ক্ষমা করেছি—তাঁর বিরুদ্ধে এখন আর আমার কোনো ক্ষোভ নেই।

আমার অন্য দুই ছেলে আমার সঙ্গে চিরকাল দুর্ব্যবহার করে এসেছে, কিন্তু আমি তাদের সেবা করেছি, ঝিচাকরদের মতো আমি তাদের খিদমত খেটেছি। আমি তাদের জন্য কিছুই রেখে গেলাম না। তাদের অন্যায় অমানুষিক আচার আচরণ, তাদের নীতিহীন কুসংস্কার, তাদের নির্লজ্জ ও নগ্ন স্বেচ্ছাচারের ভয়ে সর্বদা আমি কাঁটা হয়ে থাকতাম। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব কথা এখন থাক। যে কথা আমি বলতে চাই, তা হল যে সত্যটি আমি মনের কোণে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেই সত্যকে সকলের কাছে প্রকাশ করতে চাই আর সেই কারণে আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার প্রেমিক, সত্যিই আমি যাঁকে ভালোবাসি সেই সাইমন দ্য ব্যুরনেভ্যালের তত্ত্বাবধানে রেখে গেলাম। রেনে বয়োপ্রাপ্ত হলে তিনি সমস্ত সম্পত্তি তাকে হস্তান্তর করবেন।

আমি জগতের শ্রেষ্ঠ বিচারকের কাছে স্বীকার করছি—আমি যদি আমার প্রণয়ীর সহানুভূতি, বিশ্বাস আর ভালোবাসার আশ্রয় না পেতাম, যদি তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে পরম নির্ভরতার আশ্বাস না পেতাম—তাহলে কখনই বুঝতে পারতাম না, ঈশ্বরের সৃষ্ট-প্রেম কত মহৎ, কত ব্যাপক, নিদারুণ হতাশা, দুঃখ আর যন্ত্রণার মধ্যে প্রণয়ীর ভালোবাসা, সহানুভূতি আর সান্ত্বনা কতটা মূল্যবান। আমি যদি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম, তাহলে আমি সৃষ্টিকর্তাকে অভিসম্পাত দিতাম, জীবন আমার ঊষর মরুভূমির মতো নীরস নিষ্প্রাণ হয়ে উঠত।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুজনের জন্ম হয়েছে মঁসিয়ে কুরসিলস-এর ঔরসে আর রেনে হল মঁসিয়ে দ্য ব্যুরনেভালের ঔরসজাত। সমাজের রক্ষক ও নিয়ামকদের কাছে আমার প্রার্থনা—তাঁরা যেন সামাজিক সমস্ত নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে গিয়ে তাদের স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আমার মৃত্যুর পরে আমার প্রতি তারা যাতে ঘৃণা পোষণ না করে সে বিষয়ে তাদের উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন যথাসাধ্য।

এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।

ক্যাথারিন দ্য ক্রয়লু"

উইল পড়া শেষ হলে মঁসিয়ে দ্য কুরসিলস কুৎসিতভাবে চিৎকার করে উঠে বললেন, এ-উইল আমি মানি না। এ উইলটি যে করেছে—সে বিকৃতমস্তিষ্কের।

তাঁর কথা শুনে মঁসিয়ে দ্য ব্যুরনেভাল সামনের দিকে এগিয়ে এসে কঠোর স্বরে

বললেন, আমি সাইমন দ্য ব্যুরনেভাল, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, ভদ্রমহিলা তাঁর উইলে যে সমস্ত কথা লিখে গেছেন তার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বর্ণ অক্ষরে অক্ষরে সত্যি এবং তাঁর উইলটি যে সত্য তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি যথেষ্ট প্রমাণ দাখিল করতে পারি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু চিঠিও আছে আমার কাছে।

মঁসিয়ে দ কুরসিলস প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে হল, এখনই দুজনের মধ্যে মারপিট শুরু হবে। রাগে দুজনের চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরোতে লাগল।

মঁসিয়ে কুরসিলস তাঁকে গালাগালি দিয়ে বললেন, তুমি একটি পাজি নচ্ছার।

মঁসিয়ে দ্য ব্যুরনেভাল রেগে গিয়ে বললেন, অন্য কোনো সময় তোমার কথার যোগ্য উত্তর দেব। তোমার স্ত্রী যেভাবে তোমার কাছে অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়েছে —তাতে তোমার গালে আমার চড় মারা উচিত ছিল।

এর পর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি আমার সন্তান। তুমি আমার সঙ্গে চলো। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তোমার ইচ্ছার ওপর। তোমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার আমার কোনো অধিকার নেই। ইচ্ছা হলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার।

আমি কোনো কথা না বলে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

কয়েক দিন পরে ডুয়েল লড়তে গিয়ে মঁসিয়ে দ্য ব্যুরনেভালের হাতে নিহত হলেন মঁসিয়ে কুরসিলস। কেরেঙ্কারি চেপে রাখতে আমার ভাইয়েরা তা নিয়ে কোনো গোলমাল করল না। আমার মা যে সম্পত্তি আমাকে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন— তার অর্ধেক আমার ভাইদের দান করলাম। সে দান নিতে তারা অস্বীকার করল না। আইনমোতাবেক পদবি ত্যাগ করে আমি ব্যুরনেভাল পদবি গ্রহণ করলাম।

বছর পাঁচেক হল মঁসিয়ে ব্যুরনেভালের মৃত্যু হয়েছে। আজও আমি তাঁর জন্য শোকপালন করি।

বন্ধু এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে এগিয়ে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মা যে এভাবে উইল করেছেন, আমার মনে হয় তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। একজন সৎ মহিলার কাছে এমন ব্যবহার প্রত্যাশিত। একথা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবেন না।

আবেগের সঙ্গে তার একটা হাত চেপে ধরে বললাম, নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না।

চোর
The Thief

ডাক্তার সরিয়ার তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটি বিশেষ কথা বললেন। তাঁর মতে ফুলের মতো পবিত্র কোনো কুমারী মেয়ের সতীত্ব হানি করা একটি দণ্ডণীয় অপরাধ। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মেয়েরা একজন প্রেমিক পুরুষের সঙ্গ ও সাহচর্য পাবার জন্য ভীষণভাবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের মানসিকতা এমন এক অবর্ণনীয় রোমান্টিকতায় ভরে ওঠে যে, তাদের পক্ষে কোনো পুরুষের প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন তার কুসুমের মতো কোমল দেহবল্লরীটি কামনা, শঙ্কা, উত্তেজনা, ব্যাকুলতায় থরথর করে কেঁপে ওঠে। তখন চুম্বন আলিঙ্গন পাওয়ার জন্য তার সমস্ত শরীর অধীর ও উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা সে তখন করতে থাকে। সেই তার হঠকারিতা এবং তার পরিণাম সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করে না।

ডাক্তার একথাও বললেন, কোনো বাড়ির তালা ভেঙে সেই বাড়ির জিনিসপত্র চুরি করা যেমন অপরাধ তেমনি কোনো অল্পবয়সি কুমারী মেয়েকে সুন্দর কথায় আকৃষ্ট করে তার সতীত্ব নাশ একইরকম অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়।

অনেকের ধারণা, মেয়েরা এসব ব্যাপারে কম দোষে দোষী নয় অর্থাৎ অনেক সময় মেয়েরাই তাদের সঙ্গে দেহসংসর্গে লিপ্ত হতে পুরুষদের প্রলুব্ধ করে এবং নারী দেহের মাদক আকর্ষণ এড়ানো যে-কোনো পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। তবুও পুরুষদের যে সে সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা থাকে না—একথা বললে ভুল বলা হবে।

হোমারের ওডিসি নামক মহাকাব্যে সমুদ্রযাত্রার সময় ইউলিসিস যেমন সাইরেনদের মায়াময় গান শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—তেমনি পুরুষেরা মেয়েদের মিষ্টি কথা, মধুর প্রেমালাপ শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন নিজের আদর্শ বা নীতিবোধে অবিচলিত থাকা পুরুষদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বললে ভুল হবে না। কোনো সুন্দরী নারীর মাদক আকর্ষণে প্রলুব্ধ হয়ে যখন কামনার পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবে যায়, তখন সেই পাপের পরিণাম সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করে না, সে এমন এক অনতিক্রম্য মোহে অন্ধ হয়ে থাকে যে আমার মতো একজন বৃদ্ধ বয়সের মানুষের পক্ষেও সে প্রলোভন জয় করা কঠিন হয়ে উঠবে।

আমি এমন একজনকে জানতাম যে একজন নারীর মোহে অন্ধ হয়ে নিজের সমূহ সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। আমি যার বিষয়ে কথা বলছি সে আমোদ-আহ্লাদে মেতে থাকতে ভালোবাসত। সে মেয়েদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য তাদের পিছনে প্রচুর অর্থ অপচয় করেছে। সে আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল বলে সে ছিল আমার স্নেহের পাত্র। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের সাহচর্য পাওয়া বা তাদের সঙ্গে প্রেম করার ব্যাপারে তার উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু মেয়েদের প্রতি তার এই সীমাহীন

আসক্তি, তাদের সঙ্গে অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের প্রতি তার প্রচণ্ড আকর্ষণ দেখেও আমি তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি শত চেষ্টা করেও। সব থেকে দুঃখের ব্যাপার, এত নারীর সান্নিধ্য বা সংস্পর্শে আসার পরে সে কিন্তু সত্যিকারের প্রেমের আশীর্বাদলাভে বঞ্চিত ছিল।

তথাকথিত প্রেমের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তার সঙ্গে একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারের মেয়ের আলাপ হল আর সেই আলাপ পরিণত হল ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায়। আর এই মেয়েটির কাছ থেকেই সে বুঝতে পারল সত্যিকারের প্রেম কী!

অতি অল্পক্ষণের জন্য তারা মাঝে মাঝে দেখা করত এবং সেখানে তাদের শারীরিক মিলন ঘটত কিন্তু তাতে তারা পূর্ণ তৃপ্তিলাভের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হত। তাদের ইচ্ছা হত তারা দীর্ঘ সময় ধরে প্রেমে, বিরহে, ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে ওঠার পরে মধুর মিলনের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকুক। তাই এক দিন মেয়েটি গভীর রাত্রিতে গোপনে তাদের বাড়িতে আসার জন্য বারবার অনুরোধ করল। মেয়েটি জানাল সে তার ঘরের দরজা খুলে রাখবে তবে তাকে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির পাঁচিল টপকে এমনভাবে আসতে হবে যাতে কেউ কিছুই জানতে বা বুঝতে না পারে।

যুবকটি প্রথমে তার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেনি কারণ সে জানত এ ধরনের কাজে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। তবু মেয়েটির বারবার অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে তার কথামতো কাজ করতে রাজি হল সে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ সে এইভাবে অন্ধকারে গোপনে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু এক দিন সে অন্ধকারে ঘরে ঢোকার সময় একটা চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। সেই শব্দে তার মায়ের ঘুম ভেঙে গেলে তিনি চিৎকার করে সকলকে ডেকে তোলেন। সে তখনই স্থির করে ফেলে ধরা পড়লে সে চোর অপবাদ নেবে তবুও তার প্রেমিকার সঙ্গে তার যে গোপন সম্পর্ক আছে সে-কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

এই মনে করে সে একটা পিয়ানোর আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। সকলে আলো নিয়ে তার খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তাকে সেই পিয়ানোর আড়াল থেকে টেনে বার করা হল। এর পর পুলিশ এসে তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। তার প্রেমিকার সম্মান রক্ষার জন্য সে থানায় গিয়ে স্বীকার করল যে সে চুরি করতে ঢুকেছিল ওই বাড়িতে।

জেলে বন্দি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সে তার স্থাবরঅস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিয়ে যায় এবং সমস্ত ঘটনাটা একটা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে যায়।

রোজালি প্রুডেন্ট
Rosalie Prudent

আদালতে যখন রোজালি প্রুডেন্টের মামলার শুনানি শুরু হল তখন সকলে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। কারণ ঘটনাটা এমন রহস্যময়, কীভাবে সেই মামলার বিচারের রায় দেওয়া হবে, সেটা বিচারক, জুরি বা সরকারপক্ষের উকিল, কেউ ভেবে ঠিক করতে পারলেন না।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে খুব সহজ বলে মনে হবে। বার্মারতদের পরিবারে কাজ করত রোজালিন। হঠাৎ এক দিন বাড়ির লোকদের চোখের আড়ালে সে একটি সন্তানের জন্ম দেয় এবং তাকে গলা টিপে মেরে বাগানে ফেলে রেখে আসে।

পরে ব্যাপারটা জানাজানি হতেই বার্মারত পরিবারের মালিক ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং জানিয়ে দেন যে—রোজালিন এমন এক জঘন্য অপরাধ করেছে এবং তার পাপ কাজের দ্বারা বাড়ির পবিত্রতা সে এমনভাবে নষ্ট করেছে যে তিনি তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

অনেক বড়োলোকের বাড়িতে যারা ঝি-এর কাজ করে তারা হামেশাই এ ধরনের পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে. সেদিক দিয়ে বিচার করলে রোজালিনের এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য নয়।

কিন্তু রোজালিনকে যে ঘরটাতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল—সেই ঘরটা খুঁজে দেখা গেল সে তার সন্তানের জন্য অনেকগুলো কাঁথা তৈরি করেছে। খোঁজ নিয়ে আরও একটা ব্যাপার জানা গেল। সে প্রায় তিন মাস রাত্রে না ঘুমিয়ে অনেক কাপড় কেটে সারারাত ধরে সেগুলো সেলাই করে পোশাক বানিয়েছে। রাত্রে কাজ করার জন্য যে মুদির দোকান থেকে সে বাতি কিনত—মুদি সে কথাও বলেছে। এছাড়াও সে শহরের এক পরিচিত নার্সকে তার জন্য একটি চাকরি ঠিক করে দেওয়ার কথা বলেছিল। সে তার কথামতো পসিতে তার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে-- কারণ রোজালিন বুঝতে পেরেছিল তার এই অপরাধের জন্য বার্মারত পরিবারের মালিক তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করবেন।

রোজালিন যে অপরাধ করেছে, তার জন্য তাকে আদালতে ধরে আনা হয়েছে। বার্মারত পরিবারের মালিক ও তাঁর স্ত্রী, দুজনেই সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা রোজালিনকে শুধু অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিলেন না, তাঁরা বিচারকের কাছে আবেদন জানালেন, সে যে অপরাধ করেছে তার জন্য তাকে যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

রোজালিনকে দেখতে ভালো। তাকে সুন্দরী বললে অত্যুক্তি হয় না। দীর্ঘায়ত শরীরটা সুঠাম ছাঁদে গড়ে উঠেছে। নর্ম্যান্ডির সমতল ভূখণ্ডের নিম্নাঞ্চলে তার বাড়ি।

ঝিএর কাজে বিশেষ দক্ষ। আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে সমানে কেঁদে চলেছিল। সরকারি পক্ষের উকিল তাকে বারবার প্রশ্ন করেও তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাননি। এর পর তার অপরাধ সম্বন্ধে বিচারক জুরিদের সঙ্গে একমত হলেন এবং বললেন যে সে তার সন্তানকে হত্যা করেছে। তবে সে এই অপরাধ করেছে তীব্র হতাশা ও সাময়িক উন্মাদনায়। রোজালিন যাতে নিজের মুখে তার অপরাধ স্বীকার করে বিচারক সেজন্য আর একবার চেষ্টা করলেন। মূল ব্যাপারটায় এখনও রহস্যের জট পাকিয়ে আছে আর সে জট এখনও ছাড়ানো সম্ভব হয়নি। কারণ রোজালিন নিজের মুখে সমস্ত ঘটনাটা খুলে না বললে কিছুই জানা যাবে না। তবে তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এটা ধরে নেওয়া যায় যে রোজালিন তার সন্তানকে হত্যা করেছে কিন্তু সে একাজ করতে চায়নি। কারণ সে তার সন্তানকে লালনপালন করবে বলে তার জন্য কাঁথা আর পোশাক তৈরি করেছিল সারারাত জেগে।

বিচারক রোজালিনকে বললেন, জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি তার অপরাধ ক্ষমা করবেন, যদি সে সমস্ত ঘটনা তাঁদের কাছে খুলে বলে।

বিচারকের কাছে সহানুভূতির কথা শুনে রোজালিন মনের জোর ফিরে পেল। সে এবার আর বিচারকের প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধাবোধ করল না।

বিচারকের প্রথম প্রশ্ন হল, ''কে তোমার সন্তানের পিতা?''

রোজালিন বার্মারত পরিবারের মালিকের দিকে তাকিয়ে বলল, ''যোশেফ বার্মারত—মালিকের ভাইপো।''

বার্মারত ও তাঁর স্ত্রী তার কথা শুনে কুৎসিত স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, ''হুজুর, ও যা বলছে সব মিথ্যে।''

বিচারক তাঁদের চুপ করতে বলে রোজালিনকে বললেন, ''তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি সব কিছু বলে যাও।''

বিচারকের কাছ থেকে সাহস পেয়ে রোজালিন বলল, ''আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম সেখানে একবার যোশেফ বার্মারত আসে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে।''

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, ''সে কি কাজ করে? সে পেশায় কী?''

রোজালিন বলল, ''সামরিক বিভাগে কাজ করে। পদমর্যাদায় সে একজন আন্ডার অফিসার। সে এখানে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে এসে মাস ছয়েক থেকে গিয়েছিল। আমি কোনা দিকে তাকিয়ে দেখতাম না—সর্বদা মাথা নীচু করে চলতাম। কিন্তু যোশেফ বার্মারত সর্বদা যে আমার দিকে তাকাতেন সেটা আমি বুঝতে পারতাম। তারপর হঠাৎ এক দিন সে আমাকে প্রেম নিবেদন করে। সে আমার রূপের খুব প্রশংসা করল, বলল, আমাকে খুব সুন্দর দেখতে। আমাকে তার খুব ভালো লেগেছে। তাকেও যে আমার বেশ ভালো লেগেছিল—একথা যদি অস্বীকার করি তাহলে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমি স্বপ্নেও কখনও আশা করিনি কেউ আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ আমাকে ভালোবাসতে পারে বা কেউ আমার প্রতি সমবেদনা জানাতে পারে। আমার আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধব বলতে এমন কেউ ছিল না যার সঙ্গে আমি আমার মনের কথা খুলে বলতে পারি। তাই যোশেফের মুখে ভালোবাসা আর

সহানুভূতির কথা শুনে আমি নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম। সে এক দিন অমাকে সন্ধের দিকে নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। আমি তার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। নদীর ধারে এসে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। নদীর ধারের সন্ধ্যার মাতাল করা পরিবেশ, নদীর জলের ওপর চাঁদের শুভ্র কিরণ, আমার মনটাকে এক গভীর আবেশে ডুবিয়ে দিল। তখন আমার বাধা দেবার সমস্ত শক্তি হারিয়ে গেল—তাকে বাধা দেবার আমার কোনো ক্ষমতা রইল না। সে আমার দেহটাকে ইচ্ছামতো ভোগ করল। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর আমাকে ফেলে রেখে সে তার কর্মস্থলে ফিরে গেল। আমি প্রথম দিকে কিছুই বুঝতে পারিনি। মাস দুই-তিন পরে বুঝতে পারলাম যোশেফের সন্তান আমার গর্ভে বেড়ে উঠছে।"

এই পর্যন্ত বলে রোজালিন আবার কাঁদতে শুরু করল। বিচারক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমার বক্তব্য শেষ কর।"

রোজালিন আবার বলতে আরম্ভ করল, "যখন বুঝতে পারলাম আমি গর্ভবতী হয়েছি তখন স্থানীয় একজন পরিচিত নার্সকে আমার বিপদের কথা জানালাম। তার কাছে পরামর্শ চাইলাম। একটা চাকরি জোগাড় করে দেবার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। কারণ আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার অপরাধের কথা জানতে পারলে বার্মারত পরিবারের মালিক আমাকে বিদেয় করে দেবেন। আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমার মাইনের টাকা থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে শুরু করলাম। সারাদিনের ক্লান্তির পর এক দিন আমি যখন ঘুমোতে গেলাম, তখন আমার প্রসববেদনা শুরু হল। নার্সের উপদেশ অনুযায়ী সমস্তরকম ব্যবস্থা নিলাম এবং ঘণ্টা দু-তিন বেদনা সহ্য করার পর আমি একটি সন্তান প্রসব করলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার আমার যন্ত্রণা শুরু হল—বুঝলাম এটা প্রসবের ব্যথা। কিছুক্ষণ পরে আর একটি সন্তান প্রসব করলাম। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর আমি দুশ্চিন্তা আর ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মাতৃত্বের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যে প্রতিমাসে মাত্র কুড়ি ফ্রাঁ উপার্জন করে তার পক্ষে কি দুটো সন্তানকে লালনপালন করা বা মানুষ করে তোলা সম্ভব? চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মাথাটা ঘুরতে লাগল। এমন অবস্থায় কী যে করব কিছুই বুঝতে পারলাম না। অর্থচিন্তা আর কলঙ্কের বোঝা—আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলল। আমি তখন কী করলাম জানেন, আমি সদ্যজাত দুটি সন্তানের ওপর বালিশ চাপা দিয়ে তার ওপর বসে পড়লাম, লাফালাফি করতে লাগলাম আর কেঁদে ভাসিয়ে দিতে লাগলাম। এইভাবে এক সময় রাত শেষ হয়ে ভোর হল। আমি বালিশটা সরিয়ে নিতে দেখলাম তারা মরে কাঠ হয়ে গেছে। আমি এর পর বাগানের এক দিকে কোদাল দিয়ে একটা ছোটো গর্ত খুঁড়ে বাচ্চা দুটোকে সেখানে নিয়ে পুঁতে দিলাম।"

রোজালিনের কাহিনি শুনে আদালতে উপস্থিত সকলের চোখগুলো জলে ভরে উঠল। বিচারক নিজেও চোখের জল সামলাতে পারলেন না। তাদের কাঁদতে দেখে রোজালিনও হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বিচারক তাকে বেকসুর খালাস দিলেন।

নর্তকীর প্রণয়
Virtue in the Ballet

ভিয়েনার অপেরা-হাউসে নতর্কীদের মধ্যে যখনই কোনো নূতন মুখের দেখা পাওয়া যেত আর যদি সামান্য লাবণ্য থাকত তার যৌবনপুষ্ট দেহে তাহলে স্থানীয় ধনী মানুষদের এমন ভিড় শুরু হয়ে যেত যে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হত। সেবার শীতের শেষে একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল যে ভিয়েনা অপেরা এবার এমন একজন নর্তকীকে নিয়ে আসছে যার রূপের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

মেয়েটির নাম সাতানেলা। অল্পবয়সি মেয়েটি আজও সতীত্বের পবিত্রতাকে নষ্ট হতে দেয়নি। সাতানেলার স্বভাবপ্রকৃতি ও চরিত্র এক অদৃশ্য দৃঢ়তায় নমনীয়। এত কম বয়সে এমন ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা চোখেই পড়ে না। তার ইচ্ছা না হলে তাকে কোনো কাজে বাধ্য করা প্রায় অসম্ভব।

মঞ্চে নাচতে নেমেই সে এমন অসাধ্য সাধন করল এবং লীলায়িত দেহছন্দে এত সুন্দর আর আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে নাচল—কিছুক্ষণের মধ্যে সে দর্শকদের মন জয় করে নিল। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। পর দিন দেখল অপরিচিত ধনী ব্যক্তিদের মণিমুক্তার উপহারে তার নিজের ঘরটা ভরে উঠেছে। কিন্তু তার মনে হল অপরিচিত মানুষদের এতসব উপহার নেওয়া উচিত হবে না। তাই সে তার মাকে বারবার বলে দিল, "এসব উপহার যাদের কাছ থেকে এসেছে, তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি চাই না ওসমস্ত উপহার।"

তার মা বলল, "টাকাপয়সা নেওয়ার ইচ্ছা না হয় নিয়ো না কিন্তু উপহার নিতে তোমার আপত্তি কেন?"

এর মধ্যে এক দিন তার বাড়িতে এসে হাজির হল একজন নাম করা সোনারূপোর ব্যবসায়ী। সে এমনসব দামি দামি উপহার নিয়ে এসেছিল যা দেখে সাতানেলার মা আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল। সে বাড়ি ফিরে এসে উপহারের বহর দেখে মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, এতসব উপহার এল কোথাথেকে। কোনো লটারিফটারি জিতেছ নাকি?"

তার মায়ের প্রশ্রয় পেয়ে ব্যবসায়ীটি রোজ তাদের বাড়িতে আসতে শুরু করল। বাড়িতে এলে সাতানেলা তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে কিন্তু ব্যবসায়ীটি তাতে হতাশ হয়ে পড়ে। এইধরনের মেয়েদের কাছে অন্যধরনের ব্যবহার আশা করেছিল কিন্তু তার এমন ভদ্র ও শিষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

সে যে কাউকে প্রশ্রয় বা আমল দিত না তার পিছনে একটা কারণ ছিল। সে একটি ছেলেকে ভালোবাসত। তাদের ভালোবাসার কথা কেউ জানতে পারেনি। যার সঙ্গে তার ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল, সেই ছেলেটি এক দিন একরাশ লজ্জা আর কুণ্ঠা

নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে। সাতানেলা তার লজ্জানম্র ভাব ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে যায়। ছেলেটিকে তার বাড়িতে যাওয়ার কথা বললে সে বলে, "জানো আমি খুব গরিব, তোমার ধনৈশ্বর্য আর বিত্তবৈভবের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে যেয়ো না।"

সাতেনালা বলে, "আমার অর্থবিত্তে তোমারও অধিকার আছে। তুমি নিশ্চয়ই যাবে আমার বাড়িতে। আমার ভালোবাসার দাবি নিয়ে তুমি সেখানে যাবে।"

ছেলেটি বলল, "অন্য কারও সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কোনো সম্পর্ক আছে!"

সাতানেলা বলল, "না, কারও সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কারও কাছে নিজেকে এখনও পর্যন্ত বিকিয়ে দিইনি।"

কিন্তু সাতানেলার প্রণয়ীকে দেখে তার মা খুশি হল না। মেয়ের পছন্দের সে প্রশংসা করতে পারল না। কিন্তু যখন জানতে পারল নিজের আসল পরিচয় সে গোপন করে গেছে, আর প্রকৃতপক্ষে সে একজন ধনী কাউন্টের ছেলে, তখন তার মতের পরিবর্তন ঘটল এবং বলল, "সত্যি ছেলেটি খুব ভালো।"

যুবকটি পরে সে-কথা সাতানেলার কাছে স্বীকার করে বলল, "তুমি আমাকে কতটা ভালোবাস, সেটা পরীক্ষা করার জন্য আমার সত্য পরিচয় গোপন রেখেছিলাম।"

সাতানেলা যখন জানতে পারল, সে একজন ধনী কাউন্টের ছেলে, তখন সে বারবার তার কাছে নানারকম উপহার দাবি করতে লাগল। ছেলেটি তখন তার প্রেমিকাকে খুশি করতে তার বাবার কাছে টাকা চাইতে শুরু করল। বারবার এমনভাবে টাকা চাওয়াতে তার বাবা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল সে এক নর্তকীকে ভালোবাসে। কাউন্ট তার ছেলেকে তখন বলল, "তুমি যদি তার সংস্রব ত্যাগ না কর তাহলে এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই হবে না।"

তার বাবা তাকে যা বলেছে সেগুলো সে সাতানেলাকে গিয়ে বলল। সাতানেলা তখন বলল, "আমার আর উপহারের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সুতরাং কোনো কিছুর বিনিময়ে তোমার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা আমার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব নয়।"

তখন যুবকটি তার নিজের বাড়ি ছেড়ে সাতানেলার বাড়িতে এসে থাকতে আরম্ভ করল। সাতানেলা এর মধ্যে তার নাচ ছেড়ে দিয়েছে। সে তার বাড়ির আসবাবপত্র ও গয়না বিক্রি করে সংসার চালাতে লাগল। যুবকটি এর মধ্যে অনেক চেষ্টাচরিত্র করে এক উকিলের কাছে মুহুরির কাজ জোগাড় করে নিল।

কাউন্টের কানে পৌঁছোতে দেরি হল না ব্যাপারটা। কাউন্ট খোঁজ নিয়ে সবকিছু জানতে পেরে খুব অবাক হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন সত্যিই ওরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। ওদের যে ভালোবাসা তা নিখাদ এবং এক অতুলনীয় মহত্ত্বে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আমার বাড়িওয়ালি
My Landlady

বাড়িওয়ালাদের ভাড়াটেদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার বা আচার-আচরণ হতে পারে—এই বিষয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন জর্জ কার্ভেলন বললেন, যখন আমি রু দ্য সাঁতে পেরের একটা বোর্ডিং-এ থাকতাম সেসময়কার ঘটনা এটা। বাবা ঠিক করলেন প্যারিসে তিনি আমাকে আইন পড়তে পাঠাবেন, কিন্তু সেখানে কোথায় থেকে পড়াশোনা করব, সে ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা করলেন আমার বাবা মা। বাবা ঠিক করলেন, বছরে খরচ বাবদ আমাকে দেবেন আড়াই হাজার ফ্রাঁ। মা বললেন, আমি যদি কোনো হোটেলে থাকি তাহলে অনেক বেশি খরচ পড়ে যাবে এবং তাতে খাওয়া-দাওয়ার খরচে টান পড়বে। ফলে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। সেইজন্য তাঁরা কোনো ভালো বোর্ডিং-হাউসের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমার এক প্রতিবেশী সংবাদ দিল যে ম্যাডাম কার্গেরানের বোর্ডিং হাউসটা খুবই ভালো আর সেটা এখনও খালি আছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ম্যাডাম কার্গেরানকে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠির উত্তর পেয়ে আমি আমার ব্যাগব্যাগেজ নিয়ে এক সন্ধ্যায় ম্যাডাম কার্গেরানের বোর্ডিং-হাউসে গিয়ে উঠলাম।

বাড়িটা পাঁচতলার। ম্যাডাম কার্গেরান তাঁর চাকরকে নিয়ে থাকেন একতলায়। দোতালাটা ব্যবহার করা হত খাবার ঘর আর রান্নাঘর হিসাবে। চারজন ছাত্র ব্রিতানি থেকে এসেছিল। তারা থাকত তিনতলা আর চারতলায়। পাঁচতলায় আমাকে দুখানা ঘর দেওয়া হল। ম্যাডাম কার্গেরান সুদক্ষা তত্ত্বাবধায়কের মতো একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। কোথাও কোনো অসুবিধা হলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে দেবার ব্যবস্থা করতেন। সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ওপর তাঁর যথেষ্ট লক্ষ ছিল। সকলেই ভয় পেত ম্যাডামকে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ আলাদা।

তোমরা জান কি না জানি না। তবে বোধহয় জান একটা অন্য ধরনের স্বাতন্ত্র্য বোধে আমি গড়ে উঠেছিলাম। এক দিন ম্যাডামের মুখের ওপর বলে দিলাম, তাঁর অন্যান্য নির্দেশ মেনে চলতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু একটা নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। তাঁর বোর্ডিং-হাউসের নিয়ম ছিল—যে রাত্রি বারোটার মধ্যে বোর্ডিং-হাউসে না ফিরতে পারবে তাকে সে রাত্রে বাইরে কাটাতে হবে। তাঁর এই নিয়মের ঘোর বিরোধিতা করলাম। বললাম, যদি কাজে আটকে গিয়ে বোর্ডিং-এ ফিরতে রাত বারোটার বেশি হয়ে যায় তাহলে আপনি আইনসঙ্গতভাবে গেট খুলে দিতে বাধ্য থাকবেন।

ম্যাডাম কার্গেরান বললেন, তুমি যদি এই ধরনের ঔদ্ধত্য দেখাও আর আমার তৈরি নিয়ম ভাঙার চেষ্টা কর, তাহলে আমি থানায় যেতে বাধ্য হব। তোমার অসুবিধা হলে তুমি অন্যত্র চলে যেতে পার, আমি তোমাকে এখানে রাখতে পারব না।

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর তিনি আমার যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তবে তিনি শর্ত দিলেন একথা যেন অন্য কেউ জানতে না পারে। এই সুবিধাটা একমাত্র আমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

এর পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ বা চল্লিশের কিছু বেশি হলেও তাঁর শরীরের গঠন এমন সুন্দর আর সুঠাম ছিল তাঁকে দেখলে চব্বিশ বছরের একজন তরুণী বলেই মনে হত। আমাদের বয়সের অনেকটা ফারাক থাকলেও আমাদের মধ্যে এক প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। অনেক সময় তাঁকে চুমু খেতাম আর তিনি একটু হেসে ভ্রূকুটি করে আমার কান টেনে দিতেন।

এর মধ্যে এক দিন একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হল। পথ চলতে চলতে পরিচয় হল। কিছু দিন দেখাসাক্ষাৎও কথাবার্তা হওয়ার পর তার সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হল। দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম। এক দিন রাত্রে তাকে আমার বোর্ডিং-এর ঘরে আসতে বললাম। সে প্রথমে রাজি হয়নি। অনেক অনুরোধ উপরোধে তার মন নরম হল এবং অবশেষে সে আমার অনুরোধ রাখবে বলে কথা দিল।

রাত বারোটার পর যে-কোনো সময়ে আমি যাতে বোর্ডিং-এ ঢুকতে পারি, সেইকারণে আমার জন্য একটি বিশেষ দরজার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই দরজা দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম। চোরের মতো অতি সন্তর্পণে তাকে নিয়ে পাঁচতলায় উঠে এলাম। পাছে অন্যদের কাছে ধরা পড়ে যাই— এই ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে শব্দ হচ্ছিল।

যা হোক, সকলের নজর এড়িয়ে ওপরে উঠে এলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমে অচেতন। আমার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালাম। মেয়েটি সে ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করল। এবার আমরা স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালিয়ে দুজনে চা করে খেলাম। তারপর মেয়েটির শরীর থেকে একটা করে পোশাক খুলে ফেললাম। সে শুধু একটা সায়া পরে রইল। তার সুডৌল সোনালি রং-এর স্তন দুটো তাকে বিছানায় নিয়ে যাবার জন্য আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতে লাগল। সেও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সে বিছানায় চলে গেলে আমিও সেখানে যাব বলে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। এমন সময় ভেজানো দরজাটা ঝড়ের বেগে খুলে গেল, দেখলাম ম্যাডাম কার্গেরান একটা বাতি হাতে ঘরে ঢুকছেন। ম্যাডাম কার্গেরান শুধুমাত্র একটা সায়া পরেছিলেন। তাঁর নগ্ন বড়ো বড়ো স্তন দুটো বাতির আলোয় চকচক করছিল। আমি বজ্রাহতের মতো সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটি ম্যাডামকে দেখে লজ্জায় হাত দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেলল তারপর কাঁদতে লাগল অঝোরে।

ম্যাডাম কার্গেরান চিৎকার করে উঠলেন, তোমার লজ্জা করে না, আমার বাড়িটাকে একেবারে বেশ্যাখানা বানিয়ে ফেলেছ! এক্ষুণি ওকে গেটের বাইরে দিয়ে এসো। আমার এখানে এ সমস্ত চলবে না।

তাঁর কথা শুনে এর্মা এক মুহূর্ত দেরি করল না। দ্রুত পোশাক পরে ঘর থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেল। অনেক ডাকলেও সে কোনো সাড়া দিল না বা পিছন ফিরে তাকাল না। শুনতে পেলাম তার পায়ের শব্দ সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

এরপর ম্যাডাম কার্গেরান আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, ম্যাডাম তুমি নিশ্চয়ই জানো—আমি যা করেছি, তা আমার এই বয়সের দোষে, তুমি এর জন্য কিছু মনে কোরো না।

ম্যাডাম তখন বললেন, না, মনে করিনি। তবে এই বোর্ডিং-এর যে একটা সুনাম আছে, সেটা তোমার জেনে রাখা দরকার। ভবিষ্যতে যেন এমন কখনও আর না হয়।

তারপর থেকে ওই বোর্ডিং-এ থাকাকালীন ওরকম কাজ আর কখনও করিনি।

এক রাজার ছেলে
A King's Son

বসন্তকালের কোনো এক বিকেলে যখন সূর্য আকাশের দিগন্তে ঢলে পড়ছিল, তখন সেই অস্তমিত সূর্যের আলো রাঙিয়ে তুলেছিল সমস্ত আকাশটাকে।

শহরের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিল তখন অসংখ্য মানুষ। একটা কাফের পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্যবিভাগের দুজন অফিসার কথা বলছিল। তাদের পোশাক দেখেই বোঝা যায় তারা অফিসার পদাধিকারী। তাদের দামি পোশাক আর বলিষ্ঠ শারীরিক গঠন দেখে পথচারীদের অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে তাদের দিকে তাকাচ্ছিল। এমন সময় বিরাট দেহী এক নিগ্রো পথ দিয়ে যেতে যেতে তাঁদের দেখে প্রায় ছুটে এসে বলল, "গুড ইভনিং, লেফটেন্যান্ট।"

তাদের মধ্যে পদমর্যাদায় একজন ছিল লেফটেন্যান্ট আর একজন কর্নেল।

লেফটেন্যান্ট বলল, "তুমি কে? আমরা তো তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না।"

নিগ্রোটি বলল, "আমি কিন্তু তোমাকে ভালো করেই চিনি। আচ্ছা, তোমার কি সেই বেজির অবরোধ আর আমার আঙুর খাওয়ার ঘটনার কথা মনে পড়ছে না?"

শেষ পর্যন্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করে লেফটেন্যান্ট বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি নিশ্চয়ই টিম্বাক্টো।"

"হ্যাঁ, আমিই সেই টিম্বাক্টো।"

এর পর লেফটেন্যান্ট হাত বাড়িয়ে দিতেই, আফ্রিকার রীতি অনুযায়ী তার হাতে চুম্বন করল টিম্বাক্টো।

লেফটেন্যান্ট বলল, "চলো কাফেতে গিয়ে বসা যাক। সেখানে তোমার কথা শুনব।"

টিম্বাক্টো বলল, "কিছু মনে কোরো না অফিসার, আমি এখন খুব ব্যস্ত। তুমি জান না বোধহয়, আমি এখানে একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছি। টাকাপয়সাও যথেষ্ট আমদানি হচ্ছে। আমার রেস্টুরেন্টে এমন সব ভালো ভালো লোভনীয় খাবারের ব্যবস্থা রেখেছি—প্রাশিয়ানরা রোজ সেখানে খেতে আসে। এক দিন স্বয়ং সম্রাট এসে আমার এই রেস্টুরেন্টে খেয়ে গেছেন আর খাবারের খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক টাকা বকশিশ পেয়েছি।"

টিম্বাক্টোর কথা যেন শেষ হতে চায় না। সে আরও কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু লেফটেন্যান্ট বলল, "আজ থাক টিম্বাক্টো, তুমি যেমন ব্যস্ত আমরাও তেমন। অন্য আর এক দিন তোমার কথা শোনা যাবে।"

টিম্বাক্টো সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর কর্নেল বলল, "এই অসভ্য নিগ্রোটা কোথা থেকে এল, তোমার সঙ্গে এর পরিচয়ই বা হল কী করে?"

লেফটেন্যান্ট বলল, "শোনো, এর কাহিনি তোমাকে বলছি।

"১৮৭৭ সালে প্রাশিয়ানবাহিনীর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়, তখন তারা বেজি শহরটাকে অবরোধ করে রাখে। আমাদের বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। দেখতে দেখতে আমাদের খাবারদাবার সব শেষ হয়ে আসে। ওরা আমাদের গুলি করে মারল না ঠিকই কিন্তু খাবারদাবার-এর ব্যবস্থা করার জন্য যাতে আমরা বাইরে না বেরোতে পারি—সেজন্য কড়া পাহারায় রাখল আমাদের। সুতরাং তারা আমাদের গুলি করে না মেরে আমাদের না খাইয়ে মারার ফন্দি আঁটল।

"সেনাবাহিনীতে আমি তখন লেফটেন্যান্টের দায়িত্বে ছিলাম। আমাদের সেনাবাহিনীতে ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষির নানান জাতের সৈন্য। একবার এগারোজন আফ্রিকান সৈন্য রাতের অন্ধকারে সেনানিবাস থেকে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যায়। কিছু দিন পরেই তারা আবার ফিরে এল। আমি তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম। তারা কোনো নিয়মশৃঙ্খলার বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায় না। কিন্তু তাদের সারল্য আর প্রাণখোলা অনাবিল হাসির জন্য তাদের সুনজরে দেখতাম আর সেই কারণেই আমি তাদের নিয়মবহির্ভূত কাজের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। আমি জানতে পারলাম, এই টিম্বাক্টোই ওদের দলনেতা।

"এক দিন সকালে ব্যারাকের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড় শ্রেণির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ নীচের আঙুর খেতের দিকে আমার নজর পড়ল। মনে হল কয়েকজন লোক খুব সাবধানে চোরের মতো চলাফেরা করছে। তাদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ হতেই আমি কয়েকজন সৈন্য নিয়ে আঙুর খেতে নেমে এলাম। তখন পাকা আঙুরের মরশুম। আঙুর গাছে থোকা থোকা পাকা আঙুর ঝুলছে আর সমস্ত জায়গাটা ভরে আছে আঙুরের মিষ্টি গন্ধে। সেখানে গিয়ে দেখলাম, টিম্বাক্টো চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে চলাফেরা করছে আর মুঠো মুঠো আঙুর নিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিচ্ছে। সে এত বেশি মদ খেয়েছিল, তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বসে পড়ছিল। মুখভরতি আঙুর নিয়ে সে হাসতে লাগল। তার মুখটা সর্বদা এক সরল হাসিতে ভরে থাকত আর তার মস্ত গুণ ছিল, কোনো সমস্যাই তার কাছে সমস্যা বলে মনে হত না। শুনলাম সে নাকি এক নিগ্রো রাজার ছেলে।

"এক দিন সন্ধেবেলা অবাক হয়ে দেখলাম, টিম্বাক্টো তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে আট-দশজন প্রাশিয়ান সৈনিকের কাটা মুণ্ড একটা কাঠের দোলার ওপর চাপিয়ে ফিরে আসছে। পরে জানতে পেরেছিলাম, পাশের গ্রামের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ছ-সাতজন প্রাশিয়ান অফিসার ও দু-তিনজন প্রহরীর একটা দলকে দেখতে পায়। তারা যে-কোনো কারণে মূল সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। শত্রুসৈন্যরা তাদের দেখে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে—একটা হোটেলের মধ্যে গিয়ে ঢোকে আর টিম্বাক্টোর দল তাদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। টিম্বাক্টোর শরীরেও বেশ কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলাম। এতসব ঘটনার পরেও দেখলাম সে হাসছে।

"যখনই সুযোগ পেত, টিম্বাক্টো শত্রুসৈন্যদের খতম করে দিত। সে যে এ কাজ

করত কোনো সামরিক মর্যাদা বা জাতীয় পুরস্কার পাবার জন্য, তা নয়। সে তাদের মারত তাদের জিনিসপত্রগুলো পাবার লোভে। সে যে ঢিলে জামাটা পরত সেটা গলা থেকে পায়ের চেটো পর্যন্ত ঝুলে থাকত। আর ওই জামার পকেট দুটো ছিল বিরাট মাপের। সে সেদিন সেই প্রাশিয়ান সৈনিকদের হত্যা করে তাদের পোশাক আর তকমায় সোনা ছাড়াও আরও যেসব ধাতু পেয়েছিল সেগুলো দিয়ে সেদিন তার বড়ো বড়ো পকেট দুটো ভর্তি করে ফেলেছিল। ওগুলো বিক্রি করে সে মদের পয়সা জোগাড় করত। তবে তার সরল মনের পরিচয় পেয়ে আমি খুশি হয়েছিলাম। সে আমাকে খুব ভালোবাসত এবং আমি কীসে খুশি হই সেই চেষ্টাই করত সে সর্বদা। শীতকালে একবার আমাদের বেশ কয়েকদিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল আর তাতে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এদিকে সমস্ত রসদও শেষ হয়ে গেল। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে তীব্র কষ্ট আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। টিম্বাক্টো আমাদের ওই অবস্থা লক্ষ করে কাছে এসে বলল, আমি জানি তোমাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে এবং এখন রসদ জোগাড় করাও অসম্ভব। তোমরা যে এখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারাত্মকভাবে কষ্ট পাচ্ছ সে-কথা আমি বুঝতে পারছি। আমার কাছে যে খাবার আছে তা তুমি খেতে পারো। তখন ক্ষুধায় আমি এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছি, কোনো কিছু বিবেচনা করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই তার খাবার খেতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। এরপর টিম্বাক্টো একজনের ক্ষুধা মেটার মতো বেশ খানিকটা মাংস এনে দিল। তখন হঠাৎ আমার মনে হল, এই সময়ে গোরু, ভেড়া, ঘোড়া বা ছাগলের মাংস জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। আমি জানতাম আফ্রিকার লোকরা মানুষের মাংস খেতে অভ্যস্ত এবং যুদ্ধে চারিদিকে যেভাবে মানুষ মরছে তাতে টিম্বাক্টোর দেওয়া মাংস দেখে আমার সন্দেহ হল। সুতরাং সেটাকে মানুষের মাংস মনে করে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলাম। সেটা আমি ছুঁয়েও দেখলাম না।

"এর মধ্যে আমাকে যেদিন রাত্রে পাহারা দিতে বলা হল, সেদিন রাত্রে শুরু হল প্রচণ্ড তুষারপাত। হাড় হিম করা ঠান্ডায় মনে হল সব কিছু জমে যাবে। অনেকগুলো গরম পোশাক পরেও আমি শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। টিম্বাক্টো তখন কোথায় ছিল কে জানে? সে দৌড়ে এসে আমার গায়ে তার মোটা ওভারকোটটা চাপিয়ে দিল। আমি আপত্তি জানিয়ে তার কাছে কোটটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, এটা তুমি করতে পারো না টিম্বাক্টো, তোমারও তো গরম পোশাকের প্রয়োজন আছে।

"সে তখন কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটা ধারালো ছোরা বার করে সেটাকে দুভাগ করতে গেল। আমি তখন বাধ্য হয়ে তার হাত থেকে কোটটা নিয়ে গায়ে পরে নিলাম।

"কয়েক দিন পরেই আমরা প্রাশিয়ানদের কাছে নিদারুণভাবে পরাজিত হলাম। আমাদের দলের কে কোথায় ছিটকে পড়ল কেউ জানে না। প্রাণ নিয়ে যে যেখানে পারল পালিয়ে গেল। গোটা শহর খুঁজলে একটা লোকেরও দেখা পাওয়া যেত না। সেসময় সম্ভবত কোনো রেস্টুরেন্টে খাবারের সন্ধানে ঢুকে পড়েছিলাম, সেখানেই

টিম্বাক্টোকে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে টিম্বাক্টোর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই সে বলল, এই যে রেস্টুরেন্টটা দেখছ—এটা আমিই করেছি। কর্মচারী, কুক রেখেছি প্রচুর লোকের ভিড় হয়। তাদের মধ্যে অনেক প্রাশিয়ান এখানে খেতে আসে। তারা আমার রেস্তোরাঁর খাবারের খুব প্রশংসাও করে।

"দেখলাম, দোকানের সামনে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা আছে, সম্রাটকে ভুরিভোজনে তৃপ্তি দিয়েছে মঁসিয়ে টিম্বাক্টোর এই রেস্তোরাঁ। সুলভ মূল্যে খাবার পরিবেশন করা হয়।

"টিম্বাক্টো আমাদের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সমর্থন পেয়ে এই রেস্তোরাঁ খুলেছে। এটাকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ওর এই বিশ্বাসঘাতকতায় মনে খুব দুঃখ পেলাম। কিন্তু এই ভেবে নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম, সে আমাদের জাতশত্রু প্রাশিয়ানদের যত পচা বাজে খাবার খাইয়ে মনের জ্বালা মেটাবে।"

কাদাখোঁচা পাখি
The Snipe

গত চল্লিশ বছর ধরে ব্যারন দ্য ব্যাভেটস ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ শিকারি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু পাঁচ-ছ বছর প্যারালিসিসে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি সর্বদাই হুইল চেয়ারে বসে থাকেন আর দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেন পায়রা শিকার করে। বাকি সময় কাটাতে তিনি বইয়ের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

ব্যারন একজন মানুষ হিসাবে খুবই ভালো। আর বিগত শতাব্দীর সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। ছোটোগল্প শোনার প্রতি ছিল তাঁর মারাত্মক আসক্তি। আর সেগুলো যদি অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আশেপাশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটত সেসব বিষয়ে সমান আকর্ষণ বোধ করতেন ব্যারন। যখনই তাঁর কোনো বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত তিনি তার কাছে খবরাখবরের সন্ধান করতেন।

তিনি কাউকে জেরা করতে শুরু করলে তার নাভিশ্বাস উঠে যেত। আচ্ছা আচ্ছা উকিলও তাঁর জেরা করার কায়দা দেখে ঘাবড়ে যেতেন।

যেদিন সূর্যের প্রখর উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ত সমস্ত প্রকৃতিতে সেদিন তিনি তাঁর আরাম কেদারায় সমস্ত শরীরটাকে শিথিল করে দিয়ে অর্ধনিদ্রিত হয়ে পড়ে থাকতেন। চাকা লাগানো ওই চেয়ারটাকে চাকরদের মধ্যে কেউ একজন টেনে নিয়ে আসত। আর একটা চাকর তাঁর বন্দুকটা নিয়ে তাতে গুলি ভরে তাঁর হাতে তুলে দিত। অন্য আর একটা চাকর সকলের চোখের আড়ালে ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে থাকত আর মাঝে মাঝে দুই-একটা পায়রা উড়িয়ে দিত আর তিনি অত্যন্ত সতর্ক থেকে সে পায়রাগুলোকে লক্ষ করে গুলি করতেন।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এইভাবে পাখি শিকার করতেন। কোনো পাখি তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তাঁর খুব অস্বস্তি হত। গুলিবিদ্ধ হয়ে পাখিটা যদি মাটিতে পড়ে যেত অথবা পড়েই যদি ডিগবাজি খেতে থাকত তাহলে তিনি আনন্দে হাততালি দিয়ে প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। যোশেফ নামের যে চাকরটা তাঁর বন্দুকে গুলি ভরে দিয়েছিল তাকে বলতেন, যোশেফ নিশ্চয়ই আমার ওই গুলিতেই পাখিটা পড়েছে, তাই না?

তাঁর কথার উত্তরে যোশেফ বলত, অবশ্যই, ব্যারনের হাতের নিশানা একেবারে অব্যর্থ।

শরত ঋতু আসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে শিকারের জন্য সাজসাজ রব পড়ে যেত। আগের নিয়মটা তিনি আজও বজায় রেখেছেন। বন্ধুদের তিনি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। আকাশের গা বেয়ে পাখিরা যখন ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যেত আর তাদের লক্ষ করে তাঁর বন্ধুরা যখন গুলি করতেন তখন তাঁর মনটা খুশি আর আনন্দে

ভরে উঠত। তিনি গুলির শব্দগুলো এক এক করে গুনে মনে রেখে দিতেন। শিকারের শেষে বন্ধুরা যখন ফিরে আসতেন তখন তিনি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে শুনতে চাইতেন তাঁরা কীভাবে শিকার করেছেন। সেগুলোর প্রতিটি কৌশল, প্রত্যেকবার গুলি ছোঁড়ার বর্ণনা। খাবার টেবিলে বসে শিকারের গল্প করতে করতে তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত।

তাঁরা অদ্ভুত ধরনের সমস্ত শিকারের কাহিনি বর্ণনা করতেন, অন্তত ব্যারনের কাছে তাই মনে হত। সে সমস্ত কাহিনি ছিল যেমন রোমহর্ষক তেমনি ভয়ংকর আর দুঃসাহসিক। সেই সমস্ত শিকারের কাহিনি বলতে বলতে তাঁদের শরীরে রোমাঞ্চ জাগত, তাঁরা আনন্দে অধীর হতেন। সেগুলোর বেশ অনেকগুলোই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে খুঁজে বের করা হয়েছিল। আবার সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা এই খাবার টেবিলে আগেই অনেকবার বলা হয়েছে। প্রতিবছর একটা গল্প বারবার এখানে বলা হত নূতন উৎসাহের সঙ্গে। সেই গল্পটা হল কীভাবে বেঁটেখাটো ভাইকোঁৎ-দ্য বোরিল এর গুলির নিশানা থেকে একটা খরগোশ পালিয়ে গিয়েছিল আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেরিয়ে কীভাবে হাত-পা ছুঁড়েছিল—তার অভিনয় করে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতেন।

গল্প সত্যি মিথ্যে যে ধরনেরই হোক না কেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের বলা গল্প বিশ্বাস করতেন।

কোনো গল্প যদি কখনও না বলাও হত, একটা পুরোনো গল্প এখানে বারবার বলা হত আর সেটা হল একটা পাখির কাহিনি আর সেটা কাদাখোঁচা। এই কাদাখোঁচা পাখিটির আসার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল আর যখনই তার আসার সময় হত তখন ভোজ-টেবিলের কাছে যেন উৎসব শুরু হয়ে যেত। খাদ্যরসিক অতিথিদের সকলের এই পাখিটার ওপর একটা অসম্ভব টান ছিল বলে রাত্রের খাবার টেবিলে একটা করে কাদাখোঁচা পাখির সদ্‌গতি করা হত, শুধু প্লেটের ওপর পড়ে থাকত তার মাথাটা।

এর পর ব্যারন গির্জার পুরোহিতের দায়িত্ব নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন। তাঁর সামনে এনে রাখা হত একটি প্লেট আর প্লেটের ওপর থাকত খানিকটা চর্বি। পাখির মাথাগুলোকে তিনি প্রথমে আঙুলের ডগা দিয়ে প্লেট থেকে তুলে নিতেন, তারপর মন্ত্রোচ্চারণ করে সেগুলোকে শুদ্ধ করে নিতেন। তাঁর সামনে একটি বাতি জ্বেলে দেওয়া হত, সকলে অলৌকিক কিছু ঘটার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন।

এর পর ব্যারন পাখিটির মাথায় একটি আলপিন বিঁধিয়ে দিতেন। পরে আলপিনটাকে খুব সাবধানে আঙুল দিয়ে ধরে উপরের দিকে তুলতেন।

অতিথিরা সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে এক, দুই, তিন সংখ্যা গুনতেন আর ব্যারন তাঁর আঙুলের সাহায্যে পাখির মাথাসহ আলপিনটাকে ঘোরাতে আরম্ভ করতেন। ঘুরতে ঘুরতে পাখির চঞ্চুটা যার দিকে মুখ করে থেমে যেত সে-ই বিজয়ী হত অর্থাৎ সেই লাভ করত কাদাখোঁচার সমস্ত মাথাগুলো। এতে সকলে বিজয়ীর দিকে হিংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।

এর পর ব্যারন মাথাগুলোকে একটা একটা করে ধরে বাতির আগুনে রোস্ট করতেন।

আগুনের তাপে পাখির মাথা থেকে চর্বি গলে পড়ছে দেখে লোভে বিজয়ী অতিথির চোখ দুটো চকচক করে উঠত। এইভাবে যখন পাখির মাথাগুলো ঝলসে যেত তিনি তখন পাখির চঞ্চুটা দুই আঙুলের ডগায় ধরে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে ফেলতেন। মাথাগুলো চিবোনোর সময় যখন তাঁর চোখ দুটো রসনার তৃপ্তিতে বন্ধ হয়ে আসত তখন অন্যান্য অতিথিরা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করতেন।

শেষ মাথাটি যখন তাঁর উদরে চলে যেত তখন ব্যারন, অন্যান্য হতাশ অতিথিদের আনন্দ দানের জন্য তাঁকে একটি রোমহর্ষক শিকার কাহিনি বলার জন্য অনুরোধ করতেন।

বৃদ্ধ বোনিফেস-এর অপরাধ
Old Boniface's Crime

বৃদ্ধ বোনিফেস অন্যান্য দিনের মতো যখন পোস্ট অফিস থেকে বাইরে বেরোল চিঠিগুলো বিলি করার জন্য তখন বুঝল তার থলিতে খুব বেশি চিঠি নেই। সেটা বুঝতে পেরে সে খুব খুশি হল। মফস্‌সল শহরগুলোতে গিয়ে ডাক বিলি করাই ছিল তার কাজ। বাড়ি বাড়ি অফিসে অফিসে সমস্ত দিন ধরে ডাক বিলি করে সে যখন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আসত তখন সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ত তার কথা বলার ক্ষমতা থাকত না।

বিলি করার মতো খুব বেশি চিঠি তার কাছে ছিল না। সুতরাং তার কাজও শেষ হতে খুব বেশি দেরি হবে না। সে ঠিক করল সে যখন বাড়ি ফিরবে, ফেরার পথে একটু ঘুরেটুরে নিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ বাড়িতে ফিরে আসবে।

শহর ছাড়িয়ে এসে সে তার কাজ আরম্ভ করল। এটা জুন মাসের কথা। বনে বনে গাছে গাছে যেন ফল আর ফুলের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। তার পরনে হাতকাটা একটা নীল জামা আর মাথায় কালো টুপি। সে ব্যস্ত হয়ে হেঁটে চলেছে যব ও গমের মাঠের মধ্য দিয়ে যে সরু পায়ে চলা পথটা বেরিয়ে গেছে, সেটা ধরে। কাঁধ সমান উঁচু যব গমের গাছগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল, মৃদু বাতাসের ছোঁয়ায় তিরতির করে কেঁপে ওঠা কোনো জলাশয়ের ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে সে হেঁটে চলেছে।

সে প্রথমে একটা বাড়িতে এসে ঢুকল। বাড়ির চার পাশটা ঝোপের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ঢোকার মুখে একটা কাঠের গেট। সেখানদিয়ে খেতের মধ্যে এসে ঢুকে চাষিটির নাম ধরে সে ডাকল, মঁসিয়ে চিকট, সুপ্রভাত। এই বলে সে একখানা খবরের কাগজ তার দিকে এগিয়ে দিল। মঁসিয়ে চিকট তখন কাজ করছিল। সে কপালের ঘাম মুছে তার হাত থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কাগজখানা পড়বে। গেটের পাশেই আপেল গাছটার নীচে একটা লোহার পিপের মধ্যে তার পোষা কুকুরটা বাঁধা থাকে। সে ডাকপিয়োনটাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে তার কাঁধের ওপর লম্বা ঝোলাটা ফেলে তার সদা-সঙ্গী হাতের ছড়িটা নিয়ে দ্রুতপায়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে উঠল।

সেনামারের ছোটো গ্রামটায় চিঠি বিলির কাজ শেষ করে সে আবার মাঠের পথ ধরে এগিয়ে চলল। এবার তাকে একখানা কাগজ ডেলিভারি করার জন্য যেতে হবে ট্যাক্স কালেক্টরের বাড়ি। এই গাঁ থেকে ট্যাক্স কালেক্টরের বাড়ি হাঁটা পথে প্রায় আধ মাইল। ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে চাপাটি। গত সপ্তাহেই তিনি এখানকার অফিসে

বদলি হয়ে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি বিয়ে করেছেন। প্যারিসে ছাপা একখানি কাগজ তিনি নিয়মিত পড়েন। পিয়োন বোনিফেসের অভ্যাস ছিল, কাগজখানা ডেলিভারি দেওয়ার আগে তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া।

এর পর সে সেই কাগজখানা তার থলি থেকে বার করে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পড়তে লাগল। প্রথম পৃষ্ঠায় শুধু রাজনীতির খবর দেখে সে পাতা ওলটালো। কারণ সে সমস্ত খবরে তার মোটেই রুচি নেই। অর্থনৈতিক সংবাদগুলোর প্রতিও তার কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু সাধারণ সংবাদগুলো তাকে খুব বেশি করে টানে।

সুতরাং সেধরনের সংবাদগুলো সে খুঁজে খুঁজে পড়তে লাগল। সেদিনের একটি বিশেষ সংবাদ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেটা হল এক দারোয়ানের কুঁড়েতে একটা অপরাধের ঘটনা। সেই খবরটার প্রথম দু-তিন লাইন পড়ার পর সমস্ত ঘটনাটা সে পড়বে বলে ঠিক করল। সেই ভেবে সে পুরো ঘটনাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শেষ করে ফেলল। ভয় পাওয়ার মতো খবর সেটা। সকালবেলা একজন কাঠুরিয়া দারোয়ানের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল দরজার সামনে খানিকটা রক্ত পড়ে রয়েছে। সে ভাবল, দারোয়ান নিশ্চয়ই ওখানে কোনো খরগোশ কেটেছে। কৌতূহল হতেই সে দরজার সামনে এগিয়ে গেল, দেখল দরজার কড়ায় একটা তালা ঝুলছে আর সেটাকে কেউ লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলেছে।

ব্যাপারটা দেখে সে বেশ ভয় পেয়ে গেল। তারপর ছুটতে লাগল গ্রামের মেয়রের বাড়ির দিকে তাঁকে খবরটা জানাবার জন্য। মেয়র একজন কনস্টেবল ও একজন স্কুলশিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। কাঠুরিয়াও তাঁদের সঙ্গে এল। তাঁরা ভিতরে ঢুকে দেখলেন, দারোয়ান গলাকাটা অবস্থায় ফায়ারপ্লেসের পাশে পড়ে আছে—তার দেহের রক্তে সমস্ত মেঝেটা থিকথিক করছে। সেই রক্ত এখন জমাট বেঁধে কালো হয়ে উঠেছে। আর তার স্ত্রী বিছানার ওপর মরে পড়ে আছে। হাঁ হয়ে আছে তার মুখটা আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে আছে সিলিংটার দিকে। গলায় আঙুলের দাগগুলো যেন কেটে বসে গেছে। তাকে নিশ্চয়ই শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। আর তাদের ছ'বছরের শিশুকন্যাটিকে বালিশ চাপা দিয়ে দমবন্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছে। সেই নৃশংস পাশবিক হত্যার ঘটনা পড়ে বৃদ্ধ বোনিফেস শিউরে উঠল। নিজেকে তার কেমন যেন নার্ভাস মনে হল, কেমন যেন অবসন্ন বোধ করতে লাগল সে। ভগবানের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'হে ভগবান, মানুষ এত নিষ্ঠুর আর পাষণ্ড হতে পারে!'

এর পর সে কাগজটাকে আবাব থলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পথ চলতে লাগল। সেই বীভৎস হত্যার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে মঁসিয়ে চাপাটির বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হল। সে গেট খুলে লম্বা রাস্তাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। বাড়িটা একতলা। নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে দূরত্বের ব্যবধানে এই বাড়িটি প্রায় পাঁচশো গজ।

বোনিফেস এবার সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে এসে দরজার হাতলটা ঘোরাল। কিন্তু

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল বলে সেটা খুলল না। তারপর হঠাৎ তার নজর পড়ল খড়খড়িগুলোর দিকে। সেগুলো তখনও বন্ধ ছিল। তাতে সে ধরে নিল এখনও কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি।

ব্যাপারটা তার কাছে কেমন যেন রহস্যময় মনে হল। সবাই জানে মঁসিয়ে চাপাটি খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। বোনিফেস তার ঘড়ি দেখল, সাতটা বেজে পাঁচ। প্রায় এক ঘণ্টা এদিকটায় এসেছে সে। এই সময়ের মধ্যে মঁসিয়ে চাপাটি ঘুম থেকে উঠে পড়েন।

ব্যাপারটা জানার জন্য সে কৌতূহলী হয়ে উঠল। সন্ধানী দৃষ্টিতে বাড়ির চার পাশটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। মনে হল এ যেন তার নিজের বিপদ, তাই খুব সতর্ক হয়ে পা ফেলে ফেলে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এক জায়গায় দেখতে পেল একজন মানুষের পায়ের ছাপ।

সে যখন একটা জানালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে ঘরের ভিতরে অস্পষ্ট গোঙানির মতো শব্দ শুনতে পেল। সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য সে খড়খড়ির ওপর একটা কান চেপে ধরল। তার সন্দেহ অমূলক নয়। গোঙানির শব্দই বটে। মনে হল কেউ যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে আর তার গলার ভিতর থেকে ওইরকম কাতরানির শব্দ বেরিয়ে আসছে।

বোনিফেস স্পষ্টই বুঝতে পারল বাড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই কেউ কারও হাতে খুন হচ্ছে। সে সেখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। মাঠ পেরিয়ে, ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। নাক দিয়ে তার ঝড়ের মতো নিশ্বাস বইতে লাগল। টুপিটা মাথা থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল। টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগল। এইভাবে ছুটতে ছুটতে সে যখন থানায় এসে উপস্থিত হল, তখন সে প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে।

থানার অফিসার তখন নিজের ভাঙা চেয়ার সারাবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কাঠের কাজে অনভিজ্ঞ কনস্টেবলটি তাঁকে সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করছিল।

ঝড়ের বেগে তাদের সামনে এগিয়ে এসে বোনিফেস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, স্যার, স্যার, শিগগির চলুন, ট্যাক্স কালেক্টরকে বোধহয় কেউ খুন করেছে।

কাজ করতে করতে থানার অফিসার হঠাৎ এমন একটা সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ নির্বোধের দৃষ্টি নিয়ে বোনিফেস-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে খুন হয়েছে বললে?'

'ট্যাক্স কালেক্টর, তাড়াতাড়ি চলুন, ঘরে আমি তাঁর গোঙানির শব্দ শুনেছি।'

পুলিশ অফিসার তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে এই খবর শুনলে?'

'আমি নিজের কানে শুনেছি,' এই বলে সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল।

'তুমি তাঁদের সাহায্য করতে পারতে।' অফিসার বললেন।

বোনিফেস বলল, 'আমি সেখানে একা ছিলাম বলে সাহস করে সেখানে যেতে পারিনি।'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি একটু অপেক্ষা কর।' এই বলে তিনি তৈরি হয়ে কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বোনিফেসকেও তিনি সঙ্গে নিলেন। বাড়ির কাছে এসে অফিসার তাঁর পিস্তলটা হাতে নিয়ে সামনের টানা রাস্তাটা পেরিয়ে দরজার কাছে এসে হাজির হলেন। দরজাটা তখনও খোলা হয়নি। খড়খড়িগুলোও আগের মতো নামানো ছিল। তা থেকে তাঁরা অনুমান করলেন খুনীরা নিশ্চয়ই তখনও ঘরের ভিতরেই রয়েছে। অফিসার তখন ফিশফিশ করে বললেন, 'ওদের আমরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলব। ওরা এখনও ঘরের মধ্যেই আছে।'

উত্তেজনায় বোনিফেস একরকম কাঁপতে শুরু করল। সে অফিসারকে সঙ্গে করে একটা জানালার খড়খড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে কাঁপা গলায় বলল, 'ওইখানে আপনার কান পাতলে সব বুঝতে পারবেন।'

অফিসার জানালাটার কাছে গিয়ে খড়খড়ির ওপর নিজের একটা কান চেপে ধরে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করলেন। আর ওরা দুজন, কোনো বিপদের সম্ভাবনার মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে রইল।

পুলিশ অফিসারটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে খড়খড়ির ওপর কান পেতে রইলেন। কী শুনলেন তিনি নিজেই জানেন, কিন্তু দেখা গেল চাপা একটা হাসিতে তাঁর গলার শিরা দুটো ফুলে উঠেছে। এর পরও তিনি আর একবার খড়খড়ির ওপর কান পাতলেন। তারপর, ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে ফিরে এলেন। তাঁর ভাব দেখে ওরা তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

এবার তিনি ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওরা তাঁকে অনুসরণ করল। দরজার সামনে এসে তিনি বোনিফেসকে নীচ দিয়ে কাগজখানা আর অন্যান্য চিঠিপত্র ঢুকিয়ে দিতে বললেন।

হতবাক বোনিফেস তাঁর নির্দেশ মানতে এক মুহূর্তও দেরি করল না।

এর পর তিনি বললেন, 'চলো, এখন আমরা ফিরে যাব।'

তিনি যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন গেটের সামনে এসে বোনিফেসকে বললেন, চোখ দুটোতে তাঁর হাসির ঝিলিক খেলতে লাগল; 'বুঝলে, তুমি একটা চালাক কুকুর।'

বৃদ্ধ বোনিফেস বলল, 'কী বলছেন স্যার। ঘরের মধ্যে গোঙানির শব্দ আমি স্পষ্ট শুনেছি।'

এত সময় তাঁকে দেখে কিছুই বোঝা যায়নি। কিন্তু এখন আর তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কানফাটানো শব্দে হেসে উঠলেন। হাসির চোটে তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

তাঁর ব্যাপার দেখে তারা তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। পুলিশ অফিসারের তখন এমন অবস্থা, না পারছেন হাসি থামাতে, না পারছেন কোনো কথা বলতে। হঠাৎ তাঁর আচরণ এমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, সেটা বোঝাবার জন্য তিনি একটা খুব খারাপ ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তখনও তাদের কাছে রহস্যময়

রয়ে গেছে দেখে তিনি জানালার খড়খড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একইরকম ইঙ্গিত করলেন। এবার তাঁর সহকারী পুলিশ কর্মীটির ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না। সেও কানফাটানো শব্দে হোহো করে হাসতে শুরু করল।

বৃদ্ধ বোনিফেস মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে নির্বোধের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

এতক্ষণে অফিসারটির হাসি থামল। স্বাভাবিক হলেন তিনি। তারপর তিনি বোনিফেসের পেটে আঙুলের দু-চারটে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'তুমি সত্যিই একটা চতুর কুকুর, তোমার ভাঁড়ামিটাও ঠিক তেমন।'

তাঁর কথা শুনে বৃদ্ধ বোনিফেসের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল। সে বলল, 'আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, আমি নিজের কানে শুনেছি।'

অফিসার তার কথা শুনে আবার হাসতে শুরু করলেন। অফিসার বললেন, 'তা কীরকম শব্দ? তোমার স্ত্রীকে হত্যা করার সময় যেমন শব্দ শুনতে পাও সেইরকম কি?'

'হ্যাঁ আমার স্ত্রীকে আদর করতে গেলেই সে চিৎকার করে। কিন্তু বিশেষ মুহূর্তে সে অবশ্যই একটা শব্দ করে। কিন্তু সেটা তো এমন নয়। এতো প্রহারের শব্দ। মঁসিয়ে চাপাটি কি তাঁর স্ত্রীকে খুব মারছেন?'

অফিসারটি আবার খুব জোরে হেসে উঠলেন। এর পর তিনি বোনিফেসএর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিশফিশ করে কী যেন বললেন। বোনিফেস তাঁর কথা শুনে লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করল। তারপর বলল, 'আমার স্ত্রী তো ওরকম শব্দ করে না। তখন তার গলা থেকে যে শব্দ বেরোয় তা সম্পূর্ণ আলাদা। এই শব্দ শুনলে যে-কোনো লোকের মনে হবে একজন অন্যজনকে খুন করছে।'

বিভ্রান্ত বোনিফেস লজ্জা আর অপমানে তাঁদের সামনে থেকে পালিয়ে যাবার জন্য মাঠের পথ ধরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। সে তখনও অফিসারের অট্টহাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কনস্টেবলটাও তাঁর সঙ্গে সমানে হেসে চলেছে।

ম্যাদময়জেল কোকোতি
Mademoiselle Cocotte

পাগলা গারদের গেটটা পার হয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় বাঁ দিকে আমার নজর পড়ল, দেখলাম একটা লম্বা রোগা চেহারার লোক অঙ্গভঙ্গি করে একটা কুকুরকে ডাকছে। এদিক-ওদিক তাকালাম, কিন্তু কোনো কুকুর দেখতে পেলাম না। সে কুকুরের নাম ধরে ডাকছিল আর বলছিল, 'ও আমার কোকোতি, তুমি কোথায়, তুমি আমার কাছে এসো।' মানুষ যেভাবে তার পোষা জীবকে ডাকে সেইভাবে সে পা ঠুকে ঠুকে কোকোতি, কোকোতি বলে ডাকছিল।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটা অমন করছে কেন?'

ডাক্তার বললেন, 'ওর নাম ফ্রাঙ্কয়, সহিসের কাজ করত। ওর আদরের কুকুরটাকে জলে ডুবিয়ে মেরেছিল। সেই থেকে ওর মাথার গোলমাল।'

'ওর ঘটনাটা একবার শোনান না। মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি।'

ডাক্তার বলতে শুরু করলেন, 'প্যারিসের এক মফস্‌সল শহরে এক ধনী পরিবার বাস করত। তাদের বাড়িটা ছিল সেন নদীর ধারে একটা পার্কের মধ্যে। বাড়িটা ছিল ছিমছাম সুন্দর। গঠনশৈলী থেকে বোঝা যাবে তারা রুচিসম্পন্ন মানুষ। তাদের বাড়িতে ফ্রাঙ্কয় সহিসের কাজ করত। গ্রামের পরিবেশে সে বড়ো হয়েছে। তার হাবভাব চালচলনও গাঁয়ের লোকের মতো। ফ্রাঙ্কয় ছিল সহজ সরল মনের যুবক। তার এই সরলতার সুযোগ নিয়ে লোকে তাকে ঠকাত।

এক দিন সন্ধের দিকে যখন সে বাড়ি ফিরে আসছিল, সে লক্ষ করল একটা কুকুর তার পিছনে পিছনে আসছে। প্রথমে সে ব্যাপারটায় বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু সে যখন দেখল, কুকুরটা তার পিছন ছাড়তে রাজি নয় তখন সে প্রভুভক্ত প্রাণীটার দিকে ফিরে তাকাল। বোঝার চেষ্টা করল, কুকুরটা তার চেনা কি না। না, এ ধরনের কুকুর সে আগে তো কখনও দেখেনি।

রোগা ডিগডিগে চেহারার কুকুরটাকে দেখে তার মনে হল সে অনেক দিন পেট ভরে কিছু খেতে পায়নি। বেশ কষ্ট করেই তাকে হাঁটতে হচ্ছিল। কুকুরটা তার পিছনের দুটো পায়ের ফাঁকে লেজটা ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল। ফ্রাঙ্কয় যখন তার দিকে তাকাল, দেখল, কুকুরটা তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। ফ্রাঙ্কয় যখন দাঁড়িয়ে পড়ছিল কুকুরটাও দাঁড়িয়ে পড়ছিল। সে যখন চলছিল, কুকুরটাও তার পিছনে পিছনে আসছিল।

সে সেটাকে নানারকম শব্দ করে তাড়াবার চেষ্টা করল। তাড়া খেয়ে একটু পিছিয়ে যায় আবার এগিয়ে আসে। ফ্রাঙ্কয় একটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে সেটা ছোঁড়ার

ভান করে তাকে ভয় দেখায়। কুকুরটা ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। দুর্বল শরীরটা নিয়ে আবার একটু পিছিয়ে যায়। একটু পরে আবার সে তার পিছনে পিছনে চলতে আরম্ভ করে।

তার ওই অবস্থা দেখে ফ্রাঙ্কয়ের খুব দুঃখ হয়। করুণায় ভরে ওঠে তার মনটা। সে এবার কুকুরটাকে কাছে ডাকে। ভয়ে ভয়ে ফ্রাঙ্কয়ের দিকে এগিয়ে যায় কুকুরটা। তার পাঁজরের হাড়গুলো এবার স্পষ্ট গোনা যায়। ফ্রাঙ্কয় এবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। এবার সে বলে, কী আর করবি, আয় আমার সঙ্গে। মাদি কুকুরটা এবার গভীর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে ফ্রাঙ্কয়ের দিকে তাকিয়ে আনন্দে লেজ নাড়তে থাকে। সে বুঝে ফেলেছে, লোকটার অনুগ্রহ পেয়েছে সে। এবার সে ফ্রাঙ্কয়ের পিছু পিছু না গিয়ে তার সামনে সামনে এক অদম্য উদ্দীপনা নিয়ে দৌড়োতে শুরু করল। তার দুর্বল শরীরে যেন শক্তির জোয়ার এসেছে।

ফ্রাঙ্কয় তার মনিবের বাড়ি পৌঁছে প্রথমেই আস্তাবলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তারপর আস্তাবলের মেঝেতে বিছিয়ে দিল কয়েক আঁটি বিচালি। এর পর সে রান্নাঘর থেকে বেশ কয়েকখানা রুটি এনে কুকুরটাকে খেতে দিল। নিমেষের মধ্যে রুটিগুলো শেষ করে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল সেই খড়ের বিছানায়।

পর দিন ফ্রাঙ্কয় তার মনিবের কাছে ব্যাপারটা বলল। তিনি তাকে সেখানে থাকতে দিতে আপত্তি করলেন না। মাদি কুকুরটা তার আচার-আচরণে সকলের ভালোবাসা আদায় করে নিল। সে যেমন ছিল বুদ্ধিমতী তেমন বিশ্বাসী।

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে সকলে বিরক্ত হয়ে উঠল। কুক্কুরীটি প্রেমময়ী হয়ে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে প্রেম ও দেহদান করে চলেছে। ফলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে এলাকার সমস্ত কুকুর তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং তার সাহচর্য লাভের জন্য সর্বদা তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বারবনিতাদের মতো সে তার দেহদান করে চলেছে অবাধ উদাসীনতায়। সুতরাং তার প্রেমিকের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল। সে এই সমস্ত অসংখ্য ভক্ত প্রেমিকে পরিবৃত হয়ে গ্রামের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। দীর্ঘসময় ঘোরাঘুরি করে সে যখন ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে কোনো গাছের ছায়ায় এসে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন তার প্রেমিকরা তাকে ঘিরে পাহারা দিত আর তার দিকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকত। কামরসে সিক্ত জিব দিয়ে লালা ঝরে পড়ত। সন্ধ্যায় কুক্কুরীটা তার নিজের আস্তানায় ফিরে এলে তার স্তাবকরা তার পিছু পিছু এসে বাড়িটাকে ঘিরে থাকত। পার্কের এখানে-ওখানে সর্বত্র তারা শুয়ে বা বসে তাদের প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করত। নানাভাবে তারা ক্ষতি করত। পা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত তৈরি করত, ফুলগাছগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নষ্ট করত, সর্বত্র পায়খানা পেচ্ছাপ করে রেখে দিত। কুকুরগুলোর জ্বালায় সকলে অস্থির হয়ে উঠল। তাদের প্রেমিকাকে দেখতে না পেয়ে সমস্ত রাত ধরে তারা সমস্বরে চিৎকার করত। তাদের জন্য আশপাশের লোকজনকে জেগে থাকতে হত। অনেক চেষ্টা করেও তাদের তাড়ানো যেত না। দিনের বেলাতেও তারা অত্যাচার করতে ছাড়ল

না। বাড়ির সর্বত্র তারা অবাধে বিচরণ করত। উঠোনে, সিঁড়ির ওপর, রান্নাঘরের বারান্দায়, সর্বত্র শুয়ে বসে তারা প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করত। দশ মাইলের মধ্যে যত কুকুর ছিল, সকলে এই বাড়ি বা এই বাড়ির আশপাশে এসে আস্তানা গাড়ল।

এত সব ঘটনার পরেও, এত অত্যাচার সহ্য করেও কোকোতির প্রতি ফ্রাঙ্কয়ের ভালোবাসার টান একটুও কমল না। ফ্রাঙ্কয় বলত, এর মধ্যে মানুষের সব গুণই আছে, শুধু কথা বলতে পারে না।

ফ্রাঙ্কয় কয়েক দিন পরে একটা বকলেশ কিনে তাতে একটা তামার চাকতি আটকে দিল। চাকতিটার গায়ে কয়েকটা কথা খোদাই করিয়ে এনেছিল, 'ম্যাদময়জেল কোকোতি, মালিক—কোচম্যান ফ্রাঙ্কয়।'

এর মধ্যে কোকোতি ভীষণ মোটা হয়ে গেল। তার ফলে খুব জোরে সে ছুটতে পারত না। অল্প দৌড়িয়েই সে হাঁপিয়ে পড়ত। বছরে চারবার করে তার বাচ্চা হত। ক্রমে তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে যেখানেই যাওয়া যেত সেগুলোকে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যেত। ফ্রাঙ্কয় শেষ পর্যন্ত একটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তার মার কাছে রেখে দু-পাঁচটা করে চাদরে জড়িয়ে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে জলে দিব্যি ছুঁড়ে ফেলে দিত।

এক দিন কুকুরের অত্যাচারে মালি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এবার অস্থির হয়ে উঠল রাঁধুনি। আগে যাও বা রান্নাঘরের বারান্দায় ওরা শুয়েবসে থাকত, এবার ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। কয়লার ঘরে, রান্নাঘরের ভিতরে, কাবার্ডের নীচে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনে হল মানুষগুলো তারা পরোয়াই করে না। একটু সুযোগ পেলেই রান্নাঘর থেকে খাবার মুখে করে দে ছুট।

এর পর ফ্রাঙ্কয়ের মনিবের পক্ষে ধৈর্য রাখা আর সম্ভব হল না। তিনি কোকোতিকে বার করে দেবার জন্য তাকে আদেশ দিলেন। সে তার মনিবের আদেশ পেয়ে ভীষণ চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। সে ভেবে ঠিক করতে পারল না, কোথায় কোকোতির থাকার ব্যবস্থা করবে। তাকে রাখার জন্য অনেকের কাছে গেল, তাদের অনেক অনুরোধ করল, কিন্তু দেখা গেল তাকে রাখার কারও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। সুতরাং সে ঠিক করল, দূরের কোনো জায়গায় গিয়ে সে তাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। সেই মতো এক ট্রাক ড্রাইভারকে অনুরোধ করল প্যারিসের অপর প্রান্তে অন্য কোনো গ্রামে ছেড়ে দিয়ে আসতে।

ট্রাক ড্রাইভার যথারীতি ফ্রাঙ্কয়ের নির্দেশমতো কোকোতিকে অন্য আর একটা গ্রামে ছেড়ে দিয়ে এল। কিন্তু সন্ধে হতেই দেখা গেল কোকোতি তার পুরোনো জায়গায় ফিরে এসেছে।

এর পর কোকোতিকে আরও দূরে ছেড়ে দিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। হাব্রেগামী একটা ট্রেনের গার্ডকে পাঁচ ফ্রাঁ ঘুষ দিয়ে কোকোতিকে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করল ফ্রাঙ্কয়।

দিন তিনেক পরে কোকোতি আবার যথাস্থানে ফিরে এল। কিন্তু সে যখন ফিরে

এল তাকে দেখে মালিকের খুব দয়া হল। অনাহারে, পরিশ্রমে সে যেন ধুঁকছে। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। সুতরাং তাকে তাড়াবার কথা তিনি দ্বিতীয়বার আর উচ্চারণ করলেন না।

কোকোতি থেকে গেল। কিন্তু তার শরীরের আকর্ষণে আবার তার প্রেমিকরা আসতে আরম্ভ করল। এবার তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের কুৎসিত চিৎকারে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এর মধ্যে এক দিন ভোজের অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি রোস্ট করা একটা গোটা মুরগি মুখে নিয়ে পালাল দশাসই একটা মদ্দা কুকুর। সে দৃশ্য রাঁধুনির চোখ এড়াল না। সে শুধু নিষ্ফল আক্রোশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

খবরটা শুনে বাড়ির মালিক ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ফ্রাঙ্কয়কে ডেকে পাঠালেন। সে এলে বললেন, 'কাল সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ওই কুকুরটাকে যদি ডুবিয়ে না মার—তাহলে তোমার চাকরি থাকবে না। কথাটা মনে রেখো।'

তার মনিব যে এধরনের একটা হুকুম দিয়ে বসবেন, তা সে কল্পনাই করেনি। তাঁর কথা শুনে সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মনে হল সে বরং চাকরিটা ছেড়ে দেবে, কিন্তু তার এতদিনের পোষা কুকুরকে কিছুতেই ডুবিয়ে মারবে না। এই ভেবে সে জিনিসপত্র গোছাবার জন্য নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার মনে হল কোথায় কুকুরটাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, আর নিয়ে গেলেও সে এটাকে রাখবে কোথায়? তা ছাড়া, এই বাড়িতে তার থাকা খাওয়ার মোটেই কোনো অসুবিধা নেই, তার মনিব তাকে ভালো মাইনেপত্তরই দেয়। সুতরাং সে এবাড়ি বা চাকরি ছেড়ে কোথাও যাবে না। নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সে স্থির করল, কোকোতিকে নদীর জলে ডুবিয়েই মারবে।

প্রায় সমস্ত রাত্রি সে ঘুমোতেই পারল না। সকাল হতেই সে একগাছা লম্বা দড়ি নিয়ে আস্তাবলে গেল। ওখানেই কোকোতি থাকে। কুকুরটা তাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল, দু-একবার গা-ঝাড়া দিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কুকুরটার জন্য ফ্রাঙ্কয়ের মনটা যেন কেমন করে উঠল। সে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল, তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

ঘড়ির শব্দে সে বাস্তব চেতনায় ফিরে এল। সে তাকে ডাকল, আয়, আয়।

কুকুরটা তার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। মূক জীব কিছুই অনুমান করতে পারল না। সে ভাবল, মনিব তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। হাঁটিতে হাঁটতে তারা নদীর ধারে এসে হাজির হল। ফ্রাঙ্কয় খুঁজে খুঁজে এমন একটা জায়গা বের করল যেখানে জল অত্যন্ত গভীর। দড়ির এক প্রান্ত বেশ শক্ত করে গলার বকলেশের সঙ্গে বেঁধে আর এক প্রান্ত বাঁধল বেশ বড়োসড়ো একটা পাথরের চাঙড়-এর সঙ্গে। এর পর ফ্রাঙ্কয় কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। কুকুরটাও লেজ নাড়তে নাড়তে জিব বের করে তার প্রভুর আদর খেতে লাগল। তার মুখ দিয়ে আনন্দের গরগর শব্দ বেরোতে লাগল।

ফ্রাঙ্কয় ভাবতে লাগল কী করবে সে। কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ কী মনে হল ফ্রাঙ্কয়ের সে কুকুরটাকে চেপে ধরে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। সে প্রথমে সাঁতার কেটে পারে আসার চেষ্টা করল। সাঁতার কাটার তার অনেক দিনের অভ্যাস। স্নানের সময় সে এভাবেই সাঁতার কাটত। কিন্তু পাথরটা তাকে নিয়ে ডুবতে লাগল। প্রথমে তার শরীর, পরে তার মাথার দিকটা ডুবতে লাগল। ডুবতে ডুবতে সে বড়ো করুণ দৃষ্টিতে তার মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে কুকুরটা জলের নীচে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুদবুদ উঠতে দেখা গেল।

কিছুক্ষণ সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ফ্রাঙ্কয়। ভীষণ কষ্টে তার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখ দিয়ে। এর পর সে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

এই ঘটনার পর ভয়ংকরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল ফ্রাঙ্কয়, বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে রইল প্রায় এক মাস। বিকারের ঘোরে সে কুকুরটাকে দেখতে পেত। সে যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ হাত চেটে দিচ্ছে, জিব বের করে লেজ নাড়ছে, আনন্দে গরগর শব্দ করছে।

তার মালিক তাকে ডাক্তার দেখিয়ে সারিয়ে তুললেন। সে একটু সুস্থ হলে তার মনিব আর তাঁর স্ত্রী তাঁদের রাওয়েনের জমিদারিতে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সেখানে সে চাকরের সঙ্গে রোজ সোন নদীতে স্নান করতে যেত, দাপাদাপি করে সাঁতার কাটত, সাঁতার কেটে নদী পার হত।

এক দিন চান করতে করতে তারা এ-ওর গায়ে জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা কিছু যেন তাদের দিকে ভেসে আসছে। সেদিকে তার সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ভাসতে ভাসতে সেটা যখন তাদের খুব কাছে চলে এল—দেখা গেল সেটা একটা কুকুরের মৃতদেহ। ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেছে। সমস্ত লোম উঠে গেছে তার শরীর থেকে, ওপরের দিকে পাগুলো তুলে রয়েছে। সেগুলো শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। এর পর ফ্রাঙ্কয় নিজে একটু দূরে থেকে দেহটাকে উলটে দিল।

এরপরই ফ্রাঙ্কয় ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। সে লক্ষ করল কুকুরটার গলায় একটা বকলেশ বাঁধা। সে কাছে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করল। দেখল, বকলেশের সঙ্গে যে তামার পাতটা আটকানো আছে তাতে খোদাই করা আছে, ম্যাদময়জেল কোকোতি, মালিক—কোচম্যান ফ্রাঙ্কয়।

বুকফাটা আর্তনাদ করতে করতে সে পাড়ের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। মনে হল তার কাছ থেকে সে পালিয়ে আসতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নদীর পাড়ে এসে না পৌঁছোল, ততক্ষণ সে আর্তনাদ করতে থাকল। পাড়ে উঠেই সে উলঙ্গ অবস্থায় একইরকমভাবে চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল। তারপর হাহা করে হাসতে শুরু করল। সে তখন পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

পিতা
The Father

জাঁ দ্য ভলনয়ক্স এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মাঝে মাঝে তার বাড়ি আমি গল্প করতে যাই। অনেক সময় সেখানে থেকেও যাই কয়েকটি দিনের জন্য। সেখানে আমার বেশ সময় কাটে। নদীর ধারে বনের মধ্যে একখানা বাড়ি করে সেখানে বাস করছেন, সম্প্রতি প্যারিস থেকে এসেছেন। সেখানে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়েছেন। পার্টি, ডিনার, পুরুষ বন্ধু, মহিলা বন্ধু, মদ, মেয়েছেলে, তাসপাশা—ইত্যাদি সমস্ত জিনিসের মধ্যে তিনি পুরোপুরি ডুবে ছিলেন। জীবনে আনন্দ করার মতো সমস্ত উপকরণই তাঁর কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে এসেছেন এখানে। এটাই তাঁর জন্মভূমি।

আমরাই তাঁর দু-চারজন বন্ধু যাঁরা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যান এবং কেউ থাকেন এক সপ্তাহ আবার কেউ সপ্তা দুইও থেকে যেতে আপত্তি করেন না। আমরা গেলে তিনি খুব খুশি হন। আমাদের সাহচর্য তাঁকে আনন্দ দেয়। কিন্তু আমরা যখন তাঁকে বিদায় জানিয়ে সেখান থেকে চলে আসি, তিনি হয়তো ভিতরে ভিতরে একটু অখুশি হন কিন্তু বাইরে থেকে দেখে সেটা বোঝাই যায় না। মনে হয় তিনি বেশ সহজ স্বাভাবিক থাকেন। গত সপ্তাহে আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি যথারীতি আমার সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করলেন। আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন সাদরে। মাঝে মাঝে বৈচিত্র আনার জন্য আমরা একা একা সময় কাটাতাম। তিনি সেসময় পড়াশোনা করতেন। আমি কোনো না কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যে কাজটা আমরা করতাম, সেটা হল প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত আমরা বেড়িয়ে বেড়াতাম।

আগের মঙ্গলবার ভীষণ গরম পড়েছিল। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সবকিছু যেন পুড়ে যাচ্ছিল। রাত্রি নটার সময় আমরা নদীর ধারে বসে ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়োবার চেষ্টা করছিলাম। কলকল করে বয়ে যাচ্ছিল নদী। জলের ওপর যে সমস্ত নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত হয়ে জ্বেলে দিয়েছিল অসংখ্য প্রদীপ, সেদিকে তাকিয়ে আমরা নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। অবশ্য সে বিষয়ে যে আমাদের খুব বেশি পাণ্ডিত্য ছিল সে-কথা বলতে পারি না।

হঠাৎ দূরে একজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মঁসিয়ে, মঁসিয়ে, জাঁ চিৎকার করে বললেন, 'আমি এখানে, নদীর পাড়ে বসে আছি।'

চাকরটি আমাদের দেখে জানাল যে বেদেনি এসে পড়েছে।

বন্ধুবরের আচরণ একটু অন্যরকম মনে হল। তিনি যেটা কখনও করেন না, সেটাই করলেন। উচ্চ শব্দে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আজকের তারিখটা কি তাহলে সতেরোই জুলাই?

ঠিক আছে, ওকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি এক্ষুণি আসছি।

এর পর আমরা দুজনে সেখানথেকে উঠে পড়লাম। বন্ধু বললেন, চলো, হাঁটতে হাঁটতে তোমাকে এর কাহিনিটা বলছি।

বছর সাতেক আগের ঘটনা। আমি মাত্র কয়েক দিন প্যারিস থেকে এসেছি। সেদিন সন্ধেবেলা অরণ্যের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির শোভা দেখছিলাম। সেদিনের আবহাওয়াটাও ছিল ভারী চমৎকার। আকাশে ছিল অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়। আধো অন্ধকার আধো আলোর মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো গাছের নীচ দিয়ে আমি মন্থর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম।

চিরকালের জন্য আমি প্যারিস ছেড়ে চলে এসেছি। অনেক নোংরা, নীচ আর অর্থহীন হইচই আর হুল্লোড়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে তার বিকৃত রূপ আমি উপলব্ধি করেছি। তাতে আমি ভীষণভাবে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে যে ক্রেজিল নামের গ্রামটা আছে, আমি অরণ্যের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সেই গাঁয়ের দিকেই এগিয়ে চলেছিলাম। 'বক' নামের যে কুকুরটাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়েছিলাম সে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই কাছাকাছি ঝোপের মধ্যে কোনো শিয়াল, নেকড়ে বা বনশুয়োর লুকিয়ে আছে। সুতরাং কোনো শব্দ না করে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগলাম। হঠাৎ একজন মানুষের করুণ কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। ভাষাহীন সেই যন্ত্রণাকাতর কান্না শুনে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। মনে হল, কেউ একজন নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অন্যজনকে হত্যা করছে। সুতরাং অন্য কিছু না ভেবে, আমার হাতের মোটা ওক কাঠের লাঠিটাকে শক্ত করে চেপে ধরে কান্নার উৎসের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললাম।

যে জায়গাটা থেকে কান্নার শব্দ আসছিল, সেই জায়গার একেবারে কাছে এসে পড়লাম। সামনের একটা বাড়ি থেকেই কান্নার শব্দটা ভেসে আসছিল। বক আমার আগে আগেই দৌড়োচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে থেমে পড়ছিল আবার মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডাকাডাকি করছিল। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম কোথা থেকে বিরাট একটা কালো কুকুর আমাদের সামনে এসে দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখলাম, তার হিংস্র চোখ দুটো আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। মনে হল সে আমাদের আর বেশি দূর এগোতে দিতে চায় না।

লাঠিটা বাগিয়ে ধরে আমি তার দিকে তেড়ে গেলাম। আমি আঘাত করার আগেই বক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুটো কুকুর এবার মারামাড়ি কামড়াকামড়ি করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। কেউ কাউকে ছাড়ল না। সেই সুযোগে কুকুর দুটোর পাশ দিয়ে আমি দৌড়ে গেলাম। যেতে যেতে রাস্তার ওপর শুয়ে থাকা একটা চতুষ্পদ প্রাণীর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়িয়ে জন্তুটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম সেটা একটা ঘোড়া। ঘোড়াটার পাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সার্কাসের বা ব্যবসায়ীদের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণত এ ধরণের গাড়িগুলো ব্যবহার করা হয়। ওখানকার একটা বাড়ি থেকেই কান্নার শব্দটা আসছিল। হঠাৎ মনে

হল দরজা খোলার শব্দ শুনলাম। দ্রুত পায়ে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে তৈরি কাঠের তিনটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম।

ব্যাপারটা দেখে আমি যারপরনাই অবাক হলাম। আমি যা ভেবেছিলাম, তার কিছুই না। দেখলাম, একজন লোক নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে আর বিছানার ওপর অর্ধনগ্ন একটি নারী প্রসববেদনায় ওইভাবে চিৎকার করে কাঁদছে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, আমি যে সেখানে এসে পৌঁছেছি সেটা জানাবার জন্য লোকটাকে দু-চারবার ডাকলাম। লোকটা এবার আমার দিকে তাকাল। তাকে দেখে মার্সেলি অঞ্চলের মানুষ বলে মনে হল। মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য সে তাকে সাহায্য করতে আমার কাছে আমাকে করুণ কণ্ঠে মিনতি জানাল। ইতিপূর্বে কোনো প্রাণীকে আমি প্রসব করতে দেখিনি। সে কুকুর, বিড়াল, গোরু, ছাগল যেই হোক না কেন। মানুষ তো দূরের কথা। সুতরাং সে ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি মেয়েটির দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটিকে সে ব্যাপারে আমার অনভিজ্ঞতার কথা জানালাম। তারপরে বললাম প্রসব করানোর জন্য মেয়েটিকে তার পাশের গ্রামে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সে বলল, ঘোড়াটার হঠাৎ পা ভেঙে যাওয়ার জন্য মেয়েটিকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি বললাম, আমাদের মতো এমন দুজন বলবান পুরুষমানুষ থাকতে ঘরে বসে এভাবে হা-হুতাশ করার কোনো অর্থই হয় না। ঘোড়ার বদলে আমরাই গাড়ি টেনে নিয়ে যাব আর নিয়ে যাব আমার বাড়িতে। সেখানে সবরকমের ব্যবস্থা হবে।

সেই যুধ্যমান কুকুর দুটোর ভয়ংকর চিৎকারে কান পাতা দায় হল। তাদের মারামারি থামাবার জন্য বাইরে বেরিয়ে আচ্ছারকম পেটালাম দুটোকেই। এর পর বুদ্ধি করে কুকুর দুটোকে গাড়িটার সঙ্গে জুড়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু ব্যবস্থা করে অসুস্থ মহিলাটিকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আমরা কুকুরে-টানা গাড়িতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে এতটা রাস্তা যে পার হয়ে এসেছি তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ফিরতেও হবে এতখানি রাস্তা পার হয়ে। প্রচুর ধকল সহ্য করে, হাঁপাতে হাঁপাতে, হোঁচট খেতে খেতে—এগিয়ে যেতে লাগলাম একটু একটু করে। মনে হল কুকুরগুলো এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পক্ষে আর গাড়ি টানা সম্ভব হবে না। তারা ভীষণ ক্লান্তিতে গোঙাতে শুরু করল।

বাড়ি পৌঁছোতে প্রায় তিনটি ঘণ্টা সময় লাগল। গাড়ির মধ্যেই মেয়েটি বাচ্চাটাকে প্রসব করল। দেখা গেল বাচ্চা আর বাচ্চার মা দুজনেই সুস্থ আছে। তাদের দুজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ওই গাড়িতে করেই ডাক্তার ডাকতে ছুটলাম। এদিকে বাচ্চাটির বাবা প্রচুর মদ আর খাবার খেয়ে বাচ্চার জন্মদিন পালন করতে লাগল। সেই লোকটির স্ত্রী একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে।

প্রায় এক সপ্তাহ ওরা আমার বাড়িতে থেকে গেল। বাচ্চাটির মা অর্থাৎ ম্যাদময়জেল এলমির এর নির্ভুল দক্ষতায় ভাগ্য গণনার ক্ষমতা আছে। সে আমার হাতের রেখা বিচার করে বলল, আমার পরমায়ু একশো বছরের বেশি আর সুখ

সমৃদ্ধির মধ্যে আমি জীবন কাটাতে পারব।

আজ জুলাই মাসের সেই সতেরো তারিখ। গত বছর ঠিক এই দিন আমি এই স্ত্রীলোকটি এবং তার পরিবারকে আমার বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে সেবা যত্ন করে তাদের বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। চাকরটি সেজন্য আমাকে জানিয়ে গেল, বেদেনি আমার সঙ্গে দেখা করে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। আমি চাকরটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বললাম। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সুন্দর চেহারার অন্য আর একজন মানুষকে দেখে বেশ অবাক হলাম। লোকটা মাথা নীচু করে আমাকে সম্মান জানাল। ম্যাদময়জেল এলমিরকে যে সেবা যত্ন করে আমি তার প্রাণ রক্ষা করেছি, সে-কথা তার অজানা নয়, সেজন্য সে বর্ষপূর্তির উৎসব উপলক্ষ্য করে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে।

রাত্রির মতো তাদের খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম। পর দিন সকাল হতেই তারা আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। এলমির প্রতিবছর সতেরোই জুলাই তার মেয়েকে সঙ্গে করে এখানে আসে। প্রতিবার দেখি তার সঙ্গে একজন করে নূতন সঙ্গী। শুধু পর পর দুবছর একই লোককে দেখেছিলাম মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটা এখন বেশ বড়োসড়ো হয়েছে। সে স্ত্রীলোকটির নূতন সঙ্গীকে পাপা বলে আর আমাকে বলে মঁসিয়ে।

গল্প করতে করতে আমরা বাড়ির কাছে এসে পৌঁছোলাম। আধো আলো আধো অন্ধকারে দেখলাম তিনটি লোক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে তাদের চিনতে পারিনি। সব থেকে লম্বা লোকটি সামনে এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল। তারপর বলল, আমরা আজ এখানে এসেছি আপনাকে আমাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে।

জানতে পারলাম লোকটা বেলজিয়ামের অধিবাসী।

এর পর বাচ্চা মেয়েটা আবৃত্তি করার ভঙ্গিতে উচ্চৈস্বরে আমাকে তার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাল।

ম্যাদময়জেল এলমিরকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, ইনিই কি তোমার মেয়ের বাবা?

সে বলল, না, মঁসিয়ে।

তাহলে ওর বাবা কোথায়? সে বেঁচে আছে তো?

হ্যাঁ, মঁসিয়ে, সে বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে আমাদের দেখা বা কথাবার্তা হয়। সে এখন পুলিশ বিভাগে চাকরি করে।

তাহলে যে তোমার প্রসবের সময় তোমার কাছে ছিল, সে লোকটা কে?

সে একটা নোংরা জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। সে আমার সমস্ত টাকাপয়সা চুরি করে পালিয়ে গেছে।

আর মেয়েটির বাবা? সে কি তার মেয়েকে দেখেছে?

হ্যাঁ, মঁসিয়ে। মেয়েটিকে সে ভীষণ ভালোবাসে কিন্তু তার স্ত্রী আর সন্তান রয়েছে বলে মেয়েটার জন্য কিছু করতে সাহস পায় না।

আদর্শ
Ideal

ভিয়েনা শহরে আমার যে সমস্ত বন্ধু আছেন তাঁদের মধ্যে একজন সাহিত্যচর্চা করেন। তিনি একজন সরল প্রকৃতির মানুষ এবং কট্টর আদর্শবাদের ঘেরাটোপে তাঁর জীবনটা বাঁধা। তাঁর আদর্শের বাড়াবাড়ি আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়। অবশ্য আদর্শবাদে যে আমার আস্থা নেই বা আমি যে আদর্শবাদী নই—এমন মনে করলে ভুল হবে। আমি নিজে আদর্শবাদী বলে অপরের আদর্শ নিয়ে ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ করতে ভালোবাসি না। আমার বন্ধুর আদর্শটা বড় বিদঘুটে এবং বিচিত্র।

সাহিত্য বিষয়ে আমার বন্ধুর প্রতিভাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সূক্ষ্মভাবে অনেক কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁর ভাঁড়ার শূন্য বললেই চলে। সমালোচক হিসাবে তিনি যে সমস্ত অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেন সে সমস্ত শুনলে নিজের সমালোচনার ধারাকে অত্যন্ত হীন বলে মনে হয়। স্ত্রীজাতি তাঁকে কোনোরকমভাবে প্রভাবিত করতে পারে না।

অবশ্য একটা বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে যখন ব্যতিক্রম লক্ষ করি তখন ভীষণ অবাক হই। যখন কোনো অভিনেত্রীর বিষয়ে আমরা আলোচনা করি তখন তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে তার কথা শোনেন। তাদের কথা শুনতে শুনতে তিনি যেন কেমন অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তিনি তখন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। বার্তুলের মতো আশাতু -আকাঙ্ক্ষার রথে চড়ে ভেসে বেড়ান আকাশে। নিজেকে তিনি নাট্যামোদী হেকলাঁদ্র ভাবেন যাঁর কাছে পৃথিবীর সমস্ত নাট্যমঞ্চ সব থেকে পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য হত।

সুতরাং সেই বিচারের মাপকাঠিতে বন্ধুবর স্বাভাবিকভাবেই যে-কোনো একজন অভিনেত্রীর মোহে অন্ধ হয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকেন। তিনি নিজেকে তাঁর আদর্শ প্রেমিক হিসাবে মনে করতেন।

তাঁর পকেট খুঁজলেই এক বা একাধিক প্রেমিকার ছবি পাওয়া যেত। তাঁর মেজাজ মর্জি যখন ভালো থাকত তিনি তখন আমাকে তাঁর প্রেমিকদের ছবি দেখিয়ে যথেষ্ট গর্ববোধ করতেন। অবশ্য ছবিগুলো দেখলে ভুলেও একটি বারের জন্য মনে হত না—এদের কেউ বন্ধুবরের প্রেমিকা হয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে পারে।

এক দিন সকালবেলায় আমরা দুজনে চায়ের টেবিলে বসে চা পান করছিলাম। বন্ধু হঠাৎ তাঁর পকেট থেকে একখানা ছবি বার করে আমার সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন। স্বাভাবিক কৌতূহলে ছবিখানা দেখলাম, নিঃসন্দেহে সুন্দরী। কিন্তু সে সৌন্দর্য উগ্র, লীলায়িত ভাবভঙ্গিতে অসাধারণ। তার সাদা দুটো চোখ অবশ্যম্ভাবীভাবে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে মন্তব্য করলাম, 'চুলগুলো যদি কোনো জীবন্ত নারীর মাথার

চুল বলে মনে না হত, তাহলে ভাবতাম এ নিশ্চয়ই কোনো প্রতিমার ফটো।'

সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহিত হয়ে উঠতে দেখি। সে বলে, 'একদম ঠিক বলেছ। স্ত্রীলোকটিকে জীবন্ত ভেনাস বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হয় না, কী বল?'

'মেয়েটি কে বলো তো?' আমার উৎসুক প্রশ্ন।

'কে আবার! একজন অভিনেত্রী, রঙ্গমঞ্চে সদ্য আবির্ভাব ঘটেছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

এর পর বন্ধু তার গুণকীর্তনে মুখর হয়ে উঠলেন। অস্ট্রিয়া আর জার্মানের মানুষের মুখে মুখে ফিরছে তার নাম। যে মুহূর্তে ভিয়েনার নাট্যমঞ্চে তার আবির্ভাব ঘটেছে, সেই মুহূর্তটিকে স্বাগত জানাবার জন্য অসংখ্য নরনারী এসে উপস্থিত হয় নাট্যমঞ্চে আর তার আশপাশে।

ভেনাসের সৌন্দর্যের সঙ্গে মেয়েটির সৌন্দর্যের তুলনা করা যেতে পারে খুব নিশ্চিত হয়ে কিন্তু আমার মনে হল, নামটা যেন আমি এই প্রথম শুনছি, একেবারে অচেনা নাম।

বন্ধু যা বললেন, তাতে মনে হবে এই তরুণীটি বিরল প্রজাতির একজন নারী এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রগুণে সমৃদ্ধ। প্রথম গুণটি স্বীকার করে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা মেনে নেব? নৈব নৈব চ।

চরিত্রফরিত্রের ব্যাপারে লোকের কথায় কান দিতে আমি মোটেই রাজি নই।

এর পর কিছু দিন বাদে আমি এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে নিছক কৌতূহলবশত ছবির একটা অ্যালবামের পাতা ওলটাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা ছবির দিকে নজর পড়তেই খুব অবাক হলাম। একি, এই ছবিটা তো আগেই দেখেছি! এটা বন্ধুর সেই প্রেমিকার ছবি।

আর যে বন্ধুটির বাড়িতে এসেছি, সে আবার কোনো নীতি আদর্শে বিশ্বাসী নয়, ভয়ংকরভাবে নারীদের প্রতি আসক্ত। জাতিতে ভিয়েনিজ। অসংখ্য নারীর সঙ্গে সহবাসের অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোথায় পেলে এই ভেনাস সুন্দরীর ছবি?'

বন্ধু মোটেই অপ্রতিভ না হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সৌন্দর্যের বিচারে ভেনাসেরই সমগোত্রীয় বলতে পার। তবে রেটটা বড়ো কম। গ্রাঁবে গেলেই তুমি এ জিনিসের স্বাদ পাবে। তবে তার জন্য সামান্য কিছু পয়সা খরচ করতে হবে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'দিব্যি করে বলছি, আমি যা বললাম, তার একবর্ণও মিথ্যে নয়।'

আমি তার কথার জবাবে কিছু বলতে পারলাম না। কীই বা আমার বলার ছিল। লেখক বন্ধুর কথা ভেবে খুব দুঃখ পেলাম। বিরল প্রতিভার অধিকারিণী, সচ্চরিত্রের মানস প্রতিমা একটি গণিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে একটা বিষয়ে তার ধারণা যে সত্যি সেটা খুব শিগগির প্রমাণিত হল। মেয়েটির অভিনয় প্রতিভা যে-কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না—সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। তার অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার গুণে অতি অল্প সময়ের

মধ্যে সে নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ আসনটি অধিকার করে নিল। মফস্‌সল শহরের তুচ্ছ রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ভিয়েনার সব থেকে নামি থিয়েটার কোম্পানিতে যোগ দিল, তার কুশলী অভিনয় ক্ষমতায় মুগ্ধ করে রাখল সমস্ত দর্শককে। বছর দুয়েকের মধ্যে সহনায়িকা থেকে উঠে এল প্রধান নায়িকার আসনে।

মেয়েটির এমন অকল্পনীয় উন্নতির মূলে আমার লেখক বন্ধুর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি এ ব্যাপারে থিয়েটারের মালিককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করলেন। মালিক ভদ্রলোকও মেয়েটিকে পরীক্ষা করে বুঝলেন অভিনয় ক্ষমতা তার অসাধারণ।

দূর দূরান্তের বহু নাট্যসংস্থা বা থিয়েটার কোম্পানি থেকে তার ডাক আসতে লাগল। লেখক বন্ধুটি সব ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করতেন। সবখানেই তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, বিশেষভাবে লক্ষ রাখতেন তার অভিনয় উৎকর্ষতা যেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। মেরি স্টুয়ার্ড নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে সে অভিনয়ের যে দৃষ্টান্ত তৈরি করল তাতে সে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে পেল প্রভূত সম্মান, স্বীকৃতি ও অর্থ। এরপর ভেনাস সুন্দরী ভ্রাম্যমাণ অভিনয়ের জগত থেকে বেরিয়ে এসে উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ এবং বিখ্যাত এক রঙ্গমঞ্চের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করল বিরাট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। এই রঙ্গমঞ্চে সে যে অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার সাক্ষ্য রাখল তার শৈল্পিক দক্ষতার গুণে, তাতে সে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করল। বছর শেষ হতে না হতেই কোর্ট থিয়েটারের মালিক তার কাছে এসে উপস্থিত হল বিরাট অঙ্কের অর্থের প্রস্তাব নিয়ে। এখানেও সাফল্যের তোরণ পেরিয়ে প্রধান নায়িকার পদাভিষিক্ত হল তার অকল্পনীয় অভিনয় দক্ষতার গুণে। একজন নামিদামি সাহিত্যিকের রসালো গল্পের নাট্যরূপে অভিনয় করে একেবারে বাজিমাত করে ফেলল। এক রাতের মধ্যেই শহরের সমস্ত ধনী ও প্রভাবশালী মানুষদের সে নিজের পায়ের কাছে টেনে আনল। মধুভাণ্ডকে ঘিরে মৌমাছিরা যেমন সর্বদা গুঞ্জন করে তেমনি ওই সমস্ত পুরুষেরা তার বিপুল খ্যাতি ও শরীরী আকর্ষণে লুব্ধ হয়ে তার চার পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাজধানীর শ্রেষ্ঠ মক্ষীরানি হয়ে উঠল সে।

বিপুল বিত্তবৈভব আর বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল আমাদের এই ভেনাস সুন্দরী। বিলাসবহুল অট্টালিকা, স্তাবক ও গুণমুগ্ধ মানুষের উপহারের পাহাড়, স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ।

ভেনাস সুন্দরী যত খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে ততই আমার বন্ধু তার থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে যখন একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল, তখন আমার লেখক বন্ধুটি হতাশ বিষণ্ণ মন নিয়ে অন্য আর এক প্রতিভার সন্ধান করতে লাগল।

এর মধ্যে এক দুঃখজনক ঘটনার সূত্রপাত হল। অসংখ্য গুণমুগ্ধ স্তাবকদের ভিড়ে এক কলেজ ছাত্রও ছিল। কিন্তু রূপ ও অর্থকৌলিন্যে সে ছিল অতি নগণ্য। এক অতি সাধারণ পরিবারে সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু তার প্রতি তার ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা সীমাহীন। 'মেরি স্টুয়ার্ড' নাটকে যেদিন সে এই সুন্দরী নায়িকার অভিনয় দেখল,

সেদিন থেকে তার প্রেমে এমন উন্মত্ত হয়ে উঠল, তার অঙ্গুলিহেলনে সে তার জীবনকে হেলায় বিসর্জন দিতে পারে।

প্রেমিকাকে শুধু একটিবার দেখার জন্য কখনও অনাহারে কখনও অর্ধাহারে থেকে তিল-তিল করে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে, যেহেতু তাকে প্রতিটি শোতে দেখা যাবে সেজন্য প্রতিটি শোএর প্রথম সারির টিকিট কিনত সব থেকে বেশি টাকা খরচ করে পাছে সব চাইতে ভালো আসনটি অন্য কেউ অনেক আগে থেকে বুক করে ফেলে, সেই ভয়ে সে শো শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই লাইনে এসে দাঁড়িয়ে থাকত।

রঙ্গামঞ্চে নায়িকার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার সমস্ত মুখমণ্ডল হয়ে উঠত রক্তাভ, হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হত। নায়িকার হাসি দেখে তার মুখটা অকৃত্রিম হাসিতে ভরে উঠত। নায়িকার কান্নায় চোখের জলে তার বুক ভেসে যেত। এর পর মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার অভিনয়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে খুব জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠত।

কোর্ট থিয়েটারের দর্শকদের কাছে এই আবেগপ্রবণ যুবকটি বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠল। তার আচার-আচরণ, ভাবাবেগ আর পাগলামি নিয়ে সবাই হাসিঠাট্টা করতে শুরু করল। ব্যাপারটা নায়িকার কানে পৌঁছোতে খুব বেশি দেরি হল না।

যদিও সে প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে রেখেছে তার প্রেমিকার জন্য, তবুও আর্থিক সঙ্গতি না থাকার কারণে তার পক্ষে তার প্রেমিকাকে কোনো উপহার দেওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং সাত মন তেলও পোড়ে না রাধাও নাচে না। নায়িকার কাছ থেকে তার কোনো আমন্ত্রণও আসে না।

অনেক অধ্যবসায় ও ধৈর্যের পরে একদিন যুবকটি নায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হল।

নায়িকা যখন অভিনয়ের শেষে গাড়িতে এসে উঠত—তখন যুবকটি হাড়কাঁপানো শীত সহ্য করে কাদা বরফে ভিজে গাড়ির কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। কিছু দিন পরে ব্যাপারটা নায়িকার পরিচারিকার নজরে পড়ল। সে জানাল নায়িকাকে। কাজলকালো ডাগর দুটো চোখ মেলে সে সেই তরুণ প্রেমিকের দিকে তাকাল।

তার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে যুবকটি যেন আনন্দে মরে যেতে থাকে। তার সুপ্ত বাসনা স্বপ্নের বিলাসিতা নিয়ে তার চোখ দুটো দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। আনন্দে পুলকে হরষে রোমাঞ্চে সে যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে।

ভাষাহীন চোখ দুটো দিয়ে তারা পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় করে। প্রতিদিন একবার করে যুবকটির মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে। সে হাসিতে ঝরে পড়ে প্রেমের অবদমিত উচ্ছ্বাস। সে হাসি দেখে সে বিগলিত হয়, নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যায়। গাড়িটা যখন ছুটতে শুরু করে তখন বিরহকাতর প্রেমিক তার পিছনে দৌড়োতে থাকে যতক্ষণ তার সাধ্যে কুলায়। তারপরে সে ফিরে আসে। যতক্ষণ না গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ সে ব্যাকুল বিহ্বল দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে বিষণ্ণ মনে একরাশ অবসাদ নিয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে।

গ্রীষ্মের শুরুতে এক দিন প্রচণ্ড ঝড় উঠল আর সেই ঝড়ের সঙ্গে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। যুবক প্রেমিকটি সেদিন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে, কাকভেজা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে উপস্থিত হল প্রেমিকার বাড়ির সামনে। তার দেহ এত অবসন্ন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, মনে হল সে সেখানে পড়ে যাবে। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় সে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল।

হঠাৎ সে দেখতে পেল খুব আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল। খোলা দরজার মধ্য দিয়ে তার চোখের সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল। সে অবাক হয়ে দেখল বলিষ্ঠ চেহারার একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার ভেনাস সুন্দরীর সমস্ত শরীর ঘিরে এমনভাবে আদর করছেন, সেটাকে একমাত্র পুরাণের গল্পে বর্ণিত প্লুটোর পাহারাদার চার মাথাওয়ালা কুকুরটাকে সোহাগ জানানোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নায়িকা যে মুহূর্তে বাতিটা নিভিয়ে দেয়, সেই মুহূর্তে লুকিয়ে থাকা যুবকটির গায়ে সরকারি অফিসারটির পায়ের আঘাত লাগে। ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরোয়াল টেনে বের করেন এবং আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে যুবকটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

ওই ঘটনার পর যুবক প্রেমিক আর খালি হাতে ওখানে যেতে সাহস করে না। সে যখন ওখানে যায় তখন একখানা ছোরা নিয়ে যায় সঙ্গে করে। সেটাকে কোমরে লুকিয়ে রাখে। মনে মনে ঠিক করে ওই ছোরার আঘাতে এক দিন লোকটাকে হত্যা করে সে আত্মঘাতী হবে।

কিন্তু সেরকম সাংঘাতিক কোনো ঘটনা না ঘটলেও এমন একটা ঘটনা ঘটল যা কম বিস্ময়কর নয়। সেদিন অভিনয় শেষ করে হল থেকে বেরিয়ে আসতে ভেনাস সুন্দরীর তার একটু দেরি হল। সে যখন গাড়িতে উঠবে বলে সেখানে এসে দাঁড়াল, তখন বেশ রাত হয়েছে। দেখল, তার গুণমুগ্ধ ভক্তটি রোজকার মতো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে ওঠার পরে সে দরজা বন্ধ না করে হাতের ইশারায় যুবকটিকে কাছে ডাকল।

তার প্রেমিকার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সে বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এক দৌড়ে সেখানে এসে তার পায়ের কাছে রাস্তার ওপর বসে পড়ে। পালকের মতো নরম একটা হাত অতি সাবধানে নিজের দিকে টেনে এনে গভীর আবেগের সঙ্গে চুম্বন করে।

ভেনাস সুন্দরী তার আন্তরিকতা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখে মনে মনে খুব খুশি হয়ে ওঠে। গাড়িতে ঢুকে তার পাশে বসতে বলে। তখন যুবকটি তার হাতখানা আদর করে বুকের কাছে ধরে রেখেছে। গাড়ি থেকে নামার সময়ও সযত্নে, অতি সন্তর্পণে সুন্দরীর হাত ধরে তাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে।

সঙ্গের পরিচারিকাটি যুবকটিকে একটি সুসজ্জিত ঘরে এনে তাকে নরম কৌচের ওপর বসতে দেয়।

একটু পরেই পোশাক বদলে মিষ্টি হেসে যুবকটির কাছে এসে দাঁড়ায়। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে মোটেই সংকোচ না করে লীলায়তি ভঙ্গিতে সে যুবকটির পাশে এসে বসে।

আনন্দে অভিভূত যুবকটির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলে, 'কী গো, আমাকে বোধহয় তোমার খুব ভালো লেগেছে?'

আত্মহারা যুবক চিৎকার করে বলে, 'তুমি যে আমার স্বপ্ন বিলাস, আমার স্বপ্নের রানি।'

কৌতুকোচ্ছ্বাসে হেসে উঠে সে বলে, 'ওগো, তোমার স্বপ্ন অবশ্যই সফল হবে। আমার সাধ্য কী তোমাকে আমি বঞ্চিত করি। তোমার এই প্রেমের মাদকতা, তোমার তরুণ বয়স, তোমার এই আবেগ, তোমার এই একনিষ্ঠ ভালোবাসাকে আমি কী করে উপেক্ষা করব? তোমার সমস্ত ক্ষোভ আর হতাশাকে আমি মুছে দেব। আজ রাত্রির জন্য তুমি শুধু আমার, আমার হয়েই থাকবে।'

প্রকাশে ব্যর্থ আনন্দের আবেগে সে যেন পাগল হয়ে যাবে। অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করতে না পেরে সে নতজানু হয়ে তার পা-দুটো বুকের মধ্যে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

তার আরাধিকা হেসে উঠল, 'এই করছ কী, আমার আর দুটো কথা শোনো। যারা আমাকে প্রচুর দামি উপহারে সম্মান জানায়, আমি তাদের বাহুডোরে বাঁধা পড়ি। যেটুকু জেনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে তোমার আর্থিক কৌলিন্য বলতে কিছুই নেই। তবু নিয়মবিরোধী হয়ে আজকে রাতের জন্য তোমাকে আমি আনন্দ দেব, তোমার বহুদিনের তৃষ্ণা দূর করব। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে, আগামীকাল থেকে তুমি আর আমার কাছে আসবে না বা আমার জন্য এমন উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াবে না। কী, কোনো আপত্তি নেই তো?'

সত্যিই বেচারা! কথাগুলো শুনে তার বুকের ভিতরটা যেন হুহু করে ওঠে। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে মুখটাকে ফ্যাকাশে করে তোলে। ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে তাকায় তার স্বপ্নসুন্দরীর দিকে।

সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'কী, রাজি?'

প্রায় কান্নার সুরে ছেলেটি বলে, 'হ্যাঁ, রাজি।'

ভোরের আলো ফুটে উঠলে দেখা গেল এক ভাগ্যহীন যুবক সমস্ত নৈতিকতা, আদর্শ আর বিবেক বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে টলতে টলতে সুন্দরী অভিনেত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। তাকে দেখে মনে হবে, দেহ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নিংড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে, প্রাণশক্তি যেন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে, যৌবন যেন বিধ্বস্ত, দৃষ্টিতে হতাশার বিভ্রান্তি, চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা। কিন্তু এখনও সে জীবিত আর জীবিত বলে তার মধ্যে যদি এখনও কোনো স্বপ্নের অস্তিত্ব থেকে থাকে—তাহলে তা নিশ্চয়ই থিয়েটারের কোনো সুন্দরী অভিনেত্রীকে ঘিরে নয়।

মঁসিয়ে জোকাস্তে
Monsieur Jocaste

ম্যাডাম, শুনুন, আপনাকে যে কথা বলতে চাই। এক দিন সন্ধ্যাবেলায় বাবার একটা ব্যাভিচারের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া শুরু হয়েছিল, সে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি। আপনি ঝগড়ার সময় আমাকে অনেক কড়া কথা শুনিয়েছিলেন। আপনি ভীষণ রেগে গিয়ে আমাকে যা-নয় তাই বলে অপমান করেছিলেন, সে-কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। সেদিন আমি কিন্তু বাবার পক্ষেই কথা বলেছিলাম। আপনি তার জন্য আমাকে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

আপনার একটা কথা আমাকে ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। আপনি বলেছিলেন, আমি যার পক্ষ নিয়ে কথা বলছি, তার পক্ষে পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি কথা বলবে না। সেই কাহিনিটি আমি সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই।

মানুষকে সময় সময় এমন অনেক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় যখন সে নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়।

মেয়েটির যখন ষোলো বছর বয়স, তখন তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধের বিয়ে হয়। বৃদ্ধ ছিল ভয়ংকর নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে সে সমস্ত কাজ করত। মেয়েটির টাকার লোভে বৃদ্ধ তাকে বিয়ে করেছিল। সুন্দরী মেয়েটির দুচোখে ছিল স্বপ্ন, সে তার জীবনটাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। একটুখানি সুখ, একটুখানি শান্তির জন্য তার মনটা সর্বদা লালায়িত হয়ে থাকত। কিন্তু বিবাহিত জীবনের মধ্যে এসে তার সমস্ত সাধ, সমস্ত স্বপ্ন ধুলোর সঙ্গে মিশে গেল। সে বুঝতে পারে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে গেছে। কিন্তু নূতন এক আশায় তার মনটা উজ্জীবিত হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল তার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটতে পারে একমাত্র তার সন্তানের মধ্য দিয়ে। সেই আশায় সে বুক বাঁধল।

কিন্তু তার সেই আশা ফলবতী হল না—কোনো সন্তান হল না তার। এইভাবে দুটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে একটি যুবককে দেখে মুগ্ধ হল এবং তার প্রেমে পড়ল। ছেলেটি তেইশ বছরের এক যুবক, নাম তার পেয়ারি মর্তেল। মেয়েটিকেও সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।

শীতের এক সন্ধ্যায় মেয়েটির বাড়িতে বসে সে চা পান করছিল। তারা পাশাপাশি বসে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে চলেছিল। কিন্তু দুজনেই ছিল নির্বাক। পরস্পরকে চুম্বন করার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠাধর এক অদম্য আবেগে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। পরস্পরকে আলিঙ্গন করার জন্য আবেগে মথিত হয়ে উঠছিল তাদের ব্যাকুল দুটি হৃদয়।

শালীনতা বা ভব্যতাকে হয়তো চেষ্টা করে বজায় রাখা সম্ভব হয় কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রায় অসম্ভব। প্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণকে সংযত করা

কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং তারা প্রথমে পরস্পরের হাতে হাত রেখে আর বেশি অগ্রসর না হওয়ার জন্য সচেষ্ট হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভব্যতা শালীনতা ও শিষ্টতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে নিবিড় আলিঙ্গানের মধ্যে তারা হারিয়ে গেল। দুটি দেহ এক হয়ে মিশে গেল।

এর পর নিয়মানুযায়ী সে অন্তঃসত্ত্বা হল। সে বুঝতে পারল না তার সন্তানের পিতা কে? তার প্রেমিক না তার স্বামী? কারণ সে তার স্বামীর সঙ্গো নিয়মিত সহবাস করে।

গর্ভধারণ করার পরে সে মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। তার ধারণা হয়েছিল সন্তান প্রসবের সময় তাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে মনে মনে বারবার একটা কথাই উচ্চারণ করতে লাগল, যার ঔরসে এই সন্তানের জন্ম—সে-ই এর দায়িত্ব বহন করবে। সে এর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সে সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকবে। প্রসবের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, এই সমস্ত চিন্তা তার মনটাকে ভয়ংকরভাবে অস্থির করে তুলল।

শেষ পর্যন্ত তার ধারণাই সত্যি হল। মেয়েটি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে ইহলোক থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তার মৃত্যুতে যুবকটি দুঃখে ভেঙে পড়ল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তার শোক দুঃখ যন্ত্রণাকে গোপন করতে পারল না। তাতে মেয়েটির স্বামীর সন্দেহ হল কন্যাসন্তানটি তার স্ত্রীর প্রেমিকের। সুতরাং যুবকটি যাতে তার বাড়িতে আসতে না পারে, মেয়েটিকে যাতে সে আর দেখতে না পায় সেজন্য যুবকটিকে সে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। এর পর কন্যাসন্তানটিকে গোপনে অন্য এক জায়গায় পাঠিয়ে দিল।

এর পর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। সময়ের ব্যবধানে মানুষের দুঃখের স্মৃতি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে, সমস্ত কিছুই সে ভুলে যায়। পেয়ারি মর্টেলের মন থেকে ধীরে ধীরে সবকিছু মুছে যেতে থাকল। সে ব্যবসায়ে উন্নতি করল, উপার্জন করল প্রচুর ধন ও অর্থ বিত্ত। কিন্তু সে আর কাউকে ভালোবাসতে পারল না, পারল না অন্য কারও সঙ্গো ঘর বাঁধতে। একজন উদাসীন মানুষের মতো যান্ত্রিকভাবে জীবন কাটাতে লাগল সে। তার জীবন থেকে যেন হারিয়ে গেছে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ আর উচ্ছ্বাস।

দীর্ঘদিন তার মৃত প্রেমিকার সেই বৃদ্ধ স্বামীর সংবাদ সে পেল না। অনেক চেষ্টা করেও তার কন্যাসন্তানের খবর জোগাড় করতে পারল না, জানতে পারল না সে কোথায় আছে বা কেমন আছে?

এর পর হঠাৎ এক দিন সে একটা চিঠি পেল। যে চিঠি লিখেছে, তাকে সে চেনে না। সেই চিঠি থেকেই সে জানতে পারল মেয়েটির বৃদ্ধ স্বামী মারা গেছে। খবরটা জানতে পেরেই সে অস্থির হয়ে উঠল। তার শিশুসন্তানটির জন্য সে ভীষণভাবে উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল। মেয়েটির খোঁজ পাওয়ার জন্য সে অনেক অর্থ ব্যয় করল। একজন লোকের কাছে জানতে পারল শিশুটি আছে তার এক কাকিমার কাছে। কিন্তু তারা বড়ো গরিব। কায়ক্লেশে তাদের দিন কাটে।

মেয়েটিকে দেখার জন্য, তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। এক দিন সে হাজির হল কাকিমার বাড়িতে। সেখানে গেলে ভদ্রমহিলা তার পরিচয় জানতে চাইলেন। কিন্তু পরিচয় দিতে সে দ্বিধাবোধ করল। চল্লিশ বছরের কাছাকাছি তার বয়স হলেও তার যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা দেখলে বছর পঁচিশ ত্রিশের একজন যুবক বলেই মনে হয়। সে এবার মেয়েটির পিতার পরিচয় গোপন করে, তার কাজকর্ম ব্যাবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানাল ভদ্রমহিলাকে। সে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল সে অপরিমিত ধনৈশ্বর্য অর্থ বিত্তের মালিক।

ইতিমধ্যে তাকে ড্রয়িংরুমে এনে বসানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে একটি মেয়ে এসে ঢুকল ড্রইংরুমে। কিন্তু তাকে দেখে সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কে এই মেয়েটি, এ তো হুবহু তার সেই প্রেমিকার রূপ নিয়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই মুখ, সেই চোখ, সেইরকম হাসি, সেই একইরকম কণ্ঠস্বর। মা আর মেয়ের মধ্যে এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য ভাবাই যায় না। মেয়েটিকে দেখে তার মৃত প্রেমিকার ওপর সমস্ত সুপ্ত ভালোবাসা সুপ্ত জলধারার মতো কল্লোলিত হয়ে উঠল। এর পর তারা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করে একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠল।

বাড়ি ফিরে এসে পুরোনো স্মৃতিভারে সে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। মৃতা প্রেমিকার শোকে সে অস্থির হয়ে পড়ল। সে কাঁদতে লাগল পাগলের মতো।

মেয়েটিকে দেখার জন্য, তার কথা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে সে ছুটে গেল সেই বাড়িতে। মেয়েটির দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশা দেখে তাকে সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কেউ কি তার অভিভাবকত্বকে স্বীকার করে নেবে? তাকে দেখলে লোকে তাকে মেয়েটির প্রেমিক ভেবে নেবে। সে কি মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওরা যে কপর্দকশূন্য। কোন্ অধিকার আর পরিচয়ে সে তার বিয়ের ব্যয় ভার বহন করবে? মেয়েটিকে বিয়ে দেবার চিন্তায় তার মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তবে সে কি তার প্রেমে পড়ে গেল? বাবা হয়ে মেয়ের প্রেমে পড়া। সে- কথা ভাবতে গিয়ে সে যেন কেমন দিশাহারা হয়ে পড়ল। এক দিকে বিবেকের দংশন অন্য দিকে প্রেমের আকর্ষণ। এই দুই বিপরীত মেরুর টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে সে একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

মেয়েটির কাকিমা তার ভাবান্তর লক্ষ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সে মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। তাঁর মনে হল সে তবে অপেক্ষা করছে কেন। তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিক।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা তারা পাশাপাশি বসে প্রেমিক প্রেমিকার মতো অস্পষ্ট মৃদুস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। সে পিতৃসুলভ মানসিকতা নিয়ে তার মেয়ের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। কিন্তু তার স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবৃত্তির তাড়নায় তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল। কিছুক্ষণ পরেও যখন মেয়েটি তার হাতখানা সরিয়ে নিল না—তখন তারও ইচ্ছা হল না হাতখানা সরিয়ে দেবার। ভয়ংকর প্রবৃত্তির তাড়না তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলতে লাগল।

সে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। মেয়েটি এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল। তার মা যেভাবে পেয়ারি মর্টেলকে ভালোবেসেছিল মেয়ের ভালোবাসার প্রকৃতি ছিল একইরকম। তার মায়ের রক্তে ছিল এধরনের প্রাণঘাতী ভালোবাসা আর তাইই তার রক্তে সংক্রামিত হয়েছিল।

সমস্ত বিবেক আর মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে পেয়ারিও প্রেমিকার মতো তার সমস্ত শরীরে চুম্বন করতে লাগল।

মানুষ মাঝে মাঝে এই ধরণের উন্মত্ত অবস্থার শিকার হয়। তারা সেই নীতির কোনো ব্যতিক্রম ঘটাল না। সে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। সে কী করবে কিছুই ভেবে স্থির করতে পারল না।

মেয়েটি যে তাকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছে। সে ভয়ংকর এক কামনার দ্বারা তাড়িত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একজন পুরুষের বুকে। তার সমস্ত সত্তায়, সমস্ত স্নায়ুও সমস্ত ধমনীর মধ্যে উদ্দাম উত্তপ্ত কামের স্রোত জ্বলন্ত লাভার মতো প্রবাহিত হয়ে তাকে যেভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিল, সেই উত্তেজনাকে সে সংযত করতে পারেনি। যৌবনের আকর্ষণের ভয়ংকর উদ্দামতাকে সে প্রতিরোধ করতে পারেনি, হারিয়ে গিয়েছিল সে সেই ঘূর্ণাবর্তের অতল গহ্বরে। তাই সে তার দয়িতের কাছে আত্মনিবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু পেয়ারি যে মেয়েটির ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে। সে যে তারই আত্মজা। হোক সে তাই। কিন্তু সে তার মায়ের সঙ্গে তার কোনো প্রভেদ খুঁজে পায় না। মেয়েটি তার কাছে যেন আরও অনেক বেশি। একাধারে স্নেহ আর প্রেম তার মনের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

সেই মৃতা প্রেমিকার কাছে সে শপথ করেছিল, সারাজীবন সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের দায়ভার গ্রহণ করবে। তার জন্য যদি তাকে কোনো অন্যায় অপরাধ করতে হয়— তাতেও সে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করবে না।

পেয়ারি মেয়েটিকে এত ভালোবেসে ফেলল সে আর অন্য কোনো চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন মনে করল না। বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েও কামনার উৎপীড়নে নিজের কন্যার সঙ্গে দেহসংসর্গ করল।

তার বাবার মৃত্যু হয়েছে। কেউ জানে না তাদের সত্য পরিচয়। এই ভেবে আত্মতুষ্টি লাভ করল। সে মনে মনে বলল, গোপন পাপে আমার সমস্ত সত্ত্বা সমস্ত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাক, তবুও আমি তাকে ত্যাগ করতে পারব না। আমি আমার সমস্ত জীবন ধরে আমার প্রেমিকার মর্যাদা দিয়ে আমার নিজের কাছে ধরে রাখব আর পাপের ভারী বোঝা বইতে বইতে বিবেকের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকব।

এর পরে তারা পরিণয়সূত্রে বাঁধা পড়ল। আমি জানি না, তারা সুখী হয়েছে কি না। তবে আমাকে যদি প্রশ্ন করেন, এই অবস্থায় পড়লে আপনি কী করতেন?

বলতাম, আমি পেয়ারি মর্টেলের পথই অনুসরণ করতাম।

সন্তান
The Child

মঁসিয়ে লেমোনির স্ত্রী একটি সন্তানের জন্ম দিয়েই মারা গেলেন। তিনি বিপত্নীক হলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে এমনভাবে ভালোবাসতেন যে, ভালোবাসাকে কখনও পুরোনো বা ব্যর্থ হতে দেননি। তা এক নূতন স্বাদে, নূতন নূতন ছন্দে, নূতন মহিমায় প্রকাশিত হত। মঁসিয়ে লেমোনির যেমন ছিলেন সৎ, তেমনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। তাঁর সহজ সরলতার জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

যুবক বয়সে তিনি পাশের বাড়ির এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ের প্রেমে পড়লেন। সেই প্রেম পরিণতি লাভ করল বিয়েতে। তাঁর তখন ব্যাবসা রমরম করে চলছে। প্রচুর লাভের সঙ্গে ঘরে আসছে রাশি রাশি টাকা। কিন্তু তাঁর মনে কখনও এ প্রশ্ন জাগেনি, মেয়েটি তাঁকে ভালোবাসে না ভালোবাসে তাঁর অর্থ বিত্ত আর ব্যাবসার সাফল্যকে।

স্ত্রীর সাহচর্য, তাঁর সঙ্গ তাঁকে আনন্দ দেয়। তাঁর প্রেমিকা-স্ত্রীকে তিনি চোখে হারান। অন্য কোনো অপরূপার দিকেও ফিরে তাকাবার তাঁর ইচ্ছা জাগে না। তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বসন্তের রংএ রঙিন হয়ে উঠেছে, নূতন কুসুমে মঞ্জরিত হয়েছে তাঁদের দাম্পত্য জীবন। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন স্ত্রীর মুখের দিকে, অপলক চোখে। খাবার টেবিলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। পরিবেশ পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে খাবারের প্লেটে ঢেলে ফেলেন মদ আর নুনের পাত্রে জল ঢেলে দেন। তারপর যখন ক্ষণিকের জন্য ব্যাকুল বিহ্বলতা অন্তর্হিত হয়, তখন নিজের কাণ্ড দেখে বাচ্চাদের মতো সরলতা মাখানো উচ্চ হাসিতে ভরিয়ে তোলেন ঘরের বাতাবরণ।

মিষ্টি হেসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'দেখলে তো তোমাকে কেমন ভালোবাসি, কতরকমের ভুল যে হচ্ছে!'

স্ত্রীর মুখটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে ওঠে। তিনি ব্রীড়ার মধুর ভঙ্গিতে মুখটাকে এমনভাবে ঘুরিয়ে নেন ঝটিতি মনে হয় স্বামীর ভালোবাসার বাড়াবাড়িতে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে চেষ্টা করেন স্বামীকে সেদিকে নিয়ে আসতে। কিন্তু তিনি তাঁকে সে সুযোগ দেন না—হাত ধরে নিজের কাছে নিয়ে এসে আবেগাপ্লুত স্বরে বলে ওঠেন, 'আমার আদরের জেনি, আমার ছোট্ট জেনি সোনা।'

'ছাড়ো না, লক্ষ্মীটি, এখন কি এসবের সময়! নিজেও খাবে না, আমাকেও খেতে দেবে না।'

লেমোনির কৃত্রিম দুঃখে ভেঙে পড়ে বলেন, 'দেবীর যখন সেরকম ইচ্ছা, তাই হোক।' এই বলে তিনি চামচে করে খাবার মুখে দেন, নিজের প্লেট থেকে আর এক চামচ স্টু তুলে স্ত্রীকে খাইয়ে দেন। কিছু দিন পরে জানা গেল জেনির গর্ভে লেমেনির

সন্তান এসেছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে আনন্দে অধীর হলেন স্বামী স্ত্রী দুজনেই। ওই সময় এক মুহূর্তের জন্য গর্ভবতী স্ত্রীর কাছ ছাড়া হতেন না। সর্বদা স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখতে চাইতেন। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছোল জেনির বৃদ্ধা নার্স তাঁকে বাড়ির বাইরে থেকে বেড়িয়ে আসতে বলতেন।

জেনির ছেলেবেলার এক বন্ধু, মঁসিয়ে ড্যুরেঁটুর, জেনির বাড়িতে সপ্তাহে তিন দিন আসতেন ডিনারের নিমন্ত্রণ খেতে। আসার সময় সুন্দর সুন্দর গোলাপের বুকে নিয়ে আসতেন। মাঝে মাঝে সিনেমা বা থিয়েটারের টিকিট নিয়ে আসতেও ভুলতেন না। লেমোনিরকে প্রায়ই আবেগের সুরে তার স্ত্রীকে বলতে শোনা যেত, তোমার মতো প্রেমময়ী স্ত্রী আর ড্যুরেঁটুরের মতো অকৃত্রিম যার বন্ধু আছে তার ভাবনা কীসের? সে সত্যিই এই পৃথিবীতে একজন সুখী মানুষ।

এর পর চরম দুঃখ শোক আর দুর্ভাগ্যের শিকার হলেন লেমোনির। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু হল। শোকের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু শিশুসন্তানের মুখ চেয়ে তিনি সে ভয়ংকর সিদ্ধান্ত ত্যাগ করলেন। নিজের পরম স্নেহের শিশুসন্তানটির মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়লেন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। এক বিষণ্ণ আবেগ মেশানো ভালোবাসা তাঁকে আচ্ছন্ন করল। এই শিশুসন্তানটিকে যতবার দেখেন ততবার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখচ্ছবি। তাঁর স্ত্রীর শরীরের অংশে তৈরি হয়েছে এই শিশুটির দেহ। এর শরীরের সঙ্গে মিশে আছে তাঁর প্রিয়তমার রক্ত-মাংস-মেদ, এই শিশুটি যেন তাঁর স্ত্রীর জীবন্ত প্রতীক। জেনির প্রাণের স্পন্দন যেন শোনা যাচ্ছে সেই শিশুর দেহে। লেমোনির এই শিশুর মধ্যে জেনিকে যেন স্পষ্ট দেখতে পান। তিনি দেখেন জীবন্ত জেনী যেন তাঁর সামনে বসে আছে। ব্যাকুল আবেগে নিজের সন্তানকে বুকের মধ্যে টেনে নেন লেমোনির।

কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই শিশুটির জন্য তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। সে তার মায়ের খুনী। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সব কথা চিন্তা করেন। স্মৃতির ভারে উদাস বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে তাঁর মন। শিশুটিকে ঘুম পাড়াবার পর তার তুলোর মতো নরম গালে এঁকে দেন স্নেহের চুম্বন।

শিশুটি দিনে দিনে শশীকলার মতো বেড়ে উঠতে লাগল। এক মুহূর্তও তাকে ছেড়ে থাকেন না। যদিও তিনি শিশুটির লালনপালন ও দেখাশোনার জন্য সর্বক্ষণের একজন নার্সকে নিয়োগ করেছেন, তবুও তাকে নাওয়ানো-খাওয়ানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, পোশাক পরানো, সবকিছুই নিজের হাতে করেন। তা না করে তিনি যেন শান্তি পান না।

তাঁর বন্ধু মঁসিয়ে ড্যুরেঁটুরও শিশুটিকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন। সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে আগলে রাখেন। মাঝে মাঝে নিজে ঘোড়া হয়ে ওকে পিঠে তুলে নেন, সমস্ত ঘরটা চার হাতে-পায়ে ঘুরে বেড়ান, হাতের ওপর বসিয়ে নাচান, তারপর চুমোয় চুমোয় শিশুটিকে অস্থির করে তোলেন।

মঁসিয়ে লেমোনির মৃদুস্বরে বলেন, বলতে বলতে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখখানা, জেনির মুখখানা যেন তুলে এনে বসানো হয়েছে। মঁসিয়ে ড্যুরেটুরও বাচ্চাটিকে নিয়ে নাচানাচি করেন, কখনও কখনও কাঁধের ওপর তুলে নেন, কখনও ঘাড়ে আবার কখনও পিঠের ওপর তুলে নাচতে থাকেন, নিজের দাড়ি ভরতি গালে শিশুর নরম গাল ঘষতে থাকেন।

বৃদ্ধা নার্স কিন্তু শিশুটির ওপর মোটেই সন্তুষ্ট নন। তার জন্য এই বয়স্ক লোক দুটি যে কাণ্ডকারখানা করেন তাতে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট বিরক্ত হন। তিনি ও সমস্ত মোটেই পছন্দ করেন না।

'বাচ্চা মানুষ করার কি এই রীতি?' তিনি আরও প্রাঞ্জল হন, 'আপনারা বাচ্চাটাকে এত আদর দিচ্ছেন, দেখবেন শেষ পর্যন্ত যেন বাঁদর হয়ে না ওঠে।'

মঁসিয়ে লেমোনির ছেলের নাম রেখেছেন জাঁ। তার এখন ন বছর বয়স। পড়াশোনা সে কিছুই শেখেনি। অক্ষরপরিচয়ও ঘটেনি তার। বাপের আদর পেয়ে সত্যিকারের একটি বাঁদর হয়ে উঠেছে। তার বায়না মেটাতে মেটাতে অস্থির হয়ে উঠেছেন লেমোনির। যা বায়না করবে তা না করে ছাড়বে না। ভীষণ একগুঁয়ে। রেগে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। এসব দেখেও তার বাবা তাকে তখনও প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। হেন কাজ নেই যা তিনি ছেলের জন্য করতে পারেন না। বায়না ধরলে চাঁদ পেড়ে আনতেও বোধহয় দ্বিধা করবেন না। তাঁর বন্ধুটিও হয়েছেন সেইরকম। রোজ নূতন নূতন খেলনা কিনে আনেন, প্রচুর পরিমাণে কেক মিষ্টি কিনে এনে বাচ্চাটিকে খাওয়ান। বয়স্ক লোক দুটোর কাণ্ডকারখানা দেখে বৃদ্ধা নার্স যারপরনাই বিরক্ত হন। তিনি তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আপনারা যা করে খুব গৌরব বোধ করছেন—আসলে আপনারা বাচ্চাটার মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছেন। আপনারাই ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন। আপনাদের মিনতি করে বলছি, এ ধরনের গৌরবের কাজগুলো আপনারা দয়া করে বন্ধ করুন।'

'তাহলে আপনিই বলুন আমি কী করব?' মঁসিয়ে লেমোনির হাসতে হাসতে বলেন, 'ম্যাডাম, ওকে আমি এত ভালোবাসি, আমি ওর কোনো দাবি পূরণ না করে থাকতে পারি না। ওকে মানুষ করে তোলার জন্য আপনার দিক থেকে যতটা প্রয়োজন মনে করবেন, ততটাই করবেন, তাতে আমি কোনো বাধা দেব না।

জাঁর চেহারাটা হয়ে উঠেছে রিকেটি রোগীর মতো। শরীরটা খুব দুর্বল। এই বয়সে ভালো করে হাঁটাচলা করতে পারে না। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে ওর রক্তশূন্যতার কথা জানিয়েছেন। ওষুধ-পথ্যেরও ব্যবস্থা করেছেন। শরীরে মোটেই আয়রন নেই, ওকে খেতে হবে, লাল মাংস, শাকসবজি, স্যুপমিষ্টি খাওয়া একেবারে নিষেধ। শাকসবজি বা মাংস ও খেতেই চায় না। কেক মিষ্টির ওপর ভীষণ লোভ, ও সমস্ত খাওয়া ছেলের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর জেনেও কিনে আনছেন রাশি রাশি ক্রিম দেওয়া কেক আর মিষ্টি। আর ছেলেটা সেগুলো গোগ্রাসে গিলছে।

এক দিন ডিনার টেবিলে লেমোনির ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসেছেন। দৃঢ়

স্বভাবের বৃদ্ধা নার্স সবজির স্যুপ তৈরি করে আনলেন জাঁ-এর জন্য। বাটির ঢাকনাটা তুলে বললেন, 'স্যুপ খুব চমৎকার হয়েছে। খুব যত্ন করে ওটা রান্না করেছি। আমি একটু চেখে দেখেছি। এত ভালো স্যুপ আগে কখনও রেঁধেছি বলে আমার মনে পড়ে না। জাঁ-এর নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগবে।'

মঁসিয়ে লেমোনির রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলেন হুলস্থুল কাণ্ড এবার একটা ঘটবে। মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন।

বৃদ্ধা নার্স লেমোনিরের বাটিতে সেই স্যুপের খানিকটা ঢেলে দিলেন। তিনিও চামচে করে খেতে খেতে কৃত্রিম প্রশংসার সঙ্গে বললেন, চমৎকার, সত্যিই চমৎকার হয়েছে স্যুপটা।

এবার নার্স ছেলেটির দিকে স্যুপ ভরতি বাটিটা এগিয়ে দিলেন। তারপর একটু সরে এসে লক্ষ করতে লাগলেন।

জাঁ চামচে করে একটুখানি স্যুপ তুলে মুখে দিয়েই অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে বাটিটাকে খানিকটা দূরে ঠেলে দিল। তারপর মুখটাকে বিকৃত করে বলল, একদম জঘন্য। একেবারে বাজে। এ কি মানুষে খায়?

বৃদ্ধা নার্সের মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। প্রায় ছুটে এসে বাটি থেকে চামচে করে স্যুপ তুলে নিয়ে, গাল দুটো টিপে ধরে ছেলেটার মুখের মধ্যে ঢালতে লাগলেন। জাঁ ছটফট করে, মুখ থেকে স্যুপ বের করে দেয়। জাঁএর মুখ থেকে ছেটানো থুতু আর স্যুপে নার্সের পোশাক মাখামাখি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভীষণ রেগে গিয়ে তিনি জাঁএর মাথাটা জোর করে চেপে ধরে গাল দুটো টিপে ধরে হাঁ করিয়ে স্যুপের বাটিটা উপুড় করে দেন জাঁ-এর মুখে। জাঁ হড়হড় করে বমি করে, সমস্ত স্যুপ উঠে আসে তার পেট থেকে। এমনভাবে সে ছটফট করতে থাকে মনে হয় ছেলেটা এখনই দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে।

লেমোনির এতক্ষণ অবাক হয়ে সমস্ত কিছু লক্ষ করছিলেন। ছেলের ওই অবস্থা দেখে তিনি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি চোখ মুখ লাল করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। ধাক্কা দিয়ে নার্সকে ছুঁড়ে ফেলেন দেয়ালের দিকে।

তারপর ভয়ংকর চিৎকার করে ওঠেন, 'বেরিয়ে যা, এক্ষুণি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। ডাইনি কোথাকার, ছেলেটাকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে!'

এ ধরনের হঠাৎ আঘাত আর অপমানে ফুঁসে ওঠে বৃদ্ধা নার্স। টুপিটা মাটিতে গিয়ে ছিটকে পড়ে, চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে, চুলগুলো এলেমেলো হয়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে, 'কী! এতদূর, সাহস তো আপনার কম নয়, আপনি আমার গায়ে হাত তোলেন। বাচ্চাটার ভালোর জন্য ওকে স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলাম, আর আপনি আমাকে খুন করতে চাইছেন, খুনী কোথাকার। বাচ্চাটাকেও আপনি মেরে ফেলবেন। আপনার অতিরিক্ত প্রশ্রয়েই ওর মৃত্যু হবে।'

'এক্ষুনি বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। হতভাগা শয়তান কোথাকার! এ বাড়িতে আর কখনও ঢুকবি না। এই মুহূর্তে তোকে আমি বরখাস্ত করলাম।' তখন সমানে

গর্জন করে চলেছেন মঁসিয়ে লেমোনির। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

'কী কুৎসিত ব্যবহার! কার জন্য আপনার এত রাগ! কার জন্য আপনার এত ভালোবাসা! আপনি কি মনে করেন ও আপনার নিজের ছেলে? আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আপনার ঔরসে ওই সন্তানের জন্ম হয়নি। আপনি ছাড়া একথা সকলেই জানে। মুদি ময়রা থেকে শুরু করে মাংসের দোকানদাররা পর্যন্ত সকলেই। সকলকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, তারা ওই একই কথাই বলবে।' বলতে বলতে কান্নার আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ভিতরে ভিতরে ভীষণ এক অস্বস্তি আর ক্রোধের জ্বালা অনুভব করে তিনি।

অপ্রত্যাশিত, সম্পূর্ণ অকল্পনীয় আঘাতে লোমেনির ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে আসেন বৃদ্ধার দিকে, যেন তাঁকে এক্ষুণি গলা টিপে মেরে ফেলবেন। 'কী বললি, বল্, কী বললি তুই?'

নার্স তখন নিস্পৃহ স্বরে উত্তর দিল, সকলে যে কথা জানে, আমি সে কথাই জানি। আর আমি যেটা জানি, সেটাই বলেছি।

লোমেনির বন্য বরাহের মতো প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে নার্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু বার্ধক্য সত্ত্বেও, গায়ের জোর বা ক্ষিপ্রতা তাঁর কিছু কম ছিল না। তিনি তাঁর আক্রমণ এড়িয়ে এক পাশে সরে গেলেন। টেবিলের অন্য দিকে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, আপনি সত্যিকারের নির্বোধ। ওই ছেলেটির দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। ওর নাক, চোখ, মুখ, চুল, সমস্ত কিছু কি মঁসিয়ে ড্যুরেঁটুর এর মতো নয়। তাঁর সঙ্গে যে ওই ছেলেটির বিরাট এক সাদৃশ্য রয়েছে—তা কি আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে? এবার নিজের চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে বার করুন। আপনার সঙ্গে ওর কোনো কিছুই মিলবে না। আমি যা বলেছি সে বৃত্তান্ত কারও অজানা নয়। শহরের সকলেই ব্যাপারটা জানে আর এত বেশি করে জানে যে ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন মনে করে না। শুধু আপনিই জানেন না।

এ সমস্ত কথা বলার পর নার্স আর সেখানে দাঁড়ানোর সাহস পেলেন না। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

ঘটনাপ্রবাহে, জাঁ পাথরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

এক ঘণ্টা পরে নার্স ফিরে এলেন শান্তভাবে। তখন তাঁর রাগ পড়ে এসেছে। এর মধ্যে এক বাটি পায়েস, কয়েক টুকরো কেক, ক্রিম সমস্ত কিছু নিঃশেষ করেছে। লেমোনির তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

নার্স ছেলেটিকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এসে ওর বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলেন খাবার ঘরে। দরকারি কাজগুলো সেরে ফেললেন। কাজ করছেন কিন্তু মনের মধ্যে প্রচণ্ড অশান্তি। গোটা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, কোথাও কারও সাড়াশব্দ নেই। কান পেতে শোনার চেষ্টা করেন লোমেনিরের ঘর থেকে কোনো শব্দ আসে কি না। না, সেখানে কোনো শব্দ শুনতে পেলেন না। নার্স কি-হোল দিয়ে

দেখলেন লোমেনির শান্তভাবে টেবিলের সামনে বসে কী যেন লেখালেখি করছেন।

নার্স রান্নাঘরে ফিরে এলেন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলেন, এ বাড়িতে ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে।

বসে থাকতে থাকতে নার্সের ঘুম পেয়ে গেল। তিনি তাঁর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম যখন ভাঙল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। রাত আটটার সময় লোমেনির-এর জন্য কফি তৈরি করলেন। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে সাহস পেলেন না। তাঁর বেলের শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু রাত নটা, দশটা, এগারোটা বাজল, লেমোনির বেল বাজালেন না।

বৃদ্ধা নার্স এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। কফির ট্রে হাতে কাঁপতে কাঁপতে লোমোনিরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কান পেতে কোনো শব্দ পেলেন না। দরজায় শব্দ করলেন কিন্তু কোনো সাড়া এল না। সাহস করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই আর্তনাদ করে উঠলেন। কফির ট্রেটা মাটিতে ছিটকে পড়ল।

ঘরের সিলিং থেকে ঝুলে রয়েছে মঁসিয়ে লোমেনিরের নিষ্প্রাণ দেহটা। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ঘাড়টা ভেঙে একদিকে বেঁকে গেছে, জিবটা ঝুলে পড়েছে, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পায়ের এক পাটি চটি মেঝেতে পড়ে আছে। একটা চেয়ার বিছানার গায়ে কাত হয়ে পড়ে আছে।

ভয় আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসেন বৃদ্ধা নার্স। তাঁর চিৎকারে সকলে ছুটে আসে। ডাক্তারকে খবর দিলে তিনি পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন, কিছুক্ষণ আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

টেবিলের ওপর মঁসিয়ে ড্যুরেঁটুরে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া গেল। তাতে লেখা আছে, আমি চললাম ছেলেটিকে দেখো—লেমোনির।

একটি অতি সাধারণ নাটক
An Humble Drama

ভ্রমণপিয়াসি মানুষ যখন ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করার জন্য বেড়াতে বেরোয় তখন যদি কোনো পরিচিত মানুষকে চোখে পড়ে, তার আর আনন্দের সীমা থাকে না।

নিজের দেশ প্যারিস থেকে বেশ কিছু দূরে বেড়াতে গিয়ে সেই প্যারিসের কোনো কলেজের বন্ধু বা কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে যে ভীষণ আনন্দ হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। যখন একটা স্টেজ কোচে একজন অপরিচিত নারীর পাশে বসে সারারাত জেগে কাটাবার মতো সুযোগ ঘটে, তখন কার না খুশিতে মনটা ভরে ওঠে? তারপরে এক সময় ভোরের আলো ফুটে ওঠে। সমস্ত রাত্রি স্টেজ-কোচের খটখট শব্দ শুনতে শুনতে মাথার ভিতরটা ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। জানালার ধারের অবিরাম গোলমালের শব্দে যে কান ঝালাপালা হয়ে যায়, তাতেও মাথার মধ্যে ঝিম ধরে থাকে। সকলের যখন এমন অবস্থা, তখন দেখা গেল আপনার পাশের তরুণীটি আপনার দিকে একবার উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, পোষাক-টোশাকগুলো একটু টেনেটুনে ঠিক করে নিয়ে চুলটুলগুলো একবার ঠিকঠাক করে নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে গাছপালা, সবুজ মাঠ আর বিশাল নীল আকাশের দিকে। একজন অচেনা তরুণীর পাশে সমস্ত রাত কাটিয়ে আপনি যে রোমান্সের স্বাদ পেয়েছিলেন, সে-কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি।

আপনার মনের মধ্যে বেশ কতকগুলো প্রশ্ন এসে জমা হতে থাকে। কে এই তরুণী? কোথা থেকে এসেছেন? এঁর গন্তব্য কোথায়? এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আপনার মনটা খুশি খুশি হয়ে ওঠে। হয়তো কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে হবে আপনার। নিজে হয়তো এক অনাস্বাদিত আনন্দের মধ্যে ডুবে যাবেন কিন্তু কীসের এই আনন্দ বা কেন এই আনন্দ তা হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। মানুষের স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা সার্থক হওয়ার জন্য এমন একজন মানসপ্রতিমার ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এর পরই যখন সেই তরুণী, যাকে ঘিরে আপনার সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত কল্পনা রঙিন হয়ে উঠেছিল, আপনার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, আপনাকে বিদায় না জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে যেতে থাকেন, তখন আপনার মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। উদাস দৃষ্টিতে তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আপনি দেখতে পান, একজন ভদ্রলোক দুটি বাচ্চা আর দুটি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তরুণীর জন্য অপেক্ষা করছেন। তরুণী বধূকে আসতে দেখে ভদ্রলোকের মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি কাছে এলেই ভদ্রলোক দুহাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নেন তাঁকে। তারপর চুমোয় চুমোয় তাঁকে ভরিয়ে দেন। তরুণী বাচ্চা দুটোর হাত ধরে ভদ্রলোককে পাশে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন।

ভদ্রমহিলা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সমস্ত আশা সমস্ত স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। জীবনে হয়তো আপনি আর কোনো দিন তাকে দেখতে পাবেন না। যে তরুণীর সঙ্গে আগে আপনার দেখা হয়নি, যার সঙ্গে একটু কথা বলারও আপনার সুযোগ হয়নি, তাঁর পাশে বসে আপনি সমস্ত রাত জেগে কাটিয়ে দিয়েছেন। তবুও তাঁর বিদায়ক্ষণে আপনার মনটা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে।

কত দুঃখ, কত আনন্দ, বেদনা, হাসিকান্নার স্মৃতি মিশে আছে আমার এই ভ্রমণজীবনে।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সেসময় আমি আভারেন-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা পাহাড় অধ্যুষিত। এই পাহাড়ের নীচ দিয়ে হেঁটে হেঁটে দেখছিলাম পাহাড়ের রূপ আর তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। মনে হল পাহাড়গুলো যেন কতদিনের চেনা। বেশ সহজ সুন্দর স্বাভাবিক। সেগুলো খুব বেশি উঁচু নয়। ভীতিকর কোনো অনুভূতিও জাগায় না। সাঁসি থেকে বেরিয়ে আমি যখন নোতরদামে সাধুদের জন্য তৈরি একটি সরাইখানায় খাওয়াদাওয়া করার জন্য ভিতরে ঢুকে পড়েছি তখন দেখলাম, একজন বৃদ্ধা এক কোণে একটা চেয়ারে বসে খাওয়াদাওয়া করছেন। বৃদ্ধার বয়স প্রায় সত্তর, গৌরবর্ণা, মাথায় অনেকটা লম্বা কিন্তু চেহারাটা অত্যন্ত শীর্ণ, মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। পরনের পোশাক অত্যন্ত সাধারণ। সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন বলে মনে হল। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হবে তিনি সমস্ত বিষয়ে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। তাঁর মুখের চেহারা আমাকে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য করল। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কে এই বৃদ্ধা? কেন তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় পাহাড়ে পাহাড়ে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? এইরকম একটা দুঃসহ জীবন কেন তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন? নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলাম।

ওয়েটারকে ডেকে খাবারের দাম মেটালেন। তারপর নিজের পোশাকটাকে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে, কাঁধের ওপরের শালটাকে নামিয়ে ভাঁজ করে আবার কাঁধের ওপর রাখলেন। এর পর ঘরের কোণ থেকে পর্বতারোহণকারীদের ব্যবহারের উপযোগী একটি লোহার ছড়ি তুলে নিলেন। লক্ষ করলাম ওই লোহার ছড়িটার গায়ে অনেকের নাম খোদাই করা আছে। যা হোক বৃদ্ধা এবার ডাকবাহকদের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে একজন গাইড তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই গাইড ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে দুঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। পাহাড়ের ওপরে যে পঁভি হ্রদ আছে, আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। জায়গাটার নৈসর্গিক পরিবেশ ভারী সুন্দর। চারিদিকে শ্রেণিবদ্ধ পাহাড়। বড়ো বড়ো গাছপালা আর ঝোপঝাড় জঙ্গলে ঘেরা পরিবেশ। তিরতির করে বয়ে চলেছে লেকের শান্ত জল। আয়নার মতো স্বচ্ছ জলে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে লেক ঘিরে বেড়ে ওঠা গাছপালার প্রতিবিম্ব। দেখলাম, সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা লেকের সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই জলের

দিকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর নিষ্প্রভ চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর কোনো কথা না বলে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হনহন করে এগিয়ে গেলেন।

সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁকে আর অন্য কোথাও দেখতে পেলাম না।

পরেরদিন সন্ধ্যার সময়ে আমি মুরল দুর্গে এসে উপস্থিত হলাম। দুর্গটি পাহাড়ি উপত্যকার ঠিক মাঝখানে। আকাশচুম্বী গম্বুজগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রাচীন গৌরবের কাহিনি ঘোষণা করছে। বর্তমানে এটি একটি ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্বত্র এর ইঁট কাঠ পাথর ভেঙে পড়েছে। সিঁড়িগুলোর অবস্থা এমন নড়বড়ে হয়ে গেছে—এর ওপর পা রাখতে ভয় হয়। যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। চার পাশে শুধু বুনো ঝোপঝাড় আর আগাছার জঙ্গল। দুর্গটাকে দেখলে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের একটা কঙ্কাল তার বিরাট শরীরের চিহ্নকে বহন করে চলেছে।

সেখানে যখন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল সেই বৃদ্ধা একটা ভেঙে পড়া দেয়ালের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে তাঁকে কোনো প্রেতমূর্তি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্ধকার চোখসওয়া হয়ে আসতেই ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম মূর্তিটি সেই বৃদ্ধার। দেখলাম তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর মাঝে মাঝে হাতের রুমালটা দিয়ে চোখ মুছছেন।

যখন তাঁকে কিছু না বলেই আমি ফিরে চলে আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, 'মঁসিয়ে, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কাঁদতে দেখেছেন। কিন্তু কান্নার পিছনে কারণ না থাকলে মানুষ কখনও কাঁদে না।'

তাঁর কথার উত্তরে কী বলব ভেবে পেলাম না। বিভ্রান্ত হয়ে উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে একটা কিছু বলার জন্য বললাম, 'মাফ করবেন ম্যাডাম, আমার মনে হয়, ভয়ংকর কোনো দুর্ভাগ্যের পীড়নে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, আপনার ধারণা সঠিক কি ভুল, সে-কথা আমি বলতে চাই না। তবে আমার অবস্থা এখন একটি কুকুরের মতো, নিজের পথ চিনে নিতে যে ভুল করছে।' কথাগুলো বলেই তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

তাঁর শীর্ণ হাতখানি আমার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার সান্ত্বনার কথা শুনে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এর পর একটু শান্ত হয়ে তিনি তাঁর জীবনের কাহিনি বলতে শুরু করলেন :

আজ থেকে বহুবছর আগে, শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এক গ্রাম্য পরিবেশে আমাদের একটা সুন্দর ছিমছাম বাড়ি ছিল। সেখানেই আমি আমার একমাত্র ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে বাস করতাম। মোটামুটি সুখ শান্তি আর আনন্দের মধ্যে আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। সেই অভিশপ্ত বাড়িতে আর আমার কখনও ফিরে যাওয়া হবে না, সে সাহসও আর নেই।

আমার সেই ছেলেটাকে আমার সমস্ত জীবন দিয়ে ভালোবাসতাম। সে যখন

আমার গর্ভে বড়ো হয়ে উঠছে, নড়াচড়া করছে, তখনই তাকে দেখার জন্য আমার সমস্ত মন প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত। ওই অবস্থায় তাকে আমি আদর করতাম। তার একটা সুন্দর নাম দিয়েছিলাম, সেই নাম ধরে তাকে মিষ্টি সুরে ডাকতাম। তার জন্য আমি বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছি। ওই ছেলের জন্য আমি একরকম পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তার যখন আট বছর বয়স হল, তখন তার বাবা তাকে অনেক দূরে শহরের একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের সুতোটা আলগা হয়ে আসতে লাগল। মনে হল সে আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আমাকে তার নিজের মা বলে ভাবতে পারছে না। সে সপ্তাহে এক দিন অর্থাৎ রবিবার বাড়িতে আসত। ওইটুকুতেই আমি যা সান্ত্বনা পেতাম আর তাতেই মনকে প্রবোধ দিয়ে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করতাম।

এর কিছু দিন পরে তাকে প্যারিসের একটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। তখন সে বাড়িতে আসত বছরে মাত্র চারবার। সে যখন বাড়ি আসত তখন প্রতিবারই তাকে একজন নূতন মানুষ বলে মনে হত। প্রতিবারই তার মধ্যে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করতাম। তার হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবকিছুর মধ্যে নূতন এক ভাব, নূতন এক ছন্দ, নূতন এক পর্যায় আবিষ্কার করতাম। সে আমার চোখের আড়ালে বড়ো হয়ে উঠছে। দিনে দিনে তার মধ্যে যে নিত্যনূতন ভাবের স্ফুরণ ঘটছে, তার কামনা বাসনা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ বাসনা, ভয় আশঙ্কা আমাকে বাদ দিয়েই যে তার নিজের মধ্যে গড়ে উঠছে, আমি যে কোনোভাবেই সেসব কিছুর অংশীদার হতে পারছি না—এই চিন্তায় আমি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লাম, দুঃখে আমার মন ভেঙে পড়তে লাগল।

বেশ কয়েকবছর বাদে যখন সে বাড়ি এল, তখন তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দাড়ি গোঁফে সে একজন পুরোপুরি যুবক হয়ে উঠেছে। তাকে চুম্বন করতে গিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কি আমার সেই আদরের পুতুল, যাকে আমি সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলতাম। নিয়মানুযায়ী সে হয়তো আমাকে মা বলে ডাকে। ব্যস, ওইটুকুই।

কিছু দিন পরে সামান্য দু-একদিনের জ্বরে আমার স্বামী মারা গেলেন। তারপরে মৃত্যু হল আমার বাবা-মায়ের। এর পরে আমাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আমার ছোটো বোন দুটি এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। এর পর আমি পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। নিঃসঙ্গতা যেন আমাকে তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল। আমার সন্তান কিন্তু আমার প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেনি। সে আমাকে এক দিন তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমি তার সঙ্গে কিছুদিন বাস করলাম। এর পর আমার যেন কেমন মনে হল, আমার উপস্থিতি তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এরপর তার সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হয়েছে।

একদিন সে বিয়ে করবে বলে ঠিক করল। সেই উপলক্ষে সে আবার আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে বুক বাঁধলাম। মনে হল এবার আমি নিঃসঙ্গ জীবন থেকে মুক্তি পাব। আমরা আবার একসঙ্গে থাকব। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনি নিয়ে ভরা সংসারে সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনের বাকি দিন কটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় অন্য। তার সঙ্গে যার বিয়ে হল যে জাতিতে ইংরেজ। বিয়ের কিছু দিন পরে থেকে সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করতে লাগল। শাশুড়ি পুত্রবধূর মধ্যে চিরকালের যে সংঘাত, সেই সংঘাতের শিকার হলাম আমরা দুজনেই। সুতরাং সেখানকার বাস তুলে দিয়ে আমার সেই পুরোনো বাড়িতে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আবার আমি সেই আগের মতো একা হয়ে গেলাম।

এর পর সে ইংল্যান্ডে তার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠল। আমি বুঝলাম, আমার ছেলে পর হয়ে গেল। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই আমার নিজের সন্তানকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল, তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার স্নেহের আঁচল থেকে। সে এখন প্রতি মাসে একখানা করে চিঠি দিয়ে তার কর্তব্য করে। প্রথম দিকে সে নিজে এসে আমার খোঁজখবর নিত। সুবিধাঅসুবিধাগুলো বুঝে নিয়ে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করত। এখন সে আমার কাছে আসাই বন্ধ করে দিয়েছে।

দীর্ঘ চার চারটি বছর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এতদিনে তার মুখের বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার কপালে ভাঁজ পড়েছে, সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। ভেবে অবাক হচ্ছি, সেই শিশু এখন বৃদ্ধ হয়েছে। এক দিন সে তার মায়ের অজ্ঞাতে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাবে। আমার সঙ্গে বোধহয় আর কোনো দিন তার দেখা হবে না। আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় এইভাবেই একা একা রাস্তার কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াই। মঁসিয়ে, দয়া করে আপনি এখান থেকে চলে যান, আমার কাহিনি আপনাকে শোনাতে গিয়ে পুরোনো সমস্ত কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছে। তাতে আমি এক নিদারুণ মর্মবেদনায় বিদ্ধ হয়ে চলেছি।

বৃদ্ধার কষ্ট বাড়াবার জন্য নিজেকে দোষী করতে চাইলাম না। পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে নেমে আসতে লাগলাম। আসার সময় লক্ষ করলাম, বৃদ্ধা একটি ভাঙা দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন চুপ করে, তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে। দেখলাম তাঁর পোশাকের প্রান্তভাগ আর কাঁধের শালটা বাতাসে উড়ছে পত পত শব্দে।

মৎস্য শিকারের কাহিনি
A Fishing Excursion

গোটা প্যারিস শহরটাকে শত্রুসৈন্যরা ঘিরে রেখেছে। চারিদিক শুনশান, দুর্ভিক্ষে ধুঁকছে সমস্ত শহরটা। ক্বচিৎ দুই-একটা চড়ুই নজরে পড়ে। মানুষ যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে পেটপুরে।

জানুয়ারি মাসের এক রোদ ঝলমলে সকালে প্রচণ্ড ক্ষুর্ধাত মঁসিয়ে মরিসত প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে বিষণ্ণ মনে বুলেভার্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ঘড়ি তৈরির ব্যবসা তাঁর। বেড়াতে বেড়াতে মিলিটারির পোশাক পরা এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরিসত হাতে একটা বেতের লাঠি আর পিঠে একটা টিনের বাক্স নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যেতেন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলম্বে নেমে, হাঁটাপথে পৌঁছে যেতেন ম্যারেন্টে দ্বীপে। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে মাছ ধরতেন।

সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় মঁসিয়ে সভেজের। এই ভদ্রলোকটিরও মাছ ধরার প্রচণ্ড নেশা। রিউ-নোতরদাম-লোরেতিতে তাঁর একটা ফিতের দোকান ছিল। ক্রমে তাঁদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাঁরা পাশাপাশি বসে এক মনে মাছ ধরতেন। সেসময় প্রায়ই তাঁরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। কিন্তু কোনো কোনো দিন, যখন বসন্তের সমাগমে নবীন পত্র পুষ্পে সেজে উঠত প্রকৃতি, যখন বসন্তের প্রভাতসূর্য আকাশের বুকে সোনা রং ছড়িয়ে মানুষের মনকে আনন্দে বিহ্বল করে তুলত তখন মরিসত উচ্ছসিত হয়ে উঠতেন, কী অপূর্ব! কী সুন্দর!

মঁসিয়ে উত্তরে বলতেন, সত্যিই, এর কোনো তুলনাই হয় না। সূর্যের শেষ অস্তরাগ যখন গাছের পাতায় পাতায় সোনা রং ছড়িয়ে দিত তখন দুই বন্ধুর মধ্যে নেমে আসত নিঃসীম নীরবতা।

প্রকৃতির এই রূপ কিছুক্ষণ উপভোগ করে সভেজ বলতেন, কী মনোরম প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য! তখন দুই বন্ধু ক্ষণিক নীরবতার মধ্য দিয়ে পরস্পরের অনুভূতিকে উপলব্ধি করতেন।

পরস্পরকে তাঁরা অভিনন্দন জানিয়ে অতীত এবং বর্তমানের ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে করতে পাশাপাশি হাঁটতেন।

মরিসত বিষণ্ণ স্বরে বলতেন, আজকের আবহাওয়াটা কী মনোরম! এ বছরের মধ্যে আজকের দিনটাই বোধহয় সব থেকে সুন্দর। আচ্ছা, আমাদের মাছ ধরতে যাওয়ার কথা তোমার মনে আছে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আবার যে কবে যাব!

এর পর তাঁরা একটা কাফেতে ঢুকে অ্যাবিসিন্থ খেলেন। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দ্বিতীয়বার অ্যাবিসিন্থ খেয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁরা অল্প অল্প টলছেন, খালি পেটে অ্যাবিসিন্থ খাওয়ার ফল।

বসন্তের মৃদু বাতাসে মঁসিয়ে সভেজের নেশা বেশ জমে উঠেছে। তিনি বললেন, 'চলো।'

'কোথায়?'

'মাছ ধরতে।'

'কোথায় যাবে মাছ ধরতে?'

'কেন? কলম্বের সেই পুরোনো জায়গাটায়। যেখানে আমরা আগে মাছ ধরতে যেতাম। ওখানে ফরাসি সৈনিকরা ঘাঁটি গেড়েছে। আমি কর্নেল ডুমেলিনকে ভালো করেই চিনি। তিনি আমাদের সেখানে যাবার অনুমতি দিতে কোনো আপত্তি করবেন না।'

আনন্দে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন মরিসত, 'অবশ্যই আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

ঘণ্টাখানেক পরে তাঁরা মাছ ধরার সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে হাজির হয়েছেন কর্নেলের বাংলোয়। তাঁদের ছেলেমানুষের মতো অনুরোধে তিনি না হেসে থাকতে পারলেন না। তাঁদের মাছ ধরার জায়গায় যাওয়ার জন্য একখানি ছাড়পত্র দিয়ে তাঁদের দাবি পূরণ করলেন।

প্রায় বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁরা প্রহরীর ব্যারাকের কাছে উপস্থিত হলেন। এর পর তাকে সেই অনুমতিপত্রখানি দেখিয়ে কলম্বের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তাঁদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলেন। আর্জেন্টেউলের সমস্ত রাস্তাটা এবং নানটেরি যাওয়ার পথে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি একেবারে শুনশান, জনশূন্য। নিস্তব্ধ অর্গেমেন্ট এবং স্যানয়িস পাহাড় দুটো সমতলভূমির মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এই পাহাড়ের যে-কোনো একটির ওপর থেকে চার পাশের সমস্ত কিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

মঁসিয়ে সভেজ পাহাড়গুলোর দিকে দেখিয়ে বললেন, 'প্রাশিয়ান সৈন্যরা ওই পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সমস্ত দিকে নজর রাখছে।'

এ পর্যন্ত একজনও প্রাশিয়ান সৈন্যের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁরা জানেন যে ওরা প্যারিসের চারিদিকে ছড়িয়ে থেকে অবাধে হত্যা আর ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত অজানা অচেনা বিজয়ী সেনাবাহিনীর প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতির সঙ্গে মেশানো ভয়ংকর এক বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণা তাঁদের সমস্ত মনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করল।

মরিসত বললেন, 'মনে কর, আমাদের সঙ্গে যদি ওদের কারও একজনের দেখা হয়ে যায় তখন কী হবে?'

সত্যিকারের প্যারিসবাসীদের মতো বিদ্রূপের স্বরে সভেজ বললেন, 'আমরা ওদের

আমাদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেতে বলব।' কিন্তু ভয়ংকর সেই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্য দিয়ে আর অগ্রসর হবেন কি না—এ নিয়ে দুজনেই বেশ দ্বিধান্বিত হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত সভেজ সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'এসো, খুব সাবধানে এগোই আমরা।'

ভীতসন্ত্রস্তভাবে চার দিকে তাকাতে তাকাতে নিজেদের ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে রেখে অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন। নদীর কাছে পৌঁছোতে গেলে একফালি ফাঁকা জায়গা পার হয়ে যেতে হয়। ওই ফাঁকা জায়গাটুকু পার হবার জন্য এবার তাঁরা দৌড়োতে আরম্ভ করলেন এবং দৌড়োতে দৌড়োতে নদীর ধারে পৌঁছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে রইলেন। তাতেই তাঁরা যেন খানিকটা স্বস্তি পেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মরিসতের মনে হল কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে, তার পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পেয়েছেন। মন দিয়ে শব্দটা শোনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু না, কোনো শব্দই তিনি শুনতে পেলেন না। তাঁরা এখন সম্পূর্ণ একা। ছোট্ট দ্বীপটি তাঁদের অপরের চোখের আড়াল করে রাখল। যে বাড়িটাকে রেস্তোরাঁ হিসাবে ব্যবহার করা হত সেখানে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সুতরাং তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে মাছ ধরতে বসে পড়লেন।

সভেজ প্রথম মাছটা ধরলেন। মরিসত ধরলেন দ্বিতীয় মাছটি। প্রতি মিনিটে তাঁরা একটা করে মাছ ধরে পায়ের কাছে ঝুড়িটায় রাখতে লাগলেন। রুপোলি রং-এর মাছগুলো স্বচ্ছ জলে রুপোর আভা ছড়িয়ে সাঁতার কাটছিল। দীর্ঘদিন পরে সেই পুরোনো আনন্দের স্বাদ নূতন করে ফিরে পেয়ে তাঁরা নিজেরা যেন হারিয়ে গেলেন সম্পূর্ণ এক অন্য জগতে। তাঁরা সবকিছু ভুলে গিয়ে মাছ ধরার আনন্দে মেতে রইলেন। এমনকি যুদ্ধের কথাও ভুলে গিয়ে নতুন উদ্যমে জলে ছিপ ফেলে বসে রইলেন।

হঠাৎ কামানের শব্দে তাঁদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। দেখলেন মন্ট ভ্যালেরিনের কামান থেকে গোলা ছুটে বেরিয়ে আসছে। মরিসত উপরের দিকে না তাকিয়ে দেখলেন কামানের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারপরে আবার শোনা গেল কামানের গর্জন। এইভাবে পর পর গোলা ফাটার শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলল।

সভেজ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আবার ওরা শুরু করেছে। শান্ত স্বভাবের মরিসত হঠাৎ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠলেন, নির্বোধের দল! একে অন্যকে হত্যা করে এরা যে কী আনন্দ পায়!'

সভেজ বললেন, 'ওরা শুধু নির্বোধ নয়, জানোয়ারের থেকেও সাংঘাতিক। যতদিন দেশে সরকারের অস্তিত্ব থাকবে—ততদিন এইভাবেই চলবে।

'এটা কি জীবন? এইভাবে আতঙ্ক ভয় আর ত্রাসের মধ্যে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয়?'

মরিসত হাসতে হাসতে বললেন, তাহলে তুমি বলছ মরে যাওয়া এর থেকে ভালো?'

এর পর তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলেন। ওদিকে অন্য প্রান্ত থেকে মন্ট ভ্যালেরিনের কামান সমানে গর্জন করে চলল।

এর মধ্যে তাঁদের পিছনে কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলেন। তাঁরা ফিরে দেখলেন তাঁদের পিছনে বিরাট চেহারার চারজন প্রশিয়ান সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে কালো রং-এর মিলিটারির পোশাক। চারটি রাইফেলই তাঁদের দিকে তাক করা। চমকে ওঠার জন্য তাদের ছিপগুলো হাত থেকে জলে পড়ে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা তাঁদের হাত-পা বেঁধে নৌকোতে নিয়ে এল এবং নদী পার করে তাঁদের একটা দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হল। আমার বন্ধুরা ভেবেছিলেন— দ্বীপটি জনশূন্য এবং তাঁরা চেষ্টা করলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, একটা বাড়ির কাছে কম করে কুড়িজন প্রাশিয়ান সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন দৈত্যাকৃতির মানুষ, পোশাক দেখলেই বোঝা যায় সে অফিসার পদাধিকারী, একটা চেয়ারের দুদিকে পা ছড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে বসে বসে বিরাট একটা পাইপ টানছে। তাঁদের দেখতে পেয়ে চোস্ত ফরাসি ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, সারাদিন কেমন মাছ ধরা হল? নিশ্চয়ই অনেক মাছ পেয়েছেন? বেশ বড়ো বড়ো, তাই না?'

ঠিক সেসময় একজন সৈন্য মাছভরতি জালের থলিটা তার পায়ের কাছে এনে ফেলল। এর পর অফিসার হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছি অনেক মাছ ধরেছেন। যা হোক, ও ব্যাপারে আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের গুপ্তচর হিসাবে পাঠানো হয়েছে। মাছ ধরার ব্যাপারটা আপনাদের একটা চাল, ভেবেছিলেন এইভাবে আমাদের সমস্ত গোপন খবর সংগ্রহ করবেন। কিন্তু যত বোকা ভাবছেন, তত বোকা আমি নই। গুলি করে মারব বলে আমি আপনাদের ধরে এনেছি। আমি এই কাজ করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আমার কিছু করার নেই, যুদ্ধ যুদ্ধই। নিশ্চয়ই প্রহরী-ব্যারাকে কোনো অনুমতিপত্র দেখিয়ে এদিকে আসার সুযোগ পেয়েছেন। সেটা যদি আমাকে দেখাতে পারেন তাহলে আপনাদের আমি মুক্তি দেব।'

রক্তহীন বিবর্ণ মুখে দুই বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন কিন্তু অফিসারের কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

'আমি কথা দিচ্ছি, ব্যাপারটা কেউ জানতে পারবে না, এটা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে ফিরে যাবেন। কিন্তু যদি সেই অনুমতিপত্র দেখাতে না পারেন তাহলে জেনে রাখুন, আমার লোকেরা আপনাদের গুলি করে মেরে ফেলবে। ভেবে দেখুন, কী করবেন?'

তাঁরা তখনও স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার প্রাশিয়ান অফিসারটি নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাদের দেহদুটো নদীর জলে তলিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আপনাদের পরিবারের লোকেরা, আত্মীয়পরিজন

বা বন্ধুবান্ধব আপনাদের ফেরার জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন।'

এই সমস্ত কথা শোনার পরেও তাঁরা একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন না। এদিকে একটানা কামানের গর্জন শোনা যেতে লাগল। অফিসার জার্মান ভাষায় কয়েকজন সৈন্যকে কী একটা নির্দেশ দিয়ে চেয়ারটাকে বন্দিদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিল। তাঁদের থেকে কুড়ি ফুট দূরে এক স্কোয়াড সৈন্য প্রস্তুত হয়ে অফিসারের আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল।

অফিসার আবার বলল, 'আমি আপনাদের আর এক মিনিট সময় দিচ্ছি, এক সেকেন্ডও বেশি নয়। এর মধ্যে আপনাদের মনস্থির করতে হবে।'

এর পর হঠাৎ প্রাশিয়ান অফিসারটি দুই বন্ধুর কাছে গিয়ে মরিসতকে এক পাশে এনে ফিশ ফিশ করে বলল, 'শিগগির মঁসিয়ে, অনুমতিপত্রখানা দেখান, আপনার বন্ধু কিছুই জানতে পারবেন না। তিনি মনে করবেন, আমি আমার মত বদলেছি।' কিন্তু মরিসত কোনো কথাই বললেন না। তিনি আগের মতোই চুপ করে রইলেন।

এর পর সভেজকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে একই কথাই বললেন কিন্তু তিনিও কোনো কথা বললেন না। অফিসারের আদেশ পেয়ে সৈন্যরা তাদের লক্ষ স্থির করল। সেই মুহূর্তে মরিসতের চোখ গিয়ে পড়ল কয়েক ফুট দূরে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা সেই জালের তৈরি ব্যাগটার দিকে। মাছগুলো তখনও তার মধ্যে লাফালাফি করছে। এই দৃশ্য তাঁকে বেশ দুর্বল করে ফেলল। তিনি যথাসাধ্য তাঁর আবেগকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। এর পর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিদায়, মঁসিয়ে সভেজ, চিরবিদায়।'

'বিদায়, মঁসিয়ে মরিসত।'

তাঁরা পরস্পরের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয়ংকর এক আবেগে তাঁরা থরথর করে কাঁপছিলেন।

অফিসার আদেশ দিল, ফায়ার—

একসঙ্গে বারোটা রাইফেল গর্জে উঠল। সভেজ সোজা উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দীর্ঘদেহী মরিসত ঘুরতে ঘুরতে তাঁর বন্ধুর শরীরের ওপর পড়ে গেলেন। মরা মাছের মতো ঘোলাটে চোখ দুটো তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। রক্তের স্রোত বয়ে চলেছিল বুকের গুলিবিদ্ধ ক্ষত থেকে।

অফিসারের আদেশ পেয়ে তারা কয়েক গাছা দড়ি আর বড়ো বড়ো কতকগুলো পাথরের টুকরো নিয়ে ফিরে এল। সেই পাথরগুলো মৃত দুজন ফরাসির পায়ের সঙ্গে বেশ শক্ত করে বাঁধল। তারপর চারজন টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে এল। এর পর দেহ দুটোকে চ্যাংদোলা করে তীর থেকে যতদুর সম্ভব দূরে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পাথরের ভারে ধীরে ধীরে দেহ দুটো ডুবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জলের ওপরে কতকগুলো বুদ্‌বুদ্‌ আর ছোটো ছোটো কতকগুলো ঢেউ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। ধীরে ধীরে নদীর জল শান্ত হয়ে এল। শুধু রক্তমেশানো ছোট্ট একটা ঢেউ তীরের কাছে এসে আবার জলের সঙ্গেই মিশে গেল।

এর পর অফিসার সেই বাড়িটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, মাছগুলোই ওদের দেহ দুটো ঠুকরে ঠুকরে শেষ করে ফেলবে।

অফিসার এবার থলে-ভরতি জীবন্ত মাছগুলোকে একবার দেখে নিয়ে থলিটা তুলে নিল, হাসতে হাসতে হাঁক পাড়ল, 'উইলহেম!'

সাদা পোশাক পরা একজন সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। অফিসার তার হাতে মাছের থলিটা দিয়ে বলল, 'জীবন্ত মাছগুলো ভেজে আমাকে দেবে। ওগুলো দারুণ খেতে।' এই বলে চেয়ারের ওপর জাঁকিয়ে বসে পাইপে আগুন ধরাল।